# উদ্বোধন



উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত

মাঘ, ১৩৭৬

৭২তম বর্ষ, ১ম সংখ্যা

উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা ৩

# উদ্বোধন, মাঘ ১৩৭৬

## বিষয়-সূচী


| বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| ১। দিব্য বাণী | ... ... | ... ১ |
| ২। কথাপ্রসঙ্গে | ... ... | ... ৩ |
| উদ্বোধনের নববর্ষ | | |
| "উদ্বোধনের প্রস্তাবনা" | | |
| ৩। বৈদান্তিক ঈশ্বরবাদের কার্যকারিতা | | |
| —নিঃস্বার্থপরতা | স্বামী সারদানন্দ | ... ৮ |


*

বিষয়-সূচী


| | বিষয় | | লেখক | | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|---|---|---|
| ৪। | আমাদের জাতীয় জীবনাদর্শ | | স্বামী আদিনাথানন্দ | ... | ৯ |
| ৫। | আত্মদর্শন | ( কবিতা ) | শ্রীমতী সুজাতা প্রিয়ংবদা | ... | ১১ |
| ৬। | বিবেকানন্দ ও বেদান্তদর্শন | | ডক্টর ঝরণা ভট্টাচার্য | ... | ১২ |
| ৭। | আমেরিকায় কালীপূজা | | স্বামী শ্রদ্ধানন্দ | ... | ১৬ |
| ৮। | ব্রত | ( কবিতা ) | শ্রীগোপালচন্দ্র সাধু | ... | ২১ |
| ৯। | শ্রীকৃষ্ণ—তাঁহার আদর্শ ও শিক্ষা | | স্বামী তেজসানন্দ | ... | ২২ |
| ১০। | প্রার্থনা | ( কবিতা ) | শ্রীকৌশিকচন্দ্র দাস | ... | ২৭ |
| ১১। | স্বামী বিবেকানন্দের 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য'-প্রসঙ্গে | | শ্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোষ | ... | ২৮ |
| ১২। | স্বামী বিবেকানন্দের স্বদেশমন্ত্র | | শ্রীতারকনাথ ঘোষ | ... | ৩২ |
| ১৩। | স্বামী ব্রহ্মানন্দের অপ্রকাশিত পত্র | | ... | ... | ৩৭ |
| ১৪। | স্বামী প্রেমানন্দের অপ্রকাশিত পত্র | | ... | ... | ৩৯ |
| ১৫। | স্বামী তুরীয়ানন্দের অপ্রকাশিত পত্র | | ... | ... | ৪০ |

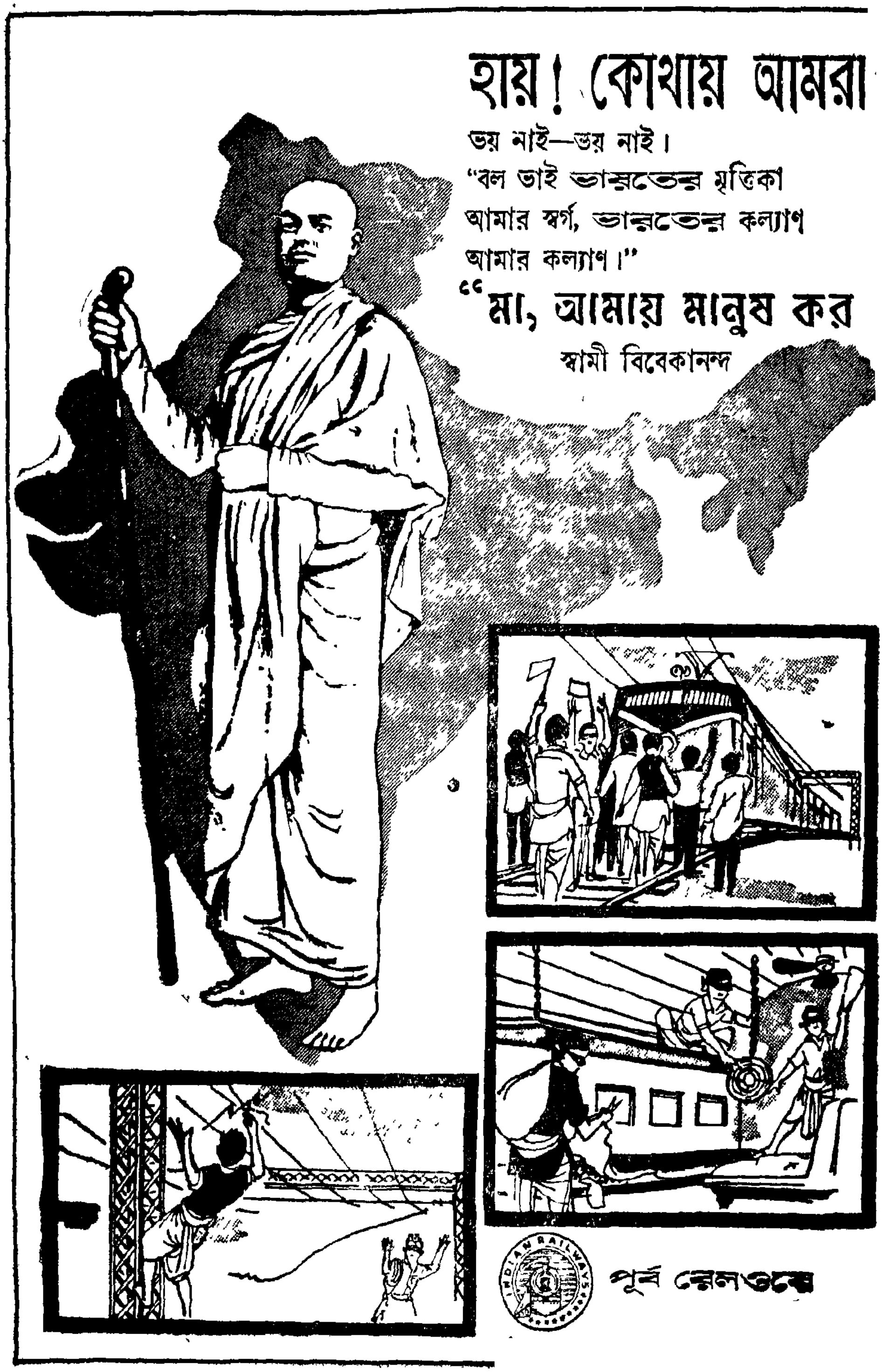
বিষয়-সূচী


| | বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|---|
| ১৬। | স্বামী অখণ্ডানন্দের অপ্রকাশিত পত্র | ... ... | ৪১ |
| ১৭। | স্বামীজীর স্মৃতি | রীভস্ ক্যালকিনস্ ... [ অনুবাদক : স্বামী চেতনানন্দ ] | ৪২ |
| ১৮। | অস্তিত্বের সীমা | শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল নাথ ... | ৪৬ |
| ১৯। | অসীম করুণাময় ( কবিতা ) | শ্রীশান্তশীল দাশ ... | ৪৮ |
| ২০। | সমালোচনা | ... ... ... | ৪৯ |
| ২১। | শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ | ... ... ... | ৫১ |
| ২২। | বিবিধ সংবাদ | ... ... ... | ৫৬ |

# উদ্বোধন, ফাল্গুন ১৩৭৬

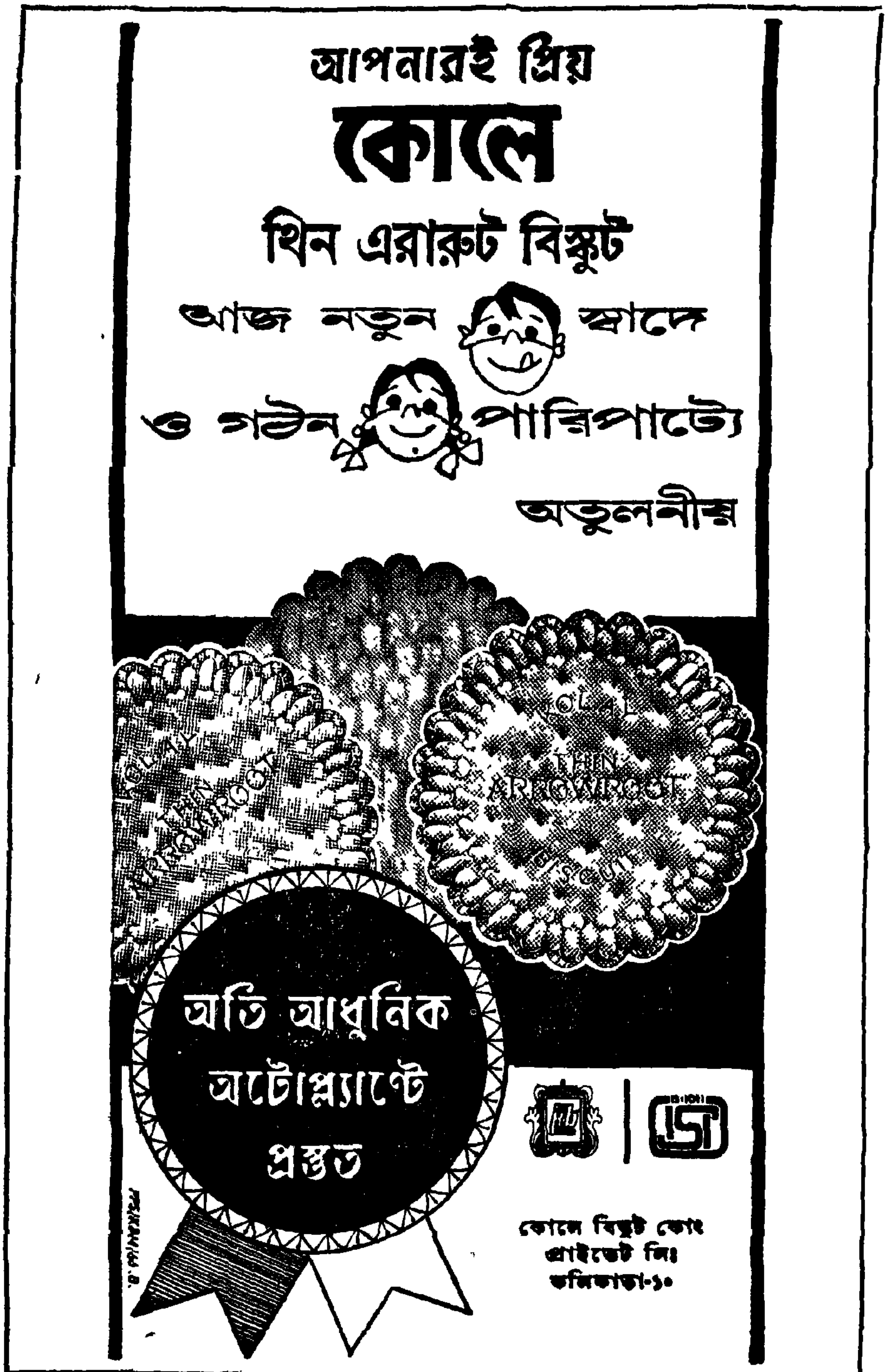
## বিষয়-সূচী


| বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| ১। দিব্য বাণী | ... ... ... | ৫৭ |
| ২। কথাপ্রসঙ্গে | ... ... ... | ৫৮ |
| যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ | | |
| ৩। অপ্রকাশিত পত্র : | | |
| (ক) স্বামী ব্রহ্মানন্দের | ... ... ... | ৬২ |
| (খ) স্বামী প্রেমানন্দের | ... ... ... | ৬৩ |
| (গ) স্বামী তুরীয়ানন্দের | ... ... ... | ৬৪ |


হায়! কোথায় আমরা
ভয় নাই—ভয় নাই।
"বল ভাই ভারতের মৃত্তিকা
আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ
আমার কল্যাণ।"
"মা, আমায় মানুষ কর
স্বামী বিবেকানন্দ
INDIAN RAILWAYS
পূর্ব রেলওয়ে

## বিষয়-সূচী


| বিষয় | | লেখক | | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|---|---|
| ৪। শ্রীরামকৃষ্ণ ও হাটে প্রেমের হাঁড়ি-ভাঙ্গার রঙ্গ-কথা | | স্বামী বুধানন্দ | ... | ৬৫ |
| ৫। নাহং নাহং | ( কবিতা ) | শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় | | ৭৫ |
| ৬। শ্রীকৃষ্ণ—তাঁহার আদর্শ ও শিক্ষা | | স্বামী তেজসানন্দ | ... | ৭৬ |
| ৭। এস মধু ফাল্গুন | ( কবিতা ) | শ্রীমতী অমিয়া ঘোষ | ... | ৮০ |
| ৮। শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজের পদপ্রান্তে | | স্বামী লোকেশ্বরানন্দ | ... | ৮১ |
| ৯। এসো মা জগদ্ধাত্রী | ( কবিতা ) | সেখ সদরউদ্দীন | ... | ৮৬ |
| ১০। সর্বভাবময় শ্রীরামকৃষ্ণ | | স্বামী জীবানন্দ | ... | ৮৭ |
| ১১। পূজা-পুষ্প | ( কবিতা ) | মহাকবি জি. শংকর কুরুপ [ অনুবাদিকা : শ্রীমতী সুজাতা প্রিয়ংবদা ] | | ৯২ |
| ১২। স্বামী বিবেকানন্দের অনুবাদ-গ্রন্থ : 'শিক্ষা' | | শ্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোষ | ... | ৯৩ |
| ১৩। বার্টাণ্ড রাসেল | | শিবদাস | ... | ৯৬ |



## বিষয়-সূচী


| | বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|---|
| ১৪। | জোসেফিন ম্যাক্‌লাউড | ব্রহ্মচারী শ্যামল | ৯৮ |
| ১৫। | সমালোচনা | ... | ১০৫ |
| ১৬। | শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ | ... | ১০৭ |
| ১৭। | বিবিধ সংবাদ | ... | ১১১ |

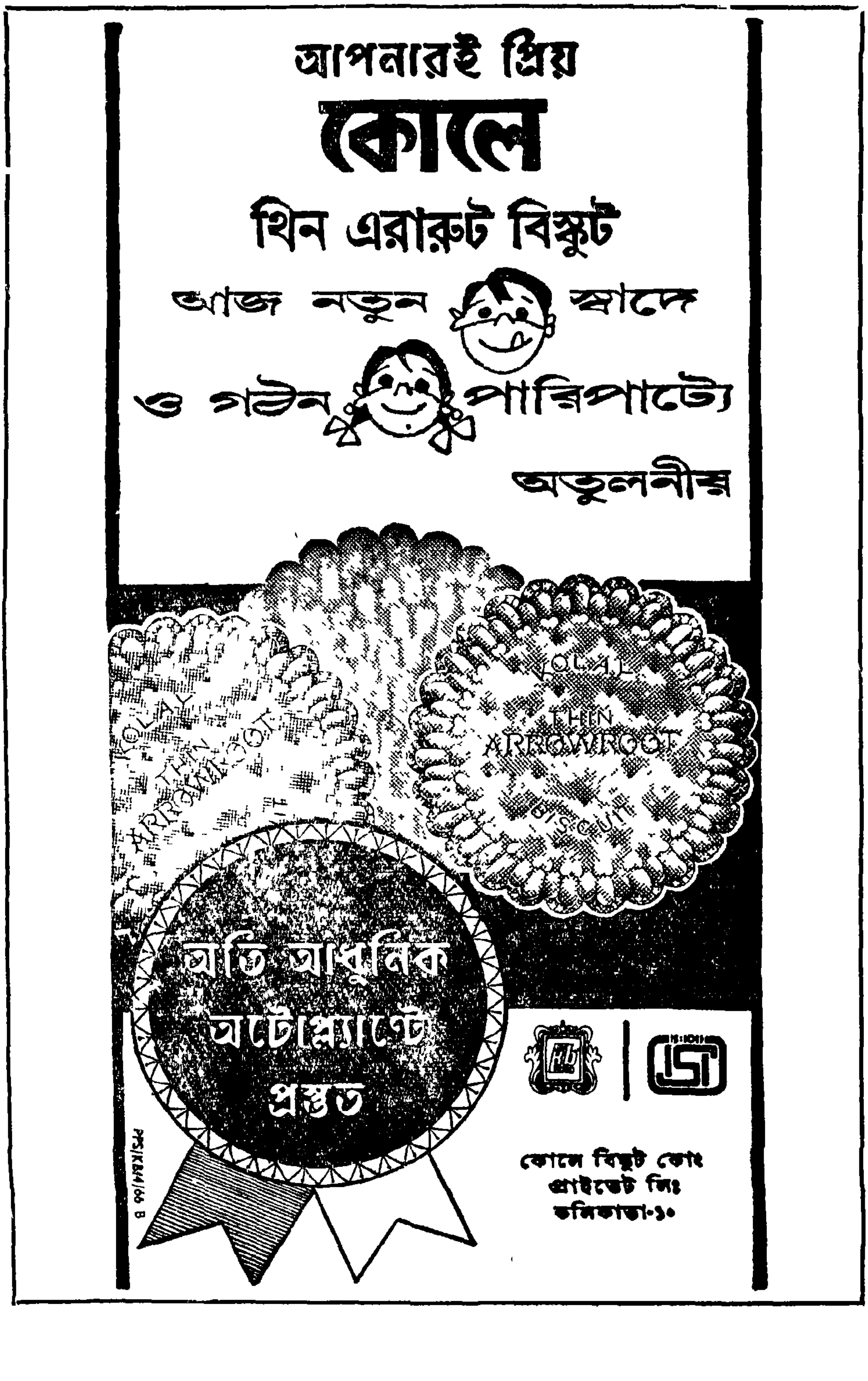
# উদ্বোধন, চৈত্র ১৩৭৬

## বিষয়-সূচী


| বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| ১। দিব্য বাণী | ... ... ... | ১১৩ |
| ২। কথাপ্রসঙ্গে | ... ... . | ১১৪ |
| ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য | | |
| শিব | | |
| ৩। স্বামী প্রেমানন্দের অপ্রকাশিত পত্র | ... ... | ১১৮ |

## বিষয়-সূচী


| | বিষয় | | লেখক | | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|---|---|---|
| ৪। | মনের বাজে খরচ | | শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় | | ১২১ |
| ৫। | জোসেফিন ম্যাক্‌লাউড | | ব্রহ্মচারী শ্যামল | … | ১২৫ |
| ৬। | দুই আর এক | | শ্রীঅমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় | | ১৩১ |
| ৭। | ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী | | স্বামী অচিন্ত্যানন্দ | … | ১৩৫ |
| ৮। | প্রতীক্ষা | ( কবিতা ) | ডক্টর মতিলাল দাশ | … | ১৩৯ |
| ৯। | স্বামী বিবেকানন্দের অনুবাদ-গ্রন্থ : 'শিক্ষা' | | শ্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোষ | … | ১৪০ |
| ১০। | নব বৃন্দাবন ও শ্রীরামকৃষ্ণ | | স্বামী চেতনানন্দ | … | ১৪৪ |
| ১১। | 'নির্বাসনা হও' | | শ্রীমতী সান্ত্বনা দেবী | … | ১৫৩ |
| ১২। | বিবেকানন্দ সোসাইটিতে স্বামীজীর জন্মোৎসব | … | … | … | ১৬১ |


আপনারই প্রিয়
কোলে
থিন এরারুট বিস্কুট
আজ নতুন স্বাদে
ও গঠন পারিপাট্যে
অতুলনীয়
KOLAY THIN ARROWROOT
KOLAY THIN ARROWROOT BISCUIT
অতি আধুনিক
অটোপ্ল্যান্টে
প্রস্তুত
ISI
কোলে বিস্কুট কোং
প্রাইভেট লিঃ
কলিকাতা-১০

বিষয়-সূচী


| বিষয় | | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|---|
| ১৩। প্রেমের ঠাকুর | ( কবিতা ) | শ্রীপ্রীতীশ মিত্র | ১৬৩ |
| ১৪। সমালোচনা | ... | ... | ১৬৪ |
| ১৫। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ | ... | ... | ১৬৫ |
| ১৬ বিবিধ সংবাদ | ... | ... | ১৬৭ |

# উদ্বোধন, বৈশাখ ১৩৭৭

## বিষয়-সূচী


| বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| ১। দিব্য বাণী | ... ... ... | ১৬৯ |
| ২। কথাপ্রসঙ্গে<br>ভগবান বুদ্ধ ও আচার্য শঙ্কর | ... ... ... | ১৭০ |
| ৩। স্বামী প্রেমানন্দের অপ্রকাশিত পত্র | ... ... ... | ১৭৩ |
| ৪। আবেদন | ... ... ... | ১৭৬ |

## বিষয়-সূচী


| | বিষয় | লেখক | | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|---|---|
| ৫। | নব যুগের নূতন পুণ্যব্রত | স্বামী রঙ্গনাথানন্দ | ... | ১৭৭ |
| ৬। | সহিষ্ণুতা ( কবিতা ) | শ্রীকানাইলাল সামন্ত | ... | ১৮০ |
| ৭। | ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী | স্বামী অচিন্ত্যানন্দ | ... | ১৮১ |
| ৮। | 'শুভ শুক্রবার' স্মরণে | শ্রীক্ষিতীশ দাশগুপ্ত | ... | ১৮৭ |
| ৯। | স্বামী বিবেকানন্দের অনুবাদ-গ্রন্থ 'শিক্ষা' | শ্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোষ | ... | ১৮৮ |
| ১০। | আচার্য শঙ্কর ও স্বামী বিবেকানন্দ | শ্রীপ্রভাকর মিত্র | ... | ১৯৩ |
| ১১। | অতীত ভারত-ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা—ভবিষ্যতের পথনির্দেশ | শ্রীসতীশচন্দ্র রায়চৌধুরী | | ২০১ |
| ১২। | দাক্ষিণাত্যে তীর্থভ্রমণ | স্বামী দীপ্ত্যানন্দ | ... | ২০৯ |

বিষয়-সূচী


| বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| ১৩। সমালোচনা ... | ... | ... ২১৭ |
| ১৪। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ ... | ... | ... ২১৮ |
| ১৫। বিবিধ সংবাদ ... | ... | ... ২২২ |

# উদ্বোধন, জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৭

## বিষয়-সূচী


| | বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|---|
| ১। | দিব্য বাণী | ... | ২২৫ |
| ২। | কথাপ্রসঙ্গে | ... | ২২৬ |
| | ধর্ম | | |
| ৩। | স্বামী ব্রহ্মানন্দের অপ্রকাশিত পত্র | ... | ২৩০ |
| ৪। | বিবেকানন্দের যুগবাণী-সমন্বয় | শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় | ২৩৩ |
| ৫। | পুণ্যস্মৃতি | স্বামী শ্রদ্ধানন্দ ... | ২৩৮ |
| ৬। | দুই বিহঙ্গ (কবিতা) | শ্রীজগন্নাথ প্রামাণিক ... | ২৪১ |
| ৭। | যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ | স্বামী বীতশোকানন্দ ... | ২৪২ |
| ৮। | 'শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'-মাধুরী | শ্রীনির্মলচন্দ্র বড়ুয়া ... | ২৪৪ |
| ৯। | শিক্ষাপ্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ | শ্রীদেবব্রত মজুমদার ... | ২৪৮ |

## বিষয়-সূচী


| | বিষয় | | লেখক | | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|---|---|---|
| ১০। | অন্নং বহু কুর্বীত | | শ্রীঅমরনাথ কুণ্ডু | ... | ২৫০ |
| ১১। | রিক্ততায় | ( কবিতা ) | ডঃ মতিলাল দাশ | ... | ২৫৩ |
| ১২। | স্বামী বিবেকানন্দের অনুবাদ-গ্রন্থ : 'শিক্ষা' | | শ্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোষ | ... | ২৫৪ |
| ১৩। | সনাতন ধর্ম | | স্বামী অমৃতত্বানন্দ | ... | ২৫৯ |
| ১৪। | নালান্দা | | স্বামী সুত্রানন্দ | ... | ২৬৪ |
| ১৫। | রবীন্দ্রনাথের 'পতিতা' | | শিবদাস | ... | ২৬৯ |
| ১৬। | সপ্তর্ষি আমার মন | ( কবিতা ) | শ্রীরাজেন্দ্র শাহ | ... | ২৭১ |



বিষয়-সূচী


| বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| ১৭। সমালোচনা | ... ... | ... ২৭২ |
| ১৮। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ | ... ... | ... ২৭৪ |
| ১৯। বিবিধ সংবাদ | ... ... | ... ২৭৯ |

# উদ্বোধন, আষাঢ় ১৩৭৭

## বিষয়-সূচী


| বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| ১। দিব্য বাণী | ... ... | ... ২৮১ |
| ২। কথাপ্রসঙ্গে<br>ভারতের সংহতি | ... ... | ... ২৮২ |
| ৩। অপ্রকাশিত পত্র : | | |
| স্বামী ব্রহ্মানন্দ | ... ... | ... ২৮৪ |
| স্বামী প্রেমানন্দ | ... ... | ... ২৮৬ |
| স্বামী তুরীয়ানন্দ | ... ... | ... ২৮৬ |
| স্বামী সুবোধানন্দ | ... ... | ... ২৮৭ |
| ৪। বর্তমান সমস্যাসমাধানে স্বামী বিবেকানন্দ | স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ | ... ২৮৯ |
| ৫। শ্রীরামকৃষ্ণ-সুপ্রভাতম্ (স্তোত্র) | স্বামী হর্ষানন্দ | ... ২৯৩ |

## বিষয়-সূচী


| বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| ৬। স্বামী প্রেমানন্দের স্মৃতিকথা | স্বামী নিখিলানন্দ .... [ অনুবাদক : স্বামী চেতনানন্দ ] | ২৯৭ |
| ৭। ভারতীয় সমন্বয়ধারা ও শ্রীরামকৃষ্ণ | শ্রীহীরেন্দ্রনারায়ণ সরকার | ৩০০ |
| ৮। প্রার্থনা (কবিতা) | ডঃ মতিলাল দাশ .... | ৩০৩ |
| ৯। স্বামীজী ও তাঁর গুরুভক্তি | স্বামী জীবানন্দ ... | ৩০৪ |
| ১০। শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ও নবযুগ | শ্রীজয়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় .... | ৩০৯ |
| ১১। লীলা (কবিতা) | শ্রীফণিভূষণ মৈত্র .... | ৩১২ |
| ১২। স্বামী বিবেকানন্দের অনুবাদ-গ্রন্থ : 'শিক্ষা' | শ্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোষ ... | ৩১৩ |
| ১৩। বহুরূপে (কবিতা) | শ্রীঅপূর্বকুমার কুণ্ডু .... | ৩১৭ |
| ১৪। শিবজ্ঞানে জীবসেবা | শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় | ৩১৮ |

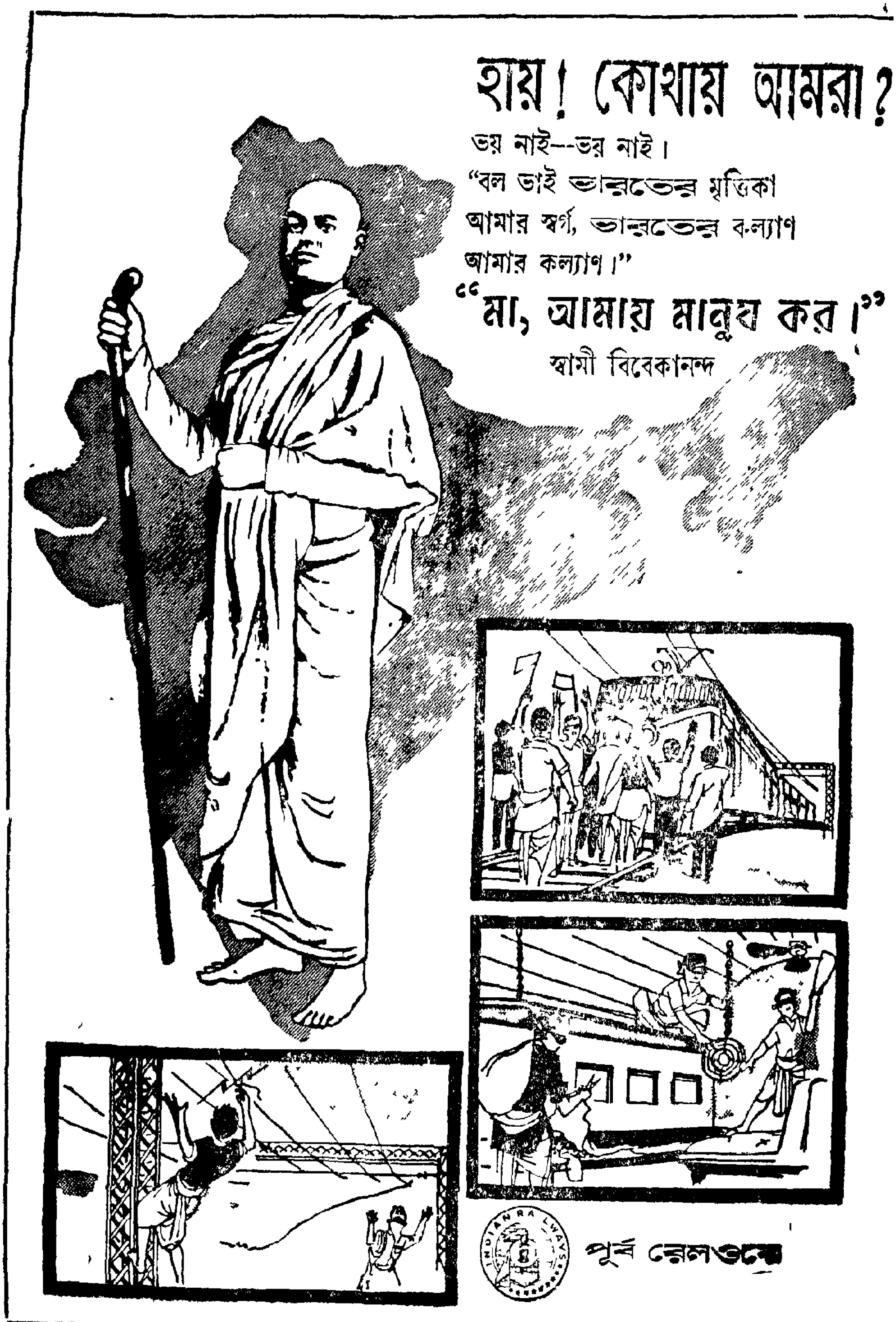
## বিষয়-সূচী


| বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| ১৫। পুনর্জন্ম ও মুক্তি | শ্রীনরেন্দ্রনাথ সিংহ | ৩২৩ |
| ১৬। সমালোচনা | ... | ৩২৯ |
| ১৭। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ | ... | ৩৩২ |
| ১৮। বিবিধ সংবাদ | ... | ৩৩৫ |

# উদ্বোধন, শ্রাবণ ১৩৭৭

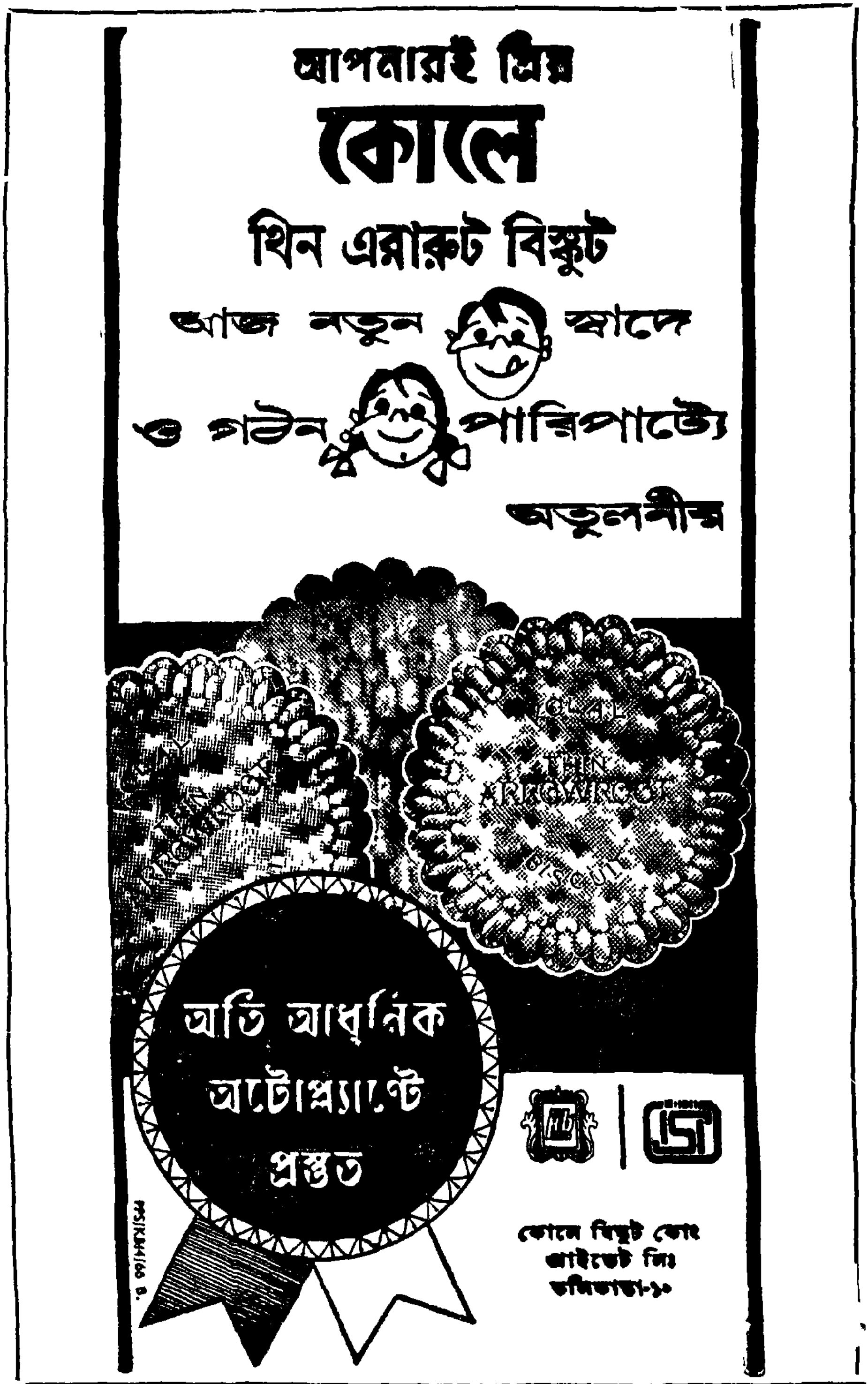
## বিষয়-সূচী


| | বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|---|
| ১ | দিব্য বাণী | ... ... ... | ৩৩৭ |
| ২। | কথাপ্রসঙ্গে<br>ঊর্ধ্বগতি না অধোগতি? | ... ... ... | ৩৩৯ |
| ৩। | স্বামী সুবোধানন্দের অপ্রকাশিত পত্র | ... ... | ৩৪২ |
| ৪। | বুদ্ধ ও বিবেকানন্দ | শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় | ৩৪৫ |
| ৫। | ভাষার বিচার | শ্রীসুজয়গোপাল রায় পোদ্দার | ৩৫১ |
| ৬। | উত্তরাখণ্ড তীর্থ-পরিক্রমা | স্বামী তেজসানন্দ .... | ৩৫৩ |


হায়! কোথায় আমরা?
ভয় নাই—ভয় নাই।
"বল ভাই ভারতের মৃত্তিকা
আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ
আমার কল্যাণ।"
"মা, আমায় মানুষ কর।"
স্বামী বিবেকানন্দ
পূর্ব রেলওয়ে

## বিষয়-সূচী


| | বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|---|
| ৭। | রামচরিতে কৃত্তিবাস ও তুলসীদাস | স্বামী চেতনানন্দ .... | ৩৬৪ |
| ৮। | অনিকেতন ( কবিতা ) | ডক্টর কুভেংপু ... [ অনুবাদিকা : শ্রীমতী সুজাতা প্রিয়ংবদা ] | ৩৭৬ |
| ৯। | স্বামী বিবেকানন্দের অনুবাদ-গ্রন্থ : 'শিক্ষা' | শ্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোষ ... | ৩৭৭ |
| ১০। | রবীন্দ্রনাথের ধ্যান | শিবদাস . ... ... | ৩৮১ |
| ১১। | সত্য ( কবিতা ) | শ্রীশ্যামাপ্রসাদ দাস ... | ৩৮৪ |


আপনারই প্রিয়
কোলে
থিন এরারুট বিস্কুট
আজ নতুন স্বাদে
ও গঠন পারিপাট্যে
অতুলনীয়
THIN ARROWROOT BISCUIT
অতি আধুনিক
অটোপ্ল্যান্টে
প্রস্তুত
কোলে বিস্কুট কোং
প্রাইভেট লিঃ
কলিকাতা-১০

বিষয়-সূচী


| বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| ১২। সমালোচনা | ... ... ... | ৩৮৫ |
| ১৩। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ | ... ... ... | ৩৮৭ |
| ১৪। বিবিধ সংবাদ | ... .. ... | ৩৯১ |

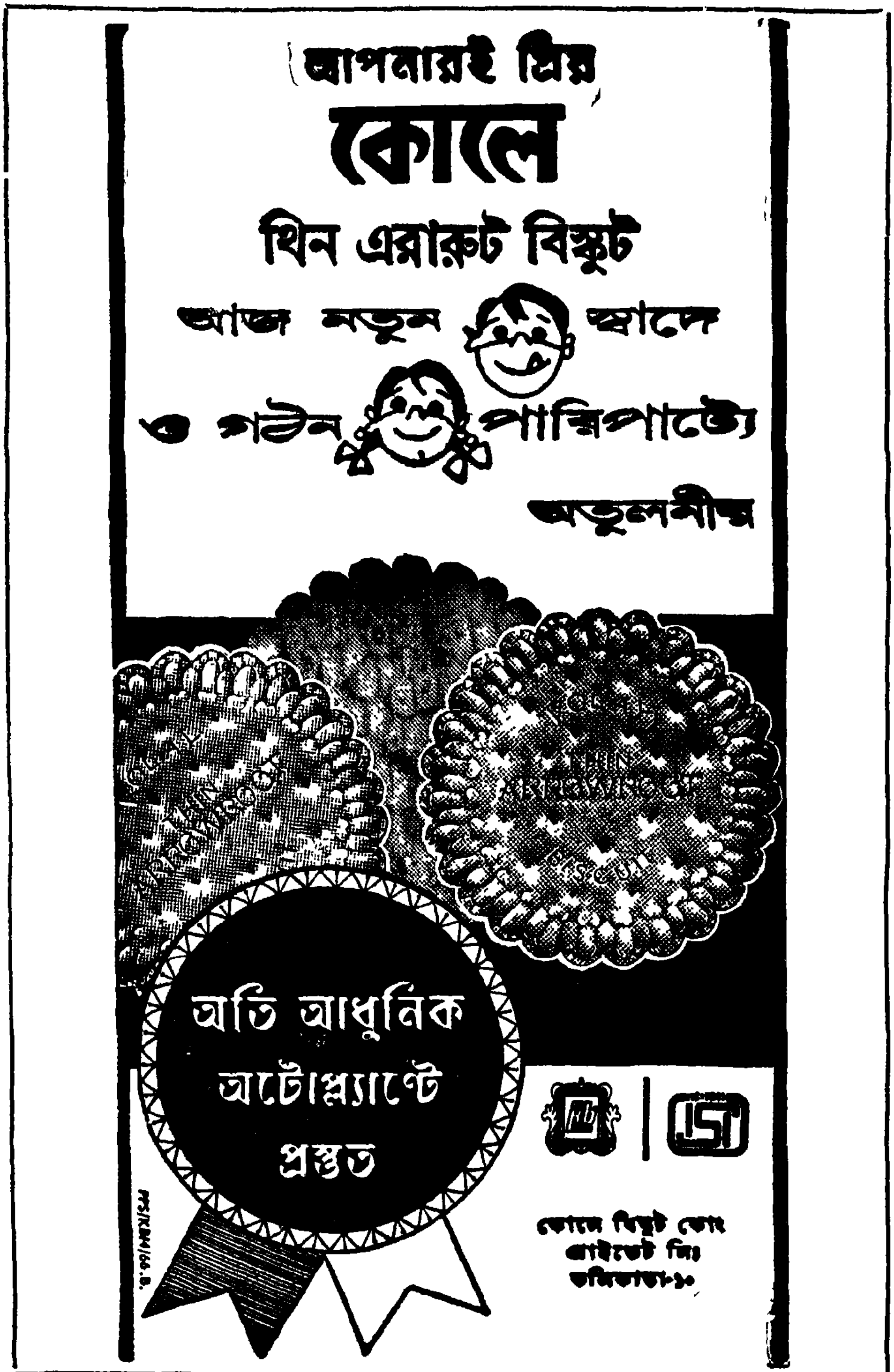
# উদ্বোধন, ভাদ্র ১৩৭৭

## বিষয়-সূচী


| বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| ১ দিব্য বাণী | ... ... | ... ৩৯৩ |
| ২। কথাপ্রসঙ্গে | ... ... | ... ৩৯৪ |
| গীতা—জাতীয় আদর্শের আলোকবর্তিকা | | |
| পথ না বিপথ? | | |
| ৩। রামচরিতে কৃত্তিবাস ও তুলসীদাস | স্বামী চেতনানন্দ | .... ৪০১ |
| ৪। বর্তমান শিক্ষা ও তাহার প্রভাব | শ্রীশ্যামাপ্রসন্ন দত্ত | ... ৪১৪ |
| ৫। প্রাণপুরুষ (কবিতা) | 'বৈভব' .. | .... ৪১৮ |

## বিষয়-সূচী


| | বিষয় | লেখক | | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|---|---|
| ৬। | স্বামী বিবেকানন্দের অনুবাদ-গ্রন্থ : 'শিক্ষা' | শ্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোষ | ... | ৪২৫ |
| ৭। | স্বয়ম্ভু শ্রীরামকৃষ্ণ | শ্রীগোরাচাঁদ কুণ্ডু | ... | ৪২৯ |
| ৮। | সার্থক বাণী (কবিতা) | শ্রীমতী সুজাতা প্রিয়ংবদা | ... | ৪৩৩ |
| ৯। | স্বামী সুবোধানন্দের অপ্রকাশিত পত্র | ... | ... | ৪৩৪ |
| ১০। | অবতারবাদ ও নরেন্দ্রনাথের মানসিক বিবর্তন | শ্রীরাধাশ্যাম দাস | ... | ৪৩৬ |


আপনারই প্রিয়
কোলে
থিন এরারুট বিস্কুট
আজ নতুন স্বাদে
ও গঠন পারিপাট্যে
অতুলনীয়
THIN ARROWROOT BISCUIT
অতি আধুনিক
অটোপ্ল্যান্টে
প্রস্তুত
ISI
কোলে বিস্কুট কোং
প্রাইভেট লিঃ
কলিকাতা-১০

## বিষয়-সূচী


| বিষয় | | লেখক | | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|---|---|
| ১১। সমালোচনা | ... | ... | ... | ৪৪২ |
| ১২। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ | ... | ... | ... | ৪৪৫ |
| ১৩। বিবিধ সংবাদ | ... | ... | ... | ৪৪৭ |

# উদ্বোধন, আশ্বিন ১৩৭৭

## বিষয়-সূচী


| | বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|---|
| ১। | দিব্য বাণী | ... ... .. | ৪৪৯ |
| ২। | কথাপ্রসঙ্গে | ... ... ... | ৪৫০ |
| | মহাশক্তি শ্রীশ্রীদুর্গা | | |
| ৩। | ভারতের যুবসম্প্রদায়ের প্রতি | স্বামী বীরেশ্বরানন্দ ... | ৪৫৩ |
| ৪। | শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর বাণী | আর্ণল্ড টয়েনবী ... | ৪৫৫ |
| ৫। | শ্রীদুর্গা-করাবলম্বস্তোত্রম্ | স্বামী হর্ষানন্দ .... | ৪৫৬ |
| ৬। | 'এবংপ্রভাবা সা দেবী' | স্বামী শ্রদ্ধানন্দ ... | ৪৫৭ |
| ৭। | এই শরতে (কবিতা) | শ্রীঅপূর্বকুমার কুণ্ডু . | ৪৬০ |


ব্রহ্ম হ'তে কীট-পরমাণু, সর্বভূতে সেই প্রেমময়,
মন প্রাণ শরীর অর্পণ কর সখে এ সবার পায়।

—বিবেকানন্দ

বিষয়-সূচী


| | বিষয় | লেখক | | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|---|---|
| ৮। | পুণ্যগন্ধা পৃথিবী | শ্রীমতী জ্যোতির্ময়ী দেবী | ··· | ৪৬১ |
| ৯। | শ্রীরামকৃষ্ণভক্তিপঞ্চকম্ ( স্তোত্র ) | শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ভক্তিতীর্থ | ···· | ৪৬৩ |
| ১০। | রাজা মহারাজ—স্মৃতিকথা | স্বামী পুণ্যানন্দ | ··· | ৪৬৪ |
| ১১। | তোমার প্রসন্ন আলো ( কবিতা ) | শ্রীশান্তশীল দাশ | ··· | ৪৬৭ |
| ১২। | 'তপো ব্রহ্মেতি' | ডক্টর রমা চৌধুরী | ... | ৪৬৮ |
| ১৩। | শ্রীশ্রীরামানুজদর্শন | স্বামী আদিনাথানন্দ | ··· | ৪৭৩ |
| ১৪। | মায়ের আগমনে ( কবিতা ) | স্বামী জীবানন্দ | ··· | ৪৭৫ |
| ১৫। | স্বামীজীর স্বদেশপ্রেম | মৌলবী রেজাউল করীম | ··· | ৪৭৬ |
| ১৬। | 'তত্র কো মোহঃ' ( কবিতা ) | শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় | ··· | ৪৮১ |
| ১৭। | বর্তমান সমস্যা | ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার | ··· | ৪৮২ |


আপনারই প্রিয়
কোলে
থিন এরারুট বিস্কুট
আজ নতুন স্বাদে
ও গঠন পারিপাট্যে
অতুলনীয়
অতি আধুনিক
অটোপ্ল্যান্টে
প্রস্তুত
কোলে বিস্কুট কোং
প্রাইভেট লিঃ
কলিকাতা-১০

## বিষয়-সূচী


| | বিষয় | | লেখক | | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|---|---|---|
| ১৮। | মা | ( কবিতা ) | শ্রীদিলীপকুমার রায় | ... | ৪৮৪ |
| ১৯। | বাজিকরের মেয়ে | ( ঐ ) | শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক | ... | ৪৮৫ |
| ২০। | রাখালের তীর্থ | ( ঐ ) | শ্রীকালিদাস রায় | ... | ৪৮৫ |
| ২১। | বিশ্বাসে মিলয়ে বস্তু | ( ঐ ) | শ্রীনরেন্দ্র দেব | ... | ৪৮৬ |
| ২২। | আর্তের প্রার্থনা | ( ঐ ) | বনফুল ... | ... | ৪৮৬ |
| ২৩। | স্বামী শিবানন্দের অপ্রকাশিত পত্র | | ... | ... | ৪৮৭ |
| ২৪। | 'মোহরাত্রিশ্চ দারুণা' | | শ্রীমতী সান্ত্বনা দাশগুপ্ত | ... | ৪৮৮ |
| ২৫। | 'লোহিতাঙ্গং নমাম্যহম্' | | ডক্টর মুরলীমোহন বিশ্বাস | ... | ৪৯৪ |
| ২৬। | শ্রীশ্রীমা ( কবিতা ) | | শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ মিত্র | ... | ৪৯৬ |
| ২৭। | ভারতে ধর্মমহাসভার প্রস্তুতি সংবাদ | | শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসু | ... | ৪৯৭ |

## বিষয়-সূচী


| | বিষয় | লেখক | | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|---|---|
| ২৮। | যারা আমাদের জাগালো ( কবিতা ) | শ্রীনরেশচন্দ্র চক্রবর্তী | ... | ৫০৪ |
| ২৯। | স্বামী বিবেকানন্দের অনুবাদ-গ্রন্থ : 'শিক্ষা' | শ্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোষ | ... | ৫০৫ |
| ৩০। | প্রাচীন বাঙালীর আহার ও পানীয় | শ্রীসুখরঞ্জন চক্রবর্তী | ... | ৫০৯ |
| ৩১। | একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা | শ্রীজীবনকৃষ্ণ দেব | ... | ৫১২ |
| ৩২। | আনন্দময়ী ( কবিতা ) | শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায় | ... | ৫১৫ |
| ৩৩। | 'আকাশ যেথায় সিন্ধুরে ধরে' | শিবদাস ... | ... | ৫১৬ |
| ৩৪। | মায়ের পূজা ( কবিতা ) | সেখ সদর উদ্দীন | ... | ৫২১ |
| ৩৫। | বিবেকানন্দ-স্মৃতিমন্দিরের উদ্বোধন | ... | .... | ৫২২ |
| ৩৬। | ভারতে ভাবগত সংহতি-সাধনে সংস্কৃত | শ্রীধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী | ... | ৫২৫ |

## বিষয়-সূচী


| বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| ৩৭। সমালোচনা | ... ... | ... ৫৩১ |
| ৩৮। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ | ... ... | ... ৫৩৩ |
| ৩৯। আবেদন | ... ... | ... ৫৩৫ |
| ৪০। বিবিধ সংবাদ | ... ... | ... ৫৩৫ |

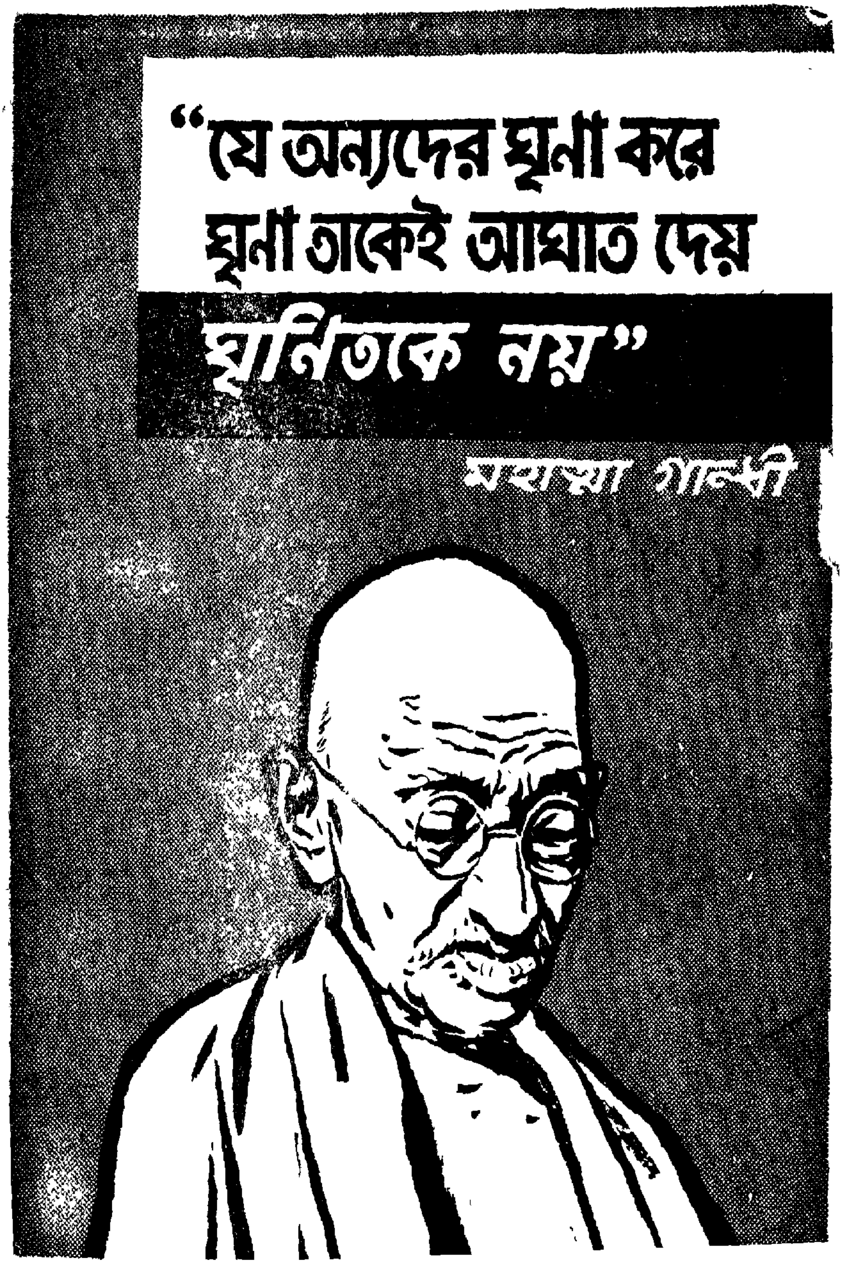

## চিত্রসূচী


| | | |
|---|---|---|
| শ্রীশ্রীদুর্গা | ... ... ... | ১ |
| বিবেকানন্দ-শিলায় বিবেকানন্দ-মন্দির | ... ... | ৫২০ |
| বিবেকানন্দ-মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত মূর্তি | ... ... | ৫২১ |

# উদ্বোধন, কার্তিক ১৩৭৭

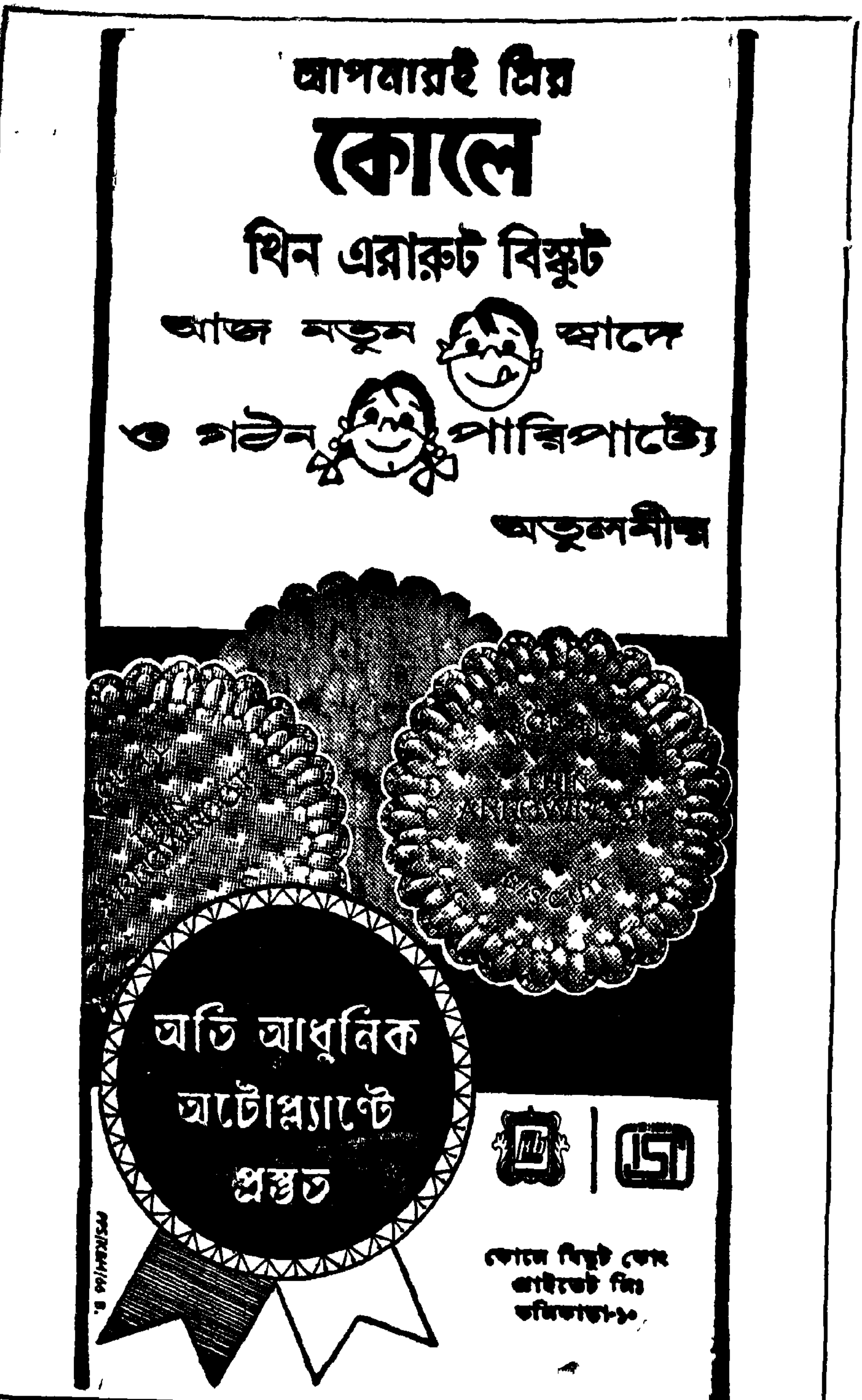
## বিষয়-সূচী


| | বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|---|
| ১। | দিব্য বাণী ... | ... | ... ৫৩৭ |
| ২। | কথাপ্রসঙ্গে ... | ... | ... ৫৩৮ |
| | শ্রীশ্রীকালিকা | | |
| ৩। | শ্রীশ্রীরামানুজদর্শন | স্বামী আদিনাথানন্দ | ... ৫৪২ |
| ৪। | প্রিয়তম ( কবিতা ) | শ্রীনীরদবরণ চট্টোপাধ্যায় | ... ৫৪৪ |
| ৫। | জগন্মাতার আরাধনা | শ্রীমতী মৃন্ময়ী দত্ত | ... ৫৪৫ |
| ৬। | স্বামী বিবেকানন্দের অনুবাদ-গ্রন্থ : 'শিক্ষা' | শ্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোষ | ... ৫৪৯ |
| ৭। | ভারতে ধর্মমহাসভার প্রস্তুতি সংবাদ | শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসু | ... ৫৫৩ |


"যে অন্যদের ঘৃনা করে
ঘৃনা তাকেই আঘাত দেয়
ঘৃনিতকে নয়"
মহাত্মা গান্ধী

## বিষয়-সূচী


| বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| ৮। প্রথম পরিচয় উদ্বোধনের সঙ্গে | শ্রীমতী জ্যোতির্ময়ী দেবী ... | ৫৫৮ |
| ৯। শিলা-মন্দির [ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে ] ( কবিতা ) | শ্রীতামসরঞ্জন রায় ... | ৫৬২ |
| ১০। 'একৈবাহং জগতাত্র' | স্বামী জীবানন্দ ... | ৫৬৫ |
| ১১। তাই তো মায়েরে শুধু ডাকি ( কবিতা ) | ডক্টর গোপেশচন্দ্র দত্ত ... | ৫৬৯ |
| ১২। তারকার জন্ম ও মৃত্যু | শিবদাস ... | ৫৭০ |
| ১৩ নমো সুন্দর নিরুপম ( কবিতা ) | পদ্মশ্রী নলিনীবালা দেবী ... [ অনুবাদ : শ্রীমতী সুজাতা প্রিয়ংবদা ] | ৫৭৯ |
| ১৪। দেবী কন্যাকুমারী | ... ... | ৫৮০ |
| ১৫। নমো বিবেকানন্দায় ( কবিতা ) | শ্রীসুধীরকুমার কর .... | ৫৮১ |


আপনারই প্রিয়
কোলে
থিন এরারুট বিস্কুট
আজ নতুন স্বাদে
ও গঠন পারিপাট্যে
অতুলনীয়
অতি আধুনিক
অটোপ্ল্যাণ্টে
প্রস্তুত
কোলে বিস্কুট কোং
প্রাইভেট লিঃ
কলিকাতা-১০

বিষয়-সূচী


| | বিষয় | লেখক | | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|---|---|
| ১৬। | শ্রীরামকৃষ্ণ-পরিজন ভবনাথ | শ্রীসতীশচন্দ্র নাথ | ... | ৫৮২ |
| ১৭। | সোনার মানুষ (কবিতা) | শ্রীঅক্রূরচন্দ্র ধর | .. | ৫৮৫ |
| ১৮। | সমালোচনা | ... ... | ... | ৫৮৬ |
| ১৯। | আবেদন | ... ... | ... | ৫৮৮ |
| ২০। | শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ | ... ... | ... | ৫৮৯ |
| ২১। | বিবিধ সংবাদ | ... ... | ... | ৫৯১ |

# উদ্বোধন, অগ্রহায়ণ ১৩৭৭

## বিষয়-সূচী


| | বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|---|
| ১। | দিব্য বাণী | ... | ৫৯৩ |
| ২। | কথাপ্রসঙ্গে মানুষের মন | ... | ৫৯৪ |
| ৩। | ওঙ্কার | স্বামী ধ্যানানন্দ | ৬০১ |
| ৪। | 'ঐ মহাসিন্ধুর ওপার হ'তে' | শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় | ৬০৯ |
| ৫। | স্বামী বিবেকানন্দের অনুবাদ-গ্রন্থ : 'শিক্ষা' | শ্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোষ | ৬১৭ |



## বিষয়-সূচী


| বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| ৬। ঋষি মার্কণ্ডেয় | শ্রীদ্বারকানাথ জ্যোতির্ভূষণ | ৬১৯ |
| ৭। শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রসঙ্গ | শ্রীনবনীহরণ মুখোপাধ্যায় ... | ৬২১ |
| ৮। ভারতের নবজীবনে স্বামী বিবেকানন্দ | ডক্টর শান্তিলাল মুখোপাধ্যায় | ৬২৭ |
| ৯। জননী সারদামণি (কবিতা) | শ্রীনৃপেন আকুলি .... | ৬৩২ |
| ১০। শ্রীশ্রীরামানুজদর্শন | স্বামী আদিনাথানন্দ ... | ৬৩৩ |


আপনারই প্রিয়
কোলে
থিন এরারুট বিস্কুট
আজ নতুন স্বাদে
ও গঠন পারিপাট্যে
অতুলনীয়
THIN ARROWROOT
অতি আধুনিক
অটোপ্ল্যান্টে
প্রস্তুত
ISI
লে বিস্কুট কোং
াইভেট লিঃ
লিকাতা-১০

## বিষয়-সূচী


| বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| ১১। শ্যামা মা (কবিতা) | শ্রীমতী জয়ন্তী বসু | ... ৬৩৫ |
| ১২। জননী কুন্তী | শ্রীমতী জয়ন্তী সিংহ | ... ৬৩৬ |
| ১৩। সমালোচনা | ... ... | ... ৬৪১ |
| ১৪। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ | ... ... | ... ৬৪২ |
| ১৫। বিবিধ সংবাদ | ... ... | ... ৬৪৮ |

# উদ্বোধন, পৌষ ১৩৭৭

## বিষয়-সূচী


| | বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|---|
| ১। | দিব্য বাণী | ... ... | ... ৬৪৯ |
| ২। | কথাপ্রসঙ্গে | ... ... | ... ৬৫০ |
| ৩। | শ্রীশ্রীরামানুজদর্শন | স্বামী আদিনাথানন্দ | ... ৬৫৩ |
| ৪। | পৃথিবীর হে ঠাকুর ( কবিতা ) | শ্রীপূর্ণেন্দু গুহরায় | .... ৬৫৬ |
| ৫। | ওঙ্কার | স্বামী ধ্যানানন্দ | ... ৬৫৭ |
| ৬। | প্রার্থনা নীরবে জাগে ( কবিতা ) | ডক্টর গোপেশচন্দ্র দত্ত | ... ৬৬২ |
| ৭। | জননী কুন্তী | শ্রীমতী জয়ন্তী সিংহ | ... ৬৬৩ |

## বিষয়-সূচী


| | বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|---|
| ৮। | স্বামী বিবেকানন্দের অনুবাদ-গ্রন্থ : 'শিক্ষা' | শ্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোষ ... | ৬৬৬ |
| ৯। | শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী | স্বামী জীবানন্দ | ৬৬৯ |
| ১০। | 'ঈশাবাস্যমিদং সর্বম্' (কবিতা) | শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় ... | ৬৭৩ |
| ১১। | ভারতের নবজীবনে স্বামী বিবেকানন্দ | ডক্টর শান্তিলাল মুখোপাধ্যায় | ৬৭৪ |
| ১২। | শ্রীরামকৃষ্ণঃ (স্তোত্র) | শ্রীসুধীরকুমার কর ... | ৬৮০ |
| ১৩। | শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রসঙ্গ | শ্রীনবনীহরণ মুখোপাধ্যায় ... | ৬৮১ |
| ১৪। | বিদ্যাসাগর | শ্রীঅক্ষয়কুমার রায় ... | ৬৮৫ |
| ১৫। | যীশুর প্রেম ও করুণার একটি কাহিনী | শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত ... | ৬৮৯ |
| ১৬। | চিত্তশুদ্ধি (কবিতা) | শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ মিত্র ... | ৬৯১ |

বিষয়-সূচী


| বিষয় | | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|---|
| ১৭। | দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন | স্বামী চেতনানন্দ ... | ৬৯২ |
| ১৮। | পরলোকে ভারতরত্ন ডক্টর সি. ভি. রামন | ... ... | ৬৯৭ |
| ১৯। | পরলোকে কবিরঞ্জন কুমুদরঞ্জন মল্লিক | ... ... | ৬৯৮ |
| ২০। | সমালোচনা | ... ... ... | ৬৯৯ |
| ২১। | শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ | ... ... ... | ৭০১ |
| ২২। | বিবিধ সংবাদ | ... ... ... | ৭০৩ |

# উদ্বোধন

## দিব্যবাণী

### ভারত-সাবিত্রী

মাতাপিতৃসহস্রাণি পুত্রদারশতানি চ।
সংসারেষ্বনুভূতানি যান্তি যাস্যন্তি চাপরে ॥ ৬০
হর্ষস্থানসহস্রাণি ভয়স্থানশতানি চ।
দিবসে দিবসে মূঢ়মাবিশন্তি ন পণ্ডিতম্ ॥ ৬১
ঊর্ধ্ববাহুর্বিরৌম্যেষ ন চ কশ্চিচ্ছৃণোতি মে।
ধর্মাদর্থশ্চ কামশ্চ স কিমর্থং ন সেব্যতে ॥ ৬২
ন জাতু কামান্ন ভয়ান্ন লোভাদ্ধর্মং ত্যজেজ্জীবিতস্যাপি হেতোঃ।
নিত্যো ধর্মঃ সুখদুঃখে ত্বনিত্যে জীবো নিত্যো হেতুরস্য ত্বনিত্যঃ ॥ ৬৩

—মহাভারত, স্বর্গারোহণ পর্ব, ৫ম অঃ

( জীবনের স্রোতে ভাসি জন্মজন্মান্তরক্রমে
জীবগণ আসি এ সংসারে )
পাইয়াছে সহস্র সহস্র জন মাতা পিতা,
শত শত পুত্র ও জায়ারে,
অনুভব করিয়াছে সঙ্গসুখ তাহাদের ;
( এ জন্মেও ভুঞ্জিয়া আবার
জীবনেরে, ) গেছে কেহ, কেহ বা যাইবে পরে
জীবননদীর পরপার। ৬০

জীবনের পথে কীর্ণ সহস্র আনন্দ আর
শত শত আতঙ্কেরো স্থান
স্পর্শে যার প্রতিদিনই হর্ষশোকান্বিত হয়
চিত্ত তার, যে জন অজ্ঞান ;
জ্ঞানী যারা তাহাদের চিত্তে কিন্তু এসকল
কখনো না পারে প্রবেশিতে। ৬১

'( অর্থকাম চাও সবে ? যে চাও সে ) ধর্ম হতে
অর্থ-কামও পার তো লভিতে!
কেন তবে করিছ না ধরমের সেবা সবে ?'—
উচ্চকণ্ঠে কহি বারবার
ঊর্ধ্বে তুলি দুই বাহু, অথচ শোনে না কেহ
সে-কথা আমার ! ৬২

ধর্ম নিত্য, অনিত্য এ সুখ-দুঃখ ; ( নিত্য তুমি,
জীবন তোমার দু-দিনের )—
জীব নিত্য, অনিত্য এ দেহাদি যা হেতু জীবনের ;
( অনিত্যের তরে কভু পরিত্যাগ কোরো না নিত্যেরে, )
কাম-ভয়-লোভবশে, জীবনেরো তরে কভু
পরিত্যাগ কোরো না ধর্মেরে। ৬৩

মহর্ষির্ভগবান্ ব্যাসঃ কৃত্বেমাং সংহিতাং পুরা।
শ্লোকৈশ্চতুর্ভির্ধর্মাত্মা পুত্রমধ্যাপয়চ্ছুকম্ ॥ ৫৯

ধর্মপ্রাণ মহাঋষি ভগবান ব্যাসদেব
চারি শ্লোকে রচি এ সংহিতা
নিজপুত্র শুকদেবে শিখায়েছিলেন, এর
বুঝায়েছিলেন মর্মকথা ॥

[ 'ভারত-সাবিত্রী' অর্থে 'মহাভারত-সাবিত্রী' হইলেও ইহা ভারতেরও প্রাণবাণী —সাবিত্রী বা গায়ত্রী, চিরযুগের মহামন্ত্র।—সঃ ]

# কথাপ্রসঙ্গে

## উদ্বোধনের নববর্ষ

সুদীর্ঘ ৭১ বৎসর ধরিয়া রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-জীবনে উপলব্ধ ও যুগোপযোগিরূপে প্রকট ভারতের সর্বজনীন সনাতন ভাবধারা পরিবেশনের কাজে শ্রীভগবানের কৃপায় এবং লেখক, পাঠক ও অনুরাগিগণের সহযোগিতায় সমভাবে ব্রতী থাকিয়া উদ্বোধন পত্রিকা ৭২তম বর্ষে পদার্পণ করিল। নববর্ষের যাত্রারম্ভে আমরা শ্রীভগবানের আশীর্বাদ এবং সুধীবর্গের সহযোগিতা প্রার্থনা করি।

বেদান্ত-ভিত্তিক ভারতের এই সনাতন আধ্যাত্মিক ভাবধারাকে জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে অনুপ্রবিষ্ট করাইতে পারিলেই ভারত বর্তমান যুগের সমাস্যাগুলির সমাধান করিয়া সর্ববিষয়ে উন্নত হইবে এবং সমগ্র জগৎকেও পথ দেখাইতে পারিবে; পারিবে নয়—মানবজাতির ভবিষ্যৎসম্বন্ধে স্বচ্ছদৃষ্টি স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়া গিয়াছেন ভারত উহা করিবেই। আধ্যাত্মিক উন্নতি জাগতিক উন্নতির পরিপন্থী -তৎকালীন এই মনোভাবের, যাহা বর্তমান সময়ে সারা জগতেই প্রবলতর হইয়াছে তাহার অসারতা দেখাইবার জন্য রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আবির্ভাব এবং জগৎ-কল্যাণের জন্য জীবনে এই উভয়ের মিলনের দৃষ্টান্ত স্থাপন ও প্রচার—"এতদিন পর্যন্ত ভারতে কেবল আধ্যাত্মিক উন্নতি এবং পাশ্চাত্য প্রদেশে কেবল বহিরুন্নতি হইয়াছে। এক্ষণে এই দুই শক্তির সম্মিলনের সময় আসিয়াছে।...আধ্যাত্মিক উন্নতি প্রবল হইলেই যে বহিঃ-কার্য বন্ধ হইবে, এমন কোন নিয়ম নাই। ভারতে এই দুটি একত্রীভূত করিতে পারিলে আমরা জগতে এক মহান্ আদর্শ দেখাইতে পারিব। রামকৃষ্ণ পরমহংস এবিষয়ের দৃষ্টান্তস্থল। তাঁহার আধ্যাত্মিক জীবনের গভীরতা কাহারও অবিদিত নাই, অথচ তাঁহা অপেক্ষা অধিক কর্মশীলই বা কে ছিল?"*

এই মিলনের কাজে সহায়তা করাকেই স্বামীজী উদ্বোধনের জীবন-ব্রত করিয়া দিয়া গিয়াছেন। উদ্বোধন পত্রিকার প্রবর্তক স্বামী বিবেকানন্দের লেখা যে 'প্রস্তাবনা'টি বুকে ধরিয়া সগৌরবে উদ্বোধন আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল (১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা; ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দ, ১৪ই জানুআরি), সেটি নিম্নে পুনর্মুদ্রিত হইল:

## "উদ্বোধনের প্রস্তাবনা"

ভারতের প্রাচীন ইতিবৃত্ত—এক দেবপ্রতিম জাতির অলৌকিক উদ্যম, বিচিত্র চেষ্টা, অসীম উৎসাহ, অপ্রতিহত শক্তিসংঘাত ও সর্বাপেক্ষা অতি গভীর চিন্তাশীলতায় পরিপূর্ণ। ইতিহাস বলিলে সচরাচর রাজা-রাজড়ার কথা ও তাঁহাদের কাম-ক্রোধ-ব্যসনাদির দ্বারা কিয়ৎকাল পরিক্ষুব্ধ, তাঁহাদের সুচেষ্টা কুচেষ্টায় সাময়িক বিচালিত সামাজিক চিত্রকে বুঝায়; তাহা হয়তো প্রাচীন ভারতে একেবারেই নাই। কিন্তু ক্ষুৎপিপাসা-কাম-ক্রোধাদি-

* 'স্বামী বিবেকানন্দের সহিত কথোপকথন'—উদ্বোধন, ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, পৃঃ ৩১-৩২

বিতাড়িত, সৌন্দর্যতৃষ্ণাকৃষ্ট ও মহান্ অপ্রতিহতবুদ্ধি, নানাভাবপরিচালিত একটি অতি বিস্তীর্ণ জনসঙ্ঘ, সভ্যতার উন্মেষের প্রায় প্রাক্কাল হইতে নানাবিধ পথ অবলম্বন করিয়া যে স্থানে উপস্থিত হইয়াছিলেন—ভারতের ধর্মগ্রন্থরাশি, কাব্যসমুদ্র, দর্শনসমূহ ও বিবিধ বৈজ্ঞানিক তন্ত্রশ্রেণী, প্রতি ছত্রে তাহার প্রতিপদবিক্ষেপ, রাজাদিপুরুষবিশেষবর্ণনাকারী পুস্তকনিচয়াপেক্ষা লক্ষগুণ স্ফুটীকৃতভাবে দেখাইয়া দিতেছে। প্রকৃতির সহিত যুগ-যুগান্তরব্যাপী সংগ্রামে তাঁহারা যে রাশীকৃত জয়পতাকা সংগ্রহ করিয়াছিলেন, আজ জীর্ণ ও বাত্যাহত হইয়াও সেগুলি প্রাচীন ভারতের জয় ঘোষণা করিতেছে।

এই জাতি মধ্য-আসিয়া, উত্তর ইউরোপ বা সুমেরু-সন্নিহিত হিমপ্রধান প্রদেশ হইতে শনৈঃ পদসঞ্চারে পবিত্র ভারতভূমিকে তীর্থরূপে পরিণত করিয়াছিলেন বা এই তীর্থভূমিই তাঁহাদের আদিম নিবাস—এখনও জানিবার উপায় নাই।

অথবা ভারতমধ্যস্থ বা ভারত-বহির্ভূত-দেশবিশেষনিবাসী একটি বিরাট জাতি নৈসর্গিক নিয়মে স্থানভ্রষ্ট হইয়া ইউরোপাদি ভূমিতে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছেন এবং তাঁহারা শ্বেতকায় বা কৃষ্ণকায়, নীলচক্ষু বা কৃষ্ণচক্ষু, কৃষ্ণকেশ বা হিরণ্যকেশ ছিলেন—কতিপয় ইউরোপীয় জাতির ভাষার সহিত সংস্কৃত ভাষার সাদৃশ্য ব্যতিরেকে, এই সকল সিদ্ধান্তের আর কোন প্রমাণ নাই। আধুনিক ভারতবাসী তাঁহাদের বংশধর কিনা, অথবা ভারতের কোন্ জাতি কত পরিমাণে তাঁহাদের শোণিত বহন করিতেছেন, এসকল প্রশ্নেরও মীমাংসা সহজ নহে।

অনিশ্চিতত্বেও আমাদের বিশেষ ক্ষতি নাই।

তবে যে জাতির মধ্যে সভ্যতার উন্মীলন হইয়াছে, যেথায় চিন্তাশীলতা পরিস্ফুট হইয়াছে, সেই স্থানে লক্ষ লক্ষ তাঁহাদের বংশধর—মানসপুত্র—তাঁহাদের ভাবরাশির, চিন্তারাশির উত্তরাধিকারী উপস্থিত। নদী, পর্বত, সমুদ্র উল্লঙ্ঘন করিয়া, দেশকালের বাধা যেন তুচ্ছ করিয়া সুপরিস্ফুট বা অজ্ঞাত অনির্বচনীয় সূত্রে ভারতীয় চিন্তারুধির অন্য অন্য জাতির ধমনীতে পঁহুছিয়াছে এবং এখনও পঁহুছিতেছে।

হয়তো আমাদের ভাগে সার্বভৌম পৈতৃক সম্পত্তি কিছু অধিক।

ভূমধ্যসাগরের পূর্বকোণে সুঠাম সুন্দর দ্বীপমালা-পরিবেষ্টিত, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য-বিভূষিত একটি ক্ষুদ্র দেশে অল্পসংখ্যক অথচ সর্বাঙ্গসুন্দর, পূর্ণাবয়ব অথচ দৃঢ়স্নায়ুপেশীসমন্বিত, লঘুকায় অথচ অটল-অধ্যবসায়-সহায়, পার্থিব সৌন্দর্যসৃষ্টির একাধিরাজ, অপূর্ব ক্রিয়াশীল, প্রতিভাশালী এক জাতি ছিলেন। অন্যান্য প্রাচীন জাতিরা ইঁহাদিগকে যবন বলিত; ইঁহাদের নিজ নাম—গ্রীক।

মনুষ্য-ইতিহাসে এই মুষ্টিমেয় অলৌকিক বীর্যশালী জাতি এক অপূর্ব দৃষ্টান্ত। যে দেশে মনুষ্য পার্থিব বিদ্যায়—সমাজনীতি, যুদ্ধনীতি, দেশশাসন, ভাস্কর্যাদি শিল্পে অগ্রসর হইয়াছেন বা হইতেছেন, সেই স্থানেই প্রাচীন গ্রীসের ছায়া পড়িয়াছে। প্রাচীন কালের কথা ছাড়িয়া দেওয়া যাউক, আমরা আধুনিক বাঙ্গালী—আজ অর্ধশতাব্দী ধরিয়া ঐ যবনগুরু-দিগের পদানুসরণ করিয়া, ইউরোপীয় সাহিত্যের মধ্য দিয়া তাঁহাদের যে আলোটুকু আসিতেছে, তাহারই দীপ্তিতে আপনাদিগের গৃহ উজ্জ্বলিত করিয়া স্পর্ধা অনুভব করিতেছি।

সমগ্র ইউরোপ আজ সর্ববিষয়ে প্রাচীন

গ্রীসের ছাত্র এবং উত্তরাধিকারী; এমনকি একজন ইংলণ্ডীয় পণ্ডিত বলিয়াছেন, "যাহা কিছু প্রকৃতি সৃষ্টি করেন নাই, তাহা গ্রীকমনের সৃষ্টি।"

সুদূরস্থিত বিভিন্ন-পর্বতসমুৎপন্ন এই দুই মহানদীর মধ্যে মধ্যে সঙ্গম উপস্থিত হয়; যখনই ঐ প্রকার ঘটনা ঘটে, তখনই জনসমাজে এক মহা আধ্যাত্মিক তরঙ্গে উত্তোলিত সভ্যতা-রেখা সুদূরসম্প্রসারিত [ হয় ] এবং মানবমধ্যে ভ্রাতৃত্ববন্ধন দৃঢ়তর হয়।

অতি প্রাচীনকালে একবার ভারতীয় দর্শন-বিদ্যা গ্রীক উৎসাহের সম্মিলনে রোমক, ইরানী প্রভৃতি মহাজাতিবর্গের অভ্যুদয় সূত্রিত করে। সিকন্দর শাহের দিগ্বিজয়ের পর এই দুই মহা-জলপ্রপাতের সংঘর্ষে প্রায় অর্ধভূভাগ ঈশাদি-নামাখ্যাত অধ্যাত্মতরঙ্গরাজি উপপ্লাবিত করে। আরবদিগের অভ্যুদয়ের সহিত পুনরায় ঐ প্রকার মিশ্রণ আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতার ভিত্তিস্থাপন করে; এবং বোধ হয় আধুনিক সময়ে পুনরায় ঐ দুই মহাশক্তির সম্মিলনকাল উপস্থিত

এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ।

ভারতের বায়ু শান্তিপ্রধান, যবনের প্রাণ শক্তিপ্রধান; একের গভীর চিন্তা, অপরের অদম্য কার্যকারিতা; একের মূলমন্ত্র 'ত্যাগ', অপরের 'ভোগ', একের সর্বচেষ্টা অন্তর্মুখী, অপরের বহির্মুখী; একের প্রায় সর্ববিদ্যা অধ্যাত্ম, অপরের অধিভূত; একজন মুক্তিপ্রিয়, অপর স্বাধীনতাপ্রাণ; একজন ইহলোক-কল্যাণলাভে নিরুৎসাহ, অপর এই পৃথিবীকে স্বর্গভূমিতে পরিণত করিতে প্রাণপণ; একজন নিত্যসুখের আশায় ইহলোকের অনিত্য সুখকে উপেক্ষা করিতেছেন, অপর নিত্যসুখে সন্দিহান হইয়া বা দূরবর্তী জানিয়া যথাসম্ভব ঐহিক সুখ-লাভে সমুদ্যত।

এ যুগে পূর্বোক্ত জাতিদ্বয়ই অন্তর্হিত হইয়াছেন, কেবল তাঁহাদের শারীরিক বা মানসিক বংশধরেরা বর্তমান।

ইউরোপ-আমেরিকা যবনদিগের সমুন্নত মুখোজ্জ্বলকারী সন্তান; আধুনিক ভারতবাসী আর্যকুলের গৌরব নহেন।

কিন্তু ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় এই আধুনিক ভারতবাসীতেও অন্তর্নিহিত পৈতৃক শক্তি বিদ্যমান। যথাকালে মহাশক্তির কৃপায় তাহার পুনঃস্ফুরণ হইবে।

প্রস্ফুরিত হইয়া কি হইবে?

পুনর্বার কি বৈদিক যজ্ঞধূমে ভারতের আকাশ তরলমেঘাবৃত প্রতিভাত হইবে, বা পশুরক্তে রন্তিদেবের কীর্তির পুনরুদ্দীপন হইবে? গোমেধ, অশ্বমেধ, দেবরের দ্বারা সুতোৎপত্তি আদি প্রাচীন প্রথা পুনরায় কি ফিরিয়া আসিবে বা বৌদ্ধোপপ্লাবনে পুনর্বার সমগ্র ভারত একটি বিস্তীর্ণ মঠে পরিণত হইবে? মনুর শাসন পুনরায় কি অপ্রতিহত-প্রভাবে প্রতিষ্ঠিত হইবে বা দেশভেদে বিভিন্ন ভক্ষ্যাভক্ষ্য-বিচারই আধুনিক কালের ন্যায় সর্বতোমুখী প্রভুতা উপভোগ করিবে? জাতিভেদ বিদ্যমান থাকিবে?—গুণগত হইবে বা চিরকাল জন্মগত থাকিবে? জাতিভেদে ভক্ষ্য সম্বন্ধে স্পৃষ্টাস্পৃষ্ট-বিচার বঙ্গদেশের ন্যায় থাকিবে, বা মান্দ্রা-জাদির ন্যায় কঠোরতর রূপ ধারণ করিবে, অথবা পঞ্জাবাদি প্রদেশের ন্যায় একেবারে তিরোহিত হইয়া যাইবে? বর্ণভেদে যৌন[১] সম্বন্ধ মনূক্ত ধর্মের ন্যায় এবং নেপালাদি দেশের ন্যায় অনুলোমক্রমে পুনঃ প্রচলিত হইবে বা বঙ্গাদি দেশের ন্যায় একবর্ণ-

---

১ বৈবাহিক

মধ্যে অবান্তর বিভাগেও প্রতিবদ্ধ হইয়া অবস্থান করিবে? এ সকল প্রশ্নের সিদ্ধান্ত করা অতীব দুরূহ। দেশভেদে, এমনকি, একই দেশে জাতি- এবং বংশভেদে আচারের ঘোর বিভিন্নতা দৃষ্টে মীমাংসা আরও দুরূহতর প্রতীত হইতেছে।

তবে হইবে কি?

যাহা আমাদের নাই, বোধ হয় পূর্বকালেও ছিল না। যাহা যবনদিগের ছিল, যাহার প্রাণস্পন্দনে ইউরোপীয় বিদ্যুদাধার হইতে ঘন ঘন মহাশক্তির সঞ্চার হইয়া ভূমণ্ডল পরিব্যাপ্ত করিতেছে, চাই তাহাই। চাই—সেই উদ্যম, সেই স্বাধীনতাপ্রিয়তা, সেই আত্মনির্ভর, সেই অটল ধৈর্য, সেই কার্যকারিতা, সেই একতাবন্ধন, সেই উন্নতিতৃষ্ণা; চাই—সর্বদা পশ্চাদ্দৃষ্টি কিঞ্চিৎ স্থগিত করিয়া অনন্ত সম্মুখসম্প্রসারিত দৃষ্টি, আর চাই—আপাদমস্তক শিরায় শিরায় সঞ্চারকারী রজোগুণ।

ত্যাগের অপেক্ষা শান্তিদাতা কে? অনন্ত কল্যাণের তুলনায় ক্ষণিক ঐহিক কল্যাণ নিশ্চিত অতি তুচ্ছ। সত্ত্বগুণাপেক্ষা মহাশক্তি-সঞ্চয় আর কিসে হয়? অধ্যাত্মবিদ্যার তুলনায় আর সব 'অবিদ্যা'—সত্য বটে, কিন্তু কয়জন এ জগতে সত্ত্বগুণ লাভ করে,—এ ভারতে কয়জন? সে মহাবীরত্ব কয়জনের আছে যে, নির্মম হইয়া সর্বত্যাগী হন? সে দূরদৃষ্টি কয়-জনের ভাগ্যে ঘটে, যাহাতে পার্থিব সুখ তুচ্ছ বোধ হয়? সে বিশাল হৃদয় কোথায়, যাহা সৌন্দর্য- ও মহিমাচিন্তায় নিজ শরীর পর্যন্ত বিস্মৃত হয়? যাঁহারা আছেন, সমগ্র ভারতের লোকসংখ্যার তুলনায় তাঁহারা মুষ্টিমেয়। —আর এই মুষ্টিমেয় লোকের মুক্তির জন্য কোটি কোটি নরনারীকে সামাজিক আধ্যাত্মিক চক্রের নীচে নিষ্পিষ্ট হইতে হইবে?

এ পেষণেরই বা কি ফল?

দেখিতেছ না যে, সত্ত্বগুণের ধুয়া ধরিয়া ধীরে ধীরে দেশ তমোগুণসমুদ্রে ডুবিয়া গেল। যেথায় মহাজড়বুদ্ধি পরাবিদ্যানুরাগের ছলনায় নিজ মূর্খতা আচ্ছাদিত করিতে চাহে; যেথায় জন্মালস বৈরাগ্যের আবরণ নিজের অকর্মণ্য-তার উপর নিক্ষেপ করিতে চাহে; যেথায় ক্রূরকর্মা তপস্যাদির ভান করিয়া নিষ্ঠুরতাকেও ধর্ম করিয়া তুলে; যেথায় নিজের সামর্থ্যহীন-তার উপর দৃষ্টি কাহারও নাই - কেবল অপরের উপর সমস্ত দোষনিক্ষেপ; বিদ্যা কেবল কতিপয় পুস্তক-কণ্ঠস্থে, প্রতিভা চর্বিত-চর্বণে এবং সর্বোপরি গৌরব কেবল পিতৃপুরুষের নাম-কীর্তনে—সে দেশ তমোগুণে দিন দিন ডুবিতেছে, তাহার কি প্রমাণান্তর চাই?

অতএব সত্ত্বগুণ এখনও বহুদূর। আমাদের মধ্যে যাঁহারা পরমহংস-পদবীতে উপস্থিত হইবার যোগ্য নহেন বা ভবিষ্যতে [ হইবার ] আশা রাখেন, তাঁহাদের পক্ষে রজোগুণের আবির্ভাবই পরম কল্যাণ। রজোগুণের মধ্য দিয়া না যাইলে কি সত্ত্বে উপনীত হওয়া যায়? ভোগ শেষ না হইলে যোগ কি করিবে? বিরাগ না হইলে ত্যাগ কোথা হইতে আসিবে?

অপর দিকে তালপত্রবহ্নির ন্যায় রজোগুণ শীঘ্রই নির্বাণোন্মুখ, সত্ত্বের সন্নিধান নিত্যবস্তুর নিকটতম, সত্ত্ব প্রায় নিত্য, রজোগুণপ্রধান জাতি দীর্ঘজীবন লাভ করে না, সত্ত্বগুণপ্রধান যেন চিরজীবী; ইহার সাক্ষী ইতিহাস।

ভারতে রজোগুণের প্রায় একান্ত অভাব; পাশ্চাত্যে সেই প্রকার সত্ত্বগুণের। ভারত হইতে সমানীত সত্ত্বধারার উপর পাশ্চাত্য জগতের জীবন নির্ভর করিতেছে নিশ্চিত, এবং নিম্নস্তরে তমোগুণকে পরাহত করিয়া রজোগুণ-প্রবাহ প্রতিবাহিত না করিলে আমাদের ঐহিক

কল্যাণ যে সমুৎপাদিত হইবে না ও বহুধা পারলৌকিক কল্যাণের বিঘ্ন উপস্থিত হইবে, ইহাও নিশ্চিত।

এই দুই শক্তির সম্মিলনের ও মিশ্রণের যথাসাধ্য সহায়তা করা 'উদ্বোধনে'র জীবনোদ্দেশ্য।

যদ্যপি ভয় আছে যে, এই পাশ্চাত্যবীর্য-তরঙ্গে আমাদের বহুকালার্জিত রত্নরাজি বা ভাসিয়া যায়; ভয় হয়, পাছে প্রবল আবর্তে পড়িয়া ভাবতভূমিও ঐহিক ভোগলাভের রণভূমিতে আত্মহারা হইয়া যায়; ভয় হয়, পাছে অসাধ্য অসম্ভব এবং মূলো-চ্ছেদকারী বিজাতীয় ঢঙের অনুকরণ করিতে যাইয়া আমরা 'ইতোনষ্টস্ততোভ্রষ্টঃ' হইয়া যাই। এইজন্য ঘরের সম্পত্তি সর্বদা সম্মুখে রাখিতে হইবে, যাহাতে আসাধারণ সকলে তাহাদের পিতৃধন সর্বদা জানিতে ও দেখিতে পারে, তাহার প্রযত্ন কবিতে হইবে ও সঙ্গে সঙ্গে নির্ভীক হইয়া সর্বদ্বার উন্মুক্ত করিতে হইবে। আসুক চাবিদিক হইতে রশ্মিধাবা, আসুক তীব্র পাশ্চাত্য কিরণ। যাহা দুর্বল দোষযুক্ত, তাহা মরণশীল—তাহা লইয়াই বা কি হইবে? যাহা বীর্যবান বলপ্রদ, তাহা অবিনশ্বর; তাহার নাশ কে করে?

কত পর্বতশিখর হইতে কত হিমনদী, কত উৎস, কত জলধারা উচ্ছ্বসিত হইয়া বিশাল সুর-তরঙ্গিণীরূপে মহাবেগে সমুদ্রাভিমুখে যাইতেছে। কত বিবিধ প্রকারের ভাব, কত শক্তি-প্রবাহ—দেশদেশান্তর হইতে কত সাধু-হৃদয়, কত ওজস্বী মস্তিষ্ক হইতে প্রসূত হইয়া নর-রঙ্গক্ষেত্র কর্মভূমি—ভারতবর্ষকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছে। লৌহবর্ত্ম-বাষ্পপোতবাহন ও তড়িৎসহায় ইংরেজের আধিপত্যে বিদ্যুদ্বেগে নানাবিধ ভাব—রীতিনীতি দেশমধ্যে বিস্তীর্ণ হইয়া পড়িতেছে। অমৃত আসিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে গরলও আসিতেছে; ক্রোধ-কোলাহল, রুধিরপাতাদি সমস্তই হইয়া গিয়াছে—এ তরঙ্গরোধের শক্তি হিন্দুসমাজে নাই। যন্ত্রোদ্ধৃত জল হইতে মৃতজীবাস্থি-বিশোধিত শর্করা পর্যন্ত সকলই বহু বাগাড়ম্বরসত্ত্বেও নিঃশব্দে গলাধঃকৃত হইল; আইনের প্রবল প্রভাবে ধীরে ধীরে, অতি যত্নে রক্ষিত রীতিগুলিরও অনেকগুলি ক্রমে ক্রমে খসিয়া পড়িতেছে,—রাখিবার শক্তি নাই। নাই বা কেন? সত্য কি বাস্তবিক শক্তিহীন? 'সত্যমেব জয়তে নানৃতম্'- এই বেদবাণী কি মিথ্যা? অথবা যেগুলি পাশ্চাত্য রাজশক্তি বা শিক্ষাশক্তির উপপ্লাবনে ভাসিয়া যাইতেছে, সেই আচারগুলিই অনাচাব ছিল? ইহাও বিশেষ বিচারের বিষয়।

'বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়' নিঃস্বার্থভাবে ভক্তিপূর্ণহৃদয়ে এই সকল প্রশ্নের মীমাংসার জন্য 'উদ্বোধন' সহৃদয় প্রেমিক বুধমণ্ডলীকে আহ্বান করিতেছে এবং দ্বেষ-বুদ্ধিবিরহিত ও ব্যক্তিগত বা সমাজগত বা সম্প্রদায়গত কুবাক্যপ্রয়োগে বিমুখ হইয়া সকল সম্প্রদায়ের সেবার জন্যই আপনার শরীর অর্পণ করিতেছে।

কার্যে আমাদের অধিকার, ফল প্রভুর হস্তে; আমরা কেবল বলি- হে ওজঃস্বরূপ! আমাদিগকে ওজস্বী কর; হে বীর্যস্বরূপ! আমাদিগকে বীর্যবান কর; হে বলস্বরূপ! আমাদিগকে বলবান কর।

# বৈদান্তিক ঈশ্বরবাদের কার্যকারিতা—নিঃস্বার্থপরতা*

**স্বামী সারদানন্দ**

······গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন, হে অর্জুন, যা কিছু শক্তিমান, যা কিছু শ্রেষ্ঠ দেখিবে, তাহা আমি; নদীর মধ্যে আমি গঙ্গা, বৃক্ষের মধ্যে আমি অশ্বত্থ, ইত্যাদি বলিয়া অবশেষে বলিতেছেন, আর আমি কত বলিব, আমি একাংশে সমস্ত জগৎ হইয়া রহিয়াছি। এই বিরাটের পূজাই শ্রেষ্ঠ পূজা। সাধন ভজন সব এক কথায় বলিলে ইহাই বলা যায় যে—স্বার্থত্যাগ। কি জ্ঞানপথ, কি ভক্তিপথ স্বার্থত্যাগ ভিন্ন কোন পথে সফল হইবার সম্ভাবনা নাই। আপনাকে ভুলিয়া যাওয়া—যে আপনাকে ভুলিতে পারিয়াছে, স্বার্থত্যাগ করিতে পারিয়াছে, তাহার সাধন ভজন সব হইয়াছে। ঈশ্বর কি খোসামোদের বশ যে, যে তাঁহাকে স্তবস্তুতি করিল, তাহার প্রতি প্রসন্ন হইবেন, আর যে করিল না, তাহার প্রতি বিমুখ হইবেন? না, তিনি একরূপ নন। একজন ভগবান মানে না, কিন্তু সে স্বার্থশূন্য, পরের সেবা তার ব্রত, ইহাই তার প্রধান সাধন। জানিও, তার ঈশ্বরলাভের বিলম্ব নাই। আর যে দিবারাত্র ঈশ্বরপূজায় ব্যস্ত কিন্তু মহা-স্বার্থপর, তার সাধন ভজন পণ্ডশ্রম মাত্র। সর্বভূতে ভগবানকে দেখিতে হইবে, সকলকেই তাঁর মূর্তি জানিয়া সেবা করিতে হইবে। বেদান্ত ইহাই বলেন, সকলেই বিরাটের অংশ। সেই বিরাট মনের এক এক ক্ষুদ্র অংশ আমরা অধিকার করিয়া বলিতেছি আমার মন। তুমি একটু লইয়া বলিতেছ, তোমার মন। যেমন গঙ্গার কোন অংশে বেড়া দিয়া আমি এক একটা নাম দিলাম ঘোষ গঙ্গা, বোস গঙ্গা ইত্যাদি সকলেই কিন্তু জানেন বাস্তবিক গঙ্গা এক। সেই এক জল-এক তরঙ্গ, কেবল নামরূপে প্রভেদ। সমুদ্রের একাংশকে এক নাম দিলাম, অন্য অংশকে আর এক নাম দিলাম, কিন্তু উহা একই সমুদ্র। সেইরূপ মন এক, কেবল উপাধিভেদে ভিন্ন ভিন্ন বলিতেছি। যখন দুই জনের মন পরস্পরের প্রতি স্বার্থশূন্য ভালবাসায় সংযুক্ত হয়, একভাবে ভাবিত হয়, তখন তাহাদের শরীর পৃথিবীর দুইপ্রান্তে থাকিলেও মনের কথা জানিতে পারে; আমরা ইহার অনেক দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই। সেইজন্য আমাদের মন ও শরীর পরস্পর সংলগ্ন রহিয়াছে, ইহা এক মহাসত্য। যখন মনে পাপচিন্তার উদয় হয়, অন্যান্য মনের পাপচিন্তা সেই মনে প্রবাহিত হইয়া তাহাকে আরো পাপে নিমগ্ন করে। আবার কোন সৎ বা ধর্মচিন্তার উদয় হইলে, যত সাধু মহাপুরুষদিগের চিন্তা তাহার মনের উপর কার্য করিয়া তাহাকে আরো উন্নত করিতে থাকে। আমাদের সমস্ত সাধন ভজন আমাদিগকে স্বার্থশূন্য করিয়া এই বিরাটের উপলব্ধির দিকে ক্রমশঃ অগ্রসর করে।

---

* উদ্বোধন, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা ( পৃঃ ৩০, ৩১ ) হইতে 'সারদানন্দ স্বামীর বক্তৃতা' প্রবন্ধের আংশিক পুনর্মুদ্রণ।—সঃ

# আমাদের জাতীয় জীবনাদর্শ

## স্বামী আদিনাথানন্দ

হিন্দু সংস্কৃতি বলিতে আমরা বুঝিব আর্য ঋষিগণের মনীষা সামগান-মুখরিত তপোবনে যে মহান সত্য আবিষ্কার করিয়াছিল এবং এই মহাসাধনার মহামহীরুহ বিগত ৬ হাজার বৎসরব্যাপী বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় প্রসারিত হইয়া একটি আধ্যাত্মিক জীবনদর্শনমূলক যে সভ্যতা সৃষ্টি করিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের ছন্দে এই সাধনার ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে।

'হেথা একদিন বিরামবিহীন মহা-ওঙ্কারধ্বনি
হৃদয়তন্ত্রে একের মন্ত্রে বেজেছিল রনরনি
তপস্যাবলে একের অনলে বহুরে
আহুতি দিয়া
বিভেদ ভুলিল, জাগায়ে তুলিল একটি
বিরাট হিয়া।'

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে আছে :

'যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু, যো বিশ্বং
ভুবনমাবিবেশ।
যো ঔষধীষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায়
নমো নমঃ॥'

'এই যে ভারতের সাধনা ইহা ভূমার সাধনা, বিশ্বের সঙ্গে ঐক্যানুভূতির সাধনা। স্বাতন্ত্র্যের দ্বারা বিক্রমশালী হইয়া উঠা লক্ষ্য নহে, মিলনের দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া উঠাই চরম পরিণাম।' ঐশ্বর্য সঞ্চিত করিয়া জাগতিক ভোগে মগ্ন থাকা নহে—আত্মার ব্যাপৃতি দ্বারা বিশ্বাত্মাকে নিজের মধ্যে এবং সর্বভূতে দর্শন করাই জীবনের সফলতা।

আজ আমাদের সম্মুখে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের দুইটি বিভিন্ন সংস্কৃতি তাহাদের আত্মগত বৈশিষ্ট্য লইয়া উপস্থিত হইয়াছে। তাহাদের সংঘর্ষ অর্থনীতি ও রাজনীতি ক্ষেত্রে চলিতেছে। একদিকে পাশ্চাত্যের জড়বাদসর্বস্ব জীবনদর্শন, বৈজ্ঞানিক উন্নতি, যন্ত্রশিল্পের বিপুল সমাবেশ, ধনোৎপাদনের চমকপ্রদ আবিষ্কারসমূহ এবং যান্ত্রিক অভ্যুদয়ের বিজয়-অভিযান। অন্যদিকে ধ্যান, ধারণা, যোগ, সমাধি, মুমুক্ষুত্ব, বিবেক, বৈরাগ্য, ঈশ্বরলাভের ব্যাকুলতা, চিত্তশুদ্ধির কঠোর ব্যবস্থা, ত্যাগ, তপস্যা, সংযম প্রভৃতি চিরন্তন প্রাচ্য আদর্শের চিত্র আমাদের চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিতেছে। কিন্তু মানবচিত্ত বিভ্রান্ত হইয়া এই জাগতিক অভ্যুদয়ের জন্য অভিযানপ্রয়াসী। কিন্তু প্রশ্ন এই—প্রাচ্যের আদর্শকে বিসর্জন দিয়া মানবপ্রগতি মঙ্গলময়, শান্তিময় হইবে কি? জড়ের উপাসনা দ্বারা আমরা তৃপ্তি পাইব কি? আজ ইহা ঐকান্তিকভাবে চিন্তা করিবার সময় আসিয়াছে।

সুতরাং প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে আমাদের চিরন্তন জাতীয় জীবনাদর্শের সম্যক অর্থবোধ। আত্মসংবিদ ব্যতীত আমরা শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ মার্গ বাছিয়া লইতে পারিব না।

আজ আরও একটি কথা দৃঢ়ভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এক জাতির সঙ্গে অন্য জাতির অনুকরণ ও অনুসরণের সম্বন্ধ নয়। আদান ও প্রদানের সম্বন্ধ। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যাহাকে বলা হয় সহাবস্থান (co-existence)। আমাদের যদি নূতন কিছু দিবার না থাকে তবে অপরের সঙ্গে আদান-প্রদান চলে না। সমকক্ষ ভাবে কাহারও সঙ্গে ব্যবহার করা যায় না।

সুতরাং ভারতবর্ষ যদি খাঁটী ভারতবর্ষ হইয়া না উঠে তবে বিশ্বের বাজারে মজুরী করা ছাড়া তাহার আর কোনও প্রয়োজন থাকিবে না। তাহা হইলে আত্মসম্মানবোধ চলিয়া যাইবে এবং দাতার আনন্দ হইতে আমরা বঞ্চিত হইব।

নিজ নিজ রাজনৈতিক মতবাদ লইয়া রাশিয়া বৃটেন বা আমেরিকা আজিকার পৃথিবীর আতঙ্ক কাটাইতে পারিতেছে না। আন্তর্জাতিক শান্তি সুদূর-পরাহত হইতেছে। পূর্ব ও পশ্চিম ভূখণ্ডের চিন্তাশীল বহু ব্যক্তি মনে করিতেছেন যে, আধ্যাত্মিক-আদর্শমূলক ভারতীয় সংস্কৃতি জগতে যথার্থ শান্তিস্থাপনে সমর্থ হইবে।

সেইজন্য অবহিতচিত্তে বিচার করিতে হইবে, যে-সত্য ভারত নিশ্চিতরূপে লাভ করিয়া জগতের জ্ঞানভাণ্ডারে দান করিবে এবং বিশ্বশান্তির ভিত্তি পত্তন করিবে, সেই সত্যটি কি? 'সে-সত্য বণিকবৃত্তি নহে—রাজনৈতিক স্বারাজ্য নহে, স্বাদেশিকতা নহে—উহা বিশ্ব-জাগতিকতা।' সেই সত্য ভারতের তপোবনে সাধিত হইয়াছে, উপনিষদে উচ্চারিত হইয়াছে, গীতায় ব্যাখ্যাত হইয়াছে। বুদ্ধদেব সে-সত্যকে পৃথিবীতে সকল মানবের নিত্য ব্যবহারে সফল করিয়া তুলিবার জন্য তপস্যা করিয়াছেন এবং বিভিন্ন যুগে দুর্গতি ও বিকৃতির মধ্যে কবীর, নানক, শ্রীচৈতন্য, আচার্য শঙ্কর ও শ্রীরামানুজ প্রভৃতি পরবর্তী মহামানবগণ সেই সত্যই প্রচার করিয়াছেন। সংক্ষেপে ভারতবর্ষের সাধনার তত্ত্ব 'জ্ঞানে অদ্বৈত তত্ত্ব, ভাবে বিশ্ব-মৈত্রী, কর্মে যোগসাধনা।' এই সত্যলাভের উপায় ব্রহ্মচর্য, শ্রীভগবানের চিন্তায় একাগ্রতা-অভ্যাস, সর্বজীবে দয়া এবং সর্বভূতে ব্রহ্মসত্তা উপলব্ধি করিয়া সেবায় আত্মদান। ভারতে ইহা কেবল কাব্যকথা- বা মতবাদরূপে ছিল না। প্রত্যেকের জীবনে উহাকে ফুটাইয়া তুলিবার অনুশাসন ছিল।

'যদ্ যদ্ কর্ম প্রকুর্বীত তৎ তদ্ ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ।
ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃ স্যাৎ হরিভক্তিপরায়ণঃ।'

এই অনুশাসন যদি আমরা বিস্মৃত না হই এবং আমাদের শিক্ষা ও দীক্ষাকে যদি এই জীবনদর্শনের অনুগত করি তবেই আমাদের জাতীয় জীবন পুনরায় সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত হইবে। ভারতের সনাতন ঐতিহ্য পুনরায় নূতন সমাজনীতি, নূতন রাজনীতি, নূতন অর্থনীতি, নূতন শিক্ষাপদ্ধতি গড়িয়া তুলিবে এবং আধ্যাত্মিক ও জাগতিক উভয়বিধ সম্পদশালী এক বিরাট মহীয়ান সভ্যতার বনিয়াদ গড়িয়া উঠিবে। ইহাই বিশ্বের অপরাপর জাতির পথপ্রদর্শক হইবে।

আমাদের এই জগৎ শ্রমবিভাগনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। সকলের নিকট সব কিছুর অধিকার থাকিবে, ইহা বলার কোন তাৎপর্য নাই। সেইজন্য পার্থিব ক্ষমতায় শক্তিশালী জাতিগুলি ভাবিয়া বসে যে, ঐ শক্তি একমাত্র প্রার্থনীয় বস্তু। প্রগতি বা সংস্কৃতির অর্থ উহাই। আবার অন্য জাতি জড়বাদী সভ্যতাকে একান্তই নিরর্থক মনে করে। ইহা প্রাচ্য দৃষ্টিভঙ্গী, অপরটি পাশ্চাত্ত্য। প্রত্যেকটির নিজস্ব গুরুত্ব ও মহিমা আছে। এই দুইটি আদর্শের সংমিশ্রণে সামঞ্জস্যবিধান করাই বর্তমান যুগসমস্যার সমাধান।

আমাদের জাতির প্রাণশক্তিকে উদ্বুদ্ধ ও তেজোদীপ্ত করিবার একমাত্র পন্থা ভারতীয় ভাবধারার মাধ্যমে বিশ্ব-বিজয়।

ভারতের দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক ভাব-রাজিকে পুনরায় দেশের বাহিরে প্রচারিত করিয়া জগতের চিন্তারাজ্য দখল করিতে

হইবে। উহা কেবল কথায় হইবে না, জীবন দেখাইতে হইবে।

পাশ্চাত্ত্য সমাজের নিকট যাহা পাইব তাহার বিনিময়ে তাহাকে আমাদের আধ্যাত্মিক সম্পদ দিতেই হইবে। আমাদের শিখিতে হইবে এবং শিখাইতেও হইবে। আমার বিশ্বাস—শুধু ভারতের নয়, সমগ্র জগতেরই কল্যাণপথে আলোকবর্ষী, মনুষ্যত্বের উদ্বোধক ধর্মানুশীলন ও বেদান্তের সার্বজনীন ভাবের ব্যাপক প্রচারকে বাদ দিয়া রাজনৈতিক বা অন্য কোন আন্দোলনই ভারতের যথার্থ উন্নতিসাধনে সক্ষম হইবে না। যথার্থ ধর্মকে আমরা জীবনে রূপায়িত করিব, তাহার উদ্বোধন, সংরক্ষণ ও প্রচারে আমরা আত্ম-নিয়োগ করিব—এই দৃঢ় ব্রত আমরা গ্রহণ করিলে ভারতের নব জাগরণ নূতন রূপ পরিগ্রহ করিবে, অমিতশক্তিশালী, অপ্রতি-রোধ্য হইবে।

# আত্ম-দর্শন

শ্রীমতী সুজাতা প্রিয়ংবদা

[ পরীত্য ভূতানি পরীত্য লোকান্
পরীত্য সর্বাঃ প্রদিশো দিশশ্চ।
উপস্থায় প্রথমজামৃতস্য
আত্মনাত্মানমভি সংবিবেশ॥ ]

যজুঃ ৩২.১১।

জানি না, আমার আত্মা
কবে যে বিচ্যুত ভেবেছিল
আপনারে বিশ্ব-আত্মা থেকে।
জানি নাকো কত জন্ম ধরি
কত লোক-লোকান্তরে
শ্রান্ত হয়ে খুঁজেছে বৃথাই
বহির্বিশ্বেতে তার আপন আশ্রয়।
পায়নি সন্ধান,
কোন্ মহাসিন্ধু মাঝে
মিলিত হবার তরে
জন্মে জন্মে চিত্তে তার উঠেছে তুফান।

এবার আমার অন্তরে
উদয় হয়েছে শ্রদ্ধার!
জ্যোতিষ্মান সে শ্রদ্ধার প্রথম কিরণে
উদ্ভাসিত হ'ল সত্য
বিন্দু হ'ল সাগর সমান,
অন্ধ অন্তর হ'ল দিব্য চক্ষুষ্মান।
দেখিলাম অভেদ আবার
বিশ্ব-আত্মার সাথে এ আত্মা আমার।
"আমার 'আমি'র ধারা" মিশে গেল ক্রমে
"পরিপূর্ণ চৈতন্যের সাগর-সঙ্গমে।"

# বিবেকানন্দ ও বেদান্তদর্শন

## ডক্টর ঝরণা ভট্টাচার্য

'শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ'—হে অমৃতের পুত্রগণ, তোমরা শ্রবণ কর—উপনিষদের এই বাণী ভারতের তথা সমগ্র বিশ্বের প্রতিটি নর-নারীর সামনে তুলে ধরেছিলেন, আজ থেকে প্রায় সত্তর বছর আগে ভারতেরই এক সন্তান, অমৃতের পুত্র স্বামী বিবেকানন্দ। মোহতমসাচ্ছন্ন প্রতিটি মানুষের কাছে এগিয়ে গেছেন তিনি আশার বাণী নিয়ে, কাটিয়ে দিতে চেয়েছেন তাদের তমোঘোর, নিদ্রাচ্ছন্নভাব। বলেছেন—উঠ, জাগো, আত্মজ্ঞান লাভ কর :

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।"

কঠ, ১।৩।১৪

এই উপনিষদের অনুপ্রেরণায় তাঁর সারা জীবন গড়ে উঠেছিল। উপনিষদ্ ও বেদান্তের শিক্ষায়-দীক্ষায় যে-জীবন তিনি লাভ করে-ছিলেন তা জড় নয়, মোহগ্রস্ত নয়, আবার অবাস্তবও নয়। তা ছিল নিছক চৈতন্যময়, জ্ঞানময়, আবার কর্মবহুল। জ্ঞান ও কর্মের এই যে সমন্বয় তা মূর্ত হ'য়ে উঠেছিল তাঁর চরিত্রে। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনে 'কর্ম-জীবনে বেদান্ত' সম্বন্ধে যে বক্তৃতা তিনি দিয়েছিলেন তাতে এই কথাই প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন যে, কর্মজীবনে বেদান্তদর্শনের উপযোগিতা আছে। ভারতীয় সংস্কৃতির ধারক-ও বাহকরূপে এই বেদান্তদর্শন প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। আধ্যাত্মিকতা ও ব্যাবহারিক জীবনের কাল্পনিক প্রভেদ দূর করতে পারে এই বেদান্ত-দর্শন। কর্মজীবনে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে, তেজ ও বীর্যে বলীয়ান করতে সমর্থ এই বেদান্তদর্শন।

তাই দেখি, বেদান্তের পটভূমিকায় স্বামী বিবেকানন্দের জীবন গড়ে উঠেছিল বলে শুধু আধ্যাত্মিকতাবাদ নিয়েই তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন না—সাধারণ বাস্তব জীবনে তার প্রভাব প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। তাই তিনি বলেছেন—"ব্যাবহারিক জগতে অদ্বৈতবাদ কার্যে পরিণত করা আমাদের যত প্রয়োজন, আধ্যাত্মিকতার প্রয়োজন ততটা নয়।"

বেদ আমাদের প্রাচীনতম শাস্ত্র এবং প্রামাণ্য শাস্ত্র। বেদের যে শিক্ষা তা অভ্রান্ত, কারণ বেদ অপৌরুষেয়। এই বেদের মধ্যেই রয়েছে দুটো দিক—এক কর্মকাণ্ড আর এক জ্ঞানকাণ্ড। কর্মকাণ্ডে আছে নানাপ্রকার যাগ-যজ্ঞ ও অনুষ্ঠানপদ্ধতির কথা আর জ্ঞানকাণ্ডে আছে বেদের আধ্যাত্মিক উপদেশ—যা পরে উপনিষদ্ বা বেদান্ত নামে পরিচিত হয়েছে। এই বেদান্তকে ভিত্তি ক'রেই দ্বৈতবাদ, বিশিষ্টা-দ্বৈতবাদ, অদ্বৈতবাদ প্রভৃতি মতবাদের সৃষ্টি। এই বিভিন্ন মতবাদগুলির মধ্যে পার্থক্য থাকলেও এদের মধ্যে যে বাস্তবিক কোন বিরোধ নাই তা স্বামী বিবেকানন্দ বুঝেছিলেন। তাই সমস্ত মতবাদের মূল উপনিষদের বাণীকেই অবলম্বন করে এগিয়ে গেছেন জীবনের আধ্যাত্মিক সাধনায় ও ব্যাবহারিক জগতের উন্নতিসাধনে। তিনি বলেছেন—"আমি এই সকল উপনিষদেই একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছি যে, প্রথমে দ্বৈতভাবের কথা—উপাসনা প্রভৃতি আরম্ভ হইয়াছে, শেষে অদ্বৈত-ভাবের অপূর্ব উচ্ছ্বাসে সেগুলি সমাপ্ত হইয়াছে।"

এই বেদান্তদর্শনের চরম ও পরম তত্ত্ব আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান। মানবমন অজ্ঞানতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন। এই দুঃখ, কষ্ট, পাপ, তাপ থেকে মানুষ অব্যাহতি পেতে চায়—পেতে চায় সুখের সন্ধান, আনন্দের আলো। কিন্তু যতক্ষণ না তার মন থেকে এই অজ্ঞানতারূপ দুঃখের আবরণ অপসারিত হচ্ছে ততক্ষণ সে ঘুরে বেড়াচ্ছে এই সংসাররূপ আবর্তে—যেখানে অহরহ অভাব, অনটন, দুঃখকষ্ট তাকে ঘিরে রয়েছে। বেদান্তে একেই বলা হয়েছে জগৎ—জড় জগৎ। তাই পাশ্চাত্য মনীষিগণ বলেছেন: ভাবতীয় দর্শনে নৈরাশ্যবাদই স্থান-লাভ করেছে। প্রত্যহই যদি মানুষ দুঃখকষ্টের বেড়াজালে আবদ্ধ থাকে তাহলে আনন্দ কোথায়? দুঃখের হাত হতে মুক্তি কোথায়? কিন্তু নৈরাশ্যবাদ যে ভারতীয় দর্শনের ভিত্তি নয়—সর্ববিধ দুঃখের আত্যন্তিক মুক্তিই যে বেদান্তের চরম কথা, একথা ভারতের জন-সাধারণের কাছে তুলে ধরেছেন স্বামী বিবেকানন্দ। তিনি বলেছেন, আশাবাদই ভারতীয় দর্শনের ভিত্তি। আশাবাদের মূল কারণই হ'ল ব্রহ্মস্বরূপে নিজেকে উপলব্ধি করা। উপনিষদে আছে—'আত্মানং বিদ্ধি'। নিজেকে জান, নিজেকে পরম ব্রহ্ম ব'লে জান, নিজেকে ব্রহ্মস্বরূপ বলে উপলব্ধি কর।

এই যে ব্রহ্মস্বরূপে নিজেকে উপলব্ধি করা—এই ব্রহ্মস্বরূপ বলতে আমরা কি বুঝি? এই জীবজগৎরূপ মায়াময় সগুণ ব্রহ্ম? না জীবজগৎ থেকে মুক্ত নির্গুণ ব্রহ্ম? আমাদের শাস্ত্রে ব্রহ্মের দ্বিবিধ স্বরূপ সম্বন্ধে উল্লেখ আছে। সগুণ ব্রহ্ম সর্বব্যাপী, জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়ের কর্তা, জগতের কারণস্বরূপ। আর নির্গুণ ব্রহ্ম দেশ, কাল ও নিমিত্তের অতীত—কার্যকারণসম্বন্ধের অতীত; ব্রহ্ম অজ্ঞেয়, অমেয়, অনির্দেশ্য; ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দস্বরূপ। তৈত্তিরীয় উপনিষদে বলা হয়েছে—'সত্যং জ্ঞান-মনন্তং ব্রহ্ম'। ব্রহ্মই সত্য বস্তু—বিশ্বের সমস্ত বস্তুই মিথ্যা। সত্যস্বরূপ ব্রহ্মই চিন্ময় জ্ঞান-স্বরূপ। বিশ্বেব যাবতীয় বস্তুই ব্রহ্মের দ্বারা প্রকাশিত হয়—কিন্তু ব্রহ্মকে প্রকাশ করবার জন্য অন্য কোন প্রকাশকের অপেক্ষা থাকে না। ব্রহ্ম স্বয়ং-প্রকাশ। চন্দ্র, সূর্য, বিদ্যুৎ, অগ্নি প্রভৃতি সমস্ত জ্যোতিষ্মান্ পদার্থই ব্রহ্মের দ্বারা প্রকাশবান।

"তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং
তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি।" কঠ, ৫।১৫

উপনিষদে যেরূপ ব্রহ্মেব নির্গুণ তত্ত্বের কথা আছে, সেরূপ সগুণ তত্ত্বেব কথাও ব্যক্ত হয়েছে। কিন্তু এই সগুণ ও নির্গুণ একই তত্ত্ব। যিনি নির্গুণ, তিনিই মায়া অবলম্বনে সগুণ হন। নির্গুণ ব্রহ্ম অনাদি মায়াজালে নিজেকে আবৃত ক'বে সগুণ ও সবিশেষ হন। মায়াই ব্রহ্মের আবরণ, এই মায়াই প্রকৃতি আব মায়াশ্রিত ব্রহ্মই ঈশ্বর।

"মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্।"
—শ্বেতাশ্ব. ৪।১০। জীব ও জগৎ ব্রহ্মেরই মায়িক বিকাশ। জগতের বাহিরেও তিনি, ভিতরেও তিনি। যাহা কিছু ব্যক্ত, যাহা কিছু অব্যক্ত—সমস্তই তিনি। বিশ্বের যাবতীয় বস্তুই ব্রহ্মময়, সমস্তই আত্মময়। ঈশোপ-নিষদেও বলা হয়েছে—"ঈশাবাস্যমিদং সর্বম্..."—ঈশ (১)। ঈশ্বরই মায়া দ্বারা নাম ও রূপের ভেদ সাধন করে দ্বৈত জগতের সৃষ্টি করেছেন। এই নাম, রূপ ও দ্বৈত জগৎ সমস্তই মিথ্যা, অনিত্য—ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, নিত্য বস্তু। যেমন একখণ্ড মাটিকে জানলে সেই মাটির দ্বারা নির্মিত যাবতীয় বস্তুরই জ্ঞান হ'য়ে থাকে, কারণ মৃন্ময় বস্তু ঐ মাটিরই বিকার

মাত্র। কেবলমাত্র নাম ও রূপে ঐ বস্তুগুলি পরস্পর পৃথক্; কিন্তু উহারা মাটি ব্যতীত আর কিছুই নয়। সেরূপ বিশ্বের যাবতীয় পদার্থের—যেমন সাগর, পর্বত, বৃক্ষ, পক্ষী, মনুষ্য প্রভৃতির নাম ও রূপে পার্থক্য থাকলেও স্বরূপতঃ তারা ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই নয়। জাগতিক পদার্থের মধ্যে নাম ও রূপের যতই পার্থক্য থাকুক, তাদের মূলে এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মই বিরাজমান। জগৎকে ব্রহ্মরূপে দেখলেই যথার্থ দেখা আর ব্রহ্মভিন্নরূপে দেখলে সেই জগৎ-দর্শন মিথ্যা হয়। এই নির্গুণ ব্রহ্মসত্তা থেকে নিজেকে পৃথক্‌ভাবে চিন্তা করলেই হয় দুঃখের উৎপত্তি। আর আনন্দের সন্ধান মেলে, যখন নৈর্ব্যক্তিক সত্তার সঙ্গে আমাদের একত্বজ্ঞান হয়। এই নির্গুণ ব্রহ্মসত্তায় একাত্মীভূত হওয়াতেই মুক্তি—এই মুক্তিই অদ্বৈতবেদান্তের অন্যতম লক্ষ্য। স্বামী বিবেকানন্দ অদ্বৈতবেদান্তের এই দিকটিকে নীতিবিজ্ঞানের ভিত্তি ব'লেই গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেছেন—"অতি প্রাচীনকাল হইতেই প্রত্যেক জাতির ভিতর এই সত্য প্রচারিত হইয়াছে—সকলকে নিজের মত ভালবাসিবে। প্রাণি-নির্বিশেষে সকলকেই নিজের মত প্রীতি করিতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু অপর প্রাণিগণকে নিজের মত ভালবাসিলে কেন কল্যাণ হইবে, কেহই তাহার কারণ নির্দেশ করেন নাই। একমাত্র নির্গুণ ব্রহ্মবাদই ইহার কারণ নির্দেশ করিতে সমর্থ। যখন সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডকে এক ও অখণ্ড বলিয়া বোধ করিবে, যখন জানিবে অপরকে ভালবাসিলে নিজেকেই ভালবাসা হইল, তখনই বুঝিবে অপরের ক্ষতি করিলে নিজেরই ক্ষতি করা হইল; তখনই আমরা বুঝিব কেন অপরের অনিষ্ট করা উচিত নয়। সুতরাং এই নির্গুণ ব্রহ্মবাদেই নীতিবিজ্ঞানের মূলতত্ত্বের যুক্তি পাওয়া যায়।"

ঈশ্বরে বিশ্বাস থাকলে যেমন হৃদয়ে অপূর্ব প্রেমের উচ্ছ্বাস হয়, তেমনি আমিই সেই নির্গুণ ব্রহ্ম ( সোঽহম্ )—এই জ্ঞান যখন হয় তখন হৃদয়ে অপূর্ব শক্তির বিকাশ হয়। তাই স্বামীজী বলছেন, এই 'সোঽহম্' জ্ঞানের মধ্যে দিয়েই আসবে বীর্য, আসবে শৌর্য, আসবে তেজস্বিতা। মানুষ যেভাবে নিজেকে চিন্তা করে, সেভাবেই নিজেকে গ'ড়ে তোলে। যদি মানুষ নিজেকে দুর্বল ভাবে তাহ'লে সে দুর্বল হবে, নিজেকে পাপী ভাবলে পাপী বলেই পরিচিত হবে। এভাবে দেখা যায় নিজের শুদ্ধি ও অশুদ্ধি নিজের চিন্তাধারার উপরই কার্যকরী হ'যে থাকে। যদি মানুষ নিজেকে 'সোঽহম্' ভাবতে শেখে, সেই তেজঃস্বরূপ চিন্ময় রূপকে নিজেরই সত্তা ব'লে চিন্তা করতে শেখে, তাহলে সে সহজেই তেজস্বী হ'তে পারবে। আমাদের মধ্যেই প্রচ্ছন্ন রয়েছে জ্ঞান, সকল শক্তি ও পবিত্রতার ভাব। অদ্বৈতবাদ থেকে আমরা এই যে শিক্ষা পেলাম, তা আমাদের জাতীয় জীবনকে উদ্বুদ্ধ ক'রে তুলবে। সকল বাধা-বিপত্তিকে দুহাতে সরিয়ে এগিয়ে যাবে মানুষ উন্নতির পথে, জয়ের পথে—আর এর জন্য চাই সাহস ও শক্তি। স্বামীজী এ সম্বন্ধে বলছেন—"আমাদের প্রয়োজন শক্তি, কেবল শক্তি। আর উপনিষদ্ শক্তির বৃহৎ আকর। উপনিষদ্ যে শক্তি সঞ্চার করিতে সমর্থ, সেই শক্তি সমগ্র জগৎকে তেজস্বী করিতে পারে। উহার দ্বারা সমগ্র মানবজাতিকে পুনরুজ্জীবিত, শক্তিমান্ ও বীর্যশালী করিতে পারা যায়।"

প্রাত্যহিক জীবনে আমরা তো সেই চিন্ময় ব্রহ্মের স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারি না—ক্ষণিক

সুখ, দুঃখ, আশা, নিরাশায় আমাদের জীবন অতিবাহিত হয়। চৈতন্যময় আত্মাকে তখন জড় বলে ভাবতে শিখি। আত্মাকে জড়ভাবে দেখা আত্মার স্বরূপ দর্শন নয়। আত্মার যথার্থ স্বরূপটি তখন অজ্ঞানে আবৃত। উপনিষদ্ বলে, এই অজ্ঞানই সর্বপ্রকার দুঃখের কারণ। আচার্য শঙ্কর বলেন—চিদানন্দস্বরূপ আত্মা অপরিবর্তনীয়, সুতরাং সত্য আর জড়স্বভাব দৃশ্য বস্তু নিয়ত পরিবর্তনশীল, সুতরাং মিথ্যা। এই সত্য ও মিথ্যার অধ্যাস বা মিলনের ফলেই জীবের সংসার-জীবন চলছে আর তা সত্য ব'লে মনে হচ্ছে [ সত্যানৃতে মিথুনীকৃত্য 'অহমিদং' 'মমেদমিতি' নৈসর্গিকোঽয়ং লোকব্যবহারঃ—ব্রঃ সূঃ শং অধ্যাসভাষ্য ]। এই অজ্ঞানের বশেই যা আপাতসুখকর বলে মনে হয় তাতেই মানুষ আকৃষ্ট হয়, আবার যা দুঃখদায়ক বলে মনে হয় তার থেকে সে নিরত্ত হয়। মানুষের জীবনেও পশুসুলভ অজ্ঞানতাই কাজ করে চলেছে। অজ্ঞানতার বশেই মানুষ অজ্ঞানতাকেও সত্য বলে, স্বাভাবিক বলে মনে ক'রে চলেছে। সমস্ত অনর্থের মূল এই অজ্ঞানতার নিবৃত্তি ও ব্রহ্মজ্ঞানের উদয়ই বেদান্তের লক্ষ্য। এ সম্বন্ধে স্বামীজী বলছেন—"অজ্ঞানই সর্বপ্রকার দুঃখের কারণ। অজ্ঞানবশতই আমরা পরস্পরকে ঘৃণা করি, পরস্পরকে জানি না বলিয়াই আমাদের পরস্পরের মধ্যে ভালবাসা নাই।" এই যে পরস্পরের মধ্যে বিভেদসৃষ্টি—এই তো অজ্ঞানতার কাজ। পরস্পরের মধ্যে বাস্তবিক কোন ভেদ নাই—এই চরম তত্ত্বের জ্ঞান হয় তখনই, যখন অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকে মুক্ত হয় মানুষ। স্বামীজী বলছেন—"যারা অসৎ কর্ম করে ও যাদের মন শান্ত নয়, তারা কখনও আত্মাকে লাভ করতে পারে না। কেবল যাঁদের হৃদয় পবিত্র, যাঁদের কার্য পবিত্র, যাঁদের ইন্দ্রিয় সংযত, তাঁদের নিকটই সেই আত্মা প্রকাশিত হন। তখনই তাঁরা আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে থাকেন। 'তত্ত্বমসি', 'অহং ব্রহ্মাস্মি' প্রভৃতি বেদান্ত-মহাবাক্যের শ্রবণ ও মননের ফলে অপরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞানের উদয় হ'য়ে থাকে।

স্বামীজী বলছেন—"মনকে বৃথা তর্কের দ্বারা চঞ্চল করিলে চলিবে না, কারণ তর্ক দ্বারা কখনও ঈশ্বরলাভ হয় না। ঈশ্বর প্রত্যক্ষের বিষয়, তর্কের বিষয় নহেন।"

কঠোপনিষদে আছে—

"এষ সর্বেষু ভূতেষু গূঢ় আত্মা ন প্রকাশতে।
দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ॥"

কঠ, ১।৩।১২

অর্থাৎ সকল প্রাণীর মধ্যে অবস্থিত আত্মা—চক্ষু অথবা অন্য কোন ইন্দ্রিয়ের নিকট প্রকাশিত হন না, কিন্তু যাঁহাদের মন পবিত্র হইয়াছে তাঁহারাই তাঁহাকে দেখিতে পান।—স্বামীজীও বলছেন—"সমগ্র উপনিষদের ভিতর প্রধান কথা এই অপরোক্ষানুভূতি।" এই অপরোক্ষানুভূতির দ্বারাই তিনি ঈশ্বরদর্শন করেছেন—আত্মদর্শন করেছেন। আত্মদর্শন বা ব্রহ্মদর্শন—বেদান্তের এই চরমতত্ত্বকে তিনি স্থান দিয়েছেন প্রাত্যহিক কর্মজীবনের মধ্যে। তিনি চেয়েছেন ভারতের তথা বিশ্বের প্রতিটি নরনারীর মধ্যে এই আত্মদর্শনের বীজ উপ্ত করতে। তাই উপনিষদের বাণী স্মরণ ক'রে তিনি বলেছেন—

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।"

# আমেরিকায় কালীপূজা

**স্বামী শ্রদ্ধানন্দ**

ইহুদী ও খ্রীষ্টধর্মে প্রতিমা পূজা করা অত্যন্ত বিগর্হিত আচরণ। বাইবেলের ওল্ড্ টেস্টামেণ্টে দেখিতে পাই ইহুদী জাতির ঈশ্বর জিহোভা বার বার তাঁহার ভক্তদের সাবধান করিয়া দিতেছেন—খবরদার, মূর্তি গড়িয়া দেবদেবীর পূজা করিও না, তাহা হইলে আমার ক্রোধ তোমাদিগকে ধ্বংস করিবে। জিহোভার অন্যতম বিশ্বাসী ভক্ত এয়ারন ( Aaron ), যাঁহার স্থান ছিল ভক্তোত্তম মজেসের ( Moses ) পরেই, এক দুর্বল মুহূর্তে প্রতিমাপূজা করিতে গিয়া কত তিরস্কৃত এবং দণ্ডিত হইয়াছিলেন, তাহা বাইবেল-পাঠকের অবিদিত নাই। জিহোভার আদেশে মজেস্ গিয়াছেন সিনাই পর্বতে প্রভুর নিকট হইতে প্রত্যক্ষ উপদেশলাভের জন্য। দলের নরনারী নাচে অপেক্ষা করিতেছে। মজেসের অবর্তমানে এয়ারন হইলেন নেতা। মজেসের ফিরিতে দেরী হইতেছে। ভয় সংশয় বিরক্তি সকলের চিত্তকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। এয়ারনও ব্যতিক্রম নন। তাঁহার চিত্তে পূর্বের সংস্কার মাথা তুলিয়াছে—প্রতিমা গড়িয়া দেবতাদের প্রসাদ ভিক্ষা করা। যেমনি চিন্তা অমনি কাজ; দলের মহিলাদের নিকট হইতে অনেকগুলি সোনার মাকড়ি চাহিয়া লইয়া ঐগুলি গালাইয়া একটি বাছুর তৈরি করিলেন এবং সকলকে ডাকিয়া বলিলেন, মজেস্ কোন্ অদৃশ্য ঈশ্বরের সঙ্গ করিতে গিয়াছে। তিনি আছেন কি নাই কে জানে? এই দেখ প্রত্যক্ষ দেবতা। এস সকলে মিলিয়া এঁর পূজা করিয়া বাঞ্ছিত ফল লাভ করি। প্রতিমাপূজার নামে সকলের মধ্যে দারুণ উৎসাহ সঞ্চারিত হইল। অলক্ষ্যে জিহোভা ভ্রুকুটি করিলেন। এই দুর্বলতার জন্য শুধু এয়ারনকে নয়, সমগ্র ইহুদীগোষ্ঠিকে মহাপ্রতাপান্বিত জিহোভার কঠোর অভিশাপ ভোগ করিতে হইয়াছিল।

বাইবেলের নিউ টেস্টামেণ্টে যীশুখ্রীষ্টের উপদেশের মধ্যে প্রতিমাপূজার সপক্ষে বা বিপক্ষে বিশেষ কোনও প্রসঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু খ্রীষ্টের তিরোভাবের পর তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তেরা দেশ-দেশান্তরে যখন খ্রীষ্টবাণী প্রচার করিতে বাহির হইয়াছেন তখন পৌত্তলিকদের সহিত জায়গায় জায়গায় তাঁহাদের সংঘর্ষ উপস্থিত হইতেছে দেখিতে পাই। তদানীন্তন গ্রীসের প্রসিদ্ধ শহর এফেসাস্ ( Ephesus )। প্রায় আড়াই লক্ষ লোকের বসতি। এখানে ডায়না ( Diana ) দেবীর মার্বেল পাথরের সুবৃহৎ মন্দির—পৃথিবীর সপ্ত বিস্ময়ের এক বিস্ময়। উহা নির্মাণ করিতে ২২০ বৎসর লাগিয়াছিল। দেবী ডায়নার প্রতি এফেসাসবাসীদের ছিল অকুণ্ঠ ভক্তি। এই এফেসাস শহরে সন্ত পল খ্রীষ্টের বার্তা লইয়া উপস্থিত হইয়াছেন। ইহুদীর রক্ত তাঁহার ধমনীতে প্রবাহিত। পৌত্তলিকতা দেখিলে ঐ রক্তের উত্তাপ ভীষণ বৃদ্ধি পাইবার কথা। কিন্তু পল খুব বুদ্ধিমান। দেবতার ও মন্দিরের প্রতিবাদ সামনাসামনি করিলে এফেসাসবাসীর উদ্যত রোষ তাঁহার জীবন নাশ করিবে, ইহা তিনি বুঝিয়াছিলেন। তাই প্রচার করিয়াছিলেন পরোক্ষে, অত্যন্ত

কৌশলে। তাঁহার চেষ্টা সফল হইয়াছিল। ডায়না দেবীর উপাসকগণ দলে দলে দেবীর উপাসনা ছাড়িয়া পরিত্রাতা যীশুখ্রীষ্টের শরণাপন্ন হইয়াছিল।

হিন্দুদের প্রতিমাপূজা অবশ্য প্রাচীন মধ্য-প্রাচ্য বা গ্রীসের পৌত্তলিকতা নয়। তথাপি মূর্তিপূজা তো! খ্রীষ্টান ও ইহুদী ধর্ম-সংস্কৃতিতে উহা অপাঙ্‌ক্তেয়। পাশ্চাত্যদেশে বেদান্তের সমাদর হইতেছে, কিন্তু হিন্দুধর্মের পূজার্চনা আচার অনুষ্ঠান প্রভৃতির ধারণা ও অনুশীলন পাশ্চাত্য লোকের পক্ষে কঠিন। যে সব পাশ্চাত্য লেখক ও সাংবাদিক ভারতবর্ষের বিরোধী সমালোচনা করিতে চান, তাঁহাদের লিখিবার এক প্রধান উপাদান হইল হিন্দুদের প্রতিমাপূজা। হিন্দুদের মন্দিরে পাঁচমাথা-যুক্ত দেবতা, কোথাও সাপের মূর্তি, কোনও মন্দিরে হস্তীর মস্তকধারী নরাকার দেবতার পূজা—আবার কোথাও রক্তপিপাসু ভীষণ-দর্শনা কালী—ইত্যাদি ইত্যাদি। এইসব মূর্তির উপাসনার মধ্যে ঈশ্বরের একত্ব, করুণা, সর্বজ্ঞত্ব প্রভৃতি ভাগবত গুণের ধ্যানধারণা কি করিয়া সংযুক্ত হইতে পারে, তাহা এই সব পাশ্চাত্য সমালোচক বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। যাহা হউক, পাশ্চাত্যের লোক শিল্প বিজ্ঞান ব্যবসা-বাণিজ্য অর্থনীতি শিক্ষার মতো জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও সারা পৃথিবীর পথপ্রদর্শক—এমন উদ্ধত মনোভাব এখন ক্রমশই কাটিয়া যাইতেছে। বাইবেলের বাহিরেও যে ধর্মের উচ্চ অভিব্যক্তি আছে এবং থাকিতে পারে তাহা ধীরে ধীরে বহু শিক্ষিত পাশ্চাত্য-বাসীর হৃদয়ঙ্গম হইতেছে।

হলিউড বেদান্ত মন্দিরে প্রতিমায় কালীপূজা আরম্ভ হয় ১৯৫০ সালে। আমেরিকাবাসীর ইহুদী-খ্রীষ্টীয় শিক্ষাদীক্ষার কথা স্মরণ রাখিয়া আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী প্রভবানন্দজী খুব সন্তর্পণে এই আনুষ্ঠানিক হিন্দুপর্ব প্রচলন করেন। প্রথম প্রথম বিশেষ অন্তরঙ্গ ভক্তদেরই ডাকা হইত। ক্রমশঃ ভক্তেরা এই পূজার মর্ম যত বুঝিতে আরম্ভ করিল ততই প্রতি বৎসর বেশী বেশী লোক আসিতে লাগিল। এখন কালীপূজা হলিউড আশ্রমের একটি প্রধান বাৎসরিক উৎসব। এই বৎসর স্যানফ্রান্সিস্‌কো হইতে আমরা দুজন সন্ন্যাসী—স্বামী স্বাহানন্দ ও আমি এই পূজায় উপস্থিত থাকিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম। আমি পূর্বে দুবার এখানে কালীপূজা দেখিয়াছি। প্রতিবারই গভীর আনন্দ ও উদ্দীপনা লইয়া ফিরি। খ্রীষ্টানদের দেশে জিহোভার উদ্যত শাসনদণ্ড আমেরিকানদের মাথায় পড়িতে পারে এমন কথা আদৌ মনে হয় না। মনে হয় জগজ্জননী মহাকালিকা ভারতবর্ষের লীলাক্ষেত্রে যেমন অগণ্য বিশ্বাসী ভক্তের হৃদয়ে একটি জাগ্রত সত্য হইয়া বিরাজ করিতেছেন, তেমনি এই দশ হাজার মাইল দূরে সম্পূর্ণ পৃথক ধর্মসংস্কার-বিশিষ্ট নরনারীর কাছেও তিনি ভুক্তিমুক্তি-দায়িকা চিন্ময়ী মহাশক্তিরূপে নিজেকে প্রকট করিতে পারেন। ডায়না ছিলেন এফেসাস-নগরবাসীদেরই দেবী, তাঁহার দৈবী সত্তা একটি নির্দিষ্ট মানবগোষ্ঠীর সীমার মধ্যেই ছিল ক্রিয়াশীল। কিন্তু হিন্দুর কালী বা বিষ্ণু বা শিব এইরূপ গোষ্ঠিদেবতারূপে পরিকল্পিত নন। তাঁহারা পরব্রহ্মেরই রূপ। শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের ভাষায়—যিনি ব্রহ্ম, তিনিই কালী। অতএব আমেরিকায় কালীপূজা যে ভারত-বর্ষেরই মতো প্রাণবন্ত এবং সার্থক হইতে পারে হলিউডে কালীপূজা দেখিয়া এই বিশ্বাস দৃঢ় হইল।

যে রাত্রে পূজা সেই দিনই বিকালে লস্

এঞ্জেলেস্ ইন্‌টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে নামিয়া সন্ধ্যার কিছু আগে হলিউড বেদান্ত সোসাইটিতে পৌঁছিলাম। মন্দিরে ঠাকুরপ্রণাম করিয়া পূজনীয় প্রভবানন্দ মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। কিছুদিন আগে তাঁহার শরীর বেশ অসুস্থ হইয়াছিল। এখন সারিয়া উঠিয়াছেন। সদানন্দ পুরুষ। কিছুক্ষণ তাঁহার নিকট বসিলে প্রাণ আনন্দময় হইয়া উঠে। দক্ষিণ ক্যালিফর্নিয়ার বেদান্ত সমিতির অনেকগুলি শাখা এবং প্রতি শাখায় নানাবিধ কাজ। সমস্ত কাজ প্রভবানন্দ মহারাজের নির্দেশে ও তত্ত্বাবধানে পরিচালিত। কিন্তু তাঁহাকে দেখিলে মনে হয় তিনি কিছুতেই লিপ্ত নন, কোন উত্তেজনাই তাঁহার কাছে ঘেঁষিতেছে না।

আমাদের দেশের আশ্রমসমূহের মতো হলিউড আশ্রমেও মন্দিরে প্রত্যহ সন্ধ্যারতি হয়। শঙ্খ বাজে না, তবে ঘণ্টা বাজে। আরতির সময় সাধুরা এবং অনেক ভক্তও উপস্থিত থাকেন। গানও হয়। আজ একটু সকালেই আরতি শেষ করা হইল, কেননা ৺কালীপূজার আয়োজন মন্দিরেই করিতে হইবে।

আরতি হইয়া গেল। চার জন আশ্রমিক মায়ের প্রতিমা আনিয়া মূল পূজাবেদীর পাশে রাখিয়াছেন। প্রতিমা গড়িয়াছেন একটি আমেরিকান ব্রহ্মচারী—নাম নির্মলচৈতন্য। ইনি শিল্পী এবং ভাস্কর। এঁর আঁকা ঠাকুর, মা, স্বামীজী, রাজা মহারাজ প্রভৃতির তৈলচিত্র হলিউড আশ্রমের নানা ঘরে দেখিতে পাওয়া যায়। অনেক ভক্তও সাগ্রহে এঁর আঁকা ছবি সংগ্রহ করিয়াছেন। প্রত্যেকটি ছবিতেই নিখুঁত কাজ পরিস্ফুট। মা কালীর প্রতিমাটিও ব্রহ্মচারী বড় দরদ দিয়া গড়িয়াছেন।

বহু বৎসর ধরিয়া এখানে কালীপূজা হইতেছে—কাজেই পূজার আয়োজনের সকল খুঁটিনাটি সেবক-সেবিকাদের নখাগ্রে। চারজন আশ্রমিক আশ্চর্য তৎপরতার সহিত বেদী সাজাইয়া ফেলিলেন এবং পূজার উপচারসমূহ ঠাকুর-ভঁাড়ার হইতে আনিয়া পূজাস্থানে সাজাইয়া রাখিলেন। কে বলিবে আমেরিকার এই পূজামণ্ডপে ভারত-ভাবতীর আবির্ভাব হয় নাই? স্বামী প্রভবানন্দজী কিছুক্ষণের জন্য আসিয়া আয়োজন দেখিয়া এবং কর্মীদের উৎসাহ দিয়া গেলেন। মন্দিরের বৃহৎ হলে ভক্তদের জায়গা হইয়াছে। যাঁহাদের খুশি মেঝেতে আসন করিয়া বসিবেন। অন্যেরা চেয়ারে বসিবেন। দুই রকম ব্যবস্থা আছে। এক কোণে কোরাস গায়ক-গায়িকাদের আসর। আর এক কোণে বেশ খানিকটা জায়গা জুড়িয়া বসিয়াছেন হিন্দুস্থানী পা-জামা ও পাঞ্জাবী-পরিহিত আমেরিকান যুবক ড্যানিয়েল ব্রকৃসম একটি সুরবাহার যন্ত্র লইয়া। ভারতীয় সঙ্গীতের উপর ড্যানিয়েল বা ড্যানের ভীষণ টান—মাদকতা বলিলেও বিশেষ ভুল হয় না। এমন কোনও ভারতীয় বাদ্যযন্ত্র নাই যাহা তাঁহার বাড়ীতে সংগৃহীত ও সুরক্ষিত হয় নাই। সব যন্ত্রেই একটু না একটু অভ্যাস তাঁহার আছে। ছয় বৎসর আগে তাঁহাকে সেতার বাজাইতে দেখিয়াছিলাম। এবার তাঁহার হাতে সুরবাহার। ড্যান ভারি দিলখোলা লোক। মুখে হাসি লাগিয়াই আছে। স্বামী প্রভবানন্দজী তাঁহার নাম দিয়াছেন রামদাস।

রাত দশটায় পূজা আরম্ভ হইল। পূজক স্বামী অসক্তানন্দ, তন্ত্রধারক স্বামী স্বাহানন্দ। স্বামী প্রভবানন্দজী তন্ত্রধারকের পাশে একটি আসনে বসিয়াছেন, তাঁহার পাশে আমি। স্তবস্তোত্রের বই সামনে রাখা, সময়মতো

পড়িব। পিছনে একটি হারমোনিয়ম আছে। প্রয়োজনমতো ভজন গাহিবার কথা। বেদীর নীচে হল ভরিয়া গিয়াছে। প্রায় দুইশত ভক্ত সমবেত। পূজার পরিবেশ বেশ জমজমাট হইয়া উঠিয়াছে। অসক্তানন্দ সুন্দর পূজা করেন। ভারতে থাকিতেই ইঁহারা আনুষ্ঠানিক পূজার্চনা শিখিয়াছিলেন। মিষ্ট গম্ভীর গলায় তিনি ও তন্ত্রধারক স্বাহানন্দ মন্ত্রোচ্চারণ করিতেছেন। প্রতিমায় প্রাণপ্রতিষ্ঠার পর ভক্তদের আনীত নানাপ্রকার অলঙ্কার পূজক নিপুণভাবে বহু যত্নে মায়ের অঙ্গে পরাইয়া দিলেন। কালিকা যেন জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছেন। ভীষণা নন, বালিকার কমনীয় সরল মুখচ্ছবি।

আমেরিকান ভক্তদের কোরাস গান আরম্ভ হইল। ইংরেজী রচনা, সুরতালও পাশ্চাত্য সঙ্গীতের। কিন্তু কথাগুলি বড় প্রাণস্পর্শী, অনেকবার 'কালী' নাম গানের মধ্যে রহিয়াছে। স্বামী প্রভবানন্দজী আমাকে মায়ের ভজন গাহিতে অনুরোধ করিলেন। একবার গাহিলাম—'সে কি এমনি মেয়ের মেয়ে', শেষের দিকে আর একবার—'মজলো আমার মনভ্রমরা'। ভারতীয় ভজন অনেক ভক্তের পছন্দ।

ইহুদীয়-খ্রীষ্ট পটভূমিকায় শিক্ষাপ্রাপ্ত এই আমেরিকান ভক্তমণ্ডলীর হিন্দুপূজার্চনার মন্ত্র, ন্যাস, মুদ্রা প্রভৃতি বুঝিবার কথা নয়। কিন্তু ইহাদের হৃদয়ের প্রীতি ও শ্রদ্ধা অপরিসীম। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী তো ইহারা পড়িয়াছে। তিনি কালীকে কি দৃষ্টিতে দেখিতেন তাহা ইহারা জানে। শ্রীরামকৃষ্ণ ও কালী যে ভিন্ন নন তাহাও ইহারা ঠাকুরের সন্ন্যাসী পার্ষদদের কথাপ্রসঙ্গে শুনিয়াছে। তাই কালীপূজার আধ্যাত্মিক অনুপ্রেরণা ইহাদের হৃদয়কে মাতাইয়া রাখিয়াছে।

ড্যান্ তাহার সুরবাহারের তারে মীড় তুলিতেছে। নিস্তব্ধ রাত্রির মর্মদেশ কাঁপিয়া উঠিতেছে। পূজকের গন্ধপুষ্প-নিবেদনের সহিত ঐ সঙ্গীতের মূর্ছনাও দেবীর চরণে নিবেদিত হইতেছে। এইবার স্তবপাঠ হইতেছে—তিনজন সন্ন্যাসী পর পর দেবীর নানা স্তোত্র পাঠ করিতেছেন। স্বামী প্রভবানন্দজীর আদেশে শ্রীমতী পাপিয়া সেনগুপ্ত দুটি গান গাহিলেন। তিনি বাঙালী, ক্যালিফর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের স্যান্টাবারবারা ক্যাম্পাসে পদার্থবিজ্ঞানে ডক্টরেটের জন্য গবেষণা করিতেছেন। ভক্ত-পরিবারের কন্যা।

ভোগারতি হইতেছে। ভারতীয় এবং পাশ্চাত্য বহুপ্রকার ভোজ্য নানাপাত্রে দেবীকে নিবেদন করা হইয়াছে। আরতির সময় সন্ন্যাসীরা দাঁড়াইয়াছেন। ভক্তদেরও অধিকাংশ দাঁড়াইয়া আরতি দর্শন করিতেছেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন ভাবে দর্শন করিয়াছিলেন, কোথায় যেন গিয়াছেন, সাদা চামড়ার ভক্তেরা সব আশেপাশে। ঠাকুর আরও বলিয়াছিলেন, ভক্তের জাতি নেই। তাঁহার এই দুটি উক্তিই বিশেষ করিয়া আজ চিত্তে জাগিতেছিল।

মন্দির-বেদীর কাছে ধূমনির্গমনের কোন চিমনি নাই বলিয়া মন্দিরের ভিতর হোমের আয়োজন করা চলে না। হোমের ব্যবস্থা হইয়াছে আশ্রমের সাবেক বাড়ির সুবৃহৎ বসিবার ঘরে। ফায়ার-প্লেসের কাছে হোমের আনুষঙ্গিক উপচারাদি সব গুছাইয়া রাখা হইয়াছে। সন্ন্যাসীরা হোমকুণ্ডকে বেড়িয়া বসিয়াছেন। ভক্তেরা ঘরের প্রতি বর্গ-ইঞ্চি পূর্ণ করিয়া ঠাসাঠাসি করিয়া উপবিষ্ট। বসিবার অসুবিধার কথা কাহারও মনে হইতেছে না। হোম বা fire ceremony দেখিতে আমেরিকান ভক্তদের খুব উৎসাহ।

অগ্নিকে ভগবানের প্রতীকরূপে উপাসনা করিবার পশ্চাতে যে উচ্চ দার্শনিক ভাবনা রহিয়াছে তাহা আমেরিকান বেদান্তীদের কাছে সহজভাবেই গ্রহণযোগ্য মনে হয়। হোমের পর প্রত্যেকের কপাল যজ্ঞতিলক-ভূষিত হইল।

তিলক পরিয়া সকলে আবার মন্দিরে আসিয়াছেন। প্রত্যেকের হাতে ফুল দেওয়া হইয়াছে। একে একে বেদীর কাছে গিয়া ভক্তেরা পুষ্পাঞ্জলি দিলেন। আমাদের দেশে মন্দিরে পুষ্পাঞ্জলি দিবার সময় যেমন একটা সোরগোল পড়িয়া যায়—কে আগে দিবে, কে পরে, এখানে সেরূপ নয়। বহু লোক লইয়া যেখানে কারবার সেখানে ইহাদের শৃঙ্খলাবোধ বিশেষ লক্ষ্য করিবার মতো। প্রত্যেকে ধীরভাবে নিজের সুযোগের জন্য অপেক্ষা করিতে শিখিয়াছে।

স্বামী প্রভবানন্দজী উঠিয়া দাঁড়াইয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে পূজারী এবং পূজার কলসবাহী একজন আমেরিকান সাধু। শান্তিজলের মন্ত্রগুলির মূল সংস্কৃত এবং পরে ইংরেজী অনুবাদ পড়া হইল। অতঃপর ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ উচ্চারণ করিয়া প্রভবানন্দ মহারাজ ধীরে ধীরে ভক্তদের মধ্যে চলিতেছেন এবং সকলের গায়ে শান্তিজলের ছিটা দিতেছেন। আমেরিকান ভক্তদের নিকট ইহাও এক অভিনব অভিজ্ঞতা।

রাত প্রায় সাড়ে তিনটা। প্রসাদগ্রহণের জন্য সকলে আশ্রমের একটি বৃহৎ হলঘরে সমবেত হইয়াছেন। বড় বড় টেবিল ও বেঞ্চি পাতা। সকলে আসন গ্রহণ করিয়াছেন। ভূরিভোজনের আয়োজন। তেলমসলা-দেওয়া খাবার আমেরিকানদের বড় সহ্য হয় না। তবে আজ রাত্রে ব্যতিক্রম। এ যে প্রসাদ! প্রসাদের ধারণা ইহাদের বেশ ভালভাবেই জানা হইয়া গিয়াছে। কাজেই খুব আনন্দের সঙ্গে ইঁহারা খিচুড়ি, পাঁপর, তরকারী, ভাজাভুজি, চাটনি, পায়স, মিষ্টি প্রভৃতি গলাধঃকরণ করিতেছেন। একটি জিনিসের শুধু অভাব—জয়ধ্বনি। "কালীমায়ীকী জয়, মহামায়ীকী জয়"—এই ভূয়োভূয়ঃ জয়রব ইঁহারা এখনও শোনেন নাই।

আগে কালীপ্রতিমা-বিসর্জনের ব্যাপারে প্রভবানন্দজী খুব সতর্কতা অবলম্বন করিতেন। খুব ভোররাত্রে নৈশ অন্ধকার থাকিতে থাকিতে মোটরে করিয়া কয়েকজন ব্রহ্মচারী সমুদ্রে প্রতিমা বিসর্জন দিয়া আসিত। এখন আর অত সাবধানতার প্রয়োজন হয় না। আমেরিকা ক্রমশই melting pot of nations (জাতিসমূহকে গালাইয়া এক করিবার পাত্র) হইয়া আসিতেছে, শুধু ইউরোপীয় জাতিগুলির নয়, এশিয়া-আফ্রিকার জাতিগুলিরও। নানা দেশের পোশাক, খাদ্য, আচার-ব্যবহার, ধর্মচর্যা অ্যাংলো-স্যাক্সন আমেরিকানদের চোখ-সওয়া হইয়া আসিতেছে। পথচারী বিবেকানন্দের পাগড়ি ধরিয়া টান দিবার মতো মনোবৃত্তি এখন আর কোনও আমেরিকানেরই নাই। তাই কালীপ্রতিমা যদি সমুদ্রের তটে দিবালোকে কাহাদের চোখে পড়ে, পড়িলই বা?

লস্ এঞ্জেলসের উপকণ্ঠে নিউপোর্ট বিচে প্রতিমা-বিসর্জনের ব্যবস্থা হইয়াছে। রবিবার রাত্রে পূজা গেল। মঙ্গলবার বিকালে বিসর্জনের সময় নির্দিষ্ট করা হইয়াছে। একটি বড় মোটর-বোট ভাড়া করিয়া সাধু ও ভক্তদের প্রায় ষাট-জনের একটি পার্টি দেবী-প্রতিমা লইয়া সমুদ্রের তিন মাইল অভ্যন্তরে চলিয়াছেন। কোরাস গান হইতেছে। আবার উহা যখন থামিতেছে

তখন দিগন্তহীন মহাসমুদ্রে শুধু মোটরবোটের ইঞ্জিনের শব্দ। সমুদ্রের মহাপ্রশান্তিকে সেই শব্দটুকু বিন্দুমাত্র চঞ্চল করিতে পারে না। আরোহীদের হৃদয়ে ইঞ্জিনের শব্দের সহিত তাল মিলাইয়া জগজ্জননীর নাম ধ্বনিত হইতেছে—কালী, কালী, কালী। স্বামী প্রভবানন্দজী কিছু পরে বোটটি থামিবার নির্দেশ দিলেন। এইবার দেবীপ্রতিমা মহাসমুদ্রে নিমজ্জিত হইবে। আমাকে বলিলেন, একটি মায়ের গান গাহিতে। গাহিলাম 'মা ত্বং হি তারা।' বিকালবেলায় ভৈরবী সুর; তা আমেরিকার বিকালে তো ভারতের সকাল। আমেরিকানরা গানের শব্দ বুঝিতেছে না, তবে গানের মর্ম সুরের মাধ্যমে তাহাদের হৃদয়ে পৌঁছিতেছে। শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জীবনে এই গানটির একটি প্রাণস্পর্শী ঐতিহ্য আছে। অনেক আমেরিকান ভক্ত তাহা জানেন। ঠাকুর নরেনকে কালীমন্দিরে পাঠাইয়াছেন, সাংসারিক বিপত্তি-দূরীকরণের প্রার্থনা জানাইবার জন্য। পরিবর্তে নরেন্দ্র মন্দিরে মায়ের জীবন্ত চিন্ময়ীসত্তা প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়া বিবেক বৈরাগ্য জ্ঞান ভক্তির জন্য প্রার্থনা করিয়াছেন। বারবার তিনবার চেষ্টা করিয়াও সাংসারিক প্রার্থনা মনে আনিতে পারিলেন না। ঠাকুর দুঃখিত ও আনন্দিত দুই-ই! দুঃখিত—কেননা নরেন্দ্রের সাংসারিক কষ্টের সুরাহা হইল না। হর্ষিত—কেননা সংসার নরেন্দ্রের জন্য নয়। যাহা হউক, এতকাল পরে নরেন্দ্রের কালীতে বিশ্বাস হইয়াছে। ঠাকুরকে ধরিয়াছেন, মায়ের গান শিখাইয়া দিতে হইবে। ঠাকুর গাহিয়া ঐ গানটি শিখাইয়া দিয়াছিলেন। নরেন্দ্র সারা রাত ঘরে এবং বারান্দায় পায়চারি করিয়া গাহিয়াছিলেন, 'মা ত্বং হি তারা।'

পরের দিন সকালে আমরা উভয়ে দক্ষিণ ক্যালিফর্নিয়া হইতে উত্তরে নিজেদের কর্মক্ষেত্রে ফিরিয়া আসিলাম। আমেরিকায় কালীপূজার স্মৃতি হৃদয়ে একটা বড সম্পদ হইয়া থাকিবে।

# ব্রত

### শ্রীগোপালচন্দ্র সাধু

বন্ধু, যখনি স্বার্থে লেগেছে ঘা—  
তখনি বলেছ,—'তোমার সঙ্গে না'।  
যখনি বলেছি,—'কর্ম পালিতে হবে'—  
তখনি বলেছ,– 'চলিলাম আমি তবে।'  
সত্যের পথে যখনি দাঁড়াতে বলি,  
তখনি শুনেছি,—'এবার তাহলে চলি।'  
অন্যায় কাজে বলেছি,—'খড়্গ হানো'—  
শুনি গুঞ্জন,—'নেতারে আর না মানো।'  
বল, আজ শুনি, কিবা ছিল অপরাধ?  
ন্যায় ও সত্যে হত্যা করিয়া, পুরিল কি মনোসাধ?  
আবার আসিব, আবার হাসিব, আপন কর্মস্রোতে,  
যা কিছু করেছি তাহাই করিব আমার সত্যব্রতে।

# শ্রীকৃষ্ণ—তাঁহার আদর্শ ও শিক্ষা

## স্বামী তেজসানন্দ

ভারতের জীবনেতিহাসের একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, মানবকল্যাণসাধনকল্পে যুগে যুগে এই পুণ্যভূমিতে এমন এক এক জন মহাপুরুষের আবির্ভাব ঘটিয়াছে, যাঁহার সাধনাপূত অত্যুজ্জ্বল জীবন, চরমতত্ত্বজ্ঞানোপলব্ধি, সর্বজনীন আদর্শ ও শিক্ষা এবং শান্তি ও সমন্বয়ের বাণী সুপ্রাচীন কাল হইতে প্রবহমান ভারতীয় সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক ভাব-ধারাকে আরও বেগশালী ও সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে। যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দ ভারতের গৌরবময় ঐতিহ্য ও মহিমময় বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে গভীর শ্রদ্ধার সহিত উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করিয়া বলিয়াছেন,—"এই সেই প্রাচীন ভারতভূমি, অন্যান্য দেশে যাইবার পূর্বেই তত্ত্বজ্ঞান যে-স্থানকে নিজ বাসভূমিরূপে নির্দিষ্ট করিয়াছিলেন ; এই সেই ভারতভূমি, যে ভূমির আধ্যাত্মিক প্রবাহ জড়রাজ্যে সাগরসদৃশ প্রবহমান স্রোতস্বতীসমূহের তুল্য, যেখানে অনন্ত হিমালয় স্তরে স্তরে উত্থিত হইয়া হিমশিখররাজিদ্বারা যেন স্বর্গরাজ্যের রহস্য-নিচয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছে ; এই সেই ভারত, যে ভারতভূমির মৃত্তিকা শ্রেষ্ঠতম ঋষি-মুনিগণের চরণরজে পবিত্রীকৃত হইয়াছে। এইখানেই সর্বপ্রথম অন্তর্জগতের রহস্য-উদ্ঘাটনের চেষ্টা হইয়াছিল, এখানেই মানব-মন নিজ স্বরূপানুসন্ধানে প্রথম অগ্রসর হইয়াছিল, এখানেই জীবাত্মার অমরত্ব, অন্তর্যামী ঈশ্বর এবং জগৎপ্রপঞ্চ ও মানবে ওতপ্রোতভাবে অবস্থিত পরমাত্মাসম্বন্ধীয় মতবাদের প্রথম উদ্ভব। ধর্ম ও দর্শনের সর্বোচ্চ আদর্শসকল এখানেই চরম পরিণতি প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই সেই ভূমি, যেখান হইতে ধর্ম ও দার্শনিক তত্ত্বসমূহ বন্যাকারে প্রবাহিত হইয়া সমগ্র জগৎকে প্লাবিত করিয়াছে, আর এখান হইতেই আবার তরঙ্গের অভ্যুদয় হইয়া নিস্তেজ জাতিসমূহের ভিতর জীবন ও তেজ সঞ্চার করিবে। এই সেই ভারত, যাহা শত শত শতাব্দীর অত্যাচার, শত শত বৈদেশিক আক্রমণ, শত শত প্রকার রীতিনীতির বিপর্যয় সহিয়াও অক্ষুণ্ণ আছে। এই সেই ভূমি, যাহা নিজ অবিনাশী বীর্য ও জীবন লইয়া পর্বত হইতেও দৃঢ়তরভাবে এখনও দণ্ডায়মান। আমাদের শাস্ত্রোপদিষ্ট আত্মা যেমন অনাদি, অনন্ত ও অমৃতস্বরূপ, আমাদের এই ভারত-ভূমির জীবনও তদ্রূপ। আর আমরা এই দেশের সন্তান।"

সুদূর অতীতের মহাভারতীয় যুগে এই ভারতবর্ষ অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল এবং এই রাজ্যসমূহ পরস্পরের উপর আধিপত্য বিস্তারের জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকিত। মহাকাব্য মহাভারত সাক্ষ্য দেয়,—কুরু, পঞ্চাল ও অন্যান্য দেশীয় রাজন্যবর্গের মধ্যে দীর্ঘকালব্যাপী দ্বন্দ্ব ও রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ-বিগ্রহ এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষকে একটি ভয়াবহ সমরাঙ্গনে পরিণত করিয়াছিল। সততা ও ন্যায়-পরায়ণতার পবিত্র নিকেতন এই ভারত অশান্তি ও অবিচার, নৃশংসতা ও অত্যাচারের রঙ্গমঞ্চ হইয়া উঠিয়াছিল। অবহেলিত ও নির্যাতিতের মর্মন্তুদ আর্তনাদ নিয়ম ও শান্তি-সংরক্ষকদের অনেকের অন্তরে বিশেষ কোন সাড়া জাগাইত

না। মাৎসর্যমদমত্ত আত্মবিস্মৃত স্বার্থান্বেষী ক্ষমতাসীন নৃপতিবৃন্দের অধিকাংশই শান্তিকামী প্রজাগণের অন্তরে ভীতি ও ঘৃণা উৎপাদন করিয়াছিল। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায় সঙ্কীর্ণতাপুষ্ট হইয়া পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষবশতঃ ধর্মীয় জগতের আবহাওয়াও বহুল পরিমাণে দূষিত করিয়া তুলিয়াছিল।

বলা বাহুল্য, এই সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে দ্বাপরযুগে এমন একজন মহাপুরুষের আগমনের প্রয়োজন হইয়াছিল, যিনি তাঁহার আধ্যাত্মিক জীবনের সমুন্নত আদর্শ ও শিক্ষা, বিচক্ষণতা ও সৃজনী প্রতিভা দ্বারা সেই যুগের জটিল সমস্যাসমূহের সমাধানপূর্বক পুনঃ প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইবেন। তাই নিপীড়িত মানবের দুঃখ-দুর্দশায় ব্যথিত হইয়া পরম করুণায় জনচিত্তের অশান্তি-তুফানতুল্য বহিঃপ্রকৃতির প্রলয়ঙ্কর দুর্যোগ ও ঝঞ্ঝার মধ্যে অজ অব্যয় পূর্ণব্রহ্ম ভগবান স্বীয় প্রকৃতিকে বশীভূত করিয়া আত্মমায়াবশে নিষ্ঠুরতার মূর্তবিগ্রহ মথুরাধীশ কংসের কারাগৃহে অবতীর্ণ হইলেন শ্রীকৃষ্ণরূপে,—সাধুসজ্জনের পরিত্রাণ, দুষ্কৃতিকারীদের বিনাশ ও ধর্মস্থাপন করিবার জন্য; তথা সংসার-কারায় আবদ্ধ জ্ঞানচক্ষুহীন মায়ামুগ্ধ মানবের মুক্তিদ্বার উদ্‌ঘাটন করিতে ও জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকলকে শুদ্ধা ভক্তি ও স্বর্গীয় প্রেমের অধিকারী করিয়া প্রকৃত শান্তি ও অমৃতপথের সন্ধান দিতে।

পাশ্চাত্য-শিক্ষায় শিক্ষিত যে-সকল ব্যক্তির চক্ষু আজও চিত্ত-চমৎকারী জড়সভ্যতার তীব্র আলোকে ঝলসাইয়া রহিয়াছে, তাহাদের নিকট ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বহুমুখী প্রতিভাদীপ্ত জীবন, শৌর্য-বীর্যগাথা, শ্রীবৃন্দাবন-লীলা প্রভৃতি যে বিরুদ্ধ সমালোচনা ও প্রচণ্ড আক্রমণের বিষয়বস্তু হইবে এবং তাহাদের দৃষ্টিতে যে এ-সকলই কল্পনা-বিলাসীদের নিছক কল্পনা-প্রসূত অবাস্তব কাহিনী, তাহাতে বিস্মিত হইবার কারণ নাই। কিন্তু সত্যানুসন্ধানী পুরাতত্ত্ববিদ ও চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ আজও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া থাকেন,—এই ভারতের বক্ষের উপর দিয়া অগণিত বৈদেশিক আক্রমণ ও ধর্মান্ধতাপ্রসূত অশোভনীয় গোঁড়ামির প্রবল তরঙ্গ শতাব্দীর পর শতাব্দী চলিয়া গিয়াছে এবং বিভিন্ন ধর্মসংঘ ও সম্প্রদায় প্রাদুর্ভূত হইয়া কালসমুদ্রের অতল গর্ভে বিলয়প্রাপ্ত হইয়াছে; তথাপি শ্রীকৃষ্ণের দিব্যজীবন, পবিত্র আদর্শ ও শিক্ষা এখনও কোটি কোটি মানবহৃদয়ে বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করিয়া তাহাদিগকে জীবনের চরম লক্ষ্যে পৌঁছিবার অফুরন্ত প্রেরণা ও পাথেয় যোগাইতেছে। বস্তুতঃ যাঁহারা আপনাদিগকে সর্বজ্ঞ পণ্ডিত বলিয়া মনে করিয়া থাকেন, অথচ চিত্তশুদ্ধি- ও আত্মজ্ঞানলাভাপেক্ষা বিষয়ভোগকেই সর্বাধিক কাম্যবস্তু বলিয়া বিবেচনা করেন, তাঁহাদের নিকট শ্রীকৃষ্ণের দিব্যলীলা ও জীবন-কাহিনী চিরদিনের জন্য রহস্যাবৃতই থাকিয়া যাইবে।

পুণ্যভূমি ভারতের অন্যতম ব্রহ্মবিদ্ ঋষি বেদব্যাস তদ্‌রচিত ভক্তিরসামৃতসিন্ধু শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণের কৌমার, পৌগণ্ড, কৈশোর ও যৌবনের* যে পবিত্র লীলা অপূর্বভাষায় বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার বর্ণালী আলেখ্য আজও ভক্তসমাজে চিরভাস্বর হইয়া রহিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের সে-লীলাকাহিনীর মধুর ঝঙ্কার অদ্যাপি শ্রদ্ধাশীল শুদ্ধচিত্ত ভক্তবৃন্দের শ্রবণে অনুরণিত হইয়া তাহাদিগকে

---

* "কৌমারং পঞ্চমাব্দান্তং পৌগণ্ডং দশমাবধি।
কৈশোরমাপঞ্চদশাদ্ যৌবনং চ ততঃ পরম্।"

—১২শ অধ্যায় ৩৭ শ্লোকের

শ্রীমৎ শুকদেবকৃত *সিদ্ধান্তপ্রদীপ* তথা শ্রীধরস্বামিকৃত ভাবার্থদীপিকা—দ্রষ্টব্য।

তদ্ভাবে অনুপ্রাণিত করিয়া তোলে।

শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত বৃন্দাবন-লীলায় আমরা দেখিতে পাই ভগবৎপ্রেমের বিচিত্র বিকাশ। দেখিতে পাই, কেমন করিয়া শান্ত-দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য-মধুর-ভাবসমূহ এই লীলায় চরম উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে এবং মানবসুলভ পার্থিব ভালবাসা ঈশ্বরে সমর্পিত হইয়া কেমন করিয়া নিষ্কলুষ স্বর্গীয় প্রেমে রূপান্তরিত হইয়াছে। ইহা অনস্বীকার্য, দেহাত্মবুদ্ধি অতিক্রম করিতে না পারিলে একদিকে যেমন বৃন্দাবন-লীলায় শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্রজাঙ্গনাগণের পবিত্র প্রেমের নিগূঢ় তাৎপর্য উপলব্ধি করা সম্ভব নহে, অপর দিকে অসংস্কৃত মনবুদ্ধিসহায়ে সেই দিব্য প্রেমের আলোচনা মানবচিত্তকে ভগবন্মুখী না করিয়া অনেক ক্ষেত্রে স্বতই নিম্নগামী করিয়া থাকে। তাই শ্রীরামকৃষ্ণদেব শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গোপীদিগের 'টান'-টাই অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিবার জন্য তাহাদের মনের তীব্র ব্যাকুলতা-কেই গ্রহণ করিতে বলিয়াছিলেন। বস্তুতঃ, ভগবানলাভের জন্য এই প্রবল ব্যাকুলতাই একনিষ্ঠ ভক্তসাধককে চিত্তশুদ্ধির মাধ্যমে অন্তিমে এই স্বর্গীয় প্রেমের অধিকারী করিয়া তুলিতে সক্ষম।

কৌমার, পৌগণ্ড, কৈশোর অতিক্রম করিয়া শ্রীকৃষ্ণ ক্রমে যৌবনে পদার্পণ করিলেন এবং যৌবনসুলভ দুর্জয় তেজ বিক্রম ও বিপুল দৈহিক শক্তির অধিকারী হইয়া তাঁহার বিচিত্রলীলা-জড়িত প্রিয় বৃন্দাবনকে অচিরে শান্তিপূর্ণ ও শ্রীমণ্ডিত করিয়া তুলিলেন। কিন্তু বিশ্বহিতকল্পে যিনি নরদেহ ধারণ করিয়াছেন, তিনি কি কখনও প্রাকৃত জনের ন্যায় সীমিত পরিমণ্ডলে নিবদ্ধ থাকিতে পারেন? কঠোর কর্তব্যের আহ্বানে, কৃষ্ণগতপ্রাণ গোপীগণের ও অপরাপর স্বজন-বৃন্দের অপরিসীম স্নেহ, প্রীতি ও প্রেমের মধুর বন্ধন অকাতরে ছিন্ন করিয়া তিনি নূতন বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ-জীবনের এই অতুলনীয় লোকোত্তর নির্লিপ্ততার আদর্শ ভারতের আধ্যাত্মিক ইতিহাসে চির উজ্জ্বল ও শিক্ষাপ্রদ হইয়া রহিয়াছে। যিনি কংস-কারাগারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, যাঁহার পিতামাতা ঐ কারাগৃহে শৃঙ্খলিত হইয়া অশেষ যাতনা ও দুঃখ ভোগ করিয়াছেন, তিনিই আজ স্বহস্তে হিংস্র পশুতুল্য কংসদৈত্যকে নিধন করিয়া মাতামহ উগ্রসেনকে মথুরার সিংহাসনে স্থাপনপূর্বক যাদবরাজ্যে পুনঃ শান্তি প্রতিষ্ঠা করিলেন।

অতঃপর বসুদেব যদুকুলপুরোহিত গর্গাচার্য ও ব্রাহ্মণগণ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের উপনয়ন-সংস্কার যথাবিধি সম্পাদন করাইলেন এবং উপনয়নান্তে উভয়ে দ্বিজত্ব-প্রাপ্ত হইয়া ও নিয়মনিষ্ঠ হইয়া আচার্যের নিকট হইতে গায়ত্র-ব্রত অর্থাৎ ব্রহ্মচর্যব্রত গ্রহণ করিলেন।

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম সর্বজ্ঞ হইয়াও লোকশিক্ষার নিমিত্ত অবন্তিপুরনিবাসী কাশ্যপগোত্রীয় দ্বিজশ্রেষ্ঠ সান্দীপনির শিষ্যত্ব গ্রহণপূর্বক কিভাবে তাঁহার নিকট হইতে শিক্ষালাভ করিয়া সর্ববিদ্যাবিশারদ হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের পঞ্চচত্বারিংশৎ অধ্যায়ে নিম্নোদ্ধৃত শ্লোক-পঞ্চকে বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে—

"প্রভবৌ সর্ববিদ্যানাং সর্বজ্ঞৌ জগদীশ্বরৌ।
নান্যসিদ্ধামলং জ্ঞানং গূহমানৌ নরেহিতৈঃ ॥৩০॥
অথো গুরুকুলে বাসমিচ্ছন্তাবুপজগ্মতুঃ।
কাশ্যং সান্দীপনিং নাম হ্যবন্তিপুরবাসিনম্ ॥৩১॥
যথোপসাদ্য তৌ দান্তৌ গুরৌ বৃত্তিমনিন্দিতাম্।
গ্রাহয়ন্তাবুপেতৌ স্ম ভক্ত্যা দেবমিবাদৃতৌ ॥৩২॥
তয়োর্দ্বিজবরস্তুষ্টঃ শুদ্ধভাবানুবৃত্তিভিঃ।
প্রোবাচ বেদমখিলান্ সাঙ্গোপনিষদো গুরুঃ ॥৩৩॥

সরহস্যং ধনুর্বেদং ধর্মান্ ন্যায়পথাংস্তথা ॥
তথা চান্বীক্ষিকীং বিদ্যাং রাজনীতিঞ্চ
ষড়্‌বিধাম্ ॥৩৪॥
সর্বং নরবরশ্রেষ্ঠৌ সর্ববিদ্যাপ্রবর্তকৌ।
সকৃন্নিগদমাত্রেণ তৌ সঞ্জগৃহতুর্নৃপ ॥৩৫॥

—অর্থাৎ যাঁহারা সর্ববিদ্যার উদ্ভবস্থল, লোকশিক্ষার নিমিত্ত মনুষ্যলীলার দ্বারা যাঁহারা নিজেদের স্বাভাবিক নির্মল জ্ঞান গোপন করিয়া রাখিয়াছিলেন, সেই সর্বজ্ঞ জগদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম গুরুকুলে বাস করিতে ইচ্ছা করিয়া অবন্তিপুরনিবাসী কাশ্যপগোত্রীয় সান্দীপনি নামক মুনির নিকট উপস্থিত হইলেন ॥৩০-৩১॥

তাঁহারা উভয়ে যথানিয়মে গুরুর নিকট উপস্থিত হইয়া গুরুর প্রতি কিরূপ অনিন্দিত ব্যবহার করিতে হয়, তাহা অপর সকলকে শিক্ষা দিয়া শ্রদ্ধাযুক্ত হৃদয়ে ও ভক্তি-সহকারে দেবতার ন্যায় গুরুর সেবা করিতে লাগিলেন ॥৩২॥

দ্বিজশ্রেষ্ঠ গুরু সান্দীপনি তাঁহাদের বিশুদ্ধ-ভাবযুক্ত সেবায় পরিতুষ্ট হইয়া শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ এই ষড়ঙ্গ ও উপনিষদের সহিত সমগ্র বেদ তাঁহাদিগকে উত্তমরূপে উপদেশ করিলেন ॥৩৩॥

সান্দীপনি মুনি মন্ত্রজ্ঞান ও দেবতাজ্ঞানের সহিত ধনুর্বেদ, মন্বাদি ধর্মশাস্ত্র, মীমাংসাদি শাস্ত্র, তর্কবিদ্যা এবং সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন, দ্বৈধীভাব ও সমাশ্রয়—এই ষড়বিধ রাজনীতি-বিদ্যা শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামকে উপদেশ করিলেন ॥৩৪॥

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! সর্ববিদ্যার প্রবর্তক নরবরশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম একবার গুরুর উচ্চারণমাত্রেই সমস্ত বিষয় শিখিয়া লইলেন ॥৩৫॥

কিন্তু সর্ববিদ্যায় পারদর্শিতালাভ করিয়াই তাঁহাদের কর্তব্যের অবসান ঘটিল না। এই শিক্ষা তাঁহাদের বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে দায়িত্বপূর্ণ ভূমিকাগ্রহণের প্রস্তুতিমাত্র। তাহারই কিঞ্চিদাভাষ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

ভারতের মহাকাব্য মহাভারত সাক্ষ্য দেয়, —দুর্যোধনের পাণ্ডবদ্বেষের জন্য কৌরব ও পাণ্ডবগণের মধ্যে ক্রমবর্ধমান বিভেদ জন্মান্ধ বৃদ্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে বিশেষভাবে চিন্তান্বিত করিয়া তুলিল। যাহাতে ইহা পারস্পরিক বিদ্বেষে ও পরিণামে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে পরিণত না হয়,—যাহাতে উভয়ের মধ্যে শান্তি ও সৌভ্রাতৃত্ব বজায় থাকে, তদুদ্দেশ্যে তিনি তাঁহার রাজ্য দ্বিধাবিভক্ত করিয়া দুর্যোধনপ্রমুখ শত-পুত্রকে হস্তিনাপুর প্রদান করিলেন এবং ইহারই অনতিদূরে পাণ্ডবদের জন্য ইন্দ্রপ্রস্থ নামক অপর একটি নগর নির্মাণ করাইলেন। অচিরে এই নগর সমৃদ্ধশালী হইয়া উঠিল। অধিকন্তু, শ্রীকৃষ্ণের আদেশে এই ইন্দ্রপ্রস্থে দানবগণের বিশ্বকর্মা ময়দানব একটি অতুলনীয় সভাগৃহও নির্মাণ করিল, যাহা দর্শন করিয়া দূরদেশাগত রাজন্যবর্গ ও ঋষিমুনিবৃন্দ শতমুখে প্রশংসা করিতে লাগিলেন। দেবর্ষি নারদ এই নানারত্নভূষিত মনোরম সভাগৃহদর্শনে মুগ্ধ হইয়া পাণ্ডবগণকে রাজসূয় যজ্ঞ করিবার উপদেশ প্রদান করিলেন। এই মহাযজ্ঞ-অনুষ্ঠান সম্বন্ধে পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণকে দ্বারকা হইতে আহ্বান করিয়া তাঁহার অভিমত জানিতে চাহিলে তিনি বলিলেন, "রাজসূয়-যজ্ঞের যোগ্য অধিকারী আপনি। কিন্তু তৎপূর্বে প্রবল পরাক্রান্ত অত্যাচারী মগধরাজ জরাসন্ধ ও তাহার সহায়ক চেদিরাজ শিশু-পালকে নিধন করা একান্ত প্রয়োজন। কারণ, জরাসন্ধ তাহার রাজধানী গিরিব্রজে বহু নৃপতিকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছে রুদ্রদেবতার প্রীত্যর্থে তাঁহাদিগকে বলি প্রদান করিবার

জন্য।" অধিকন্তু তিনি ইহাও জানাইলেন যে, জরাসন্ধের অত্যাচারে তিনি তাঁহার রাজধানী মথুরা হইতে দ্বারকায় স্থানান্তরিত করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

ভীম ও অর্জুন শ্রীকৃষ্ণ সমভিব্যাহারে ব্রতধারীর বেশে রাজধানী গিরিব্রজে প্রবেশ করিলেন,—উদ্দেশ্য জরাসন্ধকে বধ করা। জরাসন্ধ পাদ্যার্ঘ্য দিয়া তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ জরাসন্ধকে নিজের পরিচয় প্রদানপূর্বক বলিলেন, "আমরা ধর্মরক্ষার্থে এখানে উপস্থিত হইয়াছি। তুমি রুদ্রদেবের নিকট বলি দিবার জন্য নির্দোষ রাজন্যবর্গকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছ। এখনই এইসকল নৃপতিকে মুক্ত করিয়া দাও; নতুবা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও।" মদ-গর্বিত জরাসন্ধ তাঁহার আদেশপালনে অস্বীকৃত হইলে, দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীমসেনের সঙ্গে প্রচণ্ড মল্লযুদ্ধ আরম্ভ হইল। চৌদ্দদিনব্যাপী এই মল্লযুদ্ধে জরাসন্ধ শ্রান্ত ও দুর্বল হইয়া পড়িলেও, শক্তিধর ভীমসেন যখন তাহাকে নিধন করিতে সমর্থ হইলেন না, তখন শ্রীকৃষ্ণের ইঙ্গিতে ভীম জরাসন্ধের পদদ্বয় দৃঢ়হস্তে ঊর্ধ্বে উত্তোলনপূর্বক তাহার দেহ দ্বিধাবিভক্ত করিয়া তাহাকে বধ করিলেন। এস্থলে বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে জরাসন্ধ জন্মকালে শরীর দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। জরা নামী রাক্ষসী সেই দুই ভাগ একসঙ্গে সংযুক্ত করিয়াছিল বলিয়াই তাহার নাম জরাসন্ধ হইয়াছিল।

এইভাবে জরাসন্ধ নিধনপ্রাপ্ত হইলে শ্রীকৃষ্ণ জরাসন্ধের পুত্রকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া বন্দী নৃপতিগণকে মুক্ত করিয়া দিলেন মুক্তিলাভ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশে তাঁহারা যুধিষ্ঠিরের সংকল্পিত রাজসূয় যজ্ঞে উপস্থিত হইয়া সেই যজ্ঞ সুসম্পন্ন করিতে সানন্দে ও কৃতজ্ঞ-হৃদয়ে স্বীকৃতি জ্ঞাপন করিলেন।

অতঃপর চারি ভ্রাতা—ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব রাজসূয় যজ্ঞোপলক্ষে দিগ্বিজয় ও অর্থাদিসংগ্রহের উদ্দেশ্যে চারিদিকে যাত্রা করিয়া ভারতের বিভিন্ন স্থানের রাজন্যবর্গকে বশীভূত করিয়া প্রভূত ধনরত্ন আহরণপূর্বক ইন্দ্রপ্রস্থে প্রত্যাগমন করিলেন। এই মহাযজ্ঞে কৌরব ও পাণ্ডবদের প্রায় সকলেই মিলিতভাবে স্ব স্ব দায়িত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়া যজ্ঞ সুসম্পন্ন করিবার জন্য সচেষ্ট হইলেন। সর্বজনপূজ্য হইয়াও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অভ্যাগত ব্রাহ্মণগণের পাদপ্রক্ষালনের ভার স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়াছিলেন।

মহাসমারোহে এই যজ্ঞ সুসম্পন্ন হইল। যজ্ঞান্তে পিতামহ ভীষ্মের নির্দেশে যুধিষ্ঠির উক্ত সভায় সমবেত সকলের মধ্যে তেজ, বল ও বিক্রমে সর্বশ্রেষ্ঠ ও পূজ্যতম শ্রীকৃষ্ণকে সর্বোত্তম অর্ঘ্যটি প্রদান করিলেন। তদ্দর্শনে দাম্ভিক চেদিরাজ শিশুপাল ক্ষিপ্ত হইয়া ভীষ্ম ও ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে নানা কটূক্তি করিতে আরম্ভ করিলে সর্বসমক্ষে স্বীয় সুদর্শন চক্র দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ তাহার শিরচ্ছেদ করিয়া এই মহাযজ্ঞের পরিসমাপ্তি ঘটাইলেন।

শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় প্রস্থানের অব্যবহিত পূর্বে যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন,—

"অপ্রমত্তঃ স্থিতো নিত্যং প্রজাঃ পাহি
বিশাংপতে
পর্জন্যমিব ভূতানি মহাদ্রুমমিব দ্বিজাঃ ॥"—

অর্থাৎ, হে মহারাজ! আপনি সদা অপ্রমত্ত থাকিয়া প্রজাপালন করুন। জীবগণ মেঘকে আশ্রয় করিয়া জীবনধারণ করে; পক্ষিকুল আশ্রয় করে বৃক্ষকে। তেমনি বন্ধুজনেরা যেন আপনাকে আশ্রয় করিয়া সুখে জীবনযাপন করিতে পারেন।

ইহার কিছুকাল পরেই ভারতের রাষ্ট্রগগন ঘোরঘনঘটাচ্ছন্ন হইল। পাণ্ডবগণের ঐশ্বর্যে ঈর্ষান্বিত দুর্যোধন কপট দ্যূতক্রীড়ায় আহূত যুধিষ্ঠিরকে পরাজিত করিয়া সভাস্থলে দ্রৌপদীকে অপমানিত করিলেন, পাণ্ডবগণের রাজ্য হস্তগত করিয়া তাঁহাদের বনবাসে পাঠাইলেন এবং পরে কথামত তাঁহাদের রাজ্য ফিরাইয়াও দিলেন না। ফলে কুরু-পাণ্ডবের কলহ অতি ভয়াবহ রূপ ধারণ করিয়া কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে পরিণত হইল। হিমাচল হইতে কুমারিকা এবং গান্ধার হইতে প্রাগ্‌জ্যোতিষ পর্যন্ত রাজন্যবর্গ রণসাজে সজ্জিত হইয়া কেহ কৌরবপক্ষে কেহ বা পাণ্ডবপক্ষে যোগদান করিলেন। এই সঙ্কটমুহূর্তে কুরু ও পাণ্ডব পক্ষের প্রতিনিধিদ্বয় যথাক্রমে দুর্যোধন ও অর্জুন দ্বারকাধামে শ্রীকৃষ্ণসমীপে এই আসন্ন মহাযুদ্ধে তাঁহার সাহায্যপ্রার্থী হইয়া গমন করিলেন। স্বল্পবুদ্ধি দুর্যোধন শ্রীকৃষ্ণের নারায়ণী সেনা (সংশপ্তকসৈন্যবাহিনী) লাভে পরিতুষ্ট হইয়া হস্তিনাপুরে প্রত্যাগমন করিলেন। বিচক্ষণ ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন অর্জুন আধ্যাত্মিক জগতের শিরোমণি সর্বজ্ঞ বীরশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণের সৌখ্যলাভে ধন্য হইলেন। অতীত যুগের ইতিহাসে এই দুইয়ের মিলন গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। আজ দ্বারকাধামে মহাশক্তিধর পুরুষদ্বয়ের মিলনে যে শক্তি-উৎসের উদ্ভব ঘটিল, তাহাই শতধারে উৎসারিত হইয়া প্লাবনাকারে ভারতবক্ষে প্রবাহিত হইয়া যুগসঞ্চিত পুঞ্জীভূত আবিলতা ও কলুষ ধৌত করিয়া পুনঃ শান্তি-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। (ক্রমশঃ)

# প্রার্থনা

শ্রীকৌশিকচন্দ্র দাস

প্রভু মোর, দয়াময়।
এসো গো আমার হৃদয় আকাশে
জ্ঞানের আলোর বিপুল বিকাশে
তোমারে পাইলে আঁধারে করিব জয়
দূর হবে সব ভয়॥

হেথা খেলা মিছামিছি
এ কথা তো আমি বুঝি;
তবু বাসনায় অতৃপ্ত মন
শুনেও সে কথা বোঝে না কখনো—
সুমুখে যা কিছু পায়
'আমার' বলিয়া আঁকড়ি থাকিতে চায়॥

আলোকে আঁধারে গড়া এ ভুবন
দেখায় আমায় কত প্রলোভন—
আসলে সে কিছু নয়,
তোমারে পাইলে সকলি আলোক
তুমি ছাড়া কিছু নাই—
তোমার আলোর পরশ লভিয়া
আঁধার করিব জয়
প্রভু মোর, দয়াময়॥

# স্বামী বিবেকানন্দের 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' প্রসঙ্গে

অধ্যাপক শ্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোষ

'উদ্বোধন'-পত্রিকার প্রথম বর্ষে (১৩০৫-৬) 'বিলাতযাত্রীর পত্র' নামে স্বামীজীর যে সরস ভ্রমণকাহিনীটি প্রকাশিত হয়, উহার চলিত-রূপের বৈশিষ্ট্য সমকালীন বাংলাসাহিত্যের পক্ষে চমকপ্রদ ছিল, সন্দেহ নাই। তৃতীয় বর্ষ হইতে রচনার নাম হয় 'পরিব্রাজক'। স্বামী বিবেকানন্দের দ্বিতীয়বার আমেরিকা ও ইয়োরোপ-পরিক্রমার পটভূমিকায় রচিত এই 'পরিব্রাজক'-গ্রন্থটি বাংলাসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভ্রমণ-কাহিনী। স্বভাবতই এই পরিক্রমা-কালে স্বামীজীর অন্তরে ভারত তথা প্রাচ্য আদর্শ ও য়ুরোপ তথা পাশ্চাত্য আদর্শের তুলনামূলক মূল্যায়ন দেখা দিয়াছে। সেই তুলনামূলক আলোচনারই মনোজ্জ্বল রসসমৃদ্ধ প্রকাশরূপে 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' রচনাটি 'উদ্বোধন'-পত্রিকার দ্বিতীয় বর্ষ (১৩০৬-৭) হইতে প্রকাশিত হইতে থাকে।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে বঙ্গমনীষা রাজা রামমোহন রায়, কেশবচন্দ্র সেন ও প্রতাপচন্দ্র মজুমদার—এই তিন জনের মাধ্যমে ভারত ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির মিলনসাধনকল্পে সাংস্কৃতিক দূত প্রেরণ করিয়াছে। স্বামী বিবেকানন্দ কালের দিক হইতে ইঁহাদের অনুজ হইলেও পাশ্চাত্যের নিকট ভারত তথা প্রাচ্যের অধ্যাত্মমহিমা ঘোষণা এব' পাশ্চাত্যের রজো-গুণদীপ্ত জীবনপ্রবাহ ভারতে সঞ্চারের প্রয়াসের দ্বারা তিনি যে ভাব-বিনিময়ের আদর্শ স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহার দ্বারাই পাশ্চাত্যের সহিত ভারতবর্ষের সম্পর্ক সম্বন্ধে বিশ্ববাসীর ধারণা আমূল পরিবর্তিত হয়। একদিকে 'চিকাগো বক্তৃতাবলী' অন্যদিকে 'ভারতে বিবেকানন্দ'-গ্রন্থে বিধৃত প্রথমবার আমেরিকা হইতে প্রত্যাবর্তনের পর কলম্বো হইতে আলমোড়া পর্যন্ত ভারতব্যাপী অভিনন্দনের উত্তররূপে প্রদত্ত বক্তৃতাবলী— স্বামীজীর চিন্তাধারায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য আদর্শের তুলনামূলক বিচারের পটভূমি।

আমেরিকা-গমনের অব্যবহিত পূর্বে স্বামীজী আসমুদ্রহিমাচল পরিক্রমার দ্বারা রাজার প্রাসাদ হইতে দরিদ্রজনের পর্ণকুটির, সর্বত্র ভারতবাসীর সঙ্গে একাত্ম হইয়া আপাত-ম্রিয়মাণ ভারতাত্মার প্রাণস্পন্দন মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। বিদেশকে ঠিক ঠিক বুঝিতে হইলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন স্বদেশকে পরিপূর্ণভাবে জানা। আবার প্রথমবার পাশ্চাত্য-পরিভ্রমণের ফলে যে অভিজ্ঞতা হইয়াছিল, দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্য-পরিক্রমা-কালে সেই অভিজ্ঞতার পরিমার্জনার দ্বারা তিনি ভারতীয় বা প্রাচ্য সভ্যতার সহিত পাশ্চাত্য সভ্যতার ঐক্য ও পার্থক্য সম্বন্ধে আরও দৃঢ়নিশ্চয় হইয়াছেন। স্বামীজী মনে-প্রাণে অনুভব করিতেন যে, বুদ্ধের যেমন প্রাচ্যের উদ্দেশ্যে বিশেষ বাণী ছিল, তেমনি তাঁহারও জীবনোদ্দেশ্যের অন্যতম পাশ্চাত্যের প্রতি বিশেষ বাণী। সেইসঙ্গে একথাও ঘোষণা করিয়াছেন—"পাশ্চাত্যবাসীদের উদ্দেশ্যে আমার বাণী বলিষ্ঠ, প্রাচ্যবাসীদের উদ্দেশ্যে আমার বাণী বলিষ্ঠতর।"

স্বামীজীর জীবনের সমগ্র ধ্যানধারণার মূল উৎস এই স্বদেশ-জননীর যে বাণী সমগ্র

বিশ্বের অবগতির জন্য ঘোষণা করা প্রয়োজন, সে বিষয়ে 'India's Message to the World' —নামে একটি গ্রন্থের প্রাথমিক সূচনাও তিনি করিয়াছিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ গ্রন্থটি সম্পূর্ণ না হইলেও উহার প্রথম সূচনায় সূত্রাকারে 'জগতের প্রতি ভারতের বাণী'-র যে মূল বক্তব্যসমূহ বিধৃত, তাহাদের অবলম্বন করিয়া স্বামীজীর বিস্তৃত রচনা ও ভাষণাবলীর সাহায্যে এ বিষয়ে স্বামীজীর সমগ্র চিন্তাধারার পরিচয় লাভ করা যাইতে পারে।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম যুগের অধিকাংশ ইংরেজী-শিক্ষিতের মতো স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্যের পদতলে বসিয়া বিদেশী বিদ্যা-অর্জনে উৎসাহী ছিলেন না। প্রয়োজনমত বিদেশের জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা-সংস্কৃতি, সমাজ ও সভ্যতার শ্রেয় দিকগুলিকে গ্রহণ করিয়া উহাদিগকে ভারতীয়ভাবে আত্মস্থ করাই তাঁহার আদর্শ। মনে রাখিতে হইবে, তাঁহার ধারণায় আগামী যুগের সভ্যতার কেন্দ্রস্থল য়ুরোপ নহে, ভারতবর্ষ। 'উদ্বোধন' পত্রিকার আদর্শ-আলোচনা-প্রসঙ্গে ( ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা 'উদ্বোধন'-এ দ্রষ্টব্য ) তাঁহার 'প্রস্তাবনায়' ( 'ভাববার কথা'-গ্রন্থে পরিবর্তিত নাম 'বর্তমান সমস্যা' ) তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য আদর্শের আসন্ন 'সম্মিলন-কাল'-প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—

"এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ।

ভারতের বায়ু শান্তিপ্রধান, যবনের প্রাণ শক্তিপ্রধান; একের গভীর চিন্তা, অপরের অদম্য কার্যকারিতা; একের মূলমন্ত্র 'ত্যাগ', অপরের 'ভোগ'; একের সর্বচেষ্টা অন্তর্মুখী, অপরের বহির্মুখী; একের প্রায় সর্ববিদ্যা অধ্যাত্ম, অপরের অধিভূত; একজন মুক্তিপ্রিয়, অপর স্বাধীনতাপ্রাণ; একজন ইহলোক-কল্যাণলাভে নিরুৎসাহ, অপর এই পৃথিবীকে স্বর্গভূমিতে পরিণত করিতে প্রাণপণ; একজন নিত্যসুখের আশায় ইহলোকের অনিত্য সুখকে উপেক্ষা করিতেছেন; অপর নিত্যসুখে সন্দিহান হইয়া বা দূরবর্তী জানিয়া যথাসম্ভব ঐহিক সুখলাভে সমুদ্যত।···ভারত হইতে সমানীত সত্ত্বধারার উপর পাশ্চাত্য জগতের জীবন নির্ভর করিতেছে নিশ্চিত এবং নিম্নস্তরে তমোগুণকে পরাহত করিয়া রজোগুণ প্রতি-বাহিত না করিলে আমাদের ঐহিক কল্যাণ যে সমুৎপাদিত হইবে না ও বহুধা পারলৌকিক কল্যাণের বিঘ্ন উপস্থিত হইবে, ইহাও নিশ্চিত। এই দুই শক্তির সম্মিলনের ও মিশ্রণের যথাসাধ্য সহায়তা করা 'উদ্বোধনের' জীবনোদ্দেশ্য।"

স্বামীজীর এই দৃষ্টিভঙ্গীই বিস্তৃত বিশ্লেষণে ও চলিতভাষার সহজ স্বাচ্ছন্দ্যে 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য'-গ্রন্থে অভিব্যক্ত। বলা বাহুল্য, ভারতের সব মানুষই যে অধ্যাত্ম আদর্শে সমুন্নত অথবা পাশ্চাত্যের প্রতিটি ব্যক্তিই যে ঐহিক সুখে আসক্ত—এমন কথা স্বামীজীর অভিপ্রেত নয়। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রধান মানসপ্রবণতার দিকটিই তাঁহার আলোচনার বিষয়। ব্যতিক্রম সব দেশেই সম্ভব।

বাংলা গদ্যের চলিত ভাষার ইতিহাসে এই গ্রন্থখানির বিশিষ্ট স্থান সকল শ্রেণীর সমা-লোচকই স্বীকার করেন। উইলিয়ম কেরীর 'কথোপকথন' ও মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের 'প্রবোধচন্দ্রিকা' গ্রন্থদ্বয়ে চলিতভাষার যে উদাহরণ দেখা যায়, তাহা ভাষার পরীক্ষা-নিরীক্ষা অপেক্ষা বৈচিত্র্যের উদাহরণরূপেই গ্রহণীয়। প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' ও কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা'র ভাষাই সাহিত্যসৃষ্টির ক্ষেত্রে চলিত-ভাষার প্রয়োগের দিক হইতে সর্বাগ্রে

উল্লেখযোগ্য। 'আলালের ঘরের দুলালে'র মূল ভাষা সাধু হইলেও সংলাপের ক্ষেত্রে চলিতভঙ্গিমার প্রকাশে প্যারীচাঁদের কৃতিত্ব অসাধারণ। 'হুতাম পঁ্যাচার নক্সা'র ভাষায় কলিকাতার স্থানীয় বৈশিষ্ট্যের বিচিত্র প্রকাশ গ্রন্থটির আদ্যন্ত ইহার বিষয়বস্তুকে রঙ্গরসে সজীব করিয়া তুলিয়াছে। পরবর্তীকালে রবীন্দ্র-অগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষাভঙ্গিমায় চলিত ভাষার প্রভাব দেখা দিলেও রবীন্দ্রনাথের তরুণ বয়সে লেখা য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র (১২৮৮) এবং য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারী (লেখার সময়: ২২শে আগস্ট—৪ঠা নভেম্বর, ১৮৯০; বাংলা ১৩০০ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত) বই দুটিই বিবেকানন্দপূর্ব বাংলা গদ্যের ইতিহাসে চলিত-ভাষার রচনারূপে উল্লেখ-যোগ্য। সমকালে লিখিত তাঁহার 'পত্রাবলী'র ভাষাকৃতিত্ব এ ক্ষেত্রে আরো বেশী স্মরণীয়। তবু প্রমথ চৌধুরীর প্রভাবে সবুজপত্রে (১৯১৪) নিয়মিত লেখা শুরু করার পূর্বে রবীন্দ্রনাথ চলিত গদ্যকে তাঁহার রচনার বাহন করিতে পারেন নাই।

প্রথম বর্ষের 'উদ্বোধন' পত্রিকায় চলিত ভাষায় রচিত স্বামী বিবেকানন্দের "ভাববার কথা" শীর্ষক কাহিনীগুচ্ছ প্রকাশিত হওয়ার পরেই 'বিলাতযাত্রীর পত্র' (১লা ভাদ্র, ১৫শ সংখ্যা, ১৩০৬ সাল) ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইতে থাকে। দ্বিতীয় বর্ষের 'উদ্বোধন' পত্রিকার ১৫ই আষাঢ়, ১৩০৭ সংখ্যা হইতে তৃতীয় বর্ষের ১লা বৈশাখ, ১৩০৮ সংখ্যা অবধি 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' গ্রন্থের প্রকাশকাল। ১৫ই আষাঢ়, ১৩০৭ সংখ্যাটির দুই সংখ্যা আগে (১৫ই বৈশাখ, ১৩০৭) 'বর্তমান ভারত' পরিসমাপ্ত হয়। 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য'-রচনার সূচনায় ভাষাভঙ্গী যে বর্তমান ভারতের অনেকটা অনুরূপ, সেকথা এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। কিছু পরেই অবশ্য সংস্কৃত ভাষার সংহত ভঙ্গিমা পরিবর্তিত হইয়া চলিতভাষার জোয়ার দেখা দিয়াছে। স্বামীজীর মূল বাংলায় লেখা গ্রন্থ-হিসাবে 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য'ই ১৩০৯ সালে সর্বপ্রথম প্রকাশিত, 'পরিব্রাজক' ও 'বর্তমান ভারত' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৩১২ সালে; 'ভাববার কথা' ১৩১৪ সালে। গ্রন্থাকারে 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য'-প্রকাশকালে স্বামীজীর দেহত্যাগের পরে প্রাপ্ত অংশ যোগ করা হয়। গ্রন্থ-সমাপ্তির ধরনে মনে হয় স্বামীজীর ভবিষ্যতে আরও কিছু বক্তব্য-সংযোগের কল্পনা ছিল।

স্বামী বিবেকানন্দের গদ্যরীতি-আলোচনা-প্রসঙ্গে তাঁহার 'পত্রাবলী' বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। পূর্বে এই পত্রাবলী পাঁচ ভাগে (প্রথম ভাগ—১৩১১) প্রকাশিত ছিল। ১৩৫৫ ও ১৩৫৬ সাল হইতে দুই ভাগে সমগ্র পত্রাবলী প্রকাশিত হয়। স্বাভাবিকভাবেই 'পত্রাবলী'র গদ্যে স্বামীজী সাধু ও চলিত দুই ধরনের ভাষাই ব্যবহার করিয়াছেন। আমেরিকা হইতে লিখিত স্বামীজীর পত্রা-বলীতেই ধীরে ধীরে সাধু হইতে চলিত ভাষায় আত্মপ্রকাশের সূত্রপাত। 'স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা'র ষষ্ঠ খণ্ডে বিধৃত ২৮শে ডিসেম্বর, ১৮৯৩ তারিখে শ্রীহরিদাস মিত্রকে এবং ১৯শে মার্চ, ১৮৯৪ তারিখে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লেখা পত্র দুইটিতে স্বামীজীর এই ভাষাগত বিবর্তন লক্ষণীয়। দ্বিতীয় পত্রটি হইতে স্বামীজীর একালের গদ্যভঙ্গীর প্রাসঙ্গিক উদাহরণ—"দাদা, এই সব দেখে—বিশেষ দারিদ্র্য আর অজ্ঞতা দেখে আমার ঘুম হয় না; একটা বুদ্ধি ঠাওরালুম Cape Comorin (কুমারিকা অন্তরীপে) মা কুমারীর মন্দিরে ব'সে, ভারতবর্ষের শেষ পাথরটুকরার উপর ব'সে—

এই যে আমরা 'এতজন সন্ন্যাসী আছি, ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি, লোককে metaphysics (দর্শন) শিক্ষা দিচ্ছি, এ সব পাগলামি। 'খালিপেটে ধর্ম হয় না'—গুরুদেব বলতেন না? ঐ যে গরীবগুলো পশুর মত জীবনযাপন করছে, তার কারণ মূর্খতা, পাজি বেটারা চার যুগ ওদের রক্ত চুষে খেয়েছে, আর দু পা দিয়ে দলেছে।"

'উদ্বোধন'-পত্রিকা-প্রকাশকালে বাংলা-ভাষার অন্তর্নিহিত শক্তি সম্বন্ধে দুই ধরনের বক্তব্য স্বামীজীর মনে দেখা দিয়াছিল। এক, "বুদ্ধ থেকে চৈতন্য রামকৃষ্ণ পর্যন্ত—যাঁরা 'লোকহিতায়' এসেছেন"[১]—তাঁহাদের ব্যবহৃত সর্বজনবোধ্য ভাষা। 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' সেই ভাষাভঙ্গিমার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। দুই, "বিশেষণ দিয়ে verb (ক্রিয়াপদ)-এর ভাব প্রকাশ করতে পারলে ভাষার বেশী জোর হয়"।[২]—এই সচেতনতার ফলে সৃষ্ট সাধুগদ্যের অভিনব রীতি, যাহার সর্বোত্তম প্রকাশ স্বামীজীর 'বর্তমান ভারত'।

স্বামী বিবেকানন্দের বাংলা গ্রন্থচতুষ্টয়ের মূল বিষয় 'ভারতচিন্তা'। কিন্তু এই ভারতকে কেন্দ্র করিয়া বিবেকানন্দ-সাহিত্য বিশ্বপরিক্রমায় রত। সেদিক হইতে 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' দুই জীবনাদর্শের আচার-বিচার, অশন-ভূষণ হইতে আরম্ভ করিয়া আধ্যাত্মিক পরম লক্ষ্য অবধি উভয় সভ্যতার তুলনামূলক আলোচনায় আজ অবধি অনতিক্রান্ত গ্রন্থ।

স্বামী সুন্দরানন্দ-সম্পাদিত ১৩৫৪ সালের সুবর্ণ জয়ন্তী-সংখ্যা 'উদ্বোধনে' প্রকাশিত শ্রীকুমুদবন্ধু সেন মহাশয়ের 'উদ্বোধনের জয়যাত্রা' প্রবন্ধের অংশবিশেষ এ-প্রসঙ্গে পাঠকচিত্তে আগ্রহ-সঞ্চার করিবে—"দ্বিতীয় পর্যায়ের 'বঙ্গ-দর্শন'-প্রকাশের কিছুদিন পরে স্বর্গীয় রায় বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় একদিন রাত্রি আটটার পর লেখকের নিকট আসিয়া 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' গ্রন্থখানি চাহিলেন। লেখক বলিলেন, 'কেন—যখন আমি কতবার আপনাকে উহা পড়িবার জন্য সাধিয়াছি, প্রাণবন্ত জীবন্ত ভাষায় চলিত বাংলায় স্বামীজী বঙ্গ-সাহিত্যের কেমন নবরূপ দিয়াছেন, তাহা পড়িয়া দেখুন—বলিয়া বারংবার অনুরোধ সত্ত্বেও আপনি পড়িতে চাহেন নাই। আজ হঠাৎ কি প্রয়োজন হইল?' দীনেশচন্দ্র বলিলেন, 'আমি এই মাত্র রবিবাবুর নিকট থেকে তোমার কাছে আসছি। আজ রবিবাবু বিবেকানন্দের 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' বইখানির অত্যন্ত প্রশংসা করছিলেন। আমি উহা পড়ি নাই শুনে তিনি বিস্মিত হলেন! তিনি বল্লেন, "আপনি এখুনি গিয়ে বিবেকানন্দের এই বই-খানি পড়বেন। চলিত বাংলা কেমন জীবন্ত প্রাণময়রূপে প্রকাশিত হতে পারে, তা পড়লে বুঝবেন। যেমন ভাব, তেমনি ভাষা, তেমনি সূক্ষ্ম উদার দৃষ্টি আর পূর্ব-পশ্চিমের সমন্বয়ের আদর্শ দেখে অবাক হতে হয়।"

ওজস্বিতা, প্রসাদগুণ, নিপুণ বিশ্লেষণ, বুদ্ধি-দীপ্ত বাগ্‌ভঙ্গী, বিদগ্ধ পরিহাসনৈপুণ্য এবং ভারতাত্মার গভীরতম ধ্যানসত্যের মিশ্রণে বাংলা গদ্যের চিরোজ্জ্বল আদর্শসৃষ্টির নিদর্শন-রূপে 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' স্বামী বিবেকানন্দের অন্যতম অক্ষয় কীর্তি।

---

১ উদ্বোধন, ২য় বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ১৫ই চৈত্র ১৩০৬ স্বামী 'বিবেকানন্দের পত্র' দ্রষ্টব্য। ২০শে ফেব্রুয়ারি, ১৯০০ তারিখে লেখা এই পত্রের 'কিয়দংশ' ক্ষুদ্র অক্ষরে 'বাঙ্গালা ভাষা' নামে ঐ সংখ্যায় প্রকাশিত। পরবর্তী কালে 'ভাববার কথা' গ্রন্থে 'বাঙ্গালা ভাষা' নামেই বরাবর থাকে। 'বাণী ও রচনা' ৬ষ্ঠ খণ্ড দ্রঃ।

২ স্বামি-শিষ্য-সংবাদ : বাণী ও রচনা : ৯ম খণ্ড : পৃঃ ৯৩

# স্বামী বিবেকানন্দের স্বদেশমন্ত্র

শ্রীতারকনাথ ঘোষ

'বর্তমান ভারত' গ্রন্থের শেষ অনুচ্ছেদটি—যেটির কিছু অংশ 'স্বদেশমন্ত্র' নামে খ্যাত সেটিতে স্বামী বিবেকানন্দের ভাবত সম্বন্ধে সব চিন্তা যেন বীজাকারে কেন্দ্রীভূত। যে বিবেকানন্দ চলিত ভাষার পক্ষপাতী ছিলেন তিনি এই গ্রন্থে উদাত্ত গম্ভীর কণ্ঠে গাঢ-নিবদ্ধ সাধুভাষায় ধ্রুপদী আদর্শে ভারতবাসীব কাছে তার চিরায়ত জীবনধারার সত্যটি ঘোষণা করেছেন। স্বদেশমন্ত্রের প্রত্যেকটি শব্দ সজীব। দণ্ডী তাঁর কাব্যাদর্শে বলেছেন,

'একঃ শব্দঃ সুপ্রযুক্তঃ সম্যগ্‌ জগতঃ স্বর্গে
লোকে চ কামধুগ্‌ ভবতি।'

স্বামীজী যে-সব শব্দের সুপ্রয়োগ করেছেন, সেগুলির অর্থ যদি সম্যগ্‌ভাবে উপলব্ধি করা যায় তাহলে তা থেকে চতুর্বর্গই লাভ হবে। 'স্বদেশমন্ত্র' নামটি কে দিয়েছিলেন জানি না। যিনিই দিয়ে থাকুন, এই নামকবণ সার্থক—বিবেকানন্দের এই বাণী মন্ত্রের মতোই তেজোগর্ভ, শক্তিসঞ্চারী।

মন্ত্রের সূচনাতেই উদাত্ত কণ্ঠে আহ্বান—'হে ভারত'। উনিশ শতকের সব মনস্বী পুরুষের মতোই স্বামী বিবেকানন্দ ভারত-পথিক। 'শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ' বলে তিনি এখানে অন্য বাণী প্রচার করতে চাননি; সারা বিশ্বে তিনি অমৃতের বাণী শুনিয়ে এসেছিলেন, কিন্তু ভারতবর্ষে ফিরে এসে ভারতবাসীকে শুধু জাগাতে চেয়েছেন। এই চাওয়ার মূলে আছে তাঁর গভীর স্বদেশপ্রেম। সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের 'বিবেকানন্দ-চরিত' থেকে একটা ঘটনার বিবরণ পড়লেই বোঝা যাবে ভারতবর্ষকে তিনি কতখানি ভালো-বাসতেন।—

"লণ্ডন পরিত্যাগ করিবার অব্যবহিত পূর্বে একজন ইংরেজ বন্ধু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কবিয়াছিলেন, স্বামীজী। চার বৎসর বিলাসের, লীলাভূমি, গৌববমুকুটধারী মহাশক্তিশালী পাশ্চাত্যভূমিতে ভ্রমণের পব আপনার মাতৃ-ভূমি কেমন লাগিবে?' স্বদেশপ্রেমিক সন্ন্যাসী তৎক্ষণাৎ উত্তর দিয়াছিলেন, 'পাশ্চাত্যভূমিতে আসিবার পূর্বে ভাবতকে আমি ভালবাসিতাম; এক্ষণে ভারতের ধূলিকণা পর্যন্ত আমার নিকট পবিত্র, ভারতের বাতাস আমার নিকট এখন পবিত্রতামাখা, ভারত এখন আমার নিকট তীর্থস্বরূপ।'"

বিবেকানন্দেবই কথা—'এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ'—ভারত জাগবেই নিজস্বতা নিয়ে এবং সমগ্র বিশ্বকে যুগোপযোগী কল্যাণপথ দেখাবেই। শুদ্ধ জ্ঞানের জ্যোতিতে বিবেকা-নন্দের চেতনা সদাসমুজ্জ্বল থাকলেও তিনি অন্য সাধনা বাদ দিয়ে দেশজননীকে আগামী পঞ্চাশ বৎসরেব জন্য একমাত্র উপাস্য দেবতা করতে বলেছিলেন—দেশসেবাকেই ধর্মসাধনায় রূপায়িত করতে বলেছিলেন। ইহা নবযুগের বাণী—শিবজ্ঞানে জীবসেবা'।

'হে ভারত ভুলিও না'—। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেছিলেন, বাঙালী আত্মবিস্মৃত জাতি। এই আত্মবিস্মৃতি শুধু বাঙালীর নয়, সারা ভারতবাসীর। উনিশ শতকে যখন ইংরেজের মধ্য দিয়ে পশ্চিমের সভ্যতার ঢেউ আমাদের দেশে এসে পৌঁছল তখন নগর বা নগরোপকণ্ঠ-

বাসী সমাজের একটা সেরা অংশ তাতে ভেসে গেল। পশ্চিমের সাহিত্য, পশ্চিমের দর্শন, পশ্চিমের ইতিহাস—পশ্চিমের সংস্কৃতির সব কিছুই তাদের ধ্যান জ্ঞান হয়ে উঠেছিল। মেকলে এ দেশকে ইংলণ্ডের নয়া সংস্করণ বানাবার কল্পনা করেছিলেন বলে শোনা যায়। তাঁর ঐ কল্পনা এ দেশের সে-কালীন ইংরেজী-শিক্ষিত সমাজেরই আশার প্রতিচ্ছবি। আলোর একটা ঝলকে চোখ ধাঁধিয়ে গেল। এই পরানুবাদ আত্মহননেরই সামিল। সে যুগের মনীষিমাত্রেই আত্মপরিচয়ের মধ্য দিয়ে জাতিকে উদ্বুদ্ধ করতে চেষ্টা করেছেন। আত্মবিস্মৃতি পতনের সবচেয়ে বড়ো কারণ; আত্মবোধই প্রতিষ্ঠার মূলগত প্রেরণা। আমরা তখন জাতীয় আদর্শ ভুলে ছিলাম; মাঝে একটু জেগে আবার ভুলেছি। তাই স্বামীজীর 'হে ভারত, ভুলিও না'-র প্রয়োজন তখন যতখানি ছিল, এখনো ততখানিই বা তার চেয়ে বেশী।

বিবেকানন্দ ভারতকে প্রথমে তাব নারী-জাতির আদর্শের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। তিনি জানতেন যে, জাতির অর্ধাংশ নারী, দুই পক্ষে ভর দিয়েই বিহঙ্গের নভোযাত্রা—এক পক্ষ দুর্বল হলে ঐ যাত্রা শুধু যে ব্যাহত হবে তা নয়, তার পতন অবশ্যম্ভাবী। নারীশক্তি যদি অনুকূল হয় তবেই পুরুষ জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। সারদাদেবীর পুণ্য ছবি বিবেকানন্দের হৃদয়ে নিরন্তর ভাস্বর ছিল। আমেরিকায় নারীর যে শক্তিমূর্তি তিনি দেখে-ছিলেন তাকে তিনি শ্রদ্ধার সঙ্গে জগদম্বা বলে স্মরণ করেছিলেন। নারীর অভ্যুদয় তাঁর কাঙ্ক্ষিত ছিল, কিন্তু নারীজাগরণের নামে বিলাসমগ্ন পশ্চিমের নারীসমাজের আদর্শের অন্ধ অনুকরণ তাঁর অভিপ্রেত ছিল না। তিনি ভারতীয় নারীর কাছে ভারতীয় জীবন-কল্পনায় আদর্শায়িত তিনটি নারীর উল্লেখ করেছেন। ভারতীয় নারীত্বের আদর্শের গগনে চির-ভাস্বর সেই তিন নারী—সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী।

সীতা-চরিত্রের মর্মবাণী তাঁর পতিগত-প্রাণতা, তাঁর অপার সহিষ্ণুতা। সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে স্বামীই তাঁর একমাত্র ধ্যান। কৃত্তিবাসের সীতা সুশীলা কোমলা বঙ্গবধূ—কিন্তু বাল্মীকির সীতার চরিত্রে যেন একটা নিগূঢ় শক্তি আছে। ধরিত্রীকন্যা সর্বংসহা হয়ে অসামান্য ধৈর্য আর নম্রতার পরিচয় দিয়ে পাতিব্রত্যধর্ম পালন করেছেন। কৈকেয়ীর পণ-পূরণের জন্য যখন রাম বনবাসে যেতে উদ্যত, তখন তিনি তাঁর সহচারিণী হতে চেয়েছেন, বনের কষ্টকে কষ্ট বলে মনে করেননি। রাবণ-বধের পর যখন তাঁকে অগ্নিপরীক্ষা দিতে হল তখন তিনি রাঘবের ধ্যান করতে করতে অগ্নি-প্রবেশ করেছেন। অযোধ্যার রাজসভায় যখন আবার পরীক্ষা দেওয়ার প্রস্তাব উঠল, তখন কি এই সাধ্বীর অন্তর বেদনায় ভেঙ্গে পড়েছিল, সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্তি সেই জন্যই কি সর্বংসহা জননী পৃথিবীর কাছে আশ্রয় চেয়েছিলেন? কিন্তু তখনও রামময়জীবিতা কোন অভিযোগই করেননি রামের বিরুদ্ধে, তাঁর সারা সত্তা অনির্বাণ পতিপ্রেমের স্থির দ্যুতিতে অপরূপ।

সীতার মধ্যে প্রেমের শান্ত শ্রী; সাবিত্রীর মধ্যে প্রেমের সঙ্গে আশ্চর্য তেজ মিশেছে। সাবিত্রী আত্মপ্রত্যয়ে দীপ্যমানা। চারিত্রদীপ্তি তাঁর প্রেমকে সমুজ্জ্বল করে তুলেছে। সত্যবানের সঙ্গে পরিণয়ের পর তাঁর বর্ষকালের জীবন তো একটা বিপুল সাধনা। সত্যবানের মৃত্যুর পর যমরাজের সঙ্গে তাঁর আলোচনা প্রেমের সঙ্গে প্রজ্ঞার মিলনের অতুলন দৃষ্টান্ত।

সীতা একটা অলৌকিকী দীপ্তি, সাবিত্রী সবিতৃমণ্ডলের দ্যুতি, আর দময়ন্তী যেন 'প্রেমগগনে চিররাকা'। নলের প্রেমে দময়ন্তী দেবতাদের প্রত্যাখ্যান করেছেন; কলিপীড়িত নলের সঙ্গে স্বেচ্ছায় বনবাসিনী হয়েছেন; কলির ছলনায় হৃতবাস নলের সঙ্গে একবাসা হয়েছেন; নল যখন ঘুমন্ত অবস্থায় রেখে চলে গেলেন ভীমরাজদুহিতা তখনও পিতৃগৃহে সম্পদের মধ্যে আশ্রয় না নিয়ে সৈরিন্ধ্রীর জীবন যাপন করেছেন।

সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী—হ্রী, ধী, শ্রী। এঁরা নারীদেহধরা—মানবী; নারীত্বের পরিপূর্ণ সম্পদে এঁরা জীবনকে ভরিয়ে তুলতে চেয়েছেন। এই তিন আদর্শ ভারতের নারী-সমাজকে যুগ যুগ ধরে শক্তি দিয়ে আসছে; স্বামীজী জানতেন এই তিন আদর্শের অনু-গামিনী হলেই ভারতীয় নারীর জীবন বিকশিত কোকনদের মতো অনুপম হয়ে উঠবে।

'ভুলিও না—তোমার উপাস্য উমানাথ সর্বত্যাগী শঙ্কর।'—দেবাদিদেব মহাদেব ভারতবাসীর সভক্তি উপাসনার মহৎ আশ্রয়, বিশেষতঃ সন্ন্যাসিগণের।

ধ্যানতন্ময় যোগেশ্বরই ত্যাগিগণের উপাস্য। কিন্তু এই আদর্শ সর্বমানবের নয়। যে মহাদেব তপশ্চারী একক, তাঁর আরাধনা সন্ন্যাসীর পক্ষে সম্ভব, কিন্তু গৃহীর জীবনের আদর্শ শিবশক্তির মিলিত মূর্তি।

স্বামী বিবেকানন্দ যে বিশেষণটি প্রয়োগ করেছেন তার পিছনে একটি ইতিহাস আছে। 'উমানাথ'। উমা-নামের উৎপত্তি সম্পর্কে কালিদাস বলেছেন,

উ-মেতি মাত্রা তপসো নিষিদ্ধা
পশ্চাদুমাখ্যাং সুমুখী জগাম॥

'উমা-'নামের সঙ্গে তপশ্চরণের ভাবনাটি সংযুক্ত। দেবদেবের তৃতীয় নয়নের অগ্নিসম্পাতে পঞ্চশর দগ্ধ হবার পর, পার্বতীকে কঠোর তপস্যা করে শিবলাভ করতে হয়। পঞ্চতপা অপর্ণা উমাই নারীত্বের—দেবীত্বেরও চরম আদর্শ। এইজন্যই 'উমানাথ' বিশেষণ। সন্ন্যাসী এবং গৃহস্থ উভয়েরই আদর্শ শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবমূর্তি বিবেকানন্দের চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল কি?

অপর দুটি বিশেষণও তাৎপর্যময়। অন্নপূর্ণা যাঁর গৃহলক্ষ্মী তিনি সর্বত্যাগী। কবির কল্পনা তাঁকে ভিখারি করে ছেড়েছে। যিনি বিশ্বেশ্বর তাঁকে সর্বত্যাগিরূপে উপাসনা করতে পারলেই ভোগের বাসনা দূর হয়ে যেতে পারে। তিনি শঙ্কর—কল্যাণকারী। তিনি বিশ্বের শিবসাধন করছেন- এই সত্যটি হৃদয়ঙ্গম করতে পারলে কল্যাণব্রতে আত্মোৎসর্গের প্রেরণা স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে উঠবে।

ঈশোপনিষদের প্রথম মন্ত্রের শেষার্ধের নির্দেশ—

'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ ধনম্॥'

'সেইহেতু ত্যাগের দ্বারা (অথবা তাঁর ত্যক্ত বস্তু দ্বারা) ভোগ কর, কারও ধনে লোভ কোরো না। বিবেকানন্দের বাণী যেন এই উপদেশকে আরও একধাপ এগিয়ে নিয়ে গেছে। কেবল যে পরের ধনে লোভ করবে না তা নয়, নিজের বস্তুতেও লোভ করবে না। 'ভুলিও না তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন ইন্দ্রিয়-সুখের—নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে।'—বিবেকানন্দ সমাধিতে নিমগ্ন থাকতে চেয়েছিলেন বলে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর এই আকাঙ্ক্ষাকে হীন বুদ্ধি বলে-ছিলেন। বিশ্বজগতের মুক্তিই তাঁর জীবনাদর্শ। জীবন থেকে স্বার্থ বিসর্জন দিতে হবে—পরার্থে জীবনোৎসর্গই বিবেকানন্দের শিক্ষা।

কিন্তু এই পরহিতব্রতসাধন একটা শুষ্ক আদর্শ নয়। এর মূলে আরও অনেক বড়ো একটা চেতনা আছে। 'ভুলিও না—তুমি জন্ম হইতেই "মায়ের" জন্য বলি-প্রদত্ত; ভুলিও না—তোমার সমাজ সে বিরাট-মহামায়াব ছায়ামাত্র।' তোমার কাজ বা আমার কাজ নয়, সবই মায়ের। সেই নিগূঢ় শক্তি, গুণাশ্রয়া গুণময়া মহামায়ার উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই আমাদের এই জন্ম। শুধু তাই নয়, সবই মা! সব কাজই তাঁর পূজা। এই হল বিবেকানন্দেব 'বনের বেদান্তকে ঘবে টেনে আনা।' এই যে বিরাট মানবসমাজ ব্রহ্মময়ী জগদম্বার সৃজনলীলার একটি কণা, গুণাতীত ব্রহ্মেরই রূপ, এর সেবাতেই জীবন উৎসর্গ করতে হবে। শিবজ্ঞানে জীবের সেবা; 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' এই চিরায়ত মহাবাণীব ক্রিয়াত্মক প্রকাশ; 'তত্ত্বমসি' এই মহাবাক্য চৈতন্যের গভীরে উপলব্ধি করার জন্য প্রেরণাবিদ্ধ জীবনের সাধনা। শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দে প্রতিফলিত। সবই মা, সবই কালী। 'ভুলিও না—নীচ জাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই।'—এ পশ্চিমের মানবতাবাদ বা বিশ্বভ্রাতৃত্বের ধুয়া নয়। এই উপলব্ধির মূলে আছে অদ্বৈত অনুভূতি। এই বিশ্বসংসার সেই জননী থেকে সমুদ্ভূত। চৈতন্যের একটি অখণ্ড প্রবাহ, সৃষ্টির মূল উপাদানের উপলব্ধির উপনিষদ্!

কিন্তু এ শুধু কথার কথা নয়। জীবনে এই সত্যকে উপলব্ধি করতে হবে। বিবেকানন্দ অনুভব করেছিলেন যে, ক্ষীণপ্রাণ আমাদের পক্ষে এই বিরাট ভাবনা করা সম্ভবপর নয়। পাছে আমরা এই সুমহতী কল্পনার কাছে ভীত সংকুচিত বিহ্বল হয়ে পড়ি এই জন্য তিনি প্রথমে আমাদের বীর্য জাগ্রত করতে চেয়েছিলেন। 'উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্ নিবোধত'—কঠোপনিষদের এই বাণী তাঁর কত প্রিয় ছিল। ভারতবাসীর অন্তরে সাহস সঞ্চার করে তিনি তাকে উদ্দীপিত করতে চেয়েছিলেন। 'হে বীর, সাহস অবলম্বন কর।'—বিরাট বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সৃষ্টিস্থিতিবিনাশের শক্তিভূতা সনাতনীর উপলব্ধি ক্ষুদ্র চেতনায় সম্ভবপর নয়, সেই জন্যই বুঝি তিনি ভারতবাসীর কাছে দেশজননীকে সেই মহামায়ার প্রতিমূর্তিরূপে স্থাপনা করতে চেয়েছিলেন। স্বদেশজননীর সেবার মধ্য দিয়েই বিশ্বজননীর আরাধনার পথ প্রশস্ত হয়; স্বদেশবাসীর সঙ্গে আত্মিক সংযোগের অনুভূতিই তো বিশ্ব-চৈতন্যের সঙ্গে অভেদ-মিলনের ভাবনায় প্রথম পদক্ষেপ। স্বদেশমন্ত্রেই সাধনার শুরু। তিনি তিনি বলেছেন, 'সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই। বল, মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই।' ভারতবর্ষের আপামর জনসাধারণের সঙ্গে এই একাত্মবোধের উৎস হবে প্রেম। অন্তরে প্রেম না থাকলে কোনো সত্যকেই মর্মে মর্মে উপলব্ধি করা যায় না। ভারতের সব কিছুকে ভালবাসতে হবে। ভারতের মানুষের সঙ্গে প্রাণের সংযোগ অনুভব করতে হবে; ভারতকে সারা অন্তর দিয়ে নিজের করে নিতে হবে। বিবেকানন্দের বাণীতে ভারতের আত্মার সঙ্গে সংযোগের এই উপলব্ধিটি পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। 'তুমিও কটিমাত্র-বস্ত্রাবৃত হইয়া, সদর্পে ডাকিয়া বল—ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের

সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী; বল ভাই, ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ।'

কেবল ঘোষণায় আদর্শ সম্পর্কে একটা চেতনার আবছায়া অন্তরে জাগে। কিন্তু জীবনে যদি তার প্রতিষ্ঠা না হয় তাহলে তা নিছক বুলিমাত্র থেকে যায়। মহৎ আদর্শকে জীবনে ফলবান্ করে তুলতে হলে ঐকান্তিকী সাধনা চাই, আর চাই দৈবী করুণা। কালের বিচিত্র বিধানে ধর্মক্ষেত্র ভারত আজ ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র। কিন্তু পশ্চিমের অনুকরণে গড়ে তোলা রাষ্ট্রের বিশিষ্টতা যাই হোক না কেন, জীবনে যদি গভীর ধর্মবোধ অনুস্যূত না হয় তাহলে এখানে সব সাধনাই নিষ্ফল হবে।

স্বামী বিবেকানন্দ তাই গৌরীনাথ আর জগদম্বার কাছে প্রার্থনা জানাতে বলেছেন, সেই সঙ্গে মানুষের জীবনসাধনার যেটি সবচেয়ে বড়ো জিনিস সেইটি চাইতে বলেছেন: "আর বল দিনরাত, 'হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও; মা, আমার দুর্বলতা, কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর'।"

এইটাই মানুষের সবচেয়ে বড়ো চাওয়া। ঐ মনুষ্যত্ববোধ—পরিপূর্ণতার চেতনা নেই বলেই আমাদের জীবন জড়তায় আচ্ছন্ন, ক্লেদাবিল। ক্ষুদ্রচিত্তদৌর্বল্য পরিহার করে আত্ম-জাগৃতির সাধনাই প্রথমে করতে হবে। মানুষ মনুষ্যত্বের সাধনায় যতই এগোবে ততই জীবনে কল্যাণ প্রতিষ্ঠিত হবে। মানুষ যদি মানুষ হতে না পারে তাহলে সাধনায় সিদ্ধির প্রশ্ন নিরর্থক।

# স্বামী ব্রহ্মানন্দের অপ্রকাশিত পত্র

১

[ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লিখিত ]

শ্রীশ্রীগুরুদেব
শ্রীচরণ ভরসা

Belur Math,
1st. April,
1902

My Dear Sasi Maharaj,

Alasingaকে যে পত্র লিখিয়াছি তাহাতে নরেনের সংবাদ পাইয়া থাকিবে। নরেন এখন ভাল আছে। নুনজল বন্ধ করিয়া treatment হচ্ছে। আশা করা যায় আর একমাসে খুব একদম ভাল হইয়া যাবে। কোন চিন্তার কারণ নাই। শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায় আবার বেশ সারিয়া যাবে। তোমার grand utsav হয়েছে শুনে বড খুশী সকলে।

শরৎ বোধ হয় Benaras Centre খুলতে শীঘ্র যাবে। তুমি কেমন থাক মধ্যে ২ লিখে খুশী করবে। ইতি—

With love to you & Basanta.

Yours afftly.
Rakhal

২

[ স্বামী বিজ্ঞানানন্দকে লিখিত ]

শ্রীশ্রীগুরুদেব
শ্রীচরণ ভরসা

Math, Belur
13th, Feb.
1903

My Dear Pessan,

অদ্য Registered চিঠির ভিতব ১৬ শত টাকার Govt. Paper পাঠাইলাম। প্রাপ্তি-সংবাদ পাইবামাত্র পত্রে (খামের ভিতর) লিখিয়া পাঠাইবে। যেখানে তোমার সহি করিতে হইবে তথায় Pencil [ দিয়া ] × mark দিয়াছি। সে লাইনটির উপরে সই করিবে। তোমার নাম উক্ত কাগজে যেরূপ spell করা আছে সেইরূপ সই করিবে। একখানাতে একরকম আর তিনখানিতে আর একরকম। সই করিবার পূর্বে spelling দেখিয়া ঠিক সেই রকম করিবে।

তুমি শীঘ্র আবার সই করিয়া Registered envelopeর ভিতর পুরে পাঠাইবে। ভাল করিয়া যেন Seal করিয়া দেওয়া হয়; কারণ শুধু Registered letter খোয়া গেলে Govt. দায়িক নহে। এজন্য বিশেষ সতর্কের সহিত উপরে গালার Seal করিয়া দিবে।

আমি ধার করিয়া Kankhal [ -এ ] 1500/- জমি ক্রয় জন্য পাঠাইয়াছি। তোমার সই হইলে পর আমি সই করিয়া বিক্রয় করিয়া উক্ত টাকা শোধ করিব।

আশা করি তুমি ভাল আছ।

With love and greetings

Yours afftly.
Rakhal

৩

## [ স্বামী অখণ্ডানন্দকে লিখিত ]

( ইংরেজী হইতে অনূদিত )

The Math,
15th Jan. 1904

My Dear Khanda Dada,

আমাদের প্রিয় স্বামীজীর জন্মতিথি বেশ সাফল্যের সহিত উদ্‌যাপিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে প্রায় তিন হাজার ভক্ত প্রসাদ পাইয়াছেন। নিবেদিতা খুব বাগ্মিতার সহিত এক ঘণ্টা বক্তৃতা দিয়াছিল। তাহার ভাষণ বাস্তবিকই অতি চমৎকার ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। সে সত্বরই তোমার ওখানে যাইবে এবং তোমার কাজের সাহায্যের জন্য কিছু করিবে। পরে তোমাকে জানাইব। তোমার ভালবাসা ও প্রীতিপূর্ণ পত্রের জন্য অশেষ ধন্যবাদ। তোমার চিঠি পড়িয়া আমি এত আনন্দিত হইয়াছি যে, তোমার প্রতি আমার সেই পূর্বেকার আকর্ষণ আবার জাগিয়া উঠিয়াছে এবং তোমাকে দেখিতে ইচ্ছা হইতেছে। ভাল কথা, ভায়া, আমার মোটা রেশম কোথায়? যত সত্বর পার উহা পাঠাইয়া দাও। সার্টের অভাবে আমার খুবই অসুবিধা হইতেছে। তুমি যেমন একটা থান দিয়াছিলে, সেই রকমের হইলে বড় ভাল হয়। শীঘ্র পাঠাইবে। ভালবাসাদি জানিবে।

Yours afftly.
Brahmananda

৪

## [ স্বামী বিজ্ঞানানন্দকে লিখিত ]

The Math, Balur
23rd. Feb. 1904

My Dear Pessan,

তোমার Telegram কল্য পাইয়াছি। অদ্য registered যোগে Govt. Paper of Rs. 700/- দুই কেতায় ও নগদ C notes একশত পাঠাইলাম পত্রপাঠ acknowledge করিবে।

যেরূপ spelling Girish Babu Bankতে endorse করিয়া দিয়াছে সেইরূপ spelling তুমি লিখিবে। তা না হলে বিক্রয় করিবার অসুবিধা হইবে। যেখানে Pencil দিয়া × mark দিয়াছি সেইখানে সহি করিবে।

উৎসব বেশ হয়ে গেছে। তোমার ওখানকার সবিশেষ লিখিবে, আমার নিকট বক্রি ৮০০ শত ছিল, কল্যাণকে ইতিপূর্বে একশত পাঠাইয়াছি। অদ্য অন্য তহবিল হতে ১০০৲ ধার করিয়া পাঠাইলাম, Building fund-এ জমা করিয়া লইতে বলিবে। কাগজ বিক্রয় হলে শীঘ্র বক্রি সমস্ত টাকা পাঠাইয়া দিব। তুমি Girish বাবুকে একখানা পত্র লিখিবে যে আমি থাকিয়া Plan করিয়া বাটীর কার্য আরম্ভ করিয়া দিয়াছি। Excuse haste, more in my next.

Afftly yours
Brahmananda

# স্বামী প্রেমানন্দের অপ্রকাশিত পত্র

[ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লিখিত ]

শ্রীশ্রীগুরুদেব-শ্রীচরণ ভরসা

The Math,
Belur, P. O. ( Howrah )
Dated 5. 3. 09

ভাই শশী,

শ্রীশ্রীপ্রভুর কৃপায় এখানকার উৎসব একরূপ হইয়া গেল। তুমি আর কতদিন শ্রীশ্রীমহারাজজীকে ওখানে রাখিবে। সকলেই মহারাজজীকে দেখিবার জন্য উৎসুক হয়ে রয়েছে। এখানে মহারাজজীর উপস্থিতি একান্ত প্রার্থনীয়, সেই সঙ্গে তোমার উপস্থিতি বড়ই বাঞ্ছনীয়। কৃপা করে আমাদের একবার দর্শন দিয়ে যাও ইহা সকলেরই ইচ্ছা। মহারাজজী কবে আসিবেন সকলের মুখে কেবল এই কথা। তাঁহাকে আটকে রাখা তোমার আর উচিত হয় না। মহারাজের ও তোমার শরীর কেমন আছে? শুনিলাম শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর শরীর খেটে খেটে জীর্ণ-শীর্ণ হয়ে গেছে। শরৎ ভায়া শীঘ্র তথায় গিয়া শ্রীশ্রীমাকে কলিকাতা আনিবার চেষ্টা করিবে। মঠের জলবায়ু আজকাল ভাল। কিন্তু মহারাজ না থাকায় সকলই নীরস। মহারাজজীকে আমার অসংখ্য অসংখ্য সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত জানাইবে ও তুমি আমার প্রণাম ভালবাসা জানিবে। আর আর ভক্তদের ভালবাসা ও সাদর সম্ভাষণ জানাইবে। আগামী ২৯শে ফাল্গুন কাঁকুড়গাছির কালীর উদ্‌যোগে শ্রীশ্রীকামারপুকুরধামে শ্রীশ্রীপ্রভুর উৎসব হইবে।

দেবমাতা কেমন আছে? তাহাকে আমাদের সাদর সম্ভাষণ জানাইবে। তোমার কুশলাদি লিখিয়া বাধিত করিবে। ইতি

দাস
বাবুরাম

# স্বামী তুরীয়ানন্দের অপ্রকাশিত পত্র

[ শ্রীনিকুঞ্জবিহারী মল্লিককে লিখিত ]

১

শ্রীহরিঃ
শরণম্

হৃষীকেশ
২১।১।০৬

শ্রীমান্ নিকুঞ্জলাল,

তোমার ১৭ই তারিখের পোঃ কাঃ প্রাপ্তে সমাচার অবগত হইলাম। তুমি কল্যাণানন্দ প্রভৃতির সহিত একত্রে আছ জানিয়া প্রীত হইয়াছি। সেবাকার্য্য বেশ নির্ব্বাহ হইতেছে জানিয়া স্বতঃই আনন্দের উদয় হইতেছে। আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র দয়াং কুর্ব্বন্তি সাধবঃ। দয়াই ধর্ম্মের মূল। বাক্‌চচ্চড়ি অনেকেই করিতে পারে। কায করা শক্ত। অবশ্য ঠিক ঠিক কায হওয়া দুষ্কর। নিষ্কাম কর্ম্ম প্রকৃত আত্মজ্ঞ ভিন্ন করিতে পারেন না। তবে সৎকর্ম্ম যতটা হয়ে ওঠে ততটাই মঙ্গল। তোমাদের শরীর সব ভাল আছে জানিয়া সুখী হইয়াছি। আমার শরীরও মন্দ নাই। এখানকার জলবায়ু অতীব মনোরম। শীত অসহ্য নহে, বরং প্রীতিপ্রদ। এখানকার অভাবনীয় পরিবর্ত্তন হইয়াছে। বড় ২ অট্টালিকা, মস্ত বাজার সুতরাং লোকজন বৃদ্ধি। বাড়ী কিঞ্চিৎ নির্জ্জন হইলেও ঘরবাড়ীর বাড়াবাড়ি সেখানেও সেঁধিয়েছে। তবে এখানকার বিমল ভাব ও শান্তি সেইরূপই অক্ষুণ্ণ আছে ও থাকিবে। এখানকার মোহন্তের গতকাল শরীরত্যাগ হইয়াছে। কলিকাতা সত্রের অধ্যক্ষ নাথজির প্রস্তাবে ও সাধারণসম্মতিক্রমে বাজারহাট কাজকর্ম্ম সব কালকার জন্য বন্ধ ছিল। সুতরাং বুঝিবে এখন আর ঋষিজনসেবিত হৃষীকেশ নয়। আর ২ সংবাদ মঙ্গল। আমার ভালবাসাদি সকলকে জানাইবে ও তুমিও জানিবে। ইতি—

শ্রীতুরীয়ানন্দ

২

শ্রীহরিঃ
শরণম্

মায়াবতী
২।৯।'০৫

প্রিয় নিকুঞ্জলাল,

তোমার ২১ আগষ্ট তারিখের পোষ্টকার্ড পাইয়া সমাচার অবগত হইয়াছি। তুমি একটু ভাল আছ ও পুনরায় নবীন উৎসাহে এবং প্রাচীন অভিজ্ঞতাসহায়ে শ্রীভগবদ্ভজনে মনঃসমাধান করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছ জানিয়া যে কি পর্য্যন্ত প্রীত হইয়াছি তাহা আর

কি জানাইব। মনুষ্যজীবনের বিশেষত্বই ভগবচ্চিন্তার অবসর এবং তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারিলেই ইহার সাফল্য। কারণ জীবনে অন্য যাহা কিছু ভোগসুখাদি তাহা মনুষ্যেতর যোনিতেও সুলভ। প্রভু তোমার মতি স্থির রাখিয়া আপন সেবায় নিযুক্ত রাখুন এই তাঁহার নিকট প্রার্থনা। আমার শরীর আজকাল অপেক্ষাকৃত ভাল তবে অনিদ্রা অবসাদ প্রভৃতি উপদ্রব যেন সঙ্গের সাথী হইয়াছে। শ্রীবৃন্দাবনের স্মরণে চিত্তে সমূহ আনন্দের উদয় হয়। ত্রিপুরাকুঞ্জের কামদারের দেহান্তসংবাদে অতিশয় দুঃখিত হইয়াছি। লোকটী বেশ সজ্জন ছিলেন। তথাকার সকল পরিচিতদিগকে আমার সম্ভাষণ শুভেচ্ছাদি দিবে। কৃষ্ণলাল এখনও কনখলেই আছে, চাতুর্ম্মাস্য উদ্‌যাপন করিয়া কলিকাতা যাইবে। তুমি আমার ভালবাসা ও শুভেচ্ছা জানিবে এবং মধ্যে ২ আপনার কুশল লিখিয়া সুখী করিবে। ইতি—

শ্রীতুরীয়ানন্দ

# স্বামী অখণ্ডানন্দের অপ্রকাশিত পত্র

ওঁ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ
শরণম্

২৮শে চৈত্র, ১৩৪০
Belur Math, P.O.
Dt. Howrah

শ্রীমান্ ধীরেন,

তোমার বিস্তারিত পত্র পাইলাম। কর্মফল অবশ্যই ভোগ করিতে হয়, তবে শ্রীভগবানের পাদপদ্মে শরণাগত হইয়া তাঁহার নাম করিলে অনেক কষ্টের হাত হইতে নিস্তার পাওয়া যায়। যাহা খারাপ বুঝিয়াছ তাহা আর করিতে যাইও না। দীক্ষা লওয়ার সময় তোমার এখনও হয় নাই। তোমার এখন জীবিকা-উপার্জনের পন্থা স্থির করা উচিত। ঋণমুক্ত হওয়ার ও নিজে রোজগার করিয়া গ্রাসাচ্ছাদনের ও পরিবার প্রতিপালন করার চেষ্টা আগে কর। তার পর পত্র লিখিও। এবং ইতিমধ্যে খুব নিয়ম করিয়া সকাল-সন্ধ্যা যেমন হিন্দুদের নিয়ম আছে, সেইরূপ ভগবানের যে নামটি ভাল লাগে তাহাই করিবে এবং তাঁহার নিকট সরলভাবে বালকের ন্যায় প্রার্থনা করিবে। ভগবান তোমার কল্যাণ করুন। কোন ভয় বা চিন্তা করিও না। তুমি তাঁহার শরণাগত হও, তিনি তোমাকে সব রকম অসুবিধা হইতে রক্ষা করিবেন। তুমি আমার আশীর্বাদ জানিবে। শ্রীশ্রীঠাকুরের সন্তানদের কথা সর্বদা চিন্তা করিবে। ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীঅখণ্ডানন্দ

# স্বামীজীর স্মৃতি*

## রীভস্ ক্যালকিনস্

[ অনুবাদক : স্বামী চেতনানন্দ ]

স্বামী বিবেকানন্দের সহিত আমার প্রথম সাক্ষাৎ মোটেই প্রীতিপ্রদ ছিল না। তিনি গিয়েছিলেন চিকাগো ধর্মমহাসভায় ভারতীয় প্রতিনিধি হিসাবে, আর আমি ছিলাম বিশ্ব-বিদ্যালয় হতে প্রত্যাগত নূতন ধর্মযাজক। খৃষ্টানদের ইতিহাস আলোড়নকারী চমকপ্রদ শক্তির জন্য এবং প্রাচ্যের নবতারকারূপে ঘোষিত হওয়ার দরুন তাঁর প্রতি আমার বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল না। আমি মনে করি তাঁর আভিজাত্যপূর্ণ চালচলনই আমার (আমেরিকার) গণতান্ত্রিক বোধটাকে আঘাত করেছিল। তিনি যে বিরাট ব্যক্তি এ বিষয়ে তিনি কোন তর্ক করতেন না এবং তিনি ইহা স্বীকার করতেন। সেই থেকে বহু বছর আমি তাঁর সম্বন্ধে কোন কিছুই শুনি নাই।

প্রাচীন ইতালীয় সড়কের 'রুবাটিনো' জাহাজে করে নেপল্‌স্ বন্দর থেকে ১৯০০ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে আমি ভারতে পৌঁছে-ছিলাম। ঘটনাক্রমে ভোজন-কক্ষের মধ্যবর্তী টেবিলের এক পার্শ্বে আমার নির্দিষ্ট স্থান ছিল এবং উহাই আমার গল্পের পাথেয়। মধ্য-প্রদেশের মিষ্টার ড্রেক ব্রুকম্যান, আই.সি.এস., ডান পাশের প্রথম আসনটি দখল করেছিলেন এবং অপর একজন ইংরেজ, যাঁর নাম আমার স্মৃতি থেকে বিদায় নিয়েছে, তাঁর উল্টোদিকে বসেছিলেন। সুয়েজ বন্দরে এসে ভোজন-কক্ষের টেবিলের রদবদল হল, কারণ কতিপয় যাত্রী জাহাজ থেকে নেমে গেলেন। লোহিতসাগরে আমাদের প্রথম ভোজনের আসর দেখল ভারতীয় আদবকায়দায় এক অদ্ভুত আগন্তুককে ; তিনি বসেছিলেন মিঃ ড্রেক ব্রুকম্যানের ঠিক পাশে। প্রথম ভোজনের আসরে তিনি নির্বাক ছিলেন এবং সকলের ভোজন শেষ হবার পূর্বেই একখানা বিস্কুট ও কিছু সোডাওয়াটার খেয়ে উঠে গিয়ে-ছিলেন। এই মহামান্য আগন্তুকের পরিচয় নিয়ে সেই জাহাজে প্রশ্নাবলীর ঝড় উঠেছিল এবং ইহা স্পষ্টই প্রমাণিত হয়েছিল যে, তিনি নিম্নস্তরের মানুষ নন। অপরদিকে একজন কর্কশভাষী উদ্ধত যাত্রী প্রধান পরিচারককে ডেকে ঘৃণিত সুস্বাদু মদের জন্য আদেশ করল। প্রকাশ্যে ঐ যাত্রীর মদ্য-সরবরাহের কার্ড দেখে তিনি তাঁহার সামনে টেবিলের উপর একখানা হাল্কা সোডাওয়াটারের স্লিপ রাখলেন। পেন্সিলে লেখা 'বিবেকানন্দ' নামাঙ্কিত স্লিপখানা পরিচারক আমার প্লেটের পাশ থেকে নিয়ে গেল। মুহূর্তের মধ্যে আমার মনে হল, এই কি সেই লোক—যিনি ধর্মমহাসভায় উচ্ছ্বসিত আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন?—কৌতূহলা-বিষ্ট হয়ে তাকিয়ে রইলাম সমুদ্রযাত্রার পরবর্তী দিনগুলির জন্য।

স্বামীজীর সেই প্রথম দর্শন আমার মনের উপর এখনও গভীর রেখাপাত করে রয়েছে ; সুতরাং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পরিচয়ের জন্য আমি চেষ্টা করিনি। প্রয়োজনীয় বস্তু সরবরাহের জন্য পরিচারক সর্বদা টেবিলের কাছে থাকত।

---

* Prabuddha Bharata পত্রিকার ১৯২৩ খৃঃ মার্চ সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধ হইতে অনূদিত।

একজন যাত্রী বিবেকানন্দের নাম উচ্চারণ করাতে আমি কান পেতে শুনেছিলাম ; তিনি বলছিলেন যে, "আমরা তাঁর সহিত পরিচয় করব।" আমি মনে করি যে, আমার সমজাতীয় জীবনের জন্য তাঁর প্রতি আমি আকৃষ্ট হয়েছিলাম এবং সম্ভবতঃ তিনি মনে মনে আমার অব্যক্ত বন্ধুত্বের পরিচয় পেয়েছিলেন এবং ধরতে গেলে সঙ্গে সঙ্গেই তিনি আমাকে খুঁজে বের করেছিলেন।

"আপনি একজন আমেরিকাবাসী ?"

"হ্যাঁ।"

"মিশনারী নিশ্চয়ই ?"

"হ্যাঁ।"

"আপনি কেন আমাদের দেশে ধর্মশিক্ষা দিতে যাচ্ছেন ?" তিনি দৃঢভাবে বললেন।

"আপনি কেন আমাদের দেশে ধর্মপ্রচার করছেন ?" আমি প্রত্যুত্তর করলাম।

তাঁর বিশালায়তন চক্ষের সামান্য একটু ভ্রূকুটি আমাদের সমস্ত বাধা ও যুক্তিতর্ক উড়িয়ে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। যাই হোক, আমরা জোরে হেসে উঠলাম এবং পরস্পরের বন্ধু হয়ে গেলাম।

দুই-এক দিনের জন্য কতিপয় যাত্রী তাঁকে খাবার টেবিলে যুক্তিতর্কের মধ্যে টেনে আনতে অগ্রসর হয়েছিল, কিন্তু তিনি উহা অস্বীকার করেছিলেন। তাঁর উত্তরগুলি ছিল ক্ষিপ্র এবং যথেষ্ট সমাধানপূর্ণ ; কিন্তু তাঁর চেয়েও বড় কথা, সেগুলি ছিল প্রতিভাপূর্ণ। ঐ উত্তরগুলি ছিল যেমন সংক্ষিপ্ত তেমনি শাণিত ; যোগ্য উদ্ধৃতির সংযোগে ঐগুলি ঝলমল করে উঠত। সেই সময় একমাত্র ড্রেক ব্রুকম্যান ছাড়া সকল অল্পবুদ্ধি-বিশিষ্ট যাত্রীর তর্কবাণ তাঁর সামনে নিরস্ত হয়ে পড়ত। ব্রুকম্যানের তীক্ষ্ণ বিচারশীল মন বিবেকানন্দের শাণিত উত্তরগুলিকে ক্রমাগত কেটে ফেলার এবং তাঁর তর্করাশিকে স্বীকৃত সত্যের মাধ্যমে বন্ধ করে দেওয়ার উপক্রম করে তুলত। এতে স্বামীজী একটু দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে হয়ে পড়তেন। বাকী যাত্রীরা শীঘ্রই উৎসাহ হারিয়ে ফেলত এবং আমাদের ছোট দলটিকে ভোজন-সমাপ্তির পরেও আবার বাধাহীন সভা, প্রাতরাশ এবং ভোজন চালিয়ে যেতে অনুমোদন করত।

একদিন রাত্রে আমি একটি নূতন জিনিস আবিষ্কার করলাম। প্রকৃতপক্ষে স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন একজন বিরাট প্রতিভাবান পুরুষ। তাঁর বাচনভঙ্গী ছিল খরস্রোতা গঙ্গার বাধাহীন ধারার মত। হয়তো কোন প্রশ্ন তাঁকে সাময়িকভাবে বাধা দিতে চেষ্টা করত, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই তিনি তীব্র ওজস্বিনী ভাষার দ্বারা তা সরিয়ে দিয়ে তাঁর মূল বক্তব্যকে এগিয়ে নিয়ে যেতেন। কোন একদিন একটি বিশেষ বক্তৃতা শেষ হ'লে তিনি সকলের প্রতি অভিবাদন করে শান্তভাবে ভোজনকক্ষ থেকে বেরিয়ে গেলেন। তারপর মিঃ ব্রুকম্যানের উল্টোদিকে উপবিষ্ট ইংরেজ ভদ্রলোকটি টেবিলের দিকে ঝুঁকে বললেন, "আপনি কি লক্ষ্য করেছেন যে, ভারতীয় ভদ্রলোকটি যখন বাধা পেয়েছিলেন তখন তিনি যেখানে থেমেছিলেন সেখান থেকেই আবার বলতে শুরু করলেন ?"

"হ্যাঁ, আমরা দুজনেই তা লক্ষ্য করেছি।"

"তিনি আমাদের ব্যক্তিগত উপকারের জন্য তাঁর একটি হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা বলে গেলেন।"

এইরূপ নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনাগুলি ছিল আমাদের কাছে চমকপ্রদ অনুষ্ঠান ; এবং এমনকি জাহাজের ডেকের উপরকার সাধারণ ঠাট্টা-তামাসাগুলিও নির্মল আনন্দের ফোয়ারা ছোটাত।

দার্শনিক অপেক্ষা বিবেকানন্দ স্বদেশ-প্রেমিকই বেশী ছিলেন। আমি মনে করি তাঁর বেদান্তপ্রচারের মূলে ছিল তাঁর এই স্বদেশপ্রেম এবং তাঁরও মনে হয়েছিল যে, ইহাই ভারতের জাতীয়তাকে বাঁচাবার একমাত্র নিশ্চিত পথ। আমার বিশ্বাস এ ব্যাপারে তিনি ভুল করেছেন[১]। তাঁর স্বদেশপ্রেমিকত্ব আমার সেই প্রথম অসুখকর স্মৃতিকে সরিয়ে দিয়েছিল এবং আমি মনে করি তিনি তাঁর স্বদেশবাসিগণের কাছে গৌরবের সঙ্গে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন একজন প্রাচীন ধর্মমতের প্রচারক হিসাবে নয়, তবে একজন মহান দেশপ্রেমিক হিসাবে।

একদিন তাঁর তীব্র স্বদেশানুরাগ 'ক্রিশ্চিয়ান মিশনের' মূল উদ্দেশ্য ভুল বোঝার দরুন এক বিপর্যয় এনেছিল। এক সন্ধ্যায় বাদাম-কফির আসরে ভারতের স্বায়ত্তশাসনের প্রস্তুতির দিকে আলোচনার মোড ঘুরে গেল। (প্রসঙ্গক্রমে এই আলোচনাটি ঘটেছিল বাইশ বছর আগে, যখন মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড সংস্কার বিল ছিল বহু দূরের এক কুহেলিকার আড়ালে।)

স্বামী বিবেকানন্দ হঠাৎ রেগে গেলেন—"ইংলণ্ড আমাদের সুন্দর সরকার গঠনের কৌশল শিক্ষা দিক কারণ এক্ষেত্রে বৃটেন সকল জাতির ভিতর শ্রেষ্ঠ।" তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন, "আমেরিকা আমাদের কৃষি, বিজ্ঞান এবং কোন নূতন জিনিস প্রস্তুত করবার অদ্ভুত কলা শিক্ষা দিক; এক্ষেত্রে আমরা তোমাদের নীচে বসব—কিন্তু" এবং বিবেকানন্দের সেই সুমধুর কণ্ঠস্বর হঠাৎ কঠিন ও তীব্রতর হয়ে উঠল—"পৃথিবীর অন্য কোন জাতি যেন ভারতকে ধর্ম শেখাবার স্পর্ধা না রাখে; কারণ এ ব্যাপারে ভারত জগৎকে শিক্ষা দেবে।"

সেই রাত্রে ডেকে পাদচারণা করতে করতে আমরা গভীর তত্ত্বালোচনায় ডুবে গিয়েছিলাম—সেখানে কোন বৃটেনবাসী, আমেরিকান বা ভারতীয় কেউ-ই ছিল না; সেখানে ছিল আমাদের বুভুক্ষু মানবিক প্রাণ এবং সেই এক মানবসন্তান যাঁর উৎসর্গীকৃত রক্ত এখনও পড়ে রয়েছে এশিয়ার কোন একটি উডন্ত বালুকণার উপর। এখনও আমার স্মৃতিপটে ভেসে আসছে যে, আমি স্বামীজীকে বোঝাতে চেষ্টা করেছিলাম যে, তাঁর ধারণামত কোন মিশনারী ভারতে ধর্মপ্রচার করতে চেষ্টা করছে না, বরং সেই মহামানবকে জানতে এবং ভালবাসতে ভারতকে সাহায্য করছে।

আমাদের যাত্রার শেষ দু-একদিন আমাদের পারস্পরিক বোঝাপডা খুব জমে উঠেছিল এবং আমি বিশ্বাস করি যে, আমাদের পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও ভালবাসা ঘনীভূত হয়ে উঠেছিল।

---

১ ভগিনী নিবেদিতার মতে স্বামীজীর বেদান্তপ্রচার দুইটি উদ্দেশ্য সফল করেছে—'একটি জগৎ-আলোড়নকারী এবং অপরটি জাতিগঠনকারী'। ভারতের ব্যাপারে স্বামীজীর এই আন্দোলন তাঁহার নিজের কথায় প্রকাশ করা যেতে পারে: 'হিন্দুধর্মের সাধারণ ভিত্তিগুলির একতা প্রদর্শন ও তাহাদের জাতীয়তাবোধকে জাগ্রত করা'। পাশ্চাত্যে ভারতের আধ্যাত্মিক বাণী বহনের মূল উদ্দেশ্য তিনি নিম্নলিখিত কথাগুলির মাধ্যমে প্রাঞ্জলভাবে বর্ণনা করে গেছেন, "এ দান-প্রদানই প্রকৃতির নিয়ম। কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায় বা জাতি যদি ঐ নিয়ম না মানে তবে তারা জীবনে কখনই উন্নতি লাভ করতে পারবে না, আমরা নিশ্চিতই ঐ নীতির অনুসরণ করব এবং ঐ জন্যই আমি আমেরিকায় গিয়েছিলাম '…তারা দীর্ঘদিন যাবৎ তোমাদের দিয়ে আসছে ওঁদের অতুলনীয় ধন-সম্পদ আর বর্তমানে উহার বিনিময়ে তোমাদের অমূল্য সম্পদ দেবার সময় এসেছে। এবং তোমরা দেখবে কত শীঘ্র বিশ্বাস, ভালবাসা ও শ্রদ্ধার দ্বারা পরস্পরের প্রতি ঘৃণিত বিদ্বেষভাব বিদূরিত হচ্ছে এবং কত সুন্দরভাবে তারা এগিয়ে আসছে বিনা জিজ্ঞাসায় তোমাদের কল্যাণের জন্য।" ভারতে এবং ভারতেতর দেশে স্বামীজীর এই অদ্ভুত 'সমর-নীতি' সফলতা লাভ করেছে তাঁর অক্লান্ত শ্রমের বিনিময়ে।"

—EDITOR

বিবেকানন্দের রহস্যবাদ ছিল আবেগময় ও মুগ্ধকর, কারণ উহা অস্বাভাবিক ছিল না। আত্মার রহস্যময় গূঢ় বিষয়গুলি নিয়ে যখন আমাদের স্বতঃস্ফূর্তভাবে আলাপ-আলোচনা চলত, তখন তাঁর সেই বিরাট অক্ষিগোলক দুটি আস্তে আস্তে বুজে আসত; এমনকি আমার সামনে তিনি বিচরণ করতেন কোন এক অজ্ঞেয় রাজ্যে, যেখানে আমি ছিলাম অনিমন্ত্রিত। এইরূপ কোন এক সময়ে আমি মন্তব্য করেছিলাম যে, সেই অতিমানবের সঙ্গে একত্ববোধ সম্বন্ধে ক্রীশ্চিয়ানদের সতর্ক ও জাগ্রত থাকা উচিত (যেমন ব্যক্তিগত একত্ব থাকে); সুতরাং হিন্দুদের সেই সর্বব্যাপী ব্রহ্মে লীন হওয়ার সঙ্গে এখানে মূলতঃ একটা পার্থক্য রয়ে গেছে। এ কথা শোনামাত্র তিনি ঝটিতি আমার দিকে একবার তীক্ষ্ণ অনুসন্ধান-দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন, কিন্তু কোন উত্তর দিলেন না।

বোম্বেতে 'রুবাটিনো' জাহাজ ভিড়বার পূর্বরাত্রে আমরা ডেকের সামনের দিকে দাঁড়িয়ে ছিলাম। বিবেকানন্দ একটা ছোট সুন্দর পাইপ-এ ধূমপান করছিলেন এবং বেশ একটু আমোদ সহকারে বললেন যে, 'ইংরেজদের এই বদভ্যাসটা' তিনি পছন্দ করেন। মহানিশার সেই তরঙ্গায়িত সমুদ্র আর আগামী দিনের এক অজানা জীবনের ভাবনা এনে দিয়েছিল এক চরম নিস্তব্ধতা। বহু সময় ধরে একটা গাঢ় মৌনতা আমাদের মধ্যে বিরাজ করছিল। তখন তাঁর মন কোন এক অতীন্দ্রিয় রাজ্যে বিচরণ করতে লাগল এবং তিনি বুঝলেন যে, আমার দ্বারা ভারতের কোন ক্ষতি হবে না। তারপর তিনি খুব সৌহার্দের সহিত আমার কাঁধে তাঁর হাতখানা রাখলেন।

"মহাশয়", তিনি বললেন, "তারা তাদের বুদ্ধ, কৃষ্ণ এবং ক্রাইস্টের বিষয় অনেক কিছু বলতে পারে, কিন্তু আমরা জানি, বিশেষতঃ আপনি ও আমি, যে আমরা সেই সর্বাত্মক একের অংশ।"

সেই বন্ধুত্বব্যঞ্জক হাতখানি আমার কাঁধেই রইলো; আমার মনে একবারও জাগলো না যে, নির্দয়ভাবে সরিয়ে ফেলি। তারপর তিনি নিজেই হাতখানি তুলে নিলেন; আর সেই বন্ধুত্বের বিনিময়ে আমিও তাঁর দিকে আমার হাত বাড়িয়ে দিলাম।

আমি বললাম, "স্বামীজী, আপনি আপনার নিজের সম্বন্ধে যা কিছু বলুন, আমাকে টানবেন না। আপনি যে সর্বাত্মক একত্বের কথা বললেন, তা নৈর্ব্যক্তিক এবং সেইহেতু তা অজ্ঞেয়। এই মহাসাগরের বুকে ডুবন্ত জাহাজের মত যদিও আমরা সেই একত্বে ডুবে রয়েছি তথাপি তা সেই অজানার রাজ্যে। কিন্তু স্বামীজী, আমি যাঁকে জানি, যাঁকে আমি প্রাণাধিক ভালবাসি—তিনি একজন স্বতন্ত্র পুরুষ এবং অত্যন্ত বাস্তব, এবং তাঁর ভিতর সেই সর্বাত্মক পূর্ণত্ব বিরাজ করছে।"

সেই মিষ্ট পাইপটি দ্রুত তাঁর ঠোঁট থেকে সরে গেল। তিনি একটি রেলিং-এ হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন আর তাঁর সেই নিমীলিত অক্ষিগোলক দুটি ইঙ্গিত করছিল যে, বিবেকানন্দ চলে গেছে দূরে, বহু দূরে কোন এক বস্তুর অন্বেষণে। এ কি সেই সর্বাত্মক একত্ব অথবা বহুত্বে একত্ব—যা স্বামীজী সেই তমিস্রা-রজনীতে খুঁজেছিলেন?

# অস্তিত্বের সীমা

অধ্যাপক দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ.

যে ছিল একদিন প্রাণের চেয়েও প্রিয়, আত্মার সঞ্জীবনী-সুধা—যার হাসি, কথা, উদ্বেলিত প্রাণবন্যা জীবনকে রাখত সচল করে, হঠাৎ একদিন নির্মম মৃত্যু এসে তাকে কোথায় নিয়ে চলে যায়। পশ্চাতে পড়ে থাকে শুধু স্মৃতি। প্রিয়বিরহী মানুষ সে স্মৃতিকে অমর করে ধরে রাখতে চায় সাহিত্যে, শিল্পে, স্মৃতিসৌধে। একদিকে প্রিয়জনের স্মৃতিরক্ষার অক্লান্ত প্রয়াস, আর একদিকে জীবনের তাড়নায় নিত্য নতুন কর্মের জগতে ভেসে চলা। একদিকে পিছনের টান, আর একদিকে সামনের দিকে দুর্নিবার গতি। আকর্ষণ ও বিকর্ষণে জীবন হয়ে ওঠে সংঘাতমুখর। এ টানাপোড়েনে স্মৃতির জগৎও একদিন ম্লান হয়ে যায়। একমাত্র সত্য হয়ে ওঠে অবিরাম অবিশ্রাম কর্মের স্রোতে নিত্য আবর্তিত হওয়া। জীবনের কর্তব্যকঠোর রথচক্র চলে ঘর্ঘর রবে। মাড়িয়ে দিয়ে যায়, গুঁড়িয়ে দিয়ে যায় জীবনের যত কিছু প্রিয় বস্তু। জীবনের দাবী, সংসারের দাবীর শেষ নেই। তোমার গোপনতম অনুভূতির জগৎ বিবর্ণ হয়ে উঠুক, বিদীর্ণ হোক্ - তাতেও ক্ষতি নেই। তবু দিয়ে যেতে হবে। সমাজ সংসারের অফুরন্ত চাহিদা পূরণ করে যেতে হবে তোমাকে।

জীবন-পরিবেশের প্রবল নিষ্পেষণে চিত্ত যখন উদ্‌ভ্রান্ত, অদৃশ্য সুদূর লোক থেকে প্রিয়-স্মৃতির স্বর্ণরশ্মি এসে পড়ে দিশেহারা সে চিত্তের ওপর। সে স্মৃতির স্নিগ্ধ আলোকে উদ্‌ভাসিত হয়ে ওঠে চিত্তদেশ। অন্তরের পুঞ্জীভূত বিক্ষোভ কিছুকালের জন্য হলেও স্তব্ধ হয়ে যায়। অদৃশ্য স্মৃতিলোকে অবস্থিত প্রিয়জন যেন সজীব হয়ে পথ দেখায়—'ভয় নেই, ভয় নেই, যাত্রী।' আমি মরিনি, আমার মৃত্যু নেই। হতাশা-গ্লানি-অন্ধকারাচ্ছন্ন জীবনপথে আলোক বিকীর্ণ করে সত্যপথের নির্দেশ দেবার জন্যে আমি এখনও বেঁচে আছি। সংসারের ভ্রূকুটি-কুটিল রূপ দেখে তুমি ভয় পেও না। ওটা মায়া। লক্ষ্যে স্থিরদৃষ্টি রেখে জীবনপথে এগিয়ে চলো। জীবনের ধ্রুবতারাই তোমাকে পথ দেখাবে। বিশ্বহিতে জীবন উৎসর্গ করো। তবেই তোমার জীবনে আসবে পরম সার্থকতা।

অদৃশ্য জগৎ থেকে এ পরম আশ্বাসের বাণী জীবনযন্ত্রণাপীড়িত মানুষকে জাগিয়ে তোলে নবতর কর্মের পথে। আত্মকেন্দ্রিক চিন্তার জগৎ উত্তীর্ণ হয়ে সবলে সে প্রবেশ করে বৃহত্তর চেতনার জগতে। মনের দৃষ্টি তার খুলে যায়। নিজের যন্ত্রণার কথা ভুলে জগতের যন্ত্রণাজর্জর মানুষের দুঃখবেদনা দূর করবার মহত্তর প্রয়াসে আত্মনিয়োগ করে সে। সংকীর্ণপরিধিমুক্ত হয়ে বহুব্যাপ্ত জীবন অভিনব সার্থকতায় ভরে ওঠে। জীবনের নতুন অর্থ খুঁজে পায় সে! বাধাবন্ধনজয়ী ক্ষয়হীন সে মহাজীবন আকর্ষণ করে তাকে সর্বকলুষমুক্ত আনন্দময় অমৃতময় জীবনের অভিমুখে।

জগতের আনন্দ- ও অমৃতযজ্ঞে মানুষের এ আমন্ত্রণ ব্যর্থ হয়নি। আত্মস্বার্থবিস্মৃত মানুষ

যুগে যুগে যন্ত্রণাজর্জর বৃহত্তর মানবসমাজের দুঃখনিবারণের জন্য কত নিত্য নতুন পন্থা উদ্ভাবন করেছে, তার সীমা নেই। দর্শনে বিজ্ঞানে সাহিত্যে শিল্পে সে যন্ত্রণা মুক্তির পথনির্দেশ। শুধুমাত্র পথনির্দেশ দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি পরহিতে সমর্পিতপ্রাণ বৃহৎ চেতনাময় মানুষ। আশা দিয়ে সহানুভূতিপূর্ণ ভাষা দিয়ে, সক্রিয় সুপরিকল্পিত কর্মপন্থা গ্রহণ করে দুঃখক্লিষ্ট মানুষের দুঃখনিবারণকার্যে এগিয়ে গেছে বারবার। কোন ধন্যবাদ বা পুরস্কারের আশা সে করেনি। শুধুমাত্র বৃহত্তব অস্তিত্বের জগতের প্রেরণাই তাকে দুর্নিবার বেগে আকর্ষণ করেছে অন্তহীন কর্মযজ্ঞে।

সে বৃহৎ অস্তিত্বের জগৎ প্রিয়স্মৃতির জগৎ। মৃত্যুর সর্ববিধ্বংসী আঘাত সে জগতের সজীবতাকে ম্লান করতে পারে না। স্থূল দেহ নিয়ে প্রিয়জন হয়ত একদিন আমাদের চোখের সুমুখ থেকে অদৃশ্য হয়ে যায়, কিন্তু স্মৃতির জগতে অশরীরী দেহে তার অবস্থান সজীব। সে-জগৎকে কেউ বলেছেন আত্মার জগৎ, আবার কেউ বলেন পরলোক। প্রিয়স্মৃতি সে বৃহৎ চেতনা-লোকে সক্রিয় থেকে মানুষকে নিত্যনিয়ত ঠেলে নিয়ে চলেছে কর্ম থেকে কর্মান্তরে, স্বার্থমগ্ন আত্মকেন্দ্রিক জীবনচেতনা থেকে সর্বস্বার্থমুক্ত উদার-প্রসার জীবনালোকে। এই প্রসারিত জীবনচেতনা আছে বলেই মানুষ এত হিংসা-দ্বন্দ্ব-হানাহানির মধ্যে বাস করেও একেবারে পশুত্বের পর্যায়ে নেমে যায়নি। বৃহত্তর অস্তিত্বের জগতে আত্মার জ্যোতির্ময় আলো এখনও তাকে জীবনের নিকষকালো অন্ধকারে পথ দেখায়, আকর্ষণ করে হিংসামুক্ত-প্রেম-সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ আদর্শায়িত জীবনের দিকে।

সুতরাং মানুষের অস্তিত্বের জগৎ এই স্থূল জীবনালোকেই সীমাবদ্ধ এ-কথা বলি কী করে? আত্মকেন্দ্রিক ভোগলিপ্ত মানুষই প্রচার করেছে সে সঙ্কীর্ণ অস্তিত্বের জগতের কথা যা সংখ্যাতীত প্রিয়বিরহী মানুষকে নিক্ষেপ করেছে নৈরাশ্যের মরু-প্রান্তরে। বস্তুতঃপক্ষে মানুষের চেতনার জগৎ যেমন কোন সীমার বন্ধন স্বীকার করে না, তেমনি অস্তিত্বের জগৎ-ও সীমাহীন। অনন্ত কাল- এবং দেশ-বিধৃত এ জীবনলোক সভ্যতার আলোকিত যুগ থেকে আকর্ষণ করে আসছে তত্ত্বজিজ্ঞাসু দার্শনিক, জীবনসন্ধানী কবি, এমন কি বস্তুলোকবিহারী বৈজ্ঞানিকের মনকেও। কত বিচিত্র কাব্যকাহিনী, জটিল দার্শনিক তত্ত্ব বিকাশ লাভ করেছে সে বিপুল অস্তিত্বের জগৎকে কেন্দ্র করে, শিল্প- ও সঙ্গীত-জগৎ ঐশ্বর্যময় এবং মাধুর্যমণ্ডিত হয়েছে এ প্রসারিত জগৎ চেতনার স্পর্শে :

শুধু তোমার বাণী নয় গো হে বন্ধু, হে প্রিয়,
মাঝে মাঝে প্রাণে তোমার পরশখানি দিও।

অদৃশ্য অস্তিত্বলোকবিহারী প্রিয়জনের স্পর্শ-লাভের জন্য কবি-অন্তরের এ ব্যাকুল ক্রন্দন শ্রোতার মনকে স্থূল জীবন-পরিবেশ থেকে মুক্তি দিয়ে উত্তীর্ণ করে দেয় অনুভূতিগ্রাহ্য ভাবলোকে। সে ভাবলোক বস্তুর চাইতেও বাস্তব, জীবনের মর্মমূলে তার অধিষ্ঠান। কবির সমস্ত চেতনাকে আলোড়িত করে উৎসারিত হয়েছে এ জীবন-সঙ্গীত—সজীব স্মৃতির সুরভিত জগতে যার সার্থক উত্তরণ।

# অসীম করুণাময়

শ্রীশান্তশীল দাশ

তোমার করুণা বারে বারে পাই অসীম করুণাময়,
যখনি আঁধার, যখনি বেদনা, জীবনের সংশয়,
তখনি তোমার বরাভয় নামে, প্রসন্ন দীপালোক
ঘোচায় পথের সকল আঁধার, মোছায় দুঃখ শোক।

সে-আলোক তুমি পাঠাও কখনো বন্ধুর হাত ধরে,
কখনো সে আসে কিশোরের হাতে, কত না নিষ্ঠাভরে।
দেখায় সে আলো, পাই খুঁজে পথ, ঘোচে কালো নিরাশার,
কখনো সে আলো, রমণীর হাতে, জননীর রূপ তার।

দেখে কেটে যায় সব সংশয়, পাই তার পরশন,
সে যে কী গভীর স্নেহের প্রেমের, ভরে ওঠে দু'নয়ন!
বারে বারে মাথা নোয়াই স্মরণ ক'রে সেই রূপ তার;
দিয়েছ তোমার অকৃপণ দান, অহেতু কৃপা তোমার।

মনে মনে ভাবি, তোমার করুণা কী অসীম, কী সুলভ!
যে ডাকে তোমায় বারেক, তাকেই দাও সেই বৈভব।
সদা জাগ্রত সবার শিয়রে, দুটি কল্যাণ করে
মোছাও বেদনা ব্যথিতের, সব গ্লানিভার নাও হ'রে।

চিরসুন্দর হে করুণাময়, আর কোন দ্বিধা নয়,
মহাসম্পদ তোমার চরণ হোক চির আশ্রয়।

## সমালোচনা

**স্বামী অভেদানন্দের বিজ্ঞান-দৃষ্টি:** লেখক ডঃ অমিয়কুমার মজুমদার; প্রকাশক: রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, ১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, পৃঃ-২১৭, মূল্য: আট টাকা।

গ্রন্থখানি পড়িয়া বেশ ভাল লাগিল। এ-জাতীয় সাহিত্য-সৃষ্টির জন্য লেখক পাঠকমহলে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের স্বামী প্রজ্ঞানানন্দজীব অনুপ্রেরণায় লেখক বর্তমান কার্যে ব্রতী। স্বামী বিবেকানন্দের উত্তরসূরী হিসাবে স্বামী অভেদানন্দ দার্শনিক মতবাদগুলিকে কিভাবে বৈজ্ঞানিক মেজাজের কষ্টিপাথরে পরখ করিয়া লইতেন এবং অভেদানন্দমানসে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব কিভাবে প্রস্ফুটিত হইয়াছে লেখক তাহা ত্রয়োদশটি পর্বে বিশ্লেষণ করিয়াছেন।

স্বামী অভেদানন্দের বিজ্ঞান-চেতনার সূচনা তিনি দেখাইয়াছেন শৈশবের গাণিতিক পারদর্শিতায়, কৈশোরের অনুসন্ধিৎসাবৃত্তিতে ও যৌবনের মহা জিজ্ঞাসায়। পরবর্তীকালে সংস্কৃত সাহিত্যে বা শাস্ত্র-অধ্যয়নেও যে তর্ক-বিচার-প্রসূত বৈজ্ঞানিক ধর্মযুক্ত মনই তাঁহাকে পরম বৈদান্তিকে পরিণত করে এবং তাঁহার বেদান্তমত যে আধুনিক বিজ্ঞানের অবিরোধী, বরং কোনও কোনও ক্ষেত্রে আরও অগ্রসর, তাহাও লেখক বহু উদাহরণ সহকারে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। অভেদানন্দের ভাষায়, বিজ্ঞান বিশ্বের চিরন্তন সত্যকে আবিষ্কার করিতে প্রচেষ্টিত আর ধর্ম সেই চিরন্তন সত্যকে উপাসনা করার কাজে প্রবৃত্ত; আধুনিক বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তসমূহের সহিত যাহার মিল নাই, সে সমস্তই আমাদের দূরে ঠেলিয়া দিতে হইবে; বেদান্ত যে শুধু বিভিন্ন ধর্মমতের সমন্বয় করিবে তাহা নহে, বিংশ শতাব্দীর যাহা সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়—ধর্ম ও বিজ্ঞানের সামঞ্জস্য-সাধনও করিবে।

অধ্যাত্ম-বিদ্যার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে লেখক স্বামীজীর প্রাণায়ামতত্ত্বের বিশদ আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন কিভাবে স্বামী অভেদানন্দজীর মতে অখণ্ড প্রাণশক্তির কম্পন হইতেই ইলেকট্রন বা বস্তুকণার উৎপত্তি; সমগ্র জগৎ এই শক্তির বিকাশ, তন্ত্রে ইহাকে আদ্যাশক্তি বলে, বিজ্ঞান বলে energy। যোগশাস্ত্রের সুষুম্নার স্বরূপ জানিবার জন্য স্বামী অভেদানন্দ শবব্যবচ্ছেদ ক্লাসেও যোগ দিয়াছিলেন। ইহার ফলেই তিনি শরীর-বিজ্ঞানীদের জড়ের বাহিরে প্রাণশক্তির অন্বেষণের পরামর্শ দিতে পারিয়াছিলেন।

স্বামী অভেদানন্দজী ক্রমবিবর্তনবাদকে পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করিয়াও সৃষ্টিতত্ত্বের রহস্য-উদ্‌ঘাটনে সাংখ্যীয় ব্রহ্মাণ্ডতত্ত্ব-মতে বৈজ্ঞানিককে দেশকালের গণ্ডী অতিক্রম করিতে যেভাবে নির্দেশ দিয়াছিলেন, সে বিষয়েও লেখক আলোচনা করিয়াছেন।

পুনর্জন্মবাদ-প্রসঙ্গে স্বামী অভেদানন্দজীর অভিমত এই যে, মাধ্যাকর্ষণের ন্যায় অদৃশ্য শক্তি যখন বিজ্ঞানীর গ্রহণযোগ্য, তখন সূক্ষ্ম-কারণরূপ বীজের অস্তিত্বই বা কেননা বিজ্ঞান-সম্মত হইবে? কিভাবেই বা তাঁহার বিজ্ঞানী মন প্রেততত্ত্বের নানা গবেষণায় প্রবৃত্ত হয় ও 'Life Beyond Death'-গ্রন্থের অবতারণা করে,

বর্তমান পুস্তকে তাহাও বিশদভাবে আলোচিত।

মনোবিজ্ঞানীদেরও তিনি যে জড়বুদ্ধির সমস্ত স্তর ভেদ করিয়া তদূর্ধ্বে যাইতে বলেন, নচেৎ সহজাত বুদ্ধি, চিত্তবৃত্তি প্রভৃতির উৎস কোথায় তাহা বুঝা যায় না; এ কথাও লেখক বর্ণনা করিয়াছেন।

লেখক আরও দেখাইয়াছেন, প্রাচীন ইতিহাসের পর্যালোচনার দ্বারা স্বামী অভেদানন্দজী যেভাবে বিদেশে ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থার গুণ বিশ্লেষণ করিতেন তাহা তাঁহার বিজ্ঞানী মনেরই পরিচায়ক।

জ্যোতির্বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে স্বামী অভেদানন্দজীর আগ্রহ ও অন্যকে সে বিষয়ে জ্ঞান-পরিবেষণে দক্ষতা ও ফলিত বিজ্ঞান হইতে বিভিন্ন উপমা সংগ্রহ-প্রসঙ্গে লেখকের তথ্য-নিবেদন তাঁহার মূল বক্তব্যের সহায়ক।

ভারতীয় ধর্মতত্ত্ব ও সন্ন্যাস যে আধুনিক বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীর পরিপন্থী নয়, বরং প্রগতিশীল চিন্তাধারার সহায়ক, বিভেদ নয় সমন্বয়ই যে তাহাদের বাণী, সেকথা আলোচ্য গ্রন্থে পরিস্ফুট। তবে, এ-জাতীয় আলোচনা-গ্রন্থে বক্তব্য অল্প কথায় প্রকাশ করিলে উদ্দেশ্য অধিকতর সফল হয়। আমরা আলোচ্য গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি।

—ডঃ শশাঙ্কভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

**যুগজ্যোতি:** শ্রীলাবণ্যকুমার চক্রবর্তী। জ্ঞানদা সাহিত্য প্রতিষ্ঠান। ২৫, মনোহরপুকুর সেকেণ্ড লেন, কলিকাতা-২৯; পৃষ্ঠা ৯৬; মূল্য: আড়াই টাকা।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও স্বামী বিবেকানন্দের প্রত্যক্ষ কৃপাধন্য ভক্তসংখ্যা আজ একান্ত বিরল। সৌভাগ্যবশতঃ শ্রীমা সারদাদেবীর সাধু ও গৃহী ভক্তদের দর্শন আজও মেলে এবং তাঁদের পুণ্যস্মৃতি বিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তের পথিকদের কাছে অমৃততুল্য আস্বাদ বহন করে আনে। শ্রীলাবণ্যকুমার চক্রবর্তী তেমনি একজন আশীর্বাদধন্য ভক্ত, যাঁর রচনাভঙ্গীতে অধ্যাত্মপ্রেরণার সরল তন্ময়তাটুকু পাঠকচিত্তকে নিবিষ্ট করে।

শ্রীশ্রীমায়ের কথা ছাড়াও স্বামী সারদানন্দজী, মহাপুরুষ মহারাজ এবং স্বামী অখণ্ডানন্দজীর পুণ্যস্মৃতিও এ গ্রন্থে সংযোজিত। সমগ্র গ্রন্থটি শ্রীরামকৃষ্ণ-পরিমণ্ডলের স্নিগ্ধ সুবাসে পরিপূর্ণ।

তবে নিপুণতর সম্পাদনা এবং বানান-ভুলের আতিশয্য-পরিহার এ-জাতীয় গ্রন্থে অবশ্যকর্তব্য। প্রচ্ছদ ও কাগজ দুই-ই রুচিপূর্ণ এবং মূল্যবান। স্বল্পায়তনে শ্রীশ্রীমায়ের একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনা-লিখনে লেখক স্থায়ী কীর্তি অর্জন করবেন।

—প্রণবরঞ্জন ঘোষ

# শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

## শ্রীশ্রীমায়ের জন্মোৎসব

**বেলুড় মঠ ঃ** গত ১৬ই পৌষ (৩১.১২ ৬৯) বুধবার পুণ্য কৃষ্ণাসপ্তমীতে পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী সারদাদেবীর ১১৭তম শুভ-জন্মতিথি উপলক্ষে বেলুড় মঠে সারাদিন ধরিয়া আনন্দোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

প্রত্যূষে শ্রীশ্রীমায়ের মন্দিরে মঙ্গলারতি এবং বেদপাঠ দ্বারা উৎসবের শুভারম্ভ হয়। তৎপরে ভজন, বিশেষ পূজা, হোমাদি ও শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ হইয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দিরেও বিশেষ পূজাদি অনুষ্ঠিত হয়। নাটমন্দিরে বেলা ৯টা হইতে ১০টা 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা' পাঠ এবং বেলা ১০টা হইতে ১২টা কালীকীর্তন হইয়াছিল।

অপরাহ্ণে মঠপ্রাঙ্গণে আয়োজিত জনসভায় স্বামী চিদাত্মানন্দ সভাপতিত্ব করেন। স্বামী বীতশোকানন্দ, স্বামী নিরাময়ানন্দ এবং সভাপতি মহারাজ শ্রীশ্রীমায়ের পুণ্যজীবন ও বাণী অবলম্বনে সুচিন্তিত ও সময়োপযোগী ভাষণ দেন।

সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুরের মন্দিরে আরতির পর শ্রীশ্রীমায়ের আরতি হয়। সন্ধ্যারতির পর নাটমন্দিরে ভজন হইয়াছিল।

সারাদিনে বহু ভক্ত নরনারী বেলুড় মঠে সমবেত হইয়াছিলেন। প্রায় ৫,০০০ ভক্তকে হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়া হয়; বর্তমান পরিস্থিতিতে অন্নপ্রসাদ দেওয়া সম্ভব হয় নাই।

**শ্রীশ্রীমায়ের বাটী ঃ** কলিকাতা বাগবাজার পল্লীর যে বাড়ীতে (১, উদ্বোধন লেন, কলিকাতা ৩) পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর জীবনের শেষ একাদশ বৎসর অতিবাহিত হইয়াছিল, বহুপুণ্যস্মৃতিবিজড়িত সেই ভবনে শ্রীশ্রীমায়ের শুভ ১১৭তম জন্মোৎসব গত ১৬ই পৌষ (৩১. ১২. ৬৯) বুধবার বিশেষ অনুষ্ঠানসূচী সহায়ে মহা উৎসাহ ও আনন্দের সহিত অনুষ্ঠিত হয়।

মঙ্গলারতি, ষোড়শোপচার পূজা, হোম, শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ, ভজন, জীবনী-আলোচনা প্রভৃতি উৎসবের অঙ্গ ছিল।

বেলা দশটা হইতে এগারটা 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা' পাঠ ও জীবনালোচনা করেন স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। সন্ধ্যারতির পর স্বামী ঈশানানন্দ 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা' বলেন। রাত্রেও ভজন হইয়াছিল।

ভোর হইতে রাত্রি ৯টা পর্যন্ত ভক্তবৃন্দ শ্রীশ্রীমায়ের পাদপদ্মে ভক্তি-অর্ঘ্য নিবেদন করিতে আসেন। আবহাওয়া ভাল থাকায় অন্যান্য বার অপেক্ষা বেশী ভক্তসমাগম হইয়াছিল—সারাদিনে প্রায় ৪ হাজার। সমাগত সকলেই হাতে হাতে প্রসাদ গ্রহণ করেন। সারাদিন পূজাপাঠ প্রভৃতি অনুষ্ঠানে ও ভক্তসমাগমে শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ী আনন্দ-মুখর ছিল।

## কল্পতরু-উৎসব

**কাশীপুর উদ্যানবাটীতে ঃ** গত ১লা জানুআরি ১৯৭০, বাংলা ১৭ই পৌষ, বৃহস্পতিবার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের 'কল্পতরু-দিবস' উদ্‌যাপিত হয়। এতদুপলক্ষে ৩রা ও ৪ঠা জানুআরিও উৎসব হইয়াছিল।

প্রথম দিন ১লা জানুআরি বিশেষ পূজাদি, উচ্চাঙ্গ ধর্মসঙ্গীত, 'রসরঙ্গের' সভ্যবৃন্দ কর্তৃক কথা ও গানে শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাগীতি, আব্দুল কালীকীর্তন সম্প্রদায় কর্তৃক কালীকার্তন, স্বামী তীর্থানন্দ কর্তৃক ভাগবত-ব্যাখ্যা এবং শ্রীবিশ্বনাথ গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক রামায়ণকীর্তন ( স্বর্ণতরী ) অনুষ্ঠিত হয়।

অপরাহ্ণে জনসভায় সভাপতিত্ব করেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হেমচন্দ্র গুহ। বক্তা ছিলেন স্বামী শুদ্ধসত্ত্বানন্দ, স্বামী বীতশোকানন্দ ও স্বামী বুধানন্দ। সকলেই শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে সময়োপযোগী সুন্দর ভাষণ দেন। স্বামী বীতশোকানন্দ হিন্দীতে বক্তৃতা করেন।

৩রা জানুআরি শনিবার শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক কীর্তন, স্বামী দেবানন্দ কর্তৃক 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'-ব্যাখ্যা, শ্রীধনঞ্জয় ভট্টাচার্য ও শ্রীরামকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ভক্তিমূলক সঙ্গীতানুষ্ঠান হইয়াছিল।

অপরাহ্ণে জনসভায় কল্পতরু দিবস এবং শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী আলোচনা করেন স্বামী লোকেশ্বরানন্দ ( সভাপতি ), স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ ও অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু।

৪ঠা জানুআরি উৎসবের শেষদিন রবিবার মধ্যাহ্নে ভারতসরকারের প্রচারবিভাগের সৌজন্যে শ্রীপূর্ণদাস ও সম্প্রদায় কর্তৃক বাউল সঙ্গীত পরিবেশিত হয়। অপরাহ্ণে হাওড়া সমাজ কর্তৃক নদের নিমাই 'নদীয়া-লীলা' কীর্তনাভিনয় হইয়াছিল।

উৎসবের তিন দিনই কাশীপুর উদ্যান-বাটীতে সহস্র সহস্র ভক্তের সমাগম হইয়াছিল। ভক্তবৃন্দকে হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়া হয়।

**কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যানে** অন্যান্য বৎসরের মতো এবারও গত ১লা জানুআরি বৃহস্পতিবার 'কল্পতরু-দিবস' উপলক্ষে যথা-রীতি আনন্দোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। এই উৎসবের প্রধান অঙ্গ ছিল—বিশেষ পূজা, পাঠ, হোম ও ভজনাদি। প্রতিটি অনুষ্ঠান সুন্দর-ভাবে সম্পন্ন হয়। ভক্তবৃন্দ হাতে হাতে প্রসাদ গ্রহণ করেন। ভক্তসমাগমে ও ভজন-কীর্তনে কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যান সারাদিন আনন্দ-মুখর ছিল।

## স্বামী সারদানন্দের জন্মোৎসব

**উদ্বোধনে,** শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীতে গত ২৮শে পোষ, ( ১৩. ১. ৭০ ) মঙ্গলবার শুভ শুক্লা ষষ্ঠী তিথিতে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্যতম লীলাপার্ষদ শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দজী মহারাজের পুণ্য জন্মোৎসব বিশেষ আনন্দ সহকারে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

পূজ্যপাদ মহারাজের ঘরে ও পার্শ্ববর্তী কক্ষে তাঁহার প্রতিকৃতি পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা সুন্দর-ভাবে সাজানো হইয়াছিল। মঙ্গলারতি, বিশেষ পূজা, হোম, ভোগরাগ, শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ, ভজন, জীবনী-আলোচনা প্রভৃতি উৎসবের প্রতিটি অঙ্গ সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হয়।

বেলা ১০টা হইতে ১১টা স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ' পাঠ এবং পূজ্যপাদ স্বামী সারদানন্দজীর পুণ্যজীবন আলোচনা করেন।

সন্ধ্যারতির পর রাত্রে যন্ত্রসঙ্গীত ( স্বরোদ-বাদন ) এবং শ্রীনলিন মালাকারের উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত বিশেষ উপভোগ্য হইয়াছিল।

বহু সাধু ও ভক্তের সমাগমে উদ্বোধন-ভবন সারাদিন আনন্দমুখর থাকে। রাত্রেও কিছু ভক্তসমাগম হইয়াছিল। সমাগত ভক্ত-গণকে হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়া হয়।

## কার্যবিবরণী

**শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বাগবাজার** (শ্রীশ্রীমায়ের বাটী ও উদ্বোধন কার্যালয়) : ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা : বাগবাজার শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ স্থাপিত হয় ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে। এই মঠের প্রধান কার্য : শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের সেবাপূজা এবং 'উদ্বোধন' পত্রিকা ও পুস্তকাবলী প্রকাশন।

১৯৬৯ খৃষ্টাব্দের কর্মধারা নিম্নরূপ :

ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব ও শ্রীশ্রীমায়ের নিত্য সেবাপূজাদি যথাযথভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর জন্মোৎসব সুষ্ঠুভাবে যথাবিধি উদ্‌যাপন করা হয়।

ফলহারিণী কালীপূজার রাত্রে শ্রীশ্রীমায়ের বিশেষ পূজাদি, কালীপূজার রাত্রে প্রতিমায় শ্রীশ্রীকালীপূজা এবং শিবরাত্রিতে সারারাত্রি শিবপূজা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ইহা ছাড়া ক্রীস্‌মাস ইভ্‌, শঙ্করপঞ্চমী, বুদ্ধপূর্ণিমা, জন্মাষ্টমী প্রভৃতি পুণ্য দিনে সন্ধ্যারতির পর অবতার ও মহাপুরুষগণের জীবন ও বাণী পঠিত ও আলোচিত হয়। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সন্ন্যাসী সন্তানগণের পুণ্য জন্মতিথিগুলিও অনুরূপভাবে উদ্‌যাপিত হয়।

আলোচ্য বর্ষে যুগনায়ক স্বামী বিবেকানন্দ-প্রতিষ্ঠিত 'উদ্বোধন' মাসিক পত্রিকার ৭১তম বর্ষ। পত্রিকা যথারীতি প্রকাশিত হইয়াছে এবং উহার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাইতেছে, পূর্ব বৎসর অপেক্ষা পত্রিকার গ্রাহকসংখ্যা কিছু বাড়িয়াছে।

এখানকার গ্রন্থাগারটি ভক্তবৃন্দের জন্য সপ্তাহে একদিন—প্রতি রবিবার অপরাহ্নে খোলা হয়। গ্রন্থাগারের পুস্তকসংখ্যা ২,৩৯৩। আলোচ্যবর্ষে পঠিত পুস্তকসংখ্যা ২,০৮১।

প্রকাশন-বিভাগ হইতে আলোচ্য বর্ষে দুইটি নূতন পুস্তক 'স্বামীজীর আহ্বান' ও 'ভগবানলাভের পথ' প্রকাশিত হইয়াছে এবং ১১খানি পুস্তক পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। প্রকাশন-বিভাগের প্রতিষ্ঠাকাল হইতে ১৯৬৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত 'উদ্বোধন কার্যালয়' হইতে ১৬৯ খানি পুস্তক প্রকাশিত হইল।

আলোচ্য বর্ষে মঠের সাধু-কর্মিগণ এখানে এবং বাহিরে বিভিন্ন স্থানে যথাক্রমে ২২৩টি ক্লাস ও ১০০টি বক্তৃতার মাধ্যমে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবপ্রচারে ব্রতী হইয়াছিলেন।

## রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্য

**কাছারে বন্যার্তসেবা : শিলচরে—** রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক ২৭টি গ্রামের ৫,৬১৬ জন দুর্গতকে ৪,৩৫৩ কেজি চাল, ১,৭২৫ কেজি আটা, ৫৫০ খানি বস্ত্রাদি এবং ৩২৫ খানি কম্বল দেওয়া হইয়াছে। ১৬ জনকে অর্থসাহায্য দেওয়া হয়। এবং ২৭টি পরিবারকে বীজ-ধান দিয়া সাহায্য করা হয়। এতদ্ব্যতীত ২১টি পরিবারের জন্য ২১টি গৃহ নির্মিত হইয়াছে।

**অন্ধ্রে ঘূর্ণবাত্যা-বিপর্যস্তদের সেবা :** ডিসেম্বর মাসে (১৯৬৯) ১৮টি গৃহের নির্মাণকার্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এ পর্যন্ত দুর্গতদের পুনর্বাসনের জন্য মোট ৪০টি গৃহ নির্মিত হইল। আরও গৃহনির্মাণের জন্য ব্যবস্থাদি সুষ্ঠুভাবে অগ্রসর হইতেছে। গত ২২শে ডিসেম্বর স্বামী ভূতেশানন্দজী চিরালায় একটি বিদ্যালয়-ভবনের ভিত্তিস্থাপন করিয়াছেন।

## বেদান্ত কলেজের জন্য প্রার্থনা-ভবন

*গত ১৮ই ডিসেম্বর, ১৯৬৯ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ* ও মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ মহীশূর রামকৃষ্ণ আশ্রমের বেদান্ত কলেজের জন্য প্রার্থনা-ভবনের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন।

## নেফা কেন্দ্রের পরিবিস্তার

গত ৬ই ডিসেম্বর ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রী ওয়াই. বি. চ্যবন আলং (নেফা) কেন্দ্রে নিম্নলিখিত নূতন ভবনগুলির উদ্বোধন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়, ছাত্রাবাস, সাধুনিবাস, শিক্ষক-ভবন।

এই উপলক্ষে আয়োজিত সভায় স্বামী গম্ভীরানন্দজী ও আসামের রাজ্যপাল শ্রী বি. কে. নেহরু যথাক্রমে সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন।

## গীতা-জয়ন্তী

গত ২১শে ডিসেম্বর দিল্লী আশ্রমে গীতা-জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে আয়োজিত সভায় ভারতের উপ-রাষ্ট্রপতি শ্রী জি. কে. পাঠক সভাপতিত্ব করেন।

## স্বামী অশোকানন্দের দেহত্যাগ

গত ১৩ই ডিসেম্বর, ১৯৬৯ রাত্রি ১২টা ৪৫ মিনিটে (ইউ. এস. এ সময়) স্যান-ফ্রান্সিস্কো কেন্দ্রে স্বামী অশোকানন্দ (যোগেশ মহারাজ) ৭৭ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। বেশ কিছুকাল যাবৎ তিনি নানাবিধ পীড়ায় শয্যাশায়ী ছিলেন। বুকের গোলযোগের জন্য গত ১লা ডিসেম্বর তাঁহাকে হাসপাতালে ভরতি করা হয়, চিকিৎসার ফলে কিছু উন্নতি দেখা গেলেও অকস্মাৎ হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া স্তব্ধ হওয়ায় তাঁহার দেহাবসান ঘটে। ১৭ই ডিসেম্বর তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়, এই অনুষ্ঠানে উত্তর ক্যালিফর্নিয়া কেন্দ্রের সন্ন্যাসিগণের সহিত আমেরিকার অন্যান্য কেন্দ্রের ৪ জন সন্ন্যাসী যোগদান করেন।

স্বামী অশোকানন্দ ১৯২০ খৃষ্টাব্দে ভুবনেশ্বর মঠে সঙ্ঘে যোগদান করেন। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে তিনি শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের নিকট সন্ন্যাসদীক্ষা লাভ করিয়াছিলেন।

ভারতে থাকাকালে স্বামী অশোকানন্দ 'বেদান্ত কেশরী' ও 'প্রবুদ্ধ ভারত'—শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের এই দুইখানি প্রসিদ্ধ ইংরেজী মাসিক পত্রিকার সম্পাদনার ভার বিভিন্ন সময়ে বহন করিয়াছিলেন। তিনি সুযোগ্য সম্পাদক ছিলেন। তাঁহার লেখাগুলি গভীর চিন্তাশীলতা, আধ্যাত্মিকতা ও পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক।

১৯৩২ খৃষ্টাব্দে তিনি আমেরিকার স্যান-ফ্রান্সিস্কো কেন্দ্র পরিচালনার ভারপ্রাপ্ত হইয়া সেখানে গমন করেন। তাঁহার সুযোগ্য পরিচালনায় স্যানফ্রান্সিস্কো কেন্দ্রের দুইটি শাখা স্থাপিত হইয়াছে—একটি বার্কলিতে এবং অপরটি স্যাক্রামেন্টোয়। দীর্ঘ ৩৭ বৎসরব্যাপী আমেরিকায় তাঁহার রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবপ্রচার খুবই সাফল্যমণ্ডিত।

স্বামী অশোকানন্দের অসাধারণ পাণ্ডিত্য, সাহিত্যপ্রতিভা, বাগ্মিতা আমেরিকায় তাঁহাকে স্মরণীয় করিয়া রাখিবে। ভারতে ও আমেরিকায় তাঁহার অসংখ্য গুণমুগ্ধ ব্যক্তি আছেন।

এই সন্ন্যাসীর দেহনির্মুক্ত আত্মা পরমপদে মিলিত হইয়াছে।

## স্বামী কৃপানন্দের দেহত্যাগ

গত ১৩ই ডিসেম্বর বেলা ১টার সময় বৃন্দাবন সেবাশ্রমে স্বামী কৃপানন্দ (নগেন মহারাজ) সজ্ঞানে শ্রীভগবানের নামোচ্চারণ করিতে করিতে ৬১ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ

করিয়াছেন। দেহাভ্যন্তরে রক্তক্ষরণ তাঁহার দেহত্যাগের কারণ; ২৮শে নভেম্বর হইতে তিনি বিশেষভাবে অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার দেহ যমুনা নদীতে সলিল-সমাধি দেওয়া হয়।

স্বামী কৃপানন্দ শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে সঙ্ঘে যোগদান করিয়া তিনি ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের নিকট সন্ন্যাস-দীক্ষা লাভ করেন। স্বামী কৃপানন্দ ১৯৩১ হইতে ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত কলিকাতা অদ্বৈত আশ্রম ও দেওঘর বিদ্যাপীঠের কর্মী ছিলেন। ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে তিনি বৃন্দাবন সেবা-শ্রমে কর্মিরূপে প্রেরিত হন এবং ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দে কেন্দ্রটির পরিচালন-ভার গ্রহণ করেন। বৃন্দাবন সেবাশ্রমের অধ্যক্ষ থাকাকালে তিনি ইহার প্রভূত উন্নতিসাধন করেন। মথুরা রোডের উপর নবনির্মিত হাসপাতাল ভবনটি তাঁহারই দীর্ঘকালব্যাপী অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল।

স্বামী কৃপানন্দ অতি মধুরস্বভাব সন্ন্যাসী ছিলেন; যাঁহারাই তাঁহার সংস্পর্শে আসিতেন, তাঁহার চরিত্রের এই দিকটি তাঁহাদের সকলেরই অন্তর স্পর্শ করিত। অসুস্থতার মধ্যেও তাঁহার মুখের প্রসন্ন ভাব ও মধুর ব্যবহার সমভাবে অক্ষুণ্ণ ছিল।

তাঁহার আত্মা শ্রীরামকৃষ্ণ-পাদপদ্মে চির-শান্তি লাভ করিয়াছে।

## পরলোকে স্বামী গঙ্গেশানন্দ

দুঃখের সহিত জানাইতেছি গত ৯ই জানুআরি রাত্রি ২-৪৪ মিঃ সময় রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে স্বামী গঙ্গেশানন্দ দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি দীর্ঘকাল হাঁপানিতে ভুগিতেছিলেন, বয়সজনিত অন্যান্য উপসর্গও দেখা দিয়াছিল; দেহত্যাগের দুইদিন পূর্বে তাঁহাকে বেলুড় মঠ হইতে সেবাপ্রতিষ্ঠানে ভরতি করা হয়। দেহত্যাগকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৭৭ বৎসর।

স্বামী গঙ্গেশানন্দ শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে তিনি সঙ্ঘে যোগদান করেন এবং ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে স্বামী শিবানন্দজীর নিকট হইতে সন্ন্যাসদীক্ষা প্রাপ্ত হন।

১৯১৬ খৃষ্টাব্দ হইতে চার বৎসর তিনি (তখন ব্রহ্মচারী শান্তিচৈতন্য) ব্রহ্মচারী বিমলের (স্বামী দয়ানন্দ) সহিত 'উদ্বোধন' পত্রিকার যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন। পরে সুদীর্ঘকাল স্বামী শিবানন্দজীর সেবায় ব্রতী থাকার সৌভাগ্য লাভ করেন। কালিম্পঙ্-এ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের তিনি প্রতিষ্ঠাতা; মনোরম দৃশ্য-পরিবেষ্টিত এই আশ্রমটি গড়িয়া তুলিবার পর কয়েক বৎসর এখানকার অধ্যক্ষরূপে এবং পরে দিল্লী শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের অধ্যক্ষরূপে তিনি সঙ্ঘের সেবা করিয়াছিলেন। শেষজীবন তিনি প্রধানতঃ বেলুড় মঠেই অতিবাহিত করেন। তাঁহার দেহত্যাগে সঙ্ঘ একজন প্রাচীন এবং অভিজ্ঞ সন্ন্যাসীকে হারাইল।

তাঁহার আত্মা অভয় পদে লীন হইয়াছে।

# বিবিধ সংবাদ

### পৃথিবীর জনসংখ্যা

[ বর্তমানে যাহা আছে এবং বর্তমান বৃদ্ধির হার অব্যাহত থাকিলে বিংশ শতাব্দীর শেষে যাহা হইবে বলিয়া বিশেষজ্ঞগণ অনুমান করেন। ]

| দেশ | ১৯৬৯ খৃঃ | ২০০০ খৃঃ |
|---|---|---|
| চীন | ৭৫'৫ কোটি | ১৫০'০ কোটি |
| ভারত | ৫৪ ২ | ১২৫ ৯ |
| এশিয়ার অন্যান্য দেশ | ৭১ ৪ | ১৭৫ ৪ |
| ইউরোপ | ৪৫'৬ | ৫৭ ১ |
| আফ্রিকা | ৩৩ ৮ | ৮৬'০ |
| দক্ষিণ আমেরিকা | ২৭ ৫ | ৭৫ ৬ |
| রাশিয়া | ২৪'৮ | ৪০'২ |
| উত্তর আমেরিকা | ২২ ৬ | ৩৮'৮ |
| ওসেনিয়া | ১ ৮ | ৩ ২ |
| মোট— | ৩৫৭ ২ কোটি | ৭৫২ ২ কোটি |

**বারাসত রামকৃষ্ণ-শিবানন্দ আশ্রমে** মহাপুরুষ মহারাজ স্বামী শিবানন্দজীর ১১৪তম জন্মোৎসব গত ৪ঠা জানুআরি হইতে আটদিন পূজার্চনা, শাস্ত্রপাঠ ও ব্যাখ্যা, ভজন, কীর্তন, লীলাগীতি, কথকতা, ধর্মসভা, শোভাযাত্রা, প্রসাদবিতরণ প্রভৃতির মাধ্যমে সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। দুই দিনের ধর্মসভায় স্বামী গম্ভীরানন্দ, স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, স্বামী পুণ্যানন্দ, শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত, স্বামী ভূতেশানন্দ, স্বামী নিরাময়ানন্দ, স্বামী শুদ্ধসত্ত্বানন্দ ও স্বামী ক্ষমানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-শিবানন্দের জীবন ও বাণীর বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। ভজন-কীর্তনে অংশ গ্রহণ করেন বিশিষ্ট গায়কগণ। কয়েক হাজার নরনারীর এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা ভজনকীর্তনাদিসহ শহর পরিক্রমা করে। যোল হাজার নরনারায়ণ প্রসাদ গ্রহণ করেন। সহস্র সহস্র নরনারীর সমাগমে সুসজ্জিত উৎসব-প্রাঙ্গণ আনন্দমুখর ছিল।

**বৈকুণ্ঠপুর** শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা তীর্থে গত ৩১-১২-৬৯ তারিখে জগজ্জননী শ্রীশ্রীসারদা-দেবীর ১১৭তম জন্মতিথি উৎসব ভাবগম্ভীর পরিবেশের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়। ঊষা ৪ ঘটিকায় বেতারশিল্পী শ্রীমণিরাম মুখোপাধ্যায় কর্তৃক চণ্ডীগীতি দ্বারা কার্যসূচীর সূচনা হয়। মঙ্গলারতি, মাতৃস্তোত্রম্ ও বৈদিক প্রার্থনা বিশেষ অঙ্গ ছিল। বিশেষ পূজা, হোম ও ভোগরাগাদি অনুষ্ঠিত হয়। এই জন্মতিথি উৎসবের আর একটি বিশেষ অঙ্গ ছিল দরিদ্র বালকদের মধ্যে ৮ টিন বিস্কুট বিতরণ।

## বিজ্ঞপ্তি

আগামী ১৬ই মাঘ ( ৩০. ১. ১৯৭০ ) শুক্রবার কৃষ্ণাসপ্তমীতে পরম-পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ মহারাজের শুভ ১০৮তম জন্মতিথি বেলুড় মঠে ও অন্যত্র উদ্‌যাপিত হইবে।

# উদ্বোধন

## দিব্য বাণী

সর্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে।
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্‌জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্॥ ২০
পৃথক্ত্বেন তু যজ্‌জ্ঞানং নানাভাবান্ পৃথগ্বিধান্।
বেত্তি সর্বেষু ভূতেষু তজ্‌জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসম্॥ ২১
যৎ তু কৃৎস্নবদেকস্মিন্ কার্যে সক্তমহৈতুকম্।
অতত্ত্বার্থবদল্পঞ্চ তৎ তামসমুদাহৃতম্॥ ২২

[ শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা, ১৮শ অধ্যায় ]

বিবিধ প্রকার দেহমনভেদে ভিন্ন প্রতীত সকল জীবেতে,
সর্বভূতেরই প্রাণের প্রাণে
একই অব্যয় আত্মা রাজিত—এ অভেদবোধ যে-জ্ঞানে আনে
সাত্ত্বিক তাহা, ( সত্য প্রকট অবাধিত সেই অমল জ্ঞানে )॥

প্রতিটি প্রাণীরই মনবুদ্ধ্যাদি ভিন্ন বলিয়া বাহিরে তারা
একই আত্মার বিবিধ প্রকাশ হলেও দেখায় পৃথক্-পারা ;
যে জ্ঞান তারেই আত্মা ভাবিয়া প্রতি জীবকেই পৃথক্ বলিয়া,
ভিন্ন আত্মা বলিয়া জানে
রাজস সে জ্ঞান, ( দেখে তা বাহির, চাহে না গভীরে সত্তা-পানে )॥

আত্মা অথবা ঈশ্বর যিনি তাঁর সবটুকু সীমিত আছে
কেবল কোনও ব্যক্তিবিশেষে, কেবল একটি প্রতিমা মাঝে,
অন্য কোথাও নাই তিনি আর—যে-জ্ঞানে এরূপ ধারণা হয়
যুক্তিবিহীন সত্যবিরোধী তুচ্ছ সে-জ্ঞানে তামস কয়॥

সর্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ ॥ ৪৫
ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ।
প্রেমমৈত্রীকৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ ॥ ৪৬
অর্চায়ামেব হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে।
ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু সঃ ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ ॥ ৪৭

শ্রীমদ্ভাগবতম্, ১১।২

ভগবানই আত্মা মোর, এই ভগবদ্ভাবে, অভেদত্বে করিয়া গাহন,
ভগবানে, নিজেরও সর্বভূতে করে যে দর্শন,
সবই দেখে সে সত্তায়—ভক্তমাঝে সেজন উত্তম ॥
ঈশ্বর-প্রেমিক যেই, ভক্তজনে মৈত্রীভাব যার,
কৃপা করে অজ্ঞানেরে, ঈশদ্বেষী প্রতি যার ভাব উপেক্ষার,
মধ্যম সে, ( নিজসনে ঈশসনে সর্বভূতে ভেদদৃষ্টি তার ) ॥
শ্রদ্ধাভরে হরিপূজা করে যেই শুধু প্রতিমায়
নাহি কিন্তু পূজে ভক্তে, অন্যজনে, সমান শ্রদ্ধায়,
সেজন প্রাকৃত ভক্ত ভকত-সভায় ॥

# কথাপ্রসঙ্গে

## যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ

আধুনিক যুগে যে-দুটি চিন্তাতরঙ্গ বিশ্ব-মানবের চিন্তাসাগরে সর্বাধিক উত্তুঙ্গ, তাহার একটি হইল বিজ্ঞান, অপরটি সাম্যবাদ।

যুগপ্রয়োজনে অবতীর্ণ শ্রীরামকৃষ্ণ ঈশ্বরকেই বিশ্ব ও জীবনের মূল সত্তা, মূল কারণ বলিয়া ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন, নিজজীবনে উপলব্ধ এই সত্যকে উপলব্ধি করিবার সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি-অনুমোদিত পথই দেখাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার নিজের ঈশ্বর-উপলব্ধির পথে বিশ্বাসই ছিল চিরসহচর একথা সত্য, কিন্তু তাঁহার প্রধান শিষ্য নরেন্দ্রনাথ ছিলেন আধুনিক চিন্তা ও সংশয়ের মূর্ত প্রতীক ; যুগপ্রয়োজনে তাঁহাকে তিনি শিক্ষাদান করিয়াছেন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বনেই। আর, ভগবদ্বিশ্বাস, ভগবদ্ভক্তিই যে সাম্যের সুদৃঢ় ভিত্তি তাহাও বলিয়া গিয়াছেন।

বিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য হইল, কাহারো কথা শুনিয়া কোন কিছুকে সত্য বলিয়া মানিয়া লইতে হয় না। কেহ কোন সত্য আবিষ্কার করিলে তিনি কোন্ পদ্ধতি অবলম্বনে সে সত্যে উপনীত হইলেন, তাহাও ঘোষণা করিতে হয়। তখন যাঁহাদের যোগ্যতা আছে তাঁহারা সে পদ্ধতিতে নিজেরা সে-সত্যকে

যাচাইয়া দেখিয়া তবে গ্রহণ করেন। অর্থাৎ কোন কিছু 'বিশ্বাস' করিবার প্রয়োজন নাই —নিজে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া লইয়া তবে মানো। আর, সে সত্যকে যাচাই করিয়া লইবার দ্বারও সকলের জন্যই উন্মুক্ত।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবও ঠিক এই কথাই বলিয়াছেন তাঁহার আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত যুবক-ভক্তগণকে, বিশেষ করিয়া নরেন্দ্রনাথকে। বিজ্ঞানীর মতোই বারবার বলিয়াছেন, শুধু তিনি বলিতেছেন বলিয়া ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গের কোন কিছু মানিয়া লইবার প্রয়োজন নাই, নিজে 'যাচাইয়া-বাজাইয়া' দেখিয়া নিঃসংশয় হইয়া তবে উহাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ কর। নরেন্দ্রনাথ তাহা করিয়াছিলেনও। শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে প্রথম হইতেই প্রাণদিয়া ভালবাসিলেও, প্রতিদানে তাঁহার ভালবাসা পাইবার আশা না রাখিয়া কেবল তাঁহাকে দেখিবার জন্য, তাঁহার দুটি কথা শুনিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া তাঁহার কাছে ছুটিয়া আসিলেও এবং দক্ষিণেশ্বরে দ্বিতীয় দর্শনের দিনই তাঁহার অসীম দৈব-শক্তির নিঃসংশয় প্রমাণ পাইলেও শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেছেন বলিয়াই তাঁহার কথাগুলি তিনি মানিয়া লন নাই; যুক্তিবিচার সহায়ে, সাধারণজ্ঞান সহায়ে এবং সর্বোপরি নিজ প্রত্যক্ষ-উপলব্ধি সহায়ে সে কথা বা উপলব্ধিগুলির সত্যতা নিজে 'যাচাইয়া-বাজাইয়া' লইয়া তবে মানিয়াছিলেন। দক্ষিণেশ্বরে প্রথম দর্শনের দিনই শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে 'জানি প্রভু, তুমি সেই পুরাতন ঋষি, নর-রূপী নারায়ণ, জীবের দুর্গতি নিবারণ করিতে পুনরায় শরীর-ধারণ করিয়াছ' বলিতেছেন শুনিয়া ভাবিয়াছিলেন, 'এ কাহাকে দেখিতে আসিয়াছি, এ তো একেবারে উন্মাদ!' ঈশ্বরের অনস্তিত্বের স্বপক্ষে 'তাঁহাকে দেখা যায় না' বলিয়া যে যুক্তিটি এখনো প্রযুক্ত হয়, সেটিও নরেন্দ্রনাথের চিত্তকে কিছুকাল বিপুলভাবে আলোড়িত করিয়াছিল; দক্ষিণেশ্বরে প্রথম দর্শনের দিনই তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন: "ঈশ্বরকে দেখিয়াছেন কি?" এবং তাঁহার মুখে ইতিবাচক উত্তর শুনিয়া তাঁহার সে কথায় পূর্ণ আস্থাও স্থাপন করিয়াছিলেন; কিন্তু নিজে সে সত্যকে যাচাইয়া লইবার পূর্ব পর্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণের বহু আধ্যাত্মিক উপলব্ধিকে, এমন কি তাঁহার আধ্যাত্মিকতা-প্রসূত আচরণগুলিকেও সত্য বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। ধাতুদ্রব্য স্পর্শে তাঁহার অঙ্গবিকৃতি ও দেহে যন্ত্রণা স্বতই আসে, না উহা ইচ্ছাকৃত, তাহাও পরীক্ষা করিতে ছাড়েন নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণের প্রাণস্বরূপ ভবতারিণী-বিগ্রহকে তাঁহার মুখের উপর 'পুত্তলিকা' বলিতেও দ্বিধা করেন নাই নরেন্দ্রনাথ। শ্রীরামকৃষ্ণকে এমন কথা বলিতেও ছাড়েন নাই যে, মাকালী তাঁহাকে অনেক কিছু দেখাইয়া দেন, তাঁহার সহিত কথা বলেন—এসব 'মাথার খেয়াল' মাত্র, ভুল দেখা; পাশ্চাত্য-বিজ্ঞান প্রমাণ করিয়া দিয়াছে যে মানুষ এমন অনেক ভুল দেখিয়া থাকে, বিশেষ করিয়া কোন কিছু দেখিবার ইচ্ছা যদি মনে থাকে তাহা হইলে তো কথাই নাই।

স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তির দোহাই দিয়া ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও আধ্যাত্মিক উপলব্ধির বিরুদ্ধে যে-সব যুক্তি আজও আমরা প্রয়োগ করিয়া সগর্বে ভাবি এসব অকাট্য যুক্তি, নরেন্দ্রনাথ সত্যকে যাচাইয়া দেখিবার সময় তাহার কোনটিই প্রয়োগ করিতে ভুলেন নাই। আর বৈজ্ঞানিক-মনোবৃত্তিসম্পন্ন শ্রীরামকৃষ্ণ ইহাতে খুশীই হইতেন, ইহাই চাহিতেন—মানিয়া লওয়া নয়,

সর্বপ্রকারে যাচাইয়া লওয়া।

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর দোহাই যখন দিই, দুটি কথা যেন আমরা না ভুলি। একটি হইল, নরেন্দ্রনাথের মতো যথার্থ বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি যেন অবলম্বন করি। মাকালীকে প্রত্যক্ষ করার পর নরেন্দ্রনাথ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার ঈশ্বর-উপলব্ধি সম্বন্ধে যাহা বলেন, বা শাস্ত্রে যাহা লিপিবদ্ধ আছে, তাহা সত্য অথবা মিথ্যা—এ সম্বন্ধে অভিমত দিবার কোন অধিকারই কাহারো আসে না, যতক্ষণ না সে সে-সব প্রত্যক্ষ করিবার জন্য ঘোষিত নির্ধারিত পদ্ধতি অবলম্বনে চলিয়া নিজে উহার সত্যাসত্য পরীক্ষা করিয়া দেখে। পরীক্ষা করিবার যোগ্যতা অর্জনের চেষ্টা না করিয়াই, পরীক্ষাগারে না যাইয়াই বা না-যাওয়া লোকের কথা শুনিয়াই আমরা যেন অবৈজ্ঞানিকের মতো কোন মন্তব্য না করি।

অপর কথাটি হইল, প্রাথমিক বিশ্বাস। আমাদের মধ্যে কয়জন, বিজ্ঞানেরই হউক বা অধ্যাত্মজগতেরই হউক, উচ্চ তত্ত্বগুলিকে নিজে পরীক্ষা করিয়া দেখিবার মতো যোগ্যতা-সম্পন্ন? কেহই এ যোগ্যতা লইয়া জন্মগ্রহণ করেন না, সকলকেই অশেষ আয়াস স্বীকার করিয়া দীর্ঘকালের চেষ্টায় এ যোগ্যতা অর্জন করিতে হয়। বিজ্ঞানীদের পটভূমিতে থাকে শিক্ষা দ্বারা বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষসাধন। নরেন্দ্রনাথের শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকট গমনের পূর্বে ও পরে ছিল চিত্তের শুদ্ধতা ও একাগ্রতার সাধনা। এগুলি যেন না ভুলি আমরা, আর যেন না ভুলি, এই যোগ্যতা অর্জনের জন্য সকলকেই অগ্রসর হইতে হয় সত্যদ্রষ্টা বা বিজ্ঞানীদের কথায় প্রাথমিক বিশ্বাস অবলম্বনেই। 'আমি যাহা বিশ্বাস করি না, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য যোগ্যতা অর্জনের বৃথা চেষ্টা করিব কেন?'—একথা বলিয়া যদি কেহ হাত-পা গুটাইয়া বসিয়া থাকেন, সত্যলাভ তাঁহার কোন দিনই হইবে না। বিজ্ঞানের মতো ঈশ্বরতত্ত্বের ক্ষেত্রেও এ-কথা সমভাবে প্রযোজ্য। অবশ্য প্রচেষ্টার সঙ্গে সঙ্গেই উভয়ক্ষেত্রেই প্রাথমিক ফললাভ কিছু হয়ই, যাহা বিশ্বাস সংরক্ষণে ও বর্ধনে সহায়তা করে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব ঈশ্বর-উপলব্ধি বিষয়ে তাই পরীক্ষাগারের কাজের উপর, যোগ্যতা অর্জনের, মনবুদ্ধিকে শুদ্ধ পবিত্র করার এবং অভ্যাস সহায়ে মনকে একাগ্র করার উপরই জোর দিয়াছেন সর্বাধিক, কারণ মাত্র ইহাই আমাদের সত্যকে প্রত্যক্ষ করিবার যোগ্য করিতে সমর্থ; তর্ক বা প্রচেষ্টাহীন আলোচনা-মাত্র নহে। সিদ্ধি খাইলে নেশা হয় একথা মুখে বলিলে কি হইবে? চেষ্টা করিয়া সিদ্ধি যোগাড় করিয়া বাঁটিয়া খাইতে হইবে। সিদ্ধি যোগাড় করিয়া আনিয়া হাতে নাড়াচাড়া করিলেও নেশা হইবে না, বাঁটিয়া গায়ে মাখিলেও নেশা হইবে না, খাইতে হইবে। পদ্ধতি নিখুঁতভাবে অনুসরণ করিতে হইবে, যেমন করিতে হয় বিজ্ঞানের পরীক্ষাগারে; তবে ফললাভ হইবে। পঞ্চাশ মাইল টেলিগ্রাফের তার হয়তো টানিলাম অশেষ পরিশ্রম করিয়া, কিন্তু তাবে একটি জায়গায় সামান্য একটু ফাঁক থাকিয়া গেল—খবর পাঠানো যাইবে না তাহাতে। রুচি ও সামর্থ্যানুসারে একটি পদ্ধতি অবলম্বনে সত্যকে প্রত্যক্ষ করানোর জন্যই ব্যগ্র ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। কারণ প্রত্যক্ষ প্রমাণের চেয়ে বড় প্রমাণ আর নাই। কিছু প্রত্যক্ষ জ্ঞান ছাড়া যুক্তি-অনুমানাদিও দাঁড়াইবার ভিত্তিভূমি পায় না। প্রত্যক্ষের সঙ্গে না

মিলিলে যুক্তি অনুমানাদি মূল্যহীন হইয়া যায়। যেমন আজ চাঁদ হইতে প্রত্যক্ষভাবে লব্ধ তথ্যগুলির সঙ্গে যাহা মিলিতেছে না, বিজ্ঞানীদের এতদ্দিনকার সে-সব অনুমানগুলি বাতিল হইয়া যাইতেছে। প্রত্যক্ষ জ্ঞান আসিলে অনুমানাদির মূল্য আর কতটুকু? শ্রীরামকৃষ্ণদেব যেমন একদা বলিতেছেন, "বিচার আর কি করবো? দেখছি তিনিই সব হয়ে রয়েছেন!"

সাম্যের বাণীর প্রভাব আজ সারা জগতের মানুষের মনের উপর বিস্তৃত। সব মানুষকে সমদৃষ্টিতে দেখিয়া তাহারই ভিত্তিতে সমাজ ও রাষ্ট্রগঠন প্রয়োজন—এ-চিন্তার পরিধি আজ বিশ্বব্যাপী। কিন্তু এ সাম্যের দৃঢ়ভিত্তি কিছু আছে কি? মানুষ বলিতে যতক্ষণ আমরা তাহার দেহকে এবং দেহের সঙ্গে জাত ও বিনষ্ট, দেহ হইতে অভিন্ন চিন্তাদিকে ভাবিব, তাহার দেহকেই তাহার অস্তিত্বের সর্বস্ব বলিয়া ভাবিব, ততদিন এই দৃঢ়ভিত্তির সন্ধান পাওয়াই সম্ভব নয়। কারণ মানুষে মানুষে অসংখ্য ভেদ সেখানে আছে, চিরদিনই থাকিবে;—কর্মগত, জাতিগত, চিন্তাগত, রুচিগত এবং আরো অসংখ্য ভেদ। বর্তমান সময়ে সাম্যবাদী দেশগুলিও যে পরস্পরকে সমদৃষ্টিতে দেখিতে পারিতেছে না তাহার কারণ ইহাই—প্রয়োজনের বিভিন্নতা, স্বার্থের বিভিন্নতা, চিন্তার বিভিন্নতা প্রভৃতি সেখানে সমদৃষ্টির পথে বাধা সৃষ্টি করিতেছে। এই দেহসর্বস্ব ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া সব মানুষকে সমদৃষ্টিতে দেখা সম্ভবই নয়। যেখানে দাঁড়াইয়া যথার্থ সমদৃষ্টি আসে, সে ভিত্তি কি তবে কিছু নাই? আছে; শ্রীরামকৃষ্ণদেব সে ভিত্তির সন্ধান দিয়া গিয়াছেন—মানুষের অস্তিত্বের বৈচিত্র্যময় বহির্দেশে নয়, তাহার গভীরে, গভীরতম প্রদেশে দৃষ্টিকে প্রবেশ করাইয়া আসল মানুষটির দিকে তাকাইলেই সে ভিত্তির সন্ধান মিলিবে। সেখানে সত্যই সব মানুষ এক, সকলেই শিব বা ঈশ্বর—"ঈশ্বর শুদ্ধবোধস্বরূপ, তিনি আমাদের সকলেরই স্বরূপ।"

কিন্তু ইহা শুনিলেই বা বুদ্ধিগত করিলেই তো আর সমদৃষ্টি আসিবে না, এ সত্যকেও প্রত্যক্ষ করিতে হইবে। কারণ প্রত্যক্ষ ছাড়া পাকা বিশ্বাস আসে না। তাই নিজের এবং সকলের মধ্যেই ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ করিবার যোগ্যতা যে পথে আসে, তাহাকেই শ্রীরামকৃষ্ণ সকলকে সমদৃষ্টিতে দেখিবার, সকলকে সমানভাবে ভালবাসিবার পথ বলিয়া গিয়াছেন। বলিয়াছেন, ঈশ্বরে বিশ্বাস ও ঈশ্বরে ভক্তিলাভের প্রচেষ্টাই সে পথ। যথার্থ ভক্তিই সমদৃষ্টি আনিতে সক্ষম—"সব দেশের সব ধর্মের সব লোককে ভালবাসা এটি দয়া থেকে হয়, ভক্তি থেকে হয়।" দয়া এখানে বিশ্বপ্রেম—"সকলকে সমানভাবে ভালবাসার নাম দয়া।" এ ভক্তিলাভের, সর্বভূতে ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করার পথের নির্দেশও তিনি দিয়া গিয়াছেন—প্রাথমিক বিশ্বাস অবলম্বনে "শিবজ্ঞানে জীবসেবা।"

এই "শিবজ্ঞানে জীবসেবা"ই যুগধর্ম, আধুনিক যুগের ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত সব সমস্যার সমাধানের শ্রেষ্ঠ উপায়। মানুষ-জ্ঞানে নয়, ঈশ্বর-জ্ঞানে মানুষের সেবা। নিজের স্বার্থরক্ষার জন্য অবশ্যপ্রয়োজনীয় বলিয়া নয়, মানুষকে কৃপা করিয়াও নয়, ঈশ্বরারাধনা-জ্ঞানে মানবসেবা, সর্বভূতস্থ ঈশ্বরে বিশ্বাস ও ভক্তি অবলম্বনে মানবসেবা। ইহারই মাধ্যমে আমরা কেবল আমাদের আত্মীয়দের, দেশবাসীদের, আমাদের মতাবলম্বীদের বা আমাদের ধর্মাবলম্বীদের বেশী ভালবাসিবার প্রবণতার অবরোধ ভাঙ্গিয়া 'সব দেশের সব ধর্মের সব মানুষকে সমানভাবে ভালবাসিতে' পারিব, সকলের প্রতি সমদৃষ্টিসম্পন্ন হইয়া সাম্যে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিব।

যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণীই আধুনিক যুগের 'সংশয়রাক্ষস-নাশ-মহাস্ত্র' এবং সমদৃষ্টিলাভের শ্রেষ্ঠ পথপ্রদর্শক।

# অপ্রকাশিত পত্র

## (ক) স্বামী ব্রহ্মানন্দের : ( স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লিখিত )

( ১ )

The Math, Belur ( Howrah )
10th June, 1904

My Dear Sashi,

আমি শুনিলাম যে, তোমার শরীর খারাপ হইয়া গিয়াছে, তাহাতে বড়ই দুঃখিত হইলাম। আমার ইচ্ছা যে তুমি দিন কতকের জন্য মঠে আসিয়া থাক ; বিশেষতঃ শ্রীশ্রীমাতা-ঠাকুরাণী এখন কলকাতায় রহিয়াছেন, তাঁহার দর্শনলাভও হইবে। সুতরাং তোমার এখানে একবার আসা খুবই উচিত। তুমি ওখানে অত কাজ করিতেছ। মধ্যে মধ্যে এইরূপ rest না লইলে শরীর breakdown হইবার সম্ভাবনা। অতএব তুমি যত শীঘ্র পার এখানে চলিয়া আসিবে, অন্যথা করিও না।

এখানে সকলে ভাল আছে। তুমি কেমন আছ ? তুমি আমার ভালবাসা জানিবে। শুকুল ও বসন্তকে আমার ভালবাসা দিবে। আমার শরীর একরকম মন্দ নাই। তুমি কবে এখানে আসিতেছ লিখিবে।

Affly yours
Rakhal Raj

( ২ )

শ্রীশ্রীগুরুদেব শ্রীচরণ ভরসা

Sasi Niketan ( Puri )
25th July, 1906

My dear Mohantaji Moharajji of Madras Presidency,

আশা করি তোমরা সকলে ভাল আছ। কালী ভায়ার lecture-এর cuttings খগেন পাঠাইয়াছিল, পড়িয়া বিশেষ সুখ হইল। কালী মহারাজ কোথায় ২ যাইবে বিস্তারিত লিখিয়া যদি পাঠাও তাহা হইলে ভাল হয়। আমার শরীর তত ভাল নাই। প্রথমটা উপকার হইয়াছিল, এখন দিন দিন খারাপ বোধ হইতেছে। শরীরটা একেবারে বিগড়ে গেছে।

Entallyর উপেন এখানে আসিয়াছে। তাহার ৺রামনাথ দর্শন করিতে যাইবার বিশেষ ইচ্ছা। সে এখন বিরাগী বেশে ভ্রমণ করিতেছে। এ সময় ওদিককার climate কেমন ? বর্ষা অত্যন্ত হয় কিনা লিখিবে। আর এখন ওদিকে যাওয়া যুক্তিযুক্ত কিনা সবিশেষ লিখিয়া সুখী করিবে।

তুমি কেমন আছ ? বাবুরাম দাদা ভাল আছে। তোমায় ও কালীকে প্রণাম, ভালবাসা দিতেছি। ইতি

Yours affly
Rakhal

P. S. How is Khagen ? Our love & best wishes to him.

( পুনঃ খগেন কেমন আছে ? তাহাকে আমার ভালবাসা ও শুভেচ্ছা জানাইবে। )

## (খ) স্বামী প্রেমানন্দের :

### ( স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লিখিত )

( ১ )

শ্রীশ্রীগুরুপদ ভরসা

The Math, Balur P. O.
( Howrah )
Dated, 29/4/09

ভাই শশী,

তোমার চিঠি পাইয়া আনন্দিত হইলাম। অভিরামের হাতে শ্রীশ্রীপ্রভুর জন্য যে যে বাসন ও গামছা পাঠাইয়াছ পাইয়া আনন্দিত হইলাম। তুলসীর চিঠি পাইয়াছি। তুলসী কবে বাঙ্গালোরে যাইবে? তাহাকে আমার ভালবাসা ও নমস্কার জানাইবে। লাটু মহারাজের চক্ষু গত সোমবারে কাটানো হয়েছে, কোন কষ্ট হয় নাই। চোখের কোন দোষ হবে না। কালী বাগচি কেটেছে। খরচা গিরিশবাবু দিয়েছেন। সেদিন আমি উপস্থিত ছিলাম। পূজনীয়া শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী এই মাসের শেষাশেষি কলিকাতা আসিবেন। শরৎ মা'র দেশেই আছে, মা'র সঙ্গে আসিবে। এবৎসর এখানে নিত্যই বৃষ্টি হচ্ছে, সে কারণ বেশ ঠাণ্ডা। শ্রীশ্রীমহারাজ কি এখন পুরীতে থাকিবেন? মঠে আর আসিতে চান না। মহারাজের অনুপস্থিতিতে এখানকার কাজ ভাল চলে না। কিছু দিনের জন্য অন্ততঃ আসা উচিত ছিল। তবে সবই শ্রীশ্রীপ্রভুর ইচ্ছা। তুমি আমাদের ভালবাসা ও নমস্কার জানিবে ও সকল ভক্তদের জানাইবে। ইতি দাস

বাবুরাম

( ২ )

শ্রীশ্রীগুরুপদ ভরসা

মঠ
২৫।৫।০৯ ইং

ভাই শশী,

তোমার পত্র যথাসময়ে পাইয়াছিলাম। গতকল্য তোমার পুস্তক পাইয়া অতিশয় আনন্দিত হইলাম। গত পরশ্ব পরম পূজনীয়া শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী কলিকাতায় নূতন বাটীতে পৌঁছিয়াছেন। তাঁর শরীর খুবই শীর্ণ। ১২ নং গোপাল নিউগীর lane, বাগবাজার, তাঁর ঠিকানা। ভক্তিমতী দেবমাতাকে আমার প্রীতি-সম্ভাষণ জানাইয়া মার পৌঁছান সংবাদ দিও। তিনি আমায় ১০৲ টাকা পাঠাইয়াছিলেন আমের জন্য। তাঁহাকে আমার নমস্কার জানাইবে। তোমরা কেমন আছ? গতকল্য শুকুল এখানে এসেছে, আছে ভাল। এখানকার কুশল জানিবে। তুমি আমার ভালবাসা ও নমস্কার জানিবে। ইতি দাস

বাবুরাম

## (গ) স্বামী তুরীয়ানন্দের :

### ( ১ )

**( আলমবাজার মঠ হইতে ৯. ৭. ১৮৯৭ তারিখ স্বামী ব্রহ্মানন্দ কর্তৃক স্বামী অখণ্ডানন্দকে লিখিত পত্রের শেষে যুক্ত )**

ভাই গঙ্গাধর,

তোমার পোষ্টকার্ড পাইয়াছি। তাই তো এবারেও যদি ভাল ফসল না হয় তো বড়ই ভয়ানক। যা আছে ভগবানের মনে, তাহাই হইবে। শশীর প্রেরিত ৫০০৲ টাকা আসিয়াছে। Miss Muller ৫২।৵০ আনার একখানি চেক পাঠাইয়াছে। শারদা শীঘ্রই যশোহর অঞ্চলে যাইবে। নিত্যানন্দকে রাজা এখানে চলিয়া আসিতে বলিয়াছেন। তুমি আমার ভালবাসা জানিবে ও সুরেন··· -কে জানাইবে।

ইতি
শ্রীহরি

### ( ২ )

**( নিকুঞ্জবিহারী মল্লিককে লিখিত )**

শ্রীহরিঃ শরণম্

মায়াবতী
১৬. ৮. '০৫

প্রিয় নিকুঞ্জলাল,

তোমার ১২ তারিখের পোষ্টকার্ড পাইয়া সমাচার অবগত হইলাম। তোমার ২রা তারিখের পোষ্টকার্ডও যথাসময়ে পাইয়াছিলাম। তুমি আবার শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়াছ জানিয়া আনন্দিত হইয়াছি। এইবার নির্দ্বন্দ্ব হইয়া প্রভুর উপাসনায় পূর্ণ মনঃসংযোগপূর্বক প্রকৃত শান্তি অনুভব কর—তাঁহার নিকট এই প্রার্থনা। বহির্মুখী হইয়া জগতের দিকে নেত্রপাত করিলে কেবল অশান্তি ও গোলমাল। বৃথা অশান্তি ডাকিয়া আনিবার প্রয়োজন কি? তুমি পুনরায় রীতিমত আপন ইষ্টচিন্তায় নিযুক্ত হইয়া সুখশান্তি উপভোগ করিতেছ জানিতে পাইলে বিশেষ প্রীতিলাভ করিব। আমার শরীর প্রায় পূর্ববৎই আছে। দু-এক মাস এখানে থাকিয়া শীতারম্ভে অন্য কোথাও যাইবার ইচ্ছা আছে। যথাসময়ে তোমায় জানাইব। বিপিনকে আমার শুভেচ্ছাদি দিবে। নাটানিকুঞ্জের উপরের ঘরে এখন কেহ আছে নাকি? কামিনীবাবু ওখানে আছেন কি? তাঁহার খবর পাই নাই। সকল পরিচিতদিগকে সম্ভাষণাদি জানাইবে। মোহন্তজিকে আমার নমস্কার দিবে। তুমি আমার ভালবাসা ও শুভেচ্ছা জানিবে। ইতি—

শ্রীতুরীয়ানন্দ

পণ্ডিত জগন্নাথকে আমার সম্ভাষণ দিও, আমি তাহাকে পত্র লিখিতে পারি নাই, ইহাতে দুঃখিত আছি। ত্রিপুরাকুঞ্জের খবর লিখিও।

# শ্রীরামকৃষ্ণ ও হাটে প্রেমের হাঁড়ি-ভাঙ্গার রঙ্গ-কথা

## স্বামী বুধানন্দ

( ১ )

'প্রভুর প্রতিজ্ঞা ছিল শুন বিবরণ।
হাটেতে ভাঙ্গিব হাঁড়ি যাইব যখন॥
সেই হাঁড়ি-ভাঙ্গা রঙ্গ আজিকার দিনে।
কি ভাবে ভাঙ্গিলা হাঁড়ি শুন এক মনে॥'[১]

দক্ষিণেশ্বরে থাকাকালীন শেষের দিনে ঠাকুর একদিন বলেছিলেন : যাবার আগে প্রেমের হাঁড়ি ভেঙ্গে দিয়ে যাব।[২]

যেমন কথা তেমন কাজ।

সেই হাটে হাঁড়ি-ভাঙ্গার দিনটি এসেছিল ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুআরি তারিখে।

ভাবতে সত্যি আশ্চর্য লাগে না কি যে, অবতীর্ণ ভগবান নিজ প্রেমের হাঁড়ি ভেঙ্গেছিলেন আমাদের এই সমস্যা-সমাকীর্ণ কলকাতা শহরের উপকণ্ঠে। হাঁড়ি ভেঙ্গে নিজ লীলা পুষ্ট করেছিলেন অপ্রকট হবার সাড়ে ছয় মাস আগে।

শ্রীরামচন্দ্র দত্ত প্রমুখ ভক্তগণ ঠাকুরের ঐ দিনের আত্মপ্রকাশকে 'কল্পতরু রূপ প্রদর্শন'[৩] বলে বিখ্যাত করেছেন ; কিন্তু স্বামী সারদানন্দ লিখেছেন : '...উহাকে ঠাকুরের অভয়প্রকাশ অথবা আত্মপ্রকাশপূর্বক সকলকে অভয়-প্রদান বলিয়া অভিহিত করাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত।'[৪]

ঐ মহিমামণ্ডিত দিনটি কিন্তু গৃহী ভক্তদের কেন্দ্র করেই অভিব্যক্ত হয়েছিল। সেই জন্যেই বোধ হয় গৃহী ভক্তদের দেওয়া 'কল্পতরু' নামটিই 'লীলার ঈশ্বর'-এর ইচ্ছায় সর্বজন-গ্রাহ্য এমন ভাবে হয়েছে যে, সন্ন্যাসীরাও ঐ নামেই ঐ দিনের উৎসব করেন।

তবে একটি কথা আছে। ভাববার কথা।

আমরা এমন যেন মনে না করি যে, ঐ 'কল্পতরু' নামের আধারে ঐ দিনে অভিব্যক্ত রামকৃষ্ণ-কৃপার সমগ্র আধেয়টি ধরতে পেরেছি। ঐ দিনের ঐ চৈতন্য-ভাস্বর ঘটনাটি একটি মূল-বৃন্ত-হীন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। ঐ ঘটনাটি অবতীর্ণ ভগবানের একটি কৃপা-প্রেরিত মরমিয়া আত্ম-প্রকাশ। শ্রীরামকৃষ্ণ-আবির্ভাবের অনেক কথাই তাই এসে পড়ে।

একথা সম্পূর্ণরূপে মানি যে, আমাদের সহজ ঠাকুরকে কঠিন করে বুঝতে চাওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। কিন্তু এটি মনে রাখতে হবে যে, তিনি সহজ হয়েও অমেয়, কাছের মানুষটি হয়েও নিঃসীম। তাই কোন শব্দসমষ্টির বাঁধা ছাঁচে তাঁকে পুরোপুরি ধরে ফেলা যাবে না। মুঠোর মধ্যে গোটা আকাশটাকে যেমন যায় না ধরা, যদিও যায় ছোঁয়া, তেমনি কোন শব্দার্থের মুঠোয় শ্রীরামকৃষ্ণের কোন প্রকাশের সমগ্র বেদন-ব্যঞ্জনাকে যায় না ধরা, যদিও যায় আভাসে পাওয়া।

পূর্ণের এক কণাও পূর্ণ। তাই বলি 'কল্পতরু রূপ প্রদর্শন' কথাগুলিতে শুধু আভাষই আছে। আছে শুধু একটি ইঙ্গিত—একটি বিপুল আলোক-রাজ্যের অনু-রঞ্জন, তার বেশী নয়।

---

১ শ্রীঅক্ষয়কুমার সেন : শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথি, উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা, ১৩৩১, পৃঃ ৬০৬

২ দ্রষ্টব্য : সেবক রামচন্দ্র : শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের জীবন-বৃত্তান্ত, যোগোদ্যান, কলিকাতা, ১৩৪১, পৃঃ ১৮৩

৩ ঐ : পৃঃ ১৮৪

৪ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, দ্বিতীয় ভাগ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা, ১৩৭২, পৃঃ ৩৯৬

কল্পতরুর কাছে দাঁড়িয়ে চাইতে হয়। যা চাওয়া তাই পাওয়া যায়। ঐ দিনের ঘটনাটিই ধরা যাক। শরীর অত অশক্ত—আহা, বিছানায় উঠে বসতেও কতই না কষ্ট! তবু ভব-মূল শিথিল করে ভ্রাম্যমাণ হলেন কল্পতরু। ঐ উঁচু উঁচু কাঠের সিঁড়িগুলি বেয়ে নীচে নেবে এসে নিজেই ভাঙ্গলেন অমৃত-গড়া প্রেমের হাঁড়ি ভক্তদের সত্তার নিগূঢ় অন্তরে—তবে না হল চৈতন্যের অত ছড়াছড়ি, যেন মুড়ি-মুড়কি।

হাড়গুড়ানো, গলা-কাটা সাধন করে যা হয় না জন্ম-জন্মান্তরে যুগ-যুগান্তে, সে চৈতন্য ঘটে ঘটে ফুটল খোলায় চড়ানো খই-এর মতো। এমন অত্যাশ্চর্য ব্যাপার কেউ কি কখনো শুনেছে পুরাণে, কল্পকথায়, ইতিহাসে? তবু হয়েছিল ঐরূপ ঐদিন আমাদের এই কলকাতায়।

কে চেয়েছিল চৈতন্য-স্ফুরণ সেদিন?

কে পেয়েছিল চাইবার পরে?

কে-ই বা ছিল অধিকারী?

কিন্তু তবু একটি ঈশ-অভীপ্সার কারুণ্য-বেগে সমগ্র কৃপাসাগর বিন্দুবদ্ধ করে যে মহাবাণী উচ্চারণ করলেন একটি মৃদু নিঃশ্বাসের পেলবতায়, তার অপার অমোঘ শক্তিতে কি না ঘটল খণ্ড পলকে! ছিন্ন হল কর্মপাশ, কলুষ হল কৃত্য, খণ্ডিত হল কালডোর। চৈতন্য হল পুষ্পিত জর্জরিত জড়ের অনাহত হৃদয়-গুহায়। চোখে দেখলো—যা ধ্যানেও দেখা যেত না।

সে দিন অধিকারি-নির্বিশেষে চৈতন্য জাগ্রত করলেন। তারপর উপরে এসে অসহ্য গাত্র-দাহ। গঙ্গাজল সারা পায়ে গায়ে মেখে তবে কোন প্রকারে স্বস্তি। মায়ের কথায়, শুধু রসগোল্লা খেতে তো আর আসেননি! তাই বিদ্যুৎ-পলকে সকলের পাপ টেনে নিয়েছিলেন ঐ ভগবতী-তনুতে। সে জ্বালাময় ইতিহাস কি আমরা মনে রাখি! উৎসবের আনন্দে মত্ত হয়ে ভগবানের বেদনাটুকু ভুলে যাই। ভাবি ভগবানকে পেয়েছি আমরা কেঁদে—সাধন করে। তিনি যে কত কেঁদে কেঁদে সেধে সেধে আমাদের অবরুদ্ধ চৈতন্যের দোর গোড়ায় ধন্না দিয়ে অনাহারে পড়েছিলেন, সে কথা আদপে জানিইনে।

( ২ )

ঠাকুর কল্পতরু—এ তো অতি সামান্য কথা। তাঁর অসামান্য ব্যথার কথা আমরা কি জানি? তিনি যে অযাচিত হয়ে দ্বারে-দ্বারে ঘুরে-ঘুরে চৈতন্য বিতরণ করেছেন গো! সাধনশেষে কলকাতার কাছাকাছি কোথায় যাননি অনাহূত, অযাচিত? যখনই শুনেছেন কোথাও কেউ আন্তরিক সাধন করছে, তারই দুয়ারে উপস্থিত হয়েছেন মান-অপমানের তোয়াক্কা না রেখে। শেষ-সহজের এই চৈতন্য-অভিসারের কাব্যকথা হয়ত কোন দিন কোন মহাকবি রস-নিপুণতায় ব্যক্ত করবেন। সেদিন হয়ত জানিনি কে এসেছিলেন, কেন। আজ তো আমরা জানি কে এসেছিলেন চাদর মুড়ি দিয়ে সাধকের ঘুমন্ত চৈতন্যের উন্মুখতায় শাশ্বত চৈতন্যের অমর্ত্য অব্যর্থ স্ফুলিঙ্গ রেখে যেতে। অনগ্রতির অদৃশ্য শৃঙ্খলে যারা ছিল বদ্ধ, যাদের সত্য ছিল হিরণ্ময় পাত্রের আবরণে আবৃত, পথের নেশায় যারা তীর্থ ছাড়িয়ে চলেছিল সেই হারানো নিরুদ্দেশে, যারা নুড়ি নিয়ে খেলতে যেয়ে ভুলে গিছল সোনার খনির কথা, যারা ইষ্টা-পূর্তের আবর্তে পূর্তি খুঁজে খুঁজে ভুলেছিল ইষ্টকে, যারা গোঁড়ামিকে আঁকড়ে ধরেছিল ধর্ম বলে, যাদের ধর্মে ছিল না মর্ম, যারা অবস্তুকে মেনে নিয়েছিল বস্তু বলে, যাদের 'বস্তু'-বোধে ছিল অবুঝের তমো-তন্দ্রা—তাদের

কার প্রাণের মশাল জ্বালিয়ে দেননি ঠাকুর জ্ঞাতে অজ্ঞাতে ?

প্রভাতে উঠে দেখি ফুল ফুটেছে। কিন্তু তার পেছনে ধরিত্রীর রয়েছে কত অতন্দ্র সাধনা। এত যে যোগী সিদ্ধ আপ্ত পুরুষ-নারীদের হাট বসল দক্ষিণেশ্বরে তার পেছনে ঐ চৈতন্য-পুরুষের কত ছিল অতন্দ্র সাধনা তার হিসেব কেউ দিতে পারবে না। এ তো আর ঐন্দ্রজালিকের ভেল্‌কি নয়। এ যে প্রাণার্পণ জগত-তারণের সব দেওয়ার সাধনা —তবে তো কুন্তন-কলিডোর।

কল্পতরুর কাছে গিয়ে চাইতে হয়। তাঁর কাছে গিয়ে যে চাইতেও হয়নি, একমাত্র প্রতিধ্বনির মত ছাড়া। নরেন্দ্রকে প্রথম দিনে কি বলেছিলেন ? তুমি এত বিলম্বে এলে কেন? আমি যে তোমার পথ চেয়ে উন্মুখ হয়ে আছি ! ঐটিই পুরাণো কবির বিশ্বজোড়া হৃদয়ের আদি ব্যথা—*তুমি এত বিলম্বে এলে কেন ?* ভগবানের আকুতিতেই বিশ্ব ভবে রয়েছে। জীব আর কতটুকু চাইতে জানে।

তিনি তো নিম্নমূল বদ্ধমূল কল্পতরু নন যে, কাছে গিয়ে কথার ঝাঁকা দিয়ে দুটি ফল কুড়িয়ে নিলে ফুরিয়ে যাবেন। তিনি অস্পর্শ্য লোকের উর্দ্ধমূল অধঃশাখ শাশ্বত তরু ; আপন করুণায় সদা পরিব্রিয়মাণ শাখা-প্রশাখায়, পল্লবে-ফুলে-ফলে সকল জীবকে সদাই ধারণ করে আছেন।

কবির সেই ব্যথার গাঁথা কি মর্মে-মর্মে সত্যি নয় :

"আমি তো তোমারে চাহিনি জীবনে
তুমি অভাগারে চেয়েছ।"

তিনি চেয়েছিলেন আগে, আমরা চাইবার অনেক আগে। এত সাধনা করলেন কার জন্যে ? অত সাধনার ফল নিঃশেষে কার জন্যে দিয়ে গেলেন ? ঐ যে সাধন-শেষে কুঠির-ছাদের ওপর থেকে হৃদয়-নিঙরানো, অসহ-বেদনা-বিদগ্ধ আকাশভরা ক্রন্দন তার কি কোন তাৎপর্য নেই, নেই কোন যোগ-সূত্র হাটে হাঁড়ি-ভাঙ্গার সঙ্গে ? এমনটি না হলে কি করে হল ঐ চৈতন্য তথা 'সুলভ সমাচার' ? ঐ ঈশ-ক্রন্দন গিয়ে আঘাত করল অর্ধনিদ্রিত মোহাচ্ছন্ন জীবের 'হৃদয়-তন্ত্রীতে। জাগৃতি অনুরণিত হয়ে উঠল প্রাণে প্রাণে। অভিযাত্রীরা একে একে আসতে শুরু করল।

খরস্রোতা ঘোর আবর্ত-সংকুলা বাসনা-নদীর উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল ঢেউগুলি ভেঙে ভেঙে উজান বেয়ে গিয়ে আমরা কি ভগবানকে চাইতে জানি ? না পারি ? একছিটে ভক্তি নিয়ে বড়াই করি—এ আমার নিজস্ব দেয় ! কিন্তু মরমীর হিসেব খতালে দেখা যাবে যে আমার এমন অণুটিও দেয় নেই যা তাঁর কাছ থেকে পাইনি। ভগবৎ-হৃদ্‌-স্পন্দনের *যে অনুকম্পন জীব-হৃদয়ে হয়, সেই হল ভক্তি।*

ভবতারিণীর জন্যে যত কেঁদেছিলেন—নরেনের জন্যে কি তার চেয়ে কম কেঁদেছিলেন? নরেনের জন্যে কাঁদা মানে জীবের জন্যে কাঁদা। জীবের জন্যে কাঁদা মানে তাদের চৈতন্য-জাগানোর আসর জমানো। কত ধৈর্য ধরে, কত দুঃখ সয়ে, কত আশা-প্রতীক্ষায় ধীর-অধীর হয়ে, হেসে-খেলে, নেচে-গেয়ে, কর্ম-কঠোর হয়ে, অতন্দ্র ভক্ত তপস্যা করে আধার তৈরী করে তবে চৈতন্য আধেয় রাখতে পেরেছিলেন। তা না হলে ভঙ্গুর মাটির সরায় কি আর মায়া-বিধ্বংসী চৈতন্যাগ্নির আধেয় ধরত ?

চৈতন্য-জাগানোর কাজ ঠাকুর বরাবরই করে এসেছেন। তা না হলে ডোবার ঝিনুক ঐ চীনু শাখারী ঐ সমুদ্রের শঙ্খকে চিনেছিল কি করে ? এই গুরুমারা বিদ্যেটা

ঠাকুরের এতই মজ্জাগত ছিল যে, এমনকি নিজ গুরু ভৈরবী ও ন্যাঙটাও তাঁদের অলোক-সামান্য শিষ্যের সংস্পর্শে নব-চৈতন্য লাভ করেছিলেন।

তারপর দক্ষিণেশ্বরে যখন আনন্দের হাট জমল তখন কত লোক যে এই লেলিহান চৈতন্য-মঙ্গলের উল্লম্ফমান বহ্নিশিখার স্পর্শে নিজ চৈতন্য দীপ্তিমান পেয়েছিলেন তার সংখ্যা কেউ রাখেনি। স্বামী সারদানন্দ লিখেছেন কল্পতরু দিনে চৈতন্য-জাগানো-প্রসঙ্গে :

"কোন কোন ভক্তের প্রতি করুণায় ও প্রসন্নতায় আত্মহারা হইয়া দিব্যশক্তিপূত স্পর্শে তাহাকে কৃতার্থ করিতে আমরা ইতিপূর্বে দক্ষিণেশ্বরে প্রায় নিত্যই দেখিয়াছিলাম···।"[৫]

কেন-না ঐ করতেই তো এসেছিলেন। কাজেই কল্পতরু দিনেও হয়েছিল পূর্বানুবৃত্তি —তবে একটু বিশেষ ভাবে।

৩

'সম্ভবামি যুগে যুগে' বলেছিলেন কৃষ্ণাবতারে। যিনি অসম্ভব তাঁর এই সম্ভব হবার দুর্বার ও দুরূহ প্রচেষ্টা কেন? এসব 'বে-আইনী'র ঝামেলা কেন?

উদ্দেশ্য কি?

উদ্দেশ্য দুটো।

দুষ্কৃতনাশন ও ধর্মসংস্থাপন।

কিন্তু এই পাঁচ-পোয়ার ঘটিতে অসীমকে আঁটিয়ে নিয়ে এত সব কাণ্ড করতে এলেই বা কি হবে? কে চিনতে পারবে? আক্ষেপ করে কৃষ্ণ বলেছিলেন অর্জুনকে—মানুষ-তনুতে আশ্রিত হয়ে এসেছি বলে মূঢ়েরা চিনতে পারে না আমাকে।

ঠাকুরও বলেছেন রহস্যচ্ছলে অবতীর্ণ ভগবানের একটি গুহ্য শংকার কথা :

'বাউলের দল হঠাৎ এলো—নাচলে, গান গাইলে; আবার হঠাৎ চলে গেল! এলো—গেল, কেউ চিনলে না।'[৬]

এখন ভাল মানুষের মত বলা হচ্ছে 'কেউ চিনলে না'। চিনবে কি করে, রেখেছ যে চোখের মাথা খেয়ে। মায়ামোহে চুবিয়ে জীবকে করে রেখেছ উর্ধ্বশ্বাস, চিনবার অবসরটি কোথায়?

'·· মন দিয়েছ, মনেরে আঁখি ঠারি।
( ওমা ) তোমার সৃষ্টি দৃষ্টি পোড়া
মিষ্টি বলে ঘুরি।'[৭]

নিজেই কিন্তু বলেছেন, তার মায়াতে ভুলে জীব সংসারী হয়েছে',[৮] আবার এখন বলা হচ্ছে : 'কেউ চিনলে না'; দাও না সরিয়ে চোখের আবরণ, দাও না ফুটিয়ে দিব্যচক্ষু, তখন দেখবে চিনি কি না চিনি তোমায়।

ভগবানে মানুষে তফাত সামান্যই। ভগবান হচ্ছেন সেয়ান-পাগল, মানুষ হচ্ছে অজ্ঞান-পাগল।

তাই শুধু যুগে যুগে এলেই হয় না। লজ্জার মাথাটি খেয়ে বলতেই হয় : ওগো, আমি এসেছি। চেয়ে দেখো না কেমনটি এসেছি আমি। কেমন নয়ন-অভিরাম রূপ, কিরীট, অলংকার, জ্যোতি, আয়ুধ-সমন্বিত হয়ে এসেছি। কেন এলাম? ও তোমরা যে সব গোলমাল করে বসে আছো গো। তাই সব আবার সাজিয়ে গুছিয়ে দিতে এলাম।

---

৫ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ ( দ্বিতীয় ভাগ ), উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা, ১৩৭২, পৃঃ ৩৮৫

৬ শ্রীম : শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ( তৃতীয় ভাগ ), ১৩৭৫, পৃঃ ২৬৪

৭ রামপ্রসাদের গান থেকে।

৮ শ্রীম : শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ( প্রথম ভাগ ), কথামৃত ভবন, কলিকাতা, ১৩৭৫, পৃঃ ৪৪

আসলে কিন্তু অবতরণ-উন্মুখ ভগবান। তর সয় না মোটে। ভক্ত ছাড়া থাকতে পারেন না। তাই অছিলা খুঁজে বেড়ান! সে যাই হোক, আমাদের বড় লোকের রহস্য-কথায় কাজ কি?

তাই অন্য কাজের কথাই হোক। সব অবতারকেই নানা ভাবে কতিপয় ভক্ত সাধকের কাছে আত্ম-পরিচয় দিতে হয়েছে। অর্জুনকে রথের সারথ্য করে, দিব্যচক্ষু দিয়ে, বিশ্বরূপ দেখিয়ে, নিজের বিভূতি নিজে বর্ণনা করে তবে বোঝানো গিয়েছিল তিনি এসেছেন। তবে তো অত স্তুতি করেছিলেন অর্জুন অন্তর থেকে :

ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ-
ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম
ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ ॥
পিতাঽসি লোকস্য চরাচরস্য
ত্বমস্য পূজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান্।
ন ত্বৎসমোঽস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোঽন্যো
লোকত্রয়েঽপ্যপ্রতিমপ্রভাব।[১]

পূর্বে কোন কোন অবতারে অনেক ঐশ্বর্য বিভূতি দেখিয়ে, অনেক মাথাকাটাকাটি রক্তারক্তিকাণ্ড করে তবে দুষ্কৃত-নাশন ও ধর্ম-সংস্থাপন করতে হয়েছিল।

বুদ্ধ-অবতার থেকে আরম্ভ করে বাইরের ঐশ্বর্য-বিভূতির যেমন কমতি পড়েছে, তেমনি মাথাকাটাকাটিও বাদ পড়েছে। মানুষ হঠাৎ বেশী সভ্য হয়ে গিয়েছিল বলে তত নয়। কারণ এরূপও হতে পারে যে কিছু সংখ্যক মাথা কেটে ফেলে আর ধর্মসংস্থাপনের উপায় ছিল না।

শাস্ত্রে আছে যে, ধর্ম যখন ছিলেন চার পায়ে দাঁড়ানো গাভীর মতো, তখন ছিল সত্য যুগ। সংস্থাপিত ধর্মের যুগ। অধর্ম তখন একটা সমস্যা ছিল না বললেই হয়। ক্রমে ধর্ম যখন হলেন তিন পায়ে দাঁড়ানো গাভীর মতো তখন কয়েকটি দুষ্কৃতের মাথা কেটে ফেলে ধর্মসংস্থাপন করতে হয়েছিল। পরের যুগে ধর্ম যখন হলেন দু পায়ে দাঁড়ানো গাভীর মতো, তখন দুষ্কৃত-নাশনের ব্যাপারে রক্তারক্তি আরো বেশী করতে হল। কলিযুগের ধর্মকে বলা হয়েছে শাস্ত্রে একপায়ে দাঁড়ানো গাভীর মতো। এ যুগে যদি মাথা কেটে ধর্মস্থাপন করতে হত তা হলে ঝাড়সুদ্ধ উজাড় হয়ে যাবার সম্ভাবনা ছিল। কয়টা মাথা অবশিষ্ট রইল তা গুণবার লোক বেশী একটা থাকত না।

তাই মনে হয় অবতীর্ণ ভগবান ধর্মস্থাপন-কৌশল বদলে নিলেন। বুদ্ধ অবতার থেকে আরম্ভ করে দেখতে পাই **দুষ্কৃত**-নাশের উপর জোর না দিয়ে **দুষ্কৃতি**-নাশের উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। এমনি করে ধর্ম-সংস্থাপনের ব্যাপারে একটা বিবর্তনের ধারা স্পষ্টই চোখে পড়ে। এমন কি দেখা যায় যে হাড়-পাপীরাও ঈশ-করুণার একটি বিশেষ অংশ আয়ত্ত করে নিচ্ছেন।

অম্বাপলী ও অঙ্গুলিমালকে বুদ্ধ বিশেষ কৃপা করলেন, ভর্ৎসনা পর্যন্ত করেননি। ম্যারী ম্যাক্‌ডেলিন প্রমুখ অধর্মাচারী শ্লথ-চরিত্রের প্রতি যীশু দেখালেন বিশেষ করুণা। শ্রীচৈতন্যের বিশেষ কৃপা বর্ষিত হল জগাই-মাধাইর উপর। অনেক পাপকর্ম করেও গিরিশ ও তাঁর গোষ্ঠীর লোকেরা ঠাকুরের বিশেষ কৃপার ভাগী হলেন। এই দুষ্কৃতিনাশের ও ধর্মসংস্থাপনের ব্যাপারে প্রত্যেক অবতারের নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য অনুধ্যানের বিষয়।

---

১ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ১১।৩৮।৪৩

বুদ্ধ অবতারে চরিত্র-বলে বোধি জাগিয়ে হল দুষ্কৃতি-নাশন ও পঞ্চশীলের শালীনতায় মৈত্রী-প্রেম-করুণায় অভিষিক্ত করে হল ধর্ম-সংস্থাপন।

যীশু অবতারে অবতীর্ণ ভগবান দুষ্কৃতের মাথা না কেটে অন্যথায় আপন রুধিরধারায় করলেন জীবের পাপ-মোচন। আর ধর্ম-সংস্থাপন করলেন ভগবৎশক্তির নিদর্শন সহায়ে—বাইরের বিভূতি ও ভেতরের সম্ভূতি সহায়ে। তাঁর মাঝেও ছিল বোধি-জাগানোর সৌকর্য। পুনরুত্থানের পরে যীশু নিজ শিষ্যদের মধ্যে বোধিকেই বিশেষভাবে জাগ্রত করলেন।

চৈতন্য অবতারে অবতীর্ণ ভগবান ভক্তির উদ্দাম জোয়ারে ভাসিয়ে নিলেন অধর্মের জঞ্জাল, আর তাতেই পড়ল মানুষের মনের জমিতে ধর্মের পলি, যাতে করে ফলেছিল অমন আধ্যাত্মিক সোনার ফসল।

( ৪ )

রামকৃষ্ণ অবতারে অবতীর্ণ ভগবান এলেন নিরাভরণ হয়ে, এলেন ঐশ্বর্যহীন প্রায়দিগম্বর, ধূলি-আসন, অত্যন্ত সাধারণ সর্বজনের মানুষ হয়ে। তাঁর দুষ্কৃতি-নাশন ও ধর্ম-সংস্থাপনের ব্যাপারটি যুগ-প্রয়োজনে হয়েছে বিচিত্র। প্রথমে ভক্ত হয়ে, সাধক হয়ে, অনেক খড়-কাঠ পুড়িয়ে হাতে-নাতে দেখালেন ভগবান আছেন। তারপর প্রকাশ করলেন কোন কোন ভাগ্যবানের কাছে যে, তিনি আর কেউ নন—যিনি ধূলায় গড়াগড়ি দিয়ে কেঁদে-কেঁদে বলছিলেন: ও জীব, তোমার পায়ে ধরে বলি হরি-নাম বলো, তিনিই—শ্রীহরি।

তারপর একেবারে পাইয়ে দিতে ব্যস্ত হলেন।

রামকৃষ্ণ অবতারের ধর্ম-সংস্থাপনের ধারাটি এই: শুধু যে এসেছিলেন তা নয়। মানুষের প্রাঙ্গণে-অঙ্গনে নৃত্যে-গানে-কথায়-অশ্রুতে নিজেকে ধূলির সঙ্গে একেবারে মিশিয়ে দিয়েছিলেন। এতটুকু ব্যবধান রাখেননি, এসে নিজেকে একেবারে বিলিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু দিলেই কি আমরা নিতে জানি? চাই একেবারে পাইয়ে দেওয়া। তাই অতন্দ্র সাধনায় একেবারে পাইয়ে দিতে ব্যস্ত হয়েছিলেন। তাঁর এই পাইয়ে দেওয়ার সাধনার সঙ্গে হাটে প্রেমের হাঁড়ি-ভাঙ্গার কাণ্ডটি বিশেষভাবে জড়িত।

তাই জগৎকে বেশীবার মিথ্যা না বলে বললেন: মা-ই সব হয়েছেন। ন্যাজা-মুড়ো বাদ দিয়ে মর্ম-কেন্দ্রিক ধর্ম দিলেন। দিলেন একেবারে নির্যাস-বস্তু, অবস্তু বাদ দিয়ে। তাই বিজ্ঞানের কথা এত করে বললেন: দুধের কথা কানে শুনলে বা চোখে দেখলে বা মাত্র চেখে দেখলে চলবে না। ভাল করে খেয়ে পুষ্ট হতে হবে। তবে বাহাদুর।

নিত্য-লীলা দুই-ই নিলেন। তা না হলে ওজনে কম পড়ত যে। মায়া বলে জগৎকে উড়িয়ে না দিয়ে জগতের মা-কে ভিড়িয়ে দিলেন মোহাচ্ছন্ন মানুষের চৈতন্যের দোর-গোড়ায়। কারণ মায়ের সন্তান না হলে জীব হয়ে পড়ে মায়ার কীট।

আর জগতের মাকে অমনভাবে 'আমার মা' বলে পেতে কি কম সাধ্য-সাধন করতে হয়েছিল! রুধির-প্রিয়াকে গলা কেটে দিতে চেয়ে তো হল দর্শন। এত করলেন কেন? মায়ার কীট যাতে মায়ের সন্তান হয়ে বেঁচে-বর্তে যায় সেজন্যে।

দুষ্কৃতি-নাশন করলেন ঠাকুর খণ্ডন-ভব-বন্ধন হয়ে। ভব-বন্ধন-খণ্ডন করলেন কেমন করে? বহু কেঁদে বুক ভাসিয়ে। সম্মুখে

প্রত্যক্ষ ভগবানকে ধরে দিয়ে। চির-উন্মদ প্রেম-পাথার হয়ে। কলুষকে কৃত্যে পরিণত করে। আর আচম্বিতে চৈতন্য-বিদ্যুদাঘাতে।

প্রথমে দেখালেন ভক্ত কেমন করে সব শক্তি দিয়ে একাগ্র হয়ে সাধন করে তাঁর কৃপায় তাঁকে হাতে-নাতে পায়। তারপর দেখালেন নিজ আচরণে ভক্তকে পরমার্থ পাইয়ে দিতে কত ব্যগ্র ভগবান নিজে। এতে দুষ্কৃতি-নাশন ও ধর্ম-সংস্থাপন দুই-ই হল।

ধর্ম-সংস্থাপন করতে ঐ যুগ-কুরুক্ষেত্রে ঠাকুরকে কম লড়াই করতে হয়নি। যুগ-সন্ধিক্ষণে ধর্মকে আপাতবিরুদ্ধ শক্তির লড়াই করে করেই দৃঢ়মূল হতে হয়। ইতিহাসের এ ধারা ঠাকুরের সময়েও অব্যাহত ছিল। তবে তার ছিল প্রকার-ভেদ।

তাই দেখতে পাই প্রবল শৌর্যশালী অবিশ্বাস ও সংশয়ের তরঙ্গ তুলে প্রমাণের সুতীক্ষ্ণ দাবী ঘোষণা করতে এলেন নরেন্দ্রনাথ। পাপ ও উচ্ছৃঙ্খলতার মূর্তি ধরে এলেন ভৈরব গিরিশ। ঐহিকতা ও প্রত্যক্ষবাদের ঠোঁট-কাটা স্পষ্টতায় ঝাঁঝানো হয়ে এলেন ডাক্তার মহেন্দ্র সরকার। এঁরা যে জোড়ালো পূবপক্ষ উত্থাপন করলেন তাতে ছিল কালের কলহ-পরায়ণ কঠিন সংশয়-দ্বন্দ্বের প্রশ্নগুলি। ঐগুলির সুগ্রাহ্য সুমীমাংসা করেই শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্ম-সংস্থাপন করতে পেরেছিলেন অমন সহজ প্রফুল্ল স্নিগ্ধতায়।

নরেন্দ্র যেদিন কালী মানলেন, ঠাকুরের আনন্দ হয়েছিল অসীম। কারণ নরেন্দ্র কালী না মানলে সর্বজনকে চৈতন্যের অধিকারী করার মর্মটি সুদুরূহ থেকে যেত। মা-ই সব হয়েছেন কিনা। তিনিই চতুর্বর্গদাত্রী জীবের চৈতন্য খালি-পেটে তো আর হবে না। এখন এত লোককে পেট ভরে হরেক রকমের খেতে দেয় কে? তাই জগতের মা-কে আমার মা বলে না পেলে জীবের গতি নেই। চতুর্বর্গ-দাত্রী আর কেউ নেই। রামকৃষ্ণের এই পরম-কুশলী সর্বকালের সর্বজনের সর্বলাভ-পরিকল্পনাটি একটি অত্যাশ্চর্য ভাববার বিষয় নয় কি? নরেন্দ্র ঐ সত্যধারাটি ধরে যুগধর্ম পরে প্রচার করে ভাবিকালের চৈতন্য-জাগানোর উপায়টি সুভগ করে রেখে যাবেন বলেই হয়ত অত আনন্দ হয়েছিল ঠাকুরের নরেন্দ্র কালী মানায়।

গিরিশের পাপ নিলেন। কেন, না তিনি কপালমোচন। মেঘের আবরণ না ঘোচালে সূর্যের আলো প্রকাশিত হত কি করে?

প্রত্যক্ষবাদের ও বিজ্ঞানের প্রতিনিধি ভারতে সায়েন্স এসোশিয়েসনের প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ সরকারের সকল বাক্যবাণ সয়ে ওঁকে ধীরে ধীরে আয়ত্তে আনলেন ঠাকুর, কারণ এ যুগে ধর্ম-সংস্থাপন বিজ্ঞানের প্রশ্ন না মিটিয়ে করা চলবে না। তাই নরেন্দ্র ও অন্যদের হাতে ত্রস্ত বালকের মতো বারে বারে পরীক্ষিত হতে উদ্‌গ্রীবভাবে রাজী হলেন। নিজেই বললেন বাজিয়ে নিতে তাঁর অনুভূতি ও কথা। প্রত্যক্ষের উপেক্ষা নেই, অপেক্ষা আছে। ভগবানের শ্রদ্ধার নিদর্শন তাই দেখতে পাই অণুর অন্তরের বিচিত্র বিশ্বে।

ঠাকুর তাঁর বিচিত্র ধর্ম-সংস্থাপনের ধারাটি প্রবাহিত করেছিলেন ঐ রুগ্ন শয্যায় শায়িত থেকে। কেনই বা নয়—'একাংশেন স্থিতো জগৎ' যে।

( ৫ )

আরো কথা আছে। নিগূঢ় কথা। ঠাকুর আরো আন্তর ভাবে ও গোষ্ঠি-ব্যষ্টির মাঝে ধর্ম-সংস্থাপন করলেন, তন্ত্র-যোগ-ভক্তি-বেদান্ত শাস্ত্রের সিদ্ধান্তগুলি প্রত্যক্ষ করে ও করিয়ে।

মা-কে সদাই দেখছেন—কথা কইছেন—সঙ্গে নিয়ে ফিরছেন—মা বৈ কিছুই জানেন না। একঘর লোকের সঙ্গে কথা কইছেন, হঠাৎ এলেন মা বানারসি শাড়ি পরে—স্বাগত জানালেন ঠাকুর। অন্য কেউ দেখতে পেল না—কিন্তু শুনতে পেল তো সত্যপুরুষের মুখ থেকে: মা এসেছেন। এই না-দেখার দেখা, ঐ কি কম দেখা গো? কার গাত্র হয়ে ওঠেনি কণ্টকিত?

মা আছেন ও এসেছেন—এ পরোক্ষ অনুভূতিই কি কম প্রত্যক্ষ? এখন শুধু দর্শন সাফ করে নিলেই হলো। কতটা পথ এগিয়ে-এগিয়ে থাকা গেল। এ যে একেবারে পথের শেষের ঈশ-অঙ্গন। এত আলো ক'রে রেখে গেছেন সব। আর কেন অন্ধের দ্বারা নীয়মান হব—সে অন্ধ যত বড পণ্ডিতই হোক?

কাশীপুরে থাকাকালীন শরীরে এত নিদারুণ যন্ত্রণা অথচ ঈশ্বরীয় কথার বিরাম নেই। বসে আছেন সহাস্যবদন। খেলছেন ফুল নিয়ে। সংসারের কণ্টকিত দুঃখবৃন্তে ফুটে আছেন একটি আলোক-ঝলমল আনন্দ-শতদল।

এই সেই কূটস্থ যোগীর অবস্থা—কামারের নাই-এর ওপর শত-সহস্র আঘাত করছে—তবু নির্বিকার। 'যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে।' যাঁরা প্রত্যক্ষ করলেন এ অবস্থা, যোগশাস্ত্রে তাঁদের বিশ্বাস না হয় কিরূপে?

সে রাত্রিতে অসুখের খুব বাড়াবাড়ি। কলকাতায় লোক পাঠানো হল। নবগোপাল কবিরাজকে নিয়ে গিরিশ এলেন গভীর রাত্রিতে। ঠাকুরকে ঘিরে ভক্তেরা বসে আছেন—বিমর্ষভাবে। ঠাকুর বলছেন মৃদু স্বরে সেই আশ্চর্য কথা:

'দেহের অসুখ, তা হবে। দেখছি পঞ্চভূতের দেহ।'

গিরিশের দিকে তাকিয়ে বললেন: 'অনেক ঈশ্বরীয় রূপ দেখছি। তার মধ্যে এই রূপটিও (নিজের মূর্তি) দেখছি।'[১০]

মণির হাত থেকে পাখাটি হাতে নিয়ে বললেন: "এই পাখা যেমন দেখছি,—সামনে প্রত্যক্ষ, ঠিক অমনি আমি (ঈশ্বরকে) দেখেছি। আর দেখলাম, তিনি (ঈশ্বর) আর হৃদয় মধ্যে যিনি আছেন, এক ব্যক্তি…।"[১১]

কে ঐ কথাগুলি বলছিলেন?

ভাল করে ভেবে দেখেছি কি যিনি ঈশ্বর তিনিই বলছিলেন ঈশ্বরীয় কথা? তাই বলছিলুম ঠাকুর বরাবর চৈতন্য উদ্বুদ্ধ করার কাজেই নিযুক্ত ছিলেন। কল্পতরুর দিনে বাচ-বিচার না করে সকলকে ধন্য করেছিলেন তাতেই একটু বেশী প্রচার হয়ে পড়েছিল। হাটের মাঝে হাঁড়ি ভাঙ্গাতেই হৈ-চৈ হয়েছিল খুব।

চৈতন্য কি ঠাকুর ঐ একদিন জাগিয়েছিলেন আর তারপর সব হয়েছে অন্ধকার? আমরা যে আলোক-দ্যুলোকের উত্তরাধিকারী গো! একথাটি জানতে হবে।

এই যে আমাদের সংসারের দগ্ধ হৃদয়ের অভ্যন্তরে আনন্দের পূর্ণ ঘটটি বসিয়ে রেখে গেলেন, এই যে আমাদের মা—এঁকে কি আমরা সাধন করে পেয়েছি? এমন লোক কে আছে চরাচরে একজন যে আমাদের মাকে দেখেছে অথচ যার দৃষ্টি পরিচ্ছন্ন হয়নি? জেগে ওঠেনি ভেতরে একটি ঘুমন্ত শুভ শক্তি? ক্রিয়াশীল হয়নি অন্তরে একটি শিব-সংকল্প?

---

১০ শ্রীম: শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ৩য় খণ্ড, ১৩৭৪, পৃ. ২৪৯

১১ ঐ, পৃ. ২৫৮

মা-ই ঠাকুরের জ্ঞানাঞ্জন। ঐ অঞ্জন যার চোখে লেগেছে তার দৃষ্টি খুলে গেছে। তাকে আর আঁধারে কেঁদে বেড়াতে হবে না। মা-কে যে অত করে বললেন যে, তাঁকেও দেখতে হবে ঐ অসংখ্য নিম্নদৃষ্টি কীটগুলিকে, যারা আঁধারে কিল-বিল করছে, এতেও ছিল না কি জীবের চৈতন্য-স্ফুরণের জল্পনা? আর ঐ যে পিঁপড়ের সারিকে মা অতন্দ্র সাধনায় পরমান্ন জোগালেন এত কষ্ট সয়ে, এ দেখেও কি হবে না আমাদের চৈতন্য যে পিঁপড়ের মা-ই জগতের মা? ঐ যদি হল আর বাকি রইল কি?

আর ঐ যে প্রোজ্জ্বল হিরণ্যপুরুষ যাঁর বাণীতে অগ্নি-বিন্যাস, দৃষ্টিতে প্রেমপীযূষ, গতিতে ধর্ম-বিস্তার—তিনি যে দেশে-দেশান্তরে কম্বু-কণ্ঠে ঘোষণা করলেন: 'ওঠ, জাগো, চরৈবেতি,' আর ঐ যে চলল মানুষের মিছিল ইতিহাসের তেপান্তরের নানা পথে, রত হল জগৎ জুড়ে ভেতর-বাইরের শৃংখল-ভাঙ্গার সাধনায়, নবারুণরূপে আবাহন করল সব জাগরণকে, ভাষা দিল মূকের মুখে, আশা দিল পিষ্ট হৃদয়ে—ঐটিও ছিল ঠাকুরেরই চৈতন্য-জাগানোর শৈলী। নরেনকে যে এত যত্নে ও সতর্কতায় গড়ে তুললেন দিব্য ভাস্করের মতো এর পেছনে ছিল জীবোদ্ধারের স্বচ্ছ জল্পনা। জীবোদ্ধারের শৈলীটিই এ যুগে চৈতন্য-জাগানো। তাই নরেনকে করলেন ভ্রাম্যমাণ চৈতন্য-মশাল। সমাধিলাভের পরেও নরেনের শান্তি কেড়ে নিলেন। আর তাঁর বিশাল হৃদয়ে ধরিয়ে দিলেন অহেতুক জীব-প্রেমের আগুন। তারপর সে-আধারে নিজ সকল আধ্যাত্মিক শক্তি ঢেলে দিয়ে হলেন ফকির। ফিকিরটি কিন্তু এই: আরো অনেক দিন ধরে জীবোদ্ধারের দুরূহ কর্মে, চৈতন্য-জাগানোর কর্মে রত থাকা। বিবেকানন্দের মাধ্যমে ঠাকুর জগতে যে কি কাণ্ড করে বেড়াচ্ছেন তার খোঁজ কয় জন ঠিক-ঠিক রেখেছে!

ঐ পুণ্যদেহে অত কঠিন ব্যাধি হল কেন? দেখতে আমাদের মতো হয়ে এসেছিলেন কিনা। আমাদের মতো রোগজীর্ণ দেহে বাস করেও যে ঈশ-রসে মজে থাকা যায় এটি বিশেষ করে প্রমাণ করতে কি?

অন্য কারণও ছিল।

প্রথম কারণ গিরিশের পাপ গ্রহণ করে তাঁর দেহে ব্যাধি। বললেন: 'গিরিশের পাপ! আহা! ও যে কষ্ট ভোগ করতে পারবে না!'

এই যে জীব-কারুণ্যের হৃদয়বিদারী নিদর্শনটি দিলেন অবতীর্ণ ভগবান, এতেও কি জীবের চৈতন্য উদ্বুদ্ধ হবে না? ভগবানের যে কত প্রাণের বস্তু মানুষ, আমরা যে তাঁর কাছে কি, এতেও কি হাড়ে হাড়ে বুঝব না?

অসুখের দ্বিতীয় কারণ: ভক্ত সেবকদের তাঁর চার পাশে একত্র করা, এক সূত্রে গেঁথে দেওয়া, এক সংঘে সংহত করা।

তৃতীয় কারণ নিজেই নির্দেশ করেছেন এ কথায়: "এরই ভেতর মা স্বয়ং ভক্ত হয়ে লীলা করছেন। যখন প্রথম এই অবস্থা হল দেখলাম জ্যোতিতে দেহ জল জল করছে। বুক লাল হয়ে গেছে। মা-কে বললুম, মা, বাইরে প্রকাশ হয়ো না, ঢুকে যাও। তাই তো এখন এই হীন দেহ।"[১৩]

এই হীন দেহ হয়েছিল বলেই আকাশের অযুত সূর্য আপন কিরণ স্নিগ্ধ করে শুকনো খড়ের ওপর মানুষের দাওয়ায় বসে অত অমৃত প্রেমালাপ জমাতে পেরেছিলেন। এত কাছে এত নিবিড় ভাবে এত সহজে অবতীর্ণ

১৩। শ্রীম: শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ৫র্থ খণ্ড, ১৩৭৩, পৃ: ২৪০

ভগবানকে কে কবে পেয়েছিল? অযুত সূর্যের প্রভায় যদি বিভাসিত হতেন, পারতুম কি আমরা তখন তাঁকে নিজের ঘরের মেঝেতে ছেঁড়া মাদুরের ওপর বসতে বলতে? আর তাতে দুষ্কৃতিনাশন ও ধর্মসংস্থাপন এমন ভাবে হচ্ছিল যে, শুকনো মাঠের আল বেয়ে আর যেতে হচ্ছিল না—মাঠের ওপর দিয়েই সোজা পাড়ি!

ঐ প্রবাহ আজো বয়ে চলেছে। পরম কারুণিক ঠাকুরের করুণাপ্রবাহ কত ভাবে যে জীবের চৈতন্য-জাগরণের কর্মে রত আছে আজ এই ভূ-বিশ্বে তার পরিমাপ করা সাধারণ জীবের পক্ষে সম্ভব নয়। পরিমাপের প্রয়োজনও নেই।

( ৬ )

শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমণ্ডলীর কাছে প্রণত-বদ্ধাঞ্জলি হয়ে এ কথাটি শুধু বলব উপসংহারে: আমরা রামকৃষ্ণভক্ত, এ সত্যটির যাথার্থ্য যেন অনুভূত হয় আমাদের মর্মে মর্মে। এ কথাটি যেন আমরা স্বপ্নেও না ভুলি।

প্রথম কথা: যাঁরা রামকৃষ্ণভক্ত তাঁরা হবেন সত্যাশ্রয়ী, ধর্মাচারী ও অভয়।

তাঁরা যে শুধু সত্যাশ্রয়ী হবেন তা নয়, তাঁরা সত্যকে করবেন বহ্নিমান ও বেগবান।

তাঁরা যে শুধু ধর্মাচারী হবেন তা নয়, তাঁরা ধর্মকে করবেন প্রাণবান, হৃদয়বান।

তাঁরা যে শুধু অভয় হবেন তা নয়, তারা করবেন অভয়দান।

তাঁরা সত্যের, ধর্মের ও অভয়ের অগ্নি-বিন্যাস করবেন সকল চিন্তায় ও কর্মে।

যাঁরা জেনেছেন-মেনেছেন ভগবান আছেন ও ভগবানলাভই জীবনের উদ্দেশ্য, তাঁরা এমন ভাবে চিন্তা ও কর্ম করবেন যাতে জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্যের দিকে প্রতি পদক্ষেপে এগিয়ে যাওয়া চলে সহস্র বিরুদ্ধ ভাব ও বাধা-বিঘ্নের মধ্য দিয়ে। অন্যেরা অধর্ম করছে বলেই তাঁরা বিভ্রান্ত বা পথভ্রান্ত হবেন না। এক বর্ষায় জল হল না বলে কি খানদানী চাষী চাষ ছেড়ে দেবে?

যাঁরা রামকৃষ্ণ-ভক্ত তাঁরা ঐহিকতার বর্ণাঢ্যে ভুলবেন না কিছুতেই। যাঁরা 'বস্তু'র সন্ধান পেয়েছেন, তাঁরা কি আর 'অবস্তু'র ঝলকে ভোলে? তাঁরা নিশ্চিতই হবেন 'বস্তু'-বাদী।

যাঁরা রামকৃষ্ণ-ভক্ত তাঁরা হবেন মায়ের ঘরের ছেলে। তাঁরা শক্তি সাধন করবেন: দেহের শক্তি, মনের শক্তি, আত্মার শক্তি। তাঁরা মনের শক্তি দিয়ে দেহের শক্তিকে সংযত—সংহত করবেন ও আত্মার শক্তিতে মনের শক্তি লয় করবেন। আর তাঁরা এ কথাও নিশ্চয় জানবেন: ভক্তিই শক্তি।

এই ভক্তি-শক্তির জোড়ে-তোড়ে তাঁরা এগিয়ে যাবেন অন্তরে-বাহিরে, ধাপে-ধাপে, ত্যাগে-সেবায়, করায়ত্ত করবেন অভ্যুদয়-নিঃশ্রেয়স।

যাঁরা সত্যি শক্তিশালী তাঁরাই প্রেমিক হতে পারেন। এই প্রেমটিই সব চেয়ে বিশেষ-ভাবে দেয়। রামকৃষ্ণ-ভক্ত হবেন প্রেমের প্রস্রবণ, কারণ তিনি ছিলেন 'চির-উন্মদ-প্রেমপাথার।'

প্রেমিক হবেন নীলকণ্ঠ। তাঁকে সব দিয়ে বিষটুকু কেড়ে নিতে হবে যাতে সকলে উত্তীর্ণ হতে পারে ঊর্ধ্ব হতে ঊর্ধ্বতর সোপানে। তাই চাই বিষ হজম করার শক্তি। প্রেমই সেই শক্তি। পবিত্রতাই প্রেমের উৎস। তাই চাই চিত্তশুদ্ধি।

আজকের এই বৈপ্লবিক দিনে ধর্মান্বেষীদের চাই স্বচ্ছ দৃষ্টি, সোৎসাহ কর্মকুশলতা আর

বুকভরা সাহস। এই ধর্মক্ষেত্রে তাদের লড়াই করেই বাঁচতে হবে। ভগবান তাই এই শাশ্বত মন্ত্র উচ্চারণ করলেন: 'তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ।' আবার বললেন: 'যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ।' এই আদেশ শিরোধার্য করে নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে বিরুদ্ধ শক্তির মাঝ দিয়ে। তবে অনাহত থাকবার ও নিশ্চিত জয়ী হবার কৌশলটি জানা থাকা চাই। কৌশলটি অতি সহজ: চাই স্মরণে মননে জীবনের সকল সংগ্রামে ভগবানকে জড়িয়ে নেওয়া। আর তাঁর জ্ঞানের আলোকে, প্রেমের আলোকে তাঁর শক্তিতে শক্তিমান হয়ে যুঝে যাওয়া। তারপর ফলাফল তাঁতে সমর্পণ করে নিশ্চিন্ত হওয়া।

এমন ভাবে এগিয়ে গেলে একদিন নিশ্চয় আমরা দেখতে পাব কেমন অভাবিত ভাবে আমাদেরই জীবনে সত্য হয়েছে অবতীর্ণ ভগবানের প্রাণ-নিঙড়ানো শেষ আশীর্বাদ: "তোমাদের সকলের চৈতন্য হোক।"

এ কথাটি একটি শুধু শুভ ইচ্ছা নয়। এটি অবতীর্ণ ভগবানের একটি বিশেষ পূর্ণ আবির্ভাব। এতে রয়েছে ভগবানের যা দেয় তারই ঘনীভূত নির্যাস, আর ভগবানের জ্ঞান-শক্তি ও ত্রাণশক্তি এক-কেন্দ্রিক করে দেওয়া। সকলকে দেওয়া।

তাই এ আশীর্বাদ অক্ষয় ও অব্যর্থ।

"কৃপারূপে নিজে প্রভু লীলার ঈশ্বর।
আপনি বিরাজমান লীলার ভিতর॥"[১৪]

---

১৪ শ্রীঅক্ষয়কুমার সেন: শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথি, উদ্বোধন কার্যালয় ১৩৩১, পৃঃ ৬০৩

# নাহং নাহং

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

এ কথা বলিতে যেন পারি মুহুর্মুহুঃ—
—আমি নহি, আমি নহি, তুহুঁ তুহুঁ তুহুঁ।
জীবনের কুরুক্ষেত্রে ভগ্ন-উরু আমি
কাঁদিয়া আকুলকণ্ঠে কহি, অন্তর্যামী,
তোমার তোমার আমি! নহি কারও আর।
তুচ্ছ বিত্ত, তুচ্ছ খ্যাতি, তুচ্ছ অহঙ্কার!
হৃদয়ের দ্বার-প্রান্তে আছো প্রতীক্ষিয়া—
কখন্ দুয়ার খুলি লইব বরিয়া
তোমারে আমার রিক্ত নিরাসক্ত মনে!
যাই, যাই, যাই প্রভু! কমল-চরণে
এখনই সঁপিয়া দিব শূন্য মোর হিয়া!
জীবন-বাঁশরি মোর দিবে না ভরিয়া
দিব্যসুরে প্রিয়তম! মৃতকল্প মোরে
ডুবাও ডুবাও তব অমৃত-সাগরে।

# শ্রীকৃষ্ণ—তাঁহার আদর্শ ও শিক্ষা

[ পূর্বানুবৃত্তি ]

স্বামী তেজসানন্দ

বিবদমান কুরু-পাণ্ডবের মধ্যে আসন্ন যুদ্ধ নিবারণকল্পে শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবগণের রাষ্ট্রদূতরূপে শান্তির প্রস্তাব লইয়া কৌরবসভায় উপস্থিত হইলেন। তিনি শান্ত, সংযত অথচ দৃঢ়কণ্ঠে সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বন্ধুগণ! জ্ঞান ও বিদ্যায় পারদর্শী, আত্মসংযমশীল, সাহসী ও বিচক্ষণ পাণ্ডবগণের সঙ্গে আপনারা সন্ধি করুন। এই সন্ধি হইতে কেবল যে বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজনগণেরই আনন্দ বৃদ্ধি হইবে তাহা নহে; সমগ্র ভারতেই শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে। যাহারা হিতৈষী বন্ধুগণের হিতবাক্য শ্রবণ করিয়া তদনুযায়ী কার্য না করে, তাহারা অন্তিমে অপরিসীম দুঃখভাগী হয়।"

শ্রীকৃষ্ণের এই জ্ঞানগর্ভ হিতোপদেশ কৌরব-সভায় সমবেত প্রবীণ ও বিচক্ষণ ব্যক্তিগণের অন্তরে সাড়া জাগাইলেও, দুর্মতি দুর্যোধন উহাতে কর্ণপাত না করিয়া দৃপ্তকণ্ঠে সর্বসমক্ষে ঘোষণা করিলেন—

"যাবদ্ধি তীক্ষ্ণয়া সূচ্যা বিধ্যেদগ্রেণ মাধব।
তাবদপ্যপরিত্যাজ্যং ভূমের্নঃ পাণ্ডবান্ প্রতি॥"

—হে মাধব! তীক্ষ্ণসূচ্যগ্রদ্বারা বিদ্ধ ভূমিটুকুও আমি পাণ্ডবগণকে ( বিনাযুদ্ধে ) প্রদান করিব না! দুর্যোধনের এই দম্ভ ও হঠকারিতার ফলে যুদ্ধ অনিবার্য হইয়া উঠিল এবং দুই পক্ষের সৈন্যবাহিনী যুদ্ধার্থে কুরুক্ষেত্র-রণাঙ্গনে পরস্পরের সম্মুখীন হইয়া দণ্ডায়মান হইল। পাণ্ডব-সেনাপতি গাণ্ডীবধারী অর্জুনের নির্দেশে তাঁহার সারথি শ্রীকৃষ্ণ উভয় সেনার মধ্যস্থলে রথস্থাপন করিলে, অর্জুন যখন দেখিলেন যে, তাঁহার পিতৃতুল্য ব্যক্তিগণ, পিতামহ, আচার্য, মাতুল, ভ্রাতা, পুত্র, পৌত্র, তথা শ্বশুর ও সুহৃদ্‌বর্গ যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধার্থে উপস্থিত হইয়াছেন, তখন তিনি সেই বান্ধববর্গকে দর্শন করিয়া অতীব করুণাবিষ্ট ও বিষণ্ণ হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন,—হে মধুসূদন! যাঁহাদের জন্য আমাদের রাজ্যভোগ ও ধনের আকাঙ্ক্ষা, তাঁহারাই এই রণক্ষেত্রে ধন-প্রাণ পরিত্যাগ করিতে সমবেত হইয়াছেন। হে সখে! ইঁহারা আমাকে হত্যা করিলেও আমি ইঁহাদিগকে হত্যা করিতে ইচ্ছা করি না। এই পৃথিবীর কি কথা, ত্রৈলোক্যরাজ্যের নিমিত্তও আমি ইঁহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিব না। শোক-ব্যাকুলহৃদয়ে অর্জুন এই কথা বলিয়া ধনু ও শর পরিত্যাগপূর্বক রথোপরি নিশ্চেষ্ট হইয়া উপবেশন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে, অর্জুনের এই মানসিক চাঞ্চল্য ও ক্ষত্রিয়জন-বিগর্হিত দুর্বলতা সাময়িক মাত্র। তাই, মোহগ্রস্ত অর্জুনকে আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ক্ষাত্রধর্মোচিত কর্মে উদ্বুদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে তাহার হিতার্থে ত্রিকালদর্শী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেই সমবেত সৈন্যগণের তুমুল হুঙ্কার ও অশ্বের হ্রেষাধ্বনির মধ্যে তাহাকে উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের এই হিতোপদেশই পুণ্যভূমি ভারতে ও বহির্জগতে শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতা নামে অভিহিত। তিনি বলিতে লাগিলেন—

হে অর্জুন! জীবমাত্রেরই আত্মা কোন সময়েই জন্মগ্রহণ করে না এবং কখনও হত হয় না। দেহাদির ন্যায় একবার জন্মলাভ করিয়া ইহা পুনর্বার বিনাশপ্রাপ্ত হয় না।

বস্তুতঃ, অস্ত্র এই আত্মাকে ছিন্ন করিতে পারে না, অগ্নি ইহাকে দগ্ধ করিতে পারে না, জল আর্দ্র করিতে পারে না এবং বায়ুও শুষ্ক করিতে পারে না। অজ্ঞানতা-বশতই সকলে এই ভূমারূপে বিদ্যমান এক সর্বব্যাপী আত্মাকে নানাভাগে বিভক্ত মনে করিয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি ইহাকে অনন্ত, অজর, অমর ও অবিভাজ্য বলিয়াই জানেন। এই জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইলে দেহের বিনাশ হইলেও ধীর বিদ্বান ব্যক্তি কখনও মোহের বশবর্তী হইয়া আত্ম-বিস্মৃত হন না। এমতাবস্থায় তোমার মতো বিজ্ঞ বীরের পক্ষে এইপ্রকার দুর্বলতা শোভা পায় না। তুমি এই অশোভনীয় ক্লৈব্য পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হও।

এই কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গনেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আপাতবিরোধী সকল যোগ, মত এবং পথেরও সমন্বয় সাধনপূর্বক অর্জুনকে মাধ্যম করিয়া বিশ্ববাসীকে আরও শুনাইলেন—

'জ্ঞাননিষ্ঠ সন্ন্যাসিগণ যে স্থান প্রাপ্ত হন, ফলাভিসন্ধিবর্জিত কর্মযোগিগণও সেই স্থানই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সাংখ্য ও যোগ—এই দুইটি উপায়কে যিনি এক বলিয়া দেখিতে পারেন, তিনি যথার্থ বস্তুদর্শন করিয়া থাকেন।" ৫।৫

"সমত্ববুদ্ধিযুক্ত মনীষিগণ কর্মজন্য ফল পরিত্যাগপূর্বক জন্মরূপ বন্ধন হইতে বিনির্মুক্ত হইয়া অনাময় পদ (মোক্ষ) প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।" ২।৫১

"সমাহিতচেতা যোগী সর্ববস্তুতেই সমদৃষ্টি-সম্পন্ন হইয়া আত্মাকে সকল ভূতের মধ্যে প্রত্যক্ষ করেন এবং আত্মাতেও সকল ভূতকে প্রতিষ্ঠিত দেখিয়া থাকেন।" ৬।২৯

"তুমি আমাতেই (বিশ্বরূপ পরমেশ্বরেই) সংকল্প-বিকল্পাত্মক অন্তঃকরণকে স্থাপিত কর এবং আমাতেই অধ্যবসায়বতী বুদ্ধি নিবেশিত কর। তাহা হইলেই তুমি আমাতেই বাস করিতে পারিবে অর্থাৎ আমার স্বরূপপ্রাপ্ত হইয়া আমাতেই মিলিত হইতে পারিবে—ইহাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই।" ১২।৮

তিনি অবশেষে ইহাও বলিলেন,—"আমাতে হৃদয় অর্পণ কর, আমার ভক্ত হও, আমার প্রীতির জন্য যজ্ঞ কর এবং আমাকে নমস্কার কর। এইরূপ সর্বপ্রকারে আত্মসমর্পণ-রূপ ভক্তি করিলে আমাকেই পাইবে—ইহা আমি সত্য প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যেহেতু তুমি আমার প্রিয়।" ১৮।৬৬

বস্তুতঃ জ্ঞানযোগী 'নেতি নেতি'-মূলক নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক দ্বারা অজ্ঞানতাবশতঃ আত্মায় আরোপিত উপাধিসমূহ বর্জনপূর্বক যে তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী হইয়া থাকেন, কর্মযোগী ফলাভিসন্ধি না রাখিয়া সকল কর্মফল শ্রীভগবানে সমর্পণপূর্বক নিষ্কাম কর্মের দ্বারা চিত্তশুদ্ধির মাধ্যমে সেই চরমজ্ঞানেরই অধিকারী হইতে সমর্থ হন। এইরূপে যোগ-ধ্যাননিরত যোগী পুরুষ আত্মসংযমরূপ যোগা-ভ্যাস দ্বারা এবং ভক্তবৃন্দ ভগবানে সম্পূর্ণরূপে শরণাগত হইয়া অবিচল দৃঢ় নিষ্ঠা ও অব্যভিচারিণী ভক্তির সাহায্যে অন্তিমে সেই লক্ষ্যেই পঁহুছিয়া থাকেন। তাই তিনি বলিলেন—

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ॥" ৪।১১

—হে পার্থ, যে-সকল ব্যক্তি যে প্রয়োজনের জন্য আমাকে অবলম্বন করে, আমি তাহা-দিগকে সেই প্রয়োজনদানে অনুগৃহীত করিয়া থাকি। সর্বপ্রকারেই মনুষ্যগণ আমারই পথের অনুসরণ করিয়া থাকে।

শিবমহিম্নঃস্তোত্রেও অনুরূপ কথারই প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই,—

"রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিলনানাপথজুষাং।
নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব ॥" ৭

—যেরূপ ঋজু-কুটিল বিভিন্নপথগামী নদীসমূহ অন্তিমে একমাত্র অনন্ত সাগরেই মিলিত হয়, হে ঈশ্বর। তদ্রূপ রুচিভেদে মনুষ্যগণ ভিন্ন ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করিলেও, অবশেষে তাহারা পরমাত্মাস্বরূপ তোমাকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

পরমকারুণিক ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রিয়সখা অর্জুনকে সর্বশেষে বিশ্বরূপ প্রদর্শন করাইয়া তাঁহার অবিদ্যাজনিত সকল ভ্রান্তি চিরতরে অপনোদনপূর্বক বলিলেন,—

"সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি
মা শুচঃ ॥" ১৮।৬৬

—অর্থাৎ তুমি সর্বপ্রকার ধর্মাধর্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমাকেই আশ্রয় কর, তুমি শোক করিও না। আমি তোমাকে সকল প্রকার পাপ হইতে মুক্ত করিব।

শ্রীকৃষ্ণের এই আশ্বাসবাণী শ্রবণ করিয়া প্রসন্নচিত্তে অর্জুন তাঁহাকে বলিলেন—

"নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত।
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে
বচনং তব ॥" ১৮।৭৩

—হে অচ্যুত। তোমার অনুগ্রহে আমার মোহ বিনষ্ট হইয়াছে। আমি আত্মতত্ত্ববিষয়ক স্মৃতি ( অর্থাৎ জ্ঞান ) লাভ করিয়াছি। আমার সন্দেহ দূরীভূত হইয়াছে, এবং আমি স্থির হইয়াছি। আমি তোমারই কথানুসারে কাজ করিব।

"সত্যমেব জয়তে নানৃতম্"—সত্যের জয় অবশ্যম্ভাবী। মিথ্যা বা শঠতা কখনও জয়লাভ করিতে পারে না। তাই, সত্যদ্রষ্টা ঋষি বেদব্যাসের অনুগ্রহে দিব্যদৃষ্টিপ্রাপ্ত সঞ্জয় ভগবদ্গীতার অন্তিম শ্লোকে ধৃতরাষ্ট্রকে বলিয়াছিলেন—

"যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্ধরঃ।
তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতির্ধ্রুবা নীতির্মতির্মম ॥"
১৮।৭৮

—যে পক্ষে যোগেশ্বর কৃষ্ণ এবং যে পক্ষে গাণ্ডীবধারী সব্যসাচী ধনঞ্জয় বর্তমান, সেই পক্ষেই শ্রী, বিজয়, সম্পদ এবং অব্যভিচারিণী নীতি,—ইহাই আমার স্থির নিশ্চয়।

কুরুক্ষেত্র মহারণে ধর্ম-ও নীতিপরায়ণ পাণ্ডবগণেরই জয় হইল,—বিশ্বমঙ্গলবেদীমূলে দানববৃত্তির মহাবলি ঘটিল। জগৎকল্যাণ-চিকীর্ষু যুগাবতার ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরিকল্পিত ধর্মরাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইল। তিনি গীতা-মুখে সর্ব মত ও পথের সমন্বয়বার্তা প্রচার করিয়া মানবজাতির সম্মুখে যে উদার সর্বজনীন আদর্শ স্থাপন করিলেন, তাহা চিরকাল সত্যপথযাত্রী সকলের পক্ষেই পথপ্রদর্শকরূপে প্রোজ্জ্বল হইয়া থাকিবে। বিশ্বজগতের প্রাণ-পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের বাণীতে আমরা গার্হস্থ্য ও সন্ন্যাস, ত্যাগ ও নিঃস্বার্থ সেবা, নিরভিমানিতা ও প্রেমের অপূর্ব সমন্বয় দেখিতে পাই। পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে,—তিনি সর্বজনপূজ্য ও সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষরূপে গৃহীত হইলেও, তিনিই স্বেচ্ছায় ইন্দ্রপ্রস্থে রাজসূয়যজ্ঞে আমন্ত্রিত সমবেত অতিথিবর্গের পাদ-প্রক্ষালন করিয়া বিশ্ববাসীকে শিক্ষা দিয়াছিলেন,—'কোন কাজই তুচ্ছ বা নীচ নহে।' তাঁহারাই ধন্য যাঁহারা গভীর শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ও প্রেমের অর্ঘ্য দ্বারা তাঁহার রাতুলচরণ বন্দনা করিয়া থাকেন।

প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই সৃজনী-প্রতিভা

বিদ্যমান এবং প্রত্যেকেই অনন্তশক্তির আধার। অজ্ঞতাবশতঃ সে তাহার অন্তর্নিহিত অমিত শক্তি বিস্মৃত হইয়া নিজকে দুর্বল ও হীন মনে করে এবং তজ্জন্য কর্মদক্ষতা হারাইয়া নিশ্চেষ্ট ও নিরাশ হইয়া নিশ্চিন্ত আলস্যে দিনাতিপাত করিয়া থাকে এবং সমাজ-দেহে পরগাছাতুল্য হইয়া সমাজ-শরীরের রক্তশোষণ করে। তাই, শ্রীকৃষ্ণ প্রত্যেকের অন্তরের সুপ্ত পুরুষকার জাগ্রত করিবার উদ্দেশ্যে দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করিলেন—

"উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ॥"

৬।৫

—সংসার-নিমগ্ন আত্মাকে আত্মার শক্তির সাহায্যেই সেই সংসার হইতে ঊর্ধ্বে উঠাইবে। আত্মাকে অবসন্ন করিবে না। মানুষ নিজেই নিজের বন্ধু এবং নিজেই নিজের শত্রু।

বস্তুতঃ, এই পুরুষকারই সকলের ভাগ্য-নিয়ন্তা ও ভাগ্যনির্মাতা। আত্মবিস্মৃত ভারত অমিত শক্তির আধার হইয়াও আজ নিজকে দুর্বল মনে করিয়া প্রগতির পথে অগ্রসর হইবার প্রেরণা ও পাথেয় হারাইতে বসিয়াছে। স্বামী বিবেকানন্দ উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন,—দুর্বলতাই পাপ। আত্মশক্তি জাগ্রত করিয়া এই দুর্বলতারূপ মহাপাপ হইতে মুক্ত হইতে হইবে। তিনি আরও বলিয়াছেন,—আমাদের ধর্মই আমাদের তেজ, বীর্য, এমনকি জাতীয় জীবনের মূল ভিত্তি। এই ধর্মেই আমাদের জাতীয় মন, জাতীয় প্রাণ-প্রবাহ দেখিতে পাইবে। ইহাই অনুসরণ কর, তোমরা মহত্ত্ব-পদবীতে আরূঢ় হইবে; যদি উহা পরিত্যাগ কর তোমাদের মৃত্যু নিশ্চয়। বেদান্তের আলোক প্রত্যেকের গৃহে লইয়া যাও, প্রত্যেক গৃহে বেদান্তের আদর্শানুযায়ী জীবন গঠিত হউক, —প্রত্যেক জীবাত্মায় গূঢ়ভাবে যে ঈশ্বরত্ব অন্তর্নিহিত রহিয়াছে, তাহাকে জাগ্রত কর। তাহা হইলেই তোমার সফলতার পরিমাণ যতটুকুই হউক না কেন, তোমার মনে এই সন্তোষ আসিবে যে, তুমি মহাকার্যের জন্য জীবনযাপন করিয়াছ এবং মহাকার্যে প্রাণ দিয়াছ। যেরূপেই হউক, সেই মহাকার্য সাধিত হইলেই মানবজাতির ইহলোক ও পরলোকে কল্যাণ হইবে।

আজ হইতে কিঞ্চিদধিক সত্তর বৎসর পূর্বে ত্রিকালদর্শী স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন,—"আমাদের এই মাতৃভূমি গভীর নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া জাগ্রত হইতেছেন, আর কেহই এক্ষণে ইঁহার গতিরোধ করিতে সমর্থ নহে, আর ইনি নিদ্রিত হইবেন না—কোন বহিঃশক্তিই এক্ষণে ইঁহাকে চাপিয়া রাখিতে পারিবে না. কুম্ভকর্ণের নিদ্রা ভাঙ্গিতেছে।" তাঁহার সেই ভবিষ্যদ্বাণী সার্থক ও সফল হইয়াছে। ভারতবাসী পরাধীনতার শৃঙ্খল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া স্বাধীনতার বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়াছে। কিন্তু এই স্বাধীনতা-অর্জনের পর হইতে ভারত-বাসীর সম্মুখে যে-সকল গুরুতর সমস্যা সহস্র-মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, তাহা প্রগতির পথ কণ্টকাকীর্ণ করিয়া তুলিয়াছে। এই দুর্গম পথ অতিক্রম করিতে হইলে জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে ভারতের নর-নারীকে সংঘবদ্ধ হইয়া অকুতোভয়ে অগ্রসর হইতে হইবে। চারিদিক হইতে আজ বহিঃশত্রু ভারতের সদ্যোলব্ধ স্বাধীনতা-রত্ন হরণ করিবার জন্য হুমকি দিতেছে। এই সঙ্কট-মুহূর্তে অসীমবীর্যশালী ভারতের পক্ষে কোনপ্রকার দুর্বলতাই শোভা পায় না। ভারতকে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য দেশ-প্রেমিকের কণ্ঠে তাই উদাত্ত গম্ভীর স্বরে উদ্গীত হইয়াছে,—

"ঈশান, তুমি বাজাও বিষাণ, কর চেতনা দান।
কোটি কণ্ঠে ধ্বনিয়া উঠুক, দীপক রাগিণী গান॥
তাথৈয়া তাথৈয়া রুদ্রতালে নাচুক
সকল প্রাণ।
জন্মভূমির সম্মানতরে হও সবে আগুয়ান॥
হের নাকি ঐ অরাতিসৈন্য, ভারতসিংহদ্বারে।
হুঙ্কারে সদা দম্ভভরে, স্বাধীনতা হরিবারে?
আত্মকলহে জীর্ণ তোমরা শিথিল
সমাজ-মূল।
জান না কি তুমি এই দুর্দিনে শত্রু
হানিতে শূল?
ডাকিছে জননী বীর সন্তানে, রাখিতে
তাঁহার মান।
লক্ষ কোটি জোয়ান যেথায়, হবে তাঁর অপমান?
মৃত্যুভীতি দূর হোক, শুনি জননীর
আহ্বান।
বীরদাপে চল উন্নত শিরে, হিন্দু-মুসলমান॥
জাগরে ভারত! এ ঘোর নিশায়, ঘুম কি
তোমার সাজে?
দুর্বার বেগে এগিয়ে চল,
নিখিল বিশ্ব মাঝে॥"

কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গণে বিষাদগ্রস্ত মধ্যম পাণ্ডব অর্জুনকে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ যে মহা-মন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছিলেন—"ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে। ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ॥"২।৩ —সেই শক্তি-মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া সর্বপ্রকার ভীতি ও দুর্বলতা পরিহারপূর্বক ভারতের নর-নারীকে তাহাদের মাতৃভূমির স্বাধীনতারক্ষাকল্পে ও তাহার সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য আজ সমবেতভাবে বদ্ধপরিকর হইতে হইবে,—ভারতের গৌরবময় ঐতিহ্য ও আদর্শকে আরও উজ্জ্বল করিয়া তুলিতে হইবে। তবেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অগ্নিগর্ভ বাণী ও সর্বজনীন আদর্শ সার্থক ও সফল হইবে।—ভারত-সংস্কৃতির মূল উৎস উপনিষদও এই দুর্গম পথ অতিক্রম করিবার উপায় নির্দেশ করিয়া উদাত্ত গম্ভীর স্বরে বিশ্ববাসীকে শুনাইয়াছেন—

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।
ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া
দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি॥"

—তীক্ষ্ণধার ক্ষুরের উপর দিয়া গমন যেমন বিপজ্জনক, সংসারের কণ্টকাকীর্ণ দুর্গম কুটিল পথে বিচরণ করাও তেমনি দুষ্কর। সুতরাং শ্রেষ্ঠ পুরুষগণের সমুন্নত জীবন ও আদর্শকে অবলম্বন করিয়া আত্মশক্তিকে জাগ্রত কর এবং মনুষ্যত্বাপহারী সর্বপ্রকার দুর্বলতা দূর করিয়া জীবনপথে দুর্বার গতিতে অগ্রসর হও। শিবাঃ সন্তু নঃ পন্থানঃ।—মঙ্গলময় হউক আমাদের সকলের যাত্রাপথ।

# এস মধু ফাল্গুন

শ্রীমতী অমিয়া ঘোষ

বিশ্বদুলাল!
এই মধু ফাল্গুনে পুণ্য লগনে
নিখিল হৃদয়ে এস গো আজ,
সাজায়ে তোমারে মানস কুসুমে
পূজিব হৃদয়ে হৃদয়রাজ।

আজি আর্ত ধরার দুঃখ ঘুচায়ে
তোমারি আলোয় সবারে জাগায়ে
দ্বন্দ্ব-বিভেদ কলুষ ঘুচায়ে—
ঘুচাও ধরার বেদনা-লাজ,
সাম্যের রথে জগতের নাথ
হে রামকৃষ্ণ! এস গো আজ।

# শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজের পদপ্রান্তে

**স্বামী লোকেশ্বরানন্দ**

১৯২৫ সালের ডিসেম্বর মাস। আমি ৯ম শ্রেণীতে পড়ি, দশম শ্রেণীতে উঠব। স্কুলের বাৎসরিক পরীক্ষা দিয়ে আমি বাড়ীতে বসে আছি এমন সময় আমার এক কাকা কর্মস্থল থেকে ছুটি নিয়ে বাড়ীতে এলেন! তাঁর যখন ফিরে যাবার সময় হলো তখনও আমার স্কুল বন্ধ। তিনি হঠাৎ একদিন আমাকে ডেকে বললেন—'কিরে, যাবি আমার সঙ্গে বেড়াতে? তোর তো স্কুল এখনও বন্ধ, চল্ না বেড়িয়ে আসবি।' এ প্রস্তাবে আমি একেবারে লাফিয়ে উঠলাম। চিরকাল আমার বেড়াবার সখ, এ সুযোগ কি ছাড়ি? কাজেই চললাম তাঁর সঙ্গে বেড়াতে তাঁর কর্মস্থলে। তিনি তখন কাজ করতেন রংপুর জেলার ছোট একটা শহরে। লালমণিরহাটের কাছেই এই শহর।

কাকার কাছে আছি, এমন সময় লালমণির-হাট স্কুল খুলে গেল। আমার ছোট ভাই অর্থাৎ কাকার বড় ছেলে হরিপদ (প্রেমরূপানন্দ) এই স্কুলে পড়তো। তার আহ্বানে চললাম তার স্কুল দেখতে একদিন। সেখানে প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র সান্যালের সঙ্গে ঘটনা-ক্রমে আলাপ হয়ে গেল। তিনি দু-একটা প্রশ্ন করার পরেই আমাকে জিজ্ঞেস করলেন,—'তুমি পড়বে আমাদের স্কুলে?' আমিও না ভেবেচিন্তে বলে বসলাম—'তা পড়তে পারি, বাড়ীতে জিজ্ঞেস করে দেখব।' বাড়ী থেকেও সহজে অনুমতি পেয়ে গেলাম। কাজেই লাল-মণিরহাট স্কুলে ভরতি হয়ে গেলাম।

প্রথম থেকেই প্রধান শিক্ষক আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। আমারও তাঁকে অত্যন্ত ভালো লাগতো। নিত্য তিনি তাঁর বাসায় আমাকে ডেকে নিয়ে যেতেন। একবার বা একাধিক বার আমি যেতাম। কখনও কখনও ছুটির পর যেয়ে রাত নটা পর্যন্ত কাটিয়ে আসতাম। কেন যেতাম? কিসের আকর্ষণে যেতাম? প্রধান শিক্ষক ছিলেন শ্রীশ্রীমায়ের শিষ্য। শুধু তিনি নন, তিনি, তাঁর মা, তাঁর স্ত্রীও। তাঁর দুই মামা মঠের সন্ন্যাসী, তাঁর দুই জ্ঞাতি-ভাইও মঠের সন্ন্যাসী ছিলেন। তিনি আমাকে ঠাকুর-স্বামীজীর কথা শুনাতেন। শুনতে শুনতে আমি কোন্ জগতে চলে যেতাম, সময়ের খেয়াল থাকতো না! ঘণ্টার পর ঘণ্টা শুনে যাচ্ছি—তাঁর ক্লান্তি নেই, আমারও নেই। কখনও কখনও বই পড়তে দিতেন, তাও পড়তাম ঘণ্টার পর ঘণ্টা। তাঁর মা শুনতে চাইতেন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথি। সুর করে পড়ে শুনাতাম তাঁকে। প্রধান শিক্ষক ধ্যান-জপ করতে বলতেন। বাড়ীতে ফিরে যেয়ে যতক্ষণ পারি ধ্যান-জপ করতাম। অন্য শিক্ষকেরা বলতেন—বৃত্তি পেতে হবে, পরে জজ-ম্যাজিস্ট্রেট হতে হবে। প্রধান শিক্ষক বলতেন—'ওসব কথায় তুমি কান দিও না, তুমি ভালো সাধু হও—এই আমি চাই।' একদিন তাঁর এই কথা শুনে তাঁর স্ত্রী বিরক্ত হয়ে বললেন—'এ কি তোমার কথা? পরের ছেলেকে সাধু হতে বলছ; পার তুমি তোমার নিজের ছেলেকে সাধু হতে বলতে?' প্রধান শিক্ষক উত্তর দিলেন, 'আমার ছেলে যদি সাধু হয়, তাহলে সেটা তার এবং

আমাদের সমস্ত বংশের সৌভাগ্য বলে আমি মনে করব। প্রধান শিক্ষক শ্রীশ্রীঠাকুরের যে-সব সন্তানদের দেখেছেন, তিনি তাঁদের কথা বলতেন। শ্রীশ্রীমহারাজ, বাবুরাম মহারাজ, মহাপুরুষ মহারাজ—এঁদের সঙ্গ তিনি করেছিলেন। আমাকে বলতেন—'মহাপুরুষ মহারাজ মঠে বিরাজ করছেন। এই বেলা যেয়ে তাঁকে ধরো, তাঁর কৃপাভিক্ষা কর, তাঁর কাছ থেকে দীক্ষা নিতে চেষ্টা কর।' আমি মনে মনে তখন থেকেই মহাপুরুষ মহারাজকে গুরুপদে বরণ করে নিলাম। ভাবলাম যে-ভাবে হোক মঠে যেয়ে তাঁর পাদপদ্মে শরণ নেবো।

দেখতে দেখতে এক বছর কেটে গেল। প্রবেশিকা পরীক্ষা হয়ে গেল। প্রধান শিক্ষক এবং অন্যান্য শিক্ষকদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমি কলকাতায় এলাম। ইচ্ছা মঠে যাব, তারপর দেশে ফিরব। বিদায় নেবার সময় প্রধান শিক্ষক তাঁর মামা পূজনীয় সত্যেন মহারাজ (স্বামী আত্মবোধানন্দ)-এর নামে এক পত্র আমার হাতে দিলেন। তিনি জানতেন না যে, সত্যেন মহারাজ তখন মায়াবতীতে। তাতে কিন্তু আমার কোন অসুবিধা হয়নি। ট্রেনে আসতে এক সাপ্তাহিক পত্রিকা কিনলাম। যত দূর মনে পড়ে —'স্বাধীনতা'; সেইটাই তার প্রথম সংখ্যা। পাতা উল্টাতেই দেখি মহাপুরুষ মহারাজের ছবি। তিনি আশীর্বাদ করেছেন পত্রিকাটিকে। বার বার তাঁকে প্রণাম করলাম। কলকাতায় খিদিরপুরে দাদার কাছে উঠলাম। সেখানে দু-এক দিন থাকার পর সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম মঠের উদ্দেশে। কোন্ দিকে মঠ কোন ধারণাই ছিল না। সমস্ত পথ জিজ্ঞেস করতে করতে চললাম। কলকাতায় সাইকেল চড়ার কি নিয়ম-কানুন কিছুই জানতাম না। যেভাবেই হোক মঠে পৌঁছুতে হবে এই ছিল সঙ্কল্প। খুব সম্ভব সকাল দশটায় বেরিয়ে পড়েছিলাম, মঠে যখন পৌঁছুলাম তখন বিকেল তিনটে। ঠাকুরঘর কেবল খোলা হয়েছে। বেলুড় বাজারের পথ দিয়েই বোধ হয় মঠে ঢুকেছিলাম। শ্রীশ্রীমহারাজের মন্দিরের সামনে আসতে একজন মহারাজকে পেলাম। শ্রীশ্রীমহারাজের মন্দিরে প্রণাম করে ঐ মহারাজের নির্দেশ অনুসারে ঠাকুরঘরের দিকে চললাম। তখনও মন্দির হয়নি, পুরাতন ঠাকুরঘরে ঠাকুর রয়েছেন। দোতলায় উঠবার সিঁড়ির কাছে পা দিতেই মহাপুরুষ মহারাজের ঘরের পশ্চিম দিককার জানালা খুলে গেল। কি দেখলাম, ভাষায় তা বর্ণনা করতে পারব না। কি দিব্যকান্তি মূর্তি! মানুষের এমন রূপ হয় জানতাম না! আমাকে দেখে ভয়ানক খুশী! বললেন—"তুই কোথা থেকে এলি? আয়, আয় আমার কাছে।" কয়েক বার বললেন এ কথা। আমি আড়ষ্ট হয়ে গেলাম। কি বলব, কি করব বুঝতে পারছিলাম না। তখন মহাপুরুষ মহারাজ বললেন—"যা, ঠাকুরকে প্রণাম করে আয়।" স্বপ্নাবিষ্টের মতো আমি ঠাকুরঘরে যেয়ে প্রণাম করে নীচে নেমে এলাম। ততক্ষণে দুজন সন্ন্যাসী আমাকে মহাপুরুষ মহারাজের ঘরে নিয়ে যাবার জন্য এসে গেছেন। তাঁদের সঙ্গে উপরে গেলাম। মহাপুরুষ মহারাজকে প্রণাম করতে তিনি আমার পরিচয় নিলেন। আমি ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়েছি এবং সাইকেলে করে খিদিরপুর থেকে সমস্ত পথ এসেছি শুনে তিনি অবাক্। এত ছোট ছেলে কি করে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিল, কি করে কলকাতার জনাকীর্ণ পথ দিয়ে সাইকেলে করে এলো—এ তিনি ভাবতেই

পারেন না! সবাইকে ডেকে ডেকে তিনি বলতে লাগলেন—"দেখ, দেখ, এইটুকু ছেলে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়েছে আবার এতটা পথ সাইকেলে করে এসেছে!" আমি বাস্তবিক অতটা ছোট ছিলাম কিনা সন্দেহ। আমার বয়েস তখন ষোল, তবে দেখতে হয়তো ছোট ছিলাম। তিনি অনেক কথা জিজ্ঞেস করলেন, আমি কোন কথারই উত্তর গুছিয়ে দিতে পারলাম না। চিরকাল আমি মুখচোরা আর ঐ বিরাট ব্যক্তিত্বের সামনে এসে আমার জিহ্বা একেবারে আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিল। ভয় ভক্তি মিশিয়ে আমি একেবারে বিহ্বল হয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু তিনি তো অন্তর্দ্রষ্টা, তাই আমি কথা বলতে না পারলেও আমার মনের কথা বুঝতে পারছিলেন। তাই এত ধৈর্য ধরে আমাকে বারবার প্রশ্ন করে আমাকে দিয়ে আমার কথা বলিয়ে নিচ্ছিলেন। বেশ অনেকক্ষণ এইভাবে চলার পর একজন সেবককে বললেন,—"একে জ্ঞান মহারাজের সঙ্গে পরিচয় করে দাও, আর কিছু প্রসাদ দিয়ে দাও।" আর আমাকে সাবধানে বাড়ী ফিরে যেতে বললেন, আমি জ্ঞান মহারাজ এবং অন্যান্য মহারাজদের প্রণাম করে পরিপূর্ণ হৃদয়ে বাড়ী ফিরে এলাম।

কিন্তু পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজের প্রতি এমনই আকর্ষণ অনুভব করতে লাগলাম যে, তারপর দিন আবার ঠিক সেই সময়ে মঠে যেয়ে উপস্থিত। আমাকে দেখেই মহাপুরুষ মহারাজ বলে উঠলেন—"তুই আবার এসেছিস্? তোর কি পড়াশুনা নেই?" আমি বললাম—"মহারাজ, আমার তো পরীক্ষা হয়ে গেছে। এখন আবার কি পড়াশুনা?" তিনি বললেন—"তা হোক, তুই এরকম ঘন ঘন আসবি, তারপর তোর বাড়ীর লোক আমাদের দোষ দিক, বলুক আমরা তোকে তাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিচ্ছি।" আমার বাড়ীর লোক এ বিষয়ে খুবই উদার ছিলেন, কিন্তু আমি কিছুই বলতে পারলাম না। ভয়ে বুক কাঁপতে লাগলো। আমি সেদিন জ্ঞান মহারাজ ও অন্যান্য মহারাজদের সঙ্গে কিছুক্ষণ কাটিয়ে চলে এলাম।

তার দু'এক দিন পরে আবার মঠে গেলাম। খুব ভয়ে ভয়ে গেলাম, পাছে আবার ধমক খাই। এবার কিন্তু মহাপুরুষ মহারাজ বিশেষ কিছু বললেন না। একটু যেন ঔদাসীন্য দেখালেন। তাতে আরো ভয় পেয়ে গেলাম। আমি সেদিন হয়তো যেতাম না, কিন্তু দেশের বাড়ীতে যাচ্ছি, তাই যাবার আগে বিদায় নিতে গিয়েছিলাম। সাহস করে সে কথা যদি বলতে পারতাম, তাহলে হয়তো তিনি আমাকে ক্ষমা করতেন। কিন্তু বলতে পারলাম না।

পরীক্ষার ফল বেরুলে কলকাতায় কলেজে পড়তে এলাম। কলেজে পড়ার সময় প্রায় প্রত্যেক রবিবার মঠে যেতাম। সকালে যেতাম, আর সন্ধ্যায় ফিরে আসতাম। বিশেষ বিশেষ উৎসব-দিনেও যেতাম। কখনও-কখনও রাত্রি-বাসও করেছি। মঠে যেয়েই মহাপুরুষ মহারাজকে প্রণাম করতাম, আবার আসার সময় তাঁকে প্রণাম করে আসতাম। কোন কথা বলতে আমার সাহস হতো না, কিন্তু তিনি করুণাভরে আমার দিকে তাকাতেন, তাতেই আমি যথেষ্ট মনে করতাম। কখনও হয়তো তিনি জিজ্ঞেস করলেন—"কিরে, কেমন আছিস্?" আমি কোনমতে উত্তর দিয়ে পালিয়ে আসতাম। ৩।৪ মাস এভাবে যাতায়াতের পর মঠের কয়েকজন মহারাজ আমার অভিভাবক-স্থানীয় হয়ে গেলেন। তাঁরা আমার ইহকাল-পরকালের চিন্তা করতেন। তাঁদের একজন একদিন আমাকে

জিজ্ঞেস করলেন আমি দীক্ষার কথা ভেবেছি কিনা। আমি নিত্য নিজের খেয়ালমত ধ্যান-জপ করতাম, দীক্ষার কথাও ভাবতাম, কিন্তু মহাপুরুষ মহারাজকে বলতে সাহস হতো না। এই কথা শুনেই বললাম—'যদি ব্যবস্থা করে দেন, খুব ভালো হয়।' তিনি বোধহয় সত্যেন মহারাজকে বলেছিলেন, কারণ কিছু-দিনের মধ্যেই সত্যেন মহারাজ এসে আমাকে ডেকে বললেন—'আয়, আমার সঙ্গে।' সঙ্গে আরও দু-একজন মহারাজ চললেন। আমি সত্যেন মহারাজের পিছনে চললাম জড়সড় হয়ে। বুক কাঁপতে লাগলো, ভয় যদি মহাপুরুষ মহারাজ অযোগ্য বলে ফিরিয়ে দেন। অযোগ্য তো নিশ্চয়ই, কিন্তু ফিরিয়ে দিলে আমার এত দিনের স্বপ্ন ও সাধ যে ব্যর্থ হয়ে যাবে। সত্যেন মহারাজ মহাপুরুষ মহারাজের কাছে যেয়ে বললেন—'মহারাজ, এই ছেলেটি বেশ ভালো, এ কি বলতে চায় আপনাকে।' আমাকে উনি ঠেলে দেবেন এভাবে—আমি আদৌ প্রস্তুত ছিলাম না। এ সব ক্ষেত্রে কি বলতে হয় তাও জানতাম না। কোন রকমে বলে ফেললাম—'মহারাজ, আমাকে কৃপা করুন।' বলেই কাঁদতে লাগলাম। একটু স্মিত হাসি হেসে করুণাসাগর মহাপুরুষ মহারাজ বললেন—"তুমি দীক্ষা চাচ্ছ? তা দেখ, বাবা, আমরা তো আর পেশাদারী গুরু নই। তুমি ঠাকুরের নাম করবে, সে তো ভালো কথা। বল আমার সঙ্গে সঙ্গে", বলেই মহামন্ত্র বলতে লাগলেন। তাঁর চক্ষু মুদ্রিত, ধ্যানাসনে তাঁর বিছানায় বসেই মন্ত্র বলতে লাগলেন। ততক্ষণে দরজা বন্ধ করে মহা-রাজরা সবাই বেরিয়ে গেছেন। আমি মেঝেতে তাঁর দিকে মুখ করে বসে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রোচ্চারণ করতে লাগলাম। কতক্ষণ এ ভাবে কাটল আমি বলতে পারি না। মহা-পুরুষ মহারাজের কণ্ঠস্বর থামতেই আমার খেয়াল হলো। তিনি বললেন—"যাও, এবার ঠাকুরঘরে যাও।" আমি নীচে নামতেই একজন মহারাজ বললেন—'তুমি স্নান করে ঠাকুরঘরের বারান্দায় যেয়ে বসে থাক, মহা-পুরুষ মহারাজ ঠাকুরঘরে তোমাকে আবার মন্ত্র দেবেন।' তাঁর কথায় আমি তা করলাম বটে, কিন্তু মহাপুরুষ মহারাজ আর আমাকে ডাকলেন না। আমি বিকেলে প্রণাম করতে যেয়ে সামান্য প্রণামী দিয়ে এলাম তাঁকে।

এর কিছুদিন পর একদিন গঙ্গার দিক্‌কার বারান্দার রেলিঙ ধরে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন একা, এই সময় আমি যেয়ে তাঁকে জানালাম যে, আমি যেখানে থাকি সেখানে ধ্যান জপ করতে বসলে অন্যেরা ভয়ানক ঠাট্টা বিদ্রূপ করে। আমি তাই রাস্তায় চলতে চলতে ঈশ্বরের নাম করি। শুনে তিনি খুব খুশী হলেন, বললেন, "যেখানেই হোক ঈশ্বরের নাম করলেই হলো, যত পার তাঁর নাম কর, নাম করে ধন্য হয়ে যাও।" তারপর একটু থেমে বললেন—"তবে দেখ, বাবা, গাড়ী চাপা পড়ো না যেন।" বলে একটু হাসলেন। আমিও হাসলাম। তাঁর ধারণা আমি তখনও ছেলে-মানুষ। এ সব কথার পর হঠাৎ আমার বুকে হাত দিয়ে দু-একটা কথা বললেন। অদ্ভুত সে-সব কথা। সে-সব কথার তাৎপর্য তখন বুঝিনি, এখনও বুঝতে পারিনি। সব শেষে শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক তাও বলে দিলেন। এই শুভ দিনের স্মৃতি মনে জাগলে আমি অবাক্ হয়ে যাই। আমার জীবনেও যে এমন ঘটনা ঘটতে পারে—এ আমি এখনও বিশ্বাস করতে পারি না!

প্রায়ই মঠে গেলেও সবদিন মহাপুরুষ মহারাজকে একা পেতাম না। প্রায়ই ঘরে ভক্ত বা সাধুরা থাকতেন। প্রণাম করে অনেকে দাঁড়িয়ে থাকতেন, আমিও থাকতাম। অনেকে অনেক প্রশ্ন করতেন মহাপুরুষ মহারাজকে, তিনি উত্তর দিতেন শুনতাম। আমারও ইচ্ছা হতো প্রশ্ন করি, কিন্তু কখনও সাহস হয়নি প্রশ্ন করতে। আমার যে কোন প্রশ্ন ছিল তা নয়, তবে সবাই করছে দেখে আমারও করতে ইচ্ছা হতো। তবে আশ্চর্যের বিষয় এই যে, কখনও কোন প্রশ্ন যদি সত্যসত্যই মনে জাগতো, তাহলে প্রায়ই দেখতাম সেই প্রশ্ন কেউ না কেউ করেছে আর মহাপুরুষ মহারাজ তার উত্তর দিচ্ছেন। আরো মজা লাগতো যখন দেখতাম, ঐ প্রশ্নের উত্তর দেবার সময় তিনি মাঝে মাঝে আমার দিকে তাকাচ্ছেন, যেন প্রশ্নটা আমিই করেছি! একটা কথা এখানে উল্লেখ করতে পারি। অনেক লোকের পিছনে দাঁড়িয়ে থাকলেও প্রায়ই দেখতাম মহাপুরুষ মহারাজ আমার দিকে তাকিয়ে কি যেন ইশারা করে বলছেন। তাঁর ইশারার অর্থ অন্ততঃ আমি যা করতাম তা হচ্ছে—"খুব হবে, বাবা, খুব হবে।" এ হয়তো আমার কল্পনা, কিন্তু এই কল্পনা করে আমি অনেক সাহস পেতাম। একবার কিন্তু আমাকে মুখেও একথা বলেছিলেন। আমি কি একটা যেন বলেছিলাম, তার উত্তরেই একথা বলেছিলেন। তখন আমি সাধু হয়েছি এবং মঠে আছি। সেদিন তাঁকে একা পেয়েছিলাম। আর একদিনও আমাকে অভয় দিয়েছিলেন, আমি তখন দেওঘর বিদ্যাপীঠে থাকি, কোন এক ছুটিতে মঠে এসেছি। ছুটি শেষ হবার মুখে মহাপুরুষ মহারাজকে প্রণাম করে বিদায় নিতে গেলাম। বললাম—'মহারাজ, আমি বিদ্যাপীঠে ফিরে যাচ্ছি।' তিনি বেশ জোর গলায় বললেন—"যা না, বাবা বৈদ্যনাথ আছেন, তিনি দেখবেন। ভয় কি?" এই সময়ে মহাপুরুষ মহারাজ আমাকে 'দেওঘরের কানাই' বা 'লম্বা কানাই' বলতেন। আমি ততদিনে বেশ লম্বা হয়ে গেছি।

একবার এক মজার ঘটনা ঘটেছিল। আমি মঠে আছি, এমন সময় আমার চেয়ে কয়েক ক্লাস নীচে পড়তো এমন একটি যুবক এসে বললো, 'আমি দীক্ষা নেবো, আপনি ব্যবস্থা করে দিন।' সেও আমাদের স্কুলের প্রধান শিক্ষকের সংস্পর্শে এসে মঠের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। তার পীড়াপীড়িতে তাকে নিয়ে সোজা মহাপুরুষ মহারাজের কাছে গেলাম। সেদিন কোথা থেকে এত সাহস হলো বলতে পারি না। যেয়ে ছেলেটির পরিচয় দিয়ে বললাম—'মহারাজ, আপনি একে কৃপা করুন।' কী এক দিব্য হাসিতে তাঁর মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো! বললেন—"বেশ, হবে। বস্ তোরা দুজন।" আমরা মেঝেতে বসে পড়লাম। কেন বসতে বললেন বুঝতে পারছিলাম না। বসতে পারব কিছুক্ষণ তাঁর কাছে—এই তো যথেষ্ট। আমরা বসলে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—"তোকে কি মন্ত্র দিয়েছিলাম বল্।" আমি তো প্রমাদ গনলাম। অন্য লোক থাকতে মন্ত্র বলি কি করে? আমি ইতস্ততঃ করছি দেখে তিনি বললেন—"আরে ছোঁড়া, আমাকে বলতেও তোর আপত্তি?" তখন আশ্বস্ত হয়ে বললাম। আশ্চর্যের বিষয়, আমার ঐ সঙ্গীটিকে আমার মন্ত্রই দিলেন, ঠিক যেভাবে আমাকে দিয়েছিলেন, সেই ভাবেই দিলেন। আমার ঐ সঙ্গীটি এত সহজে তাঁর কৃপা পাবে তা ভাবতেই পারেনি। সে বুদ্ধিমান। ফুল, ফল সঙ্গে করে কিছু এনেছিল, সেগুলি মহাপুরুষ মহারাজকে দিল, আর তাঁকে প্রণাম করে মহাখুশী হয়ে বাড়ী চলে গেল।

একবার মহাপুরুষ মহারাজের জন্মদিন। সেবার খুব ঘটা করে উৎসব হচ্ছে। কী চোখ-ঝলসানো রূপ তাঁর সেদিন দেখেছিলাম! কতবার যে লুকিয়ে তাঁকে দেখে এসেছি তার ইয়ত্তা নেই। মাঝে মাঝে যেয়ে প্রণামও করছিলাম তাঁকে। প্রত্যেকবারই আমার প্রতি প্রসন্ন দৃষ্টি এবং মৃদু হাসি। বারবার এভাবে যেয়ে প্রণাম করছি দেখে একজন সেবক বলে উঠলেন—'তুমি কতবার প্রণাম করবে?' আমি বেশ স্পর্ধা সহকারে বললাম—'আজ যতবার খুশি প্রণাম করব, কারো বাধা মানব না।' বলেই মহাপুরুষ মহারাজের দিকে তাকিয়ে দেখলাম তিনি মৃদু হাসি দিয়ে আমার এই উক্তির সমর্থন করছেন।

এ ভাবের ছোট-খাটো ঘটনা মনে পড়ে, কিন্তু তার তাৎপর্য আমার কাছে যতটা, ততটা অন্যের কাছে হবে তা আমি আশা করতে পারি না। এই সব ছোট-খাটো ঘটনার ভিতর দিয়ে যে করুণা আমি লাভ করেছি, তার স্মৃতি এখন আমার সহায় ও সম্বল। দুঃখ হয়, কেন আরো তাঁর কাছে যাবার চেষ্টা করিনি। এত সহজলভ্য তিনি ছিলেন অথচ দায়সারা প্রণাম করা ছাড়া তাঁর কাছে ঘেঁষবার আর কোনো চেষ্টাই করিনি। যতটুকু কৃপা তাঁর পেয়েছি, তা তিনি অহেতুক কৃপাসিন্ধু বলেই পেয়েছি—আমার যোগ্যতার জোরে নয়, চেষ্টার ফলেও নয়।

# এসো মা জগদ্ধাত্রী

### সেখ সদরউদ্দীন

এসো মা জগদ্ধাত্রী ধরায়, কোলে তুলে ধরো,
তোমার ছেলে—জগৎ কাঁদে, দুঃখ হরণ করো।
অনেক দিন সে কোল পায়নি, নাও মা কোলে নাও,
ধূলো-কাদা লেগেছে গায়, দাও মা ধুয়ে দাও।

অবোধ শিশু, তাই বোঝে না অনেক কিছুই হায়,
দিবস-রাতে কত হাজার করছে সে অন্যায়।
ভুল করেছে, তবুও মা, তোমারই সে ছেলে,
পাপের গ্লানি মুছবে মাগো স্পর্শ তোমার পেলে।

তাইতো বলি জননী গো, কাঁদিয়োও নাকো আর,
নাও তুলে মা কোলে আবার জগৎকে তোমার।
অজ্ঞানতায় বদ্ধ জমাট দূর হোয়ে যাক্ রাত্রি,
নূতন আলোয় ভুবন ভরে এসো জগদ্ধাত্রী!

# সর্বভাবময় শ্রীরামকৃষ্ণ

## স্বামী জীবানন্দ

দুই অধ্যাপক বন্ধু পরস্পর আলাপরত। একজন বললেন, "এমন একটি নাম করুন তো যে নাম শোনামাত্রই বিশ্ববাসীর মনে মহা আনন্দ ও অসীম উদারতার ভাব জাগে।" অপর জন উত্তর দিলেন, "নিঃসন্দেহে বলা যাবে, লোকপাবন সেই নাম 'শ্রীরামকৃষ্ণ'। যে নাম অগণিত মানুষের ইষ্টনাম, যে রূপ সাধকের ধ্যানগম্য, যাঁর কথামৃত শুনলেই মনে অনাবিল আনন্দের সঞ্চার হয়, সে নামের, সে রূপের মহিমা বর্ণনা করা সাধ্যাতীত। জগতে জন্মগ্রহণ করেছেন বহু মহাপুরুষ। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণে যেমন সর্বজনীন ভাব আছে, তেমন আর কোথাও নেই। সর্বসংস্কারমুক্ত সর্বভাবময় দেবমানব শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি তাই সব দেশের মানুষ জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে আকৃষ্ট হয়।"

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব ঊনবিংশ শতাব্দীতে। ঊনবিংশ শতাব্দী বিজ্ঞানের যুগ, সন্দেহ ও সংশয়বাদের যুগও। এই যুগে শিল্প-বিজ্ঞানের দ্রুত উন্নতি, নব নব আবিষ্ক্রিয়া। উনিশ শতকে যখন পাশ্চাত্য দেশ শিল্প-বিজ্ঞানে উৎকর্ষ সাধন ক'রে সমগ্র পৃথিবীতে জড়বাদ-প্রচারে সচেষ্ট, তখন ভারতবাসীও পাশ্চাত্যের আপাতমনোরম ভোগবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাই-ই জীবনে একমাত্র অবলম্বনীয় ব'লে ভেবেছিল। ভারত তখন বৈদেশিক শক্তির নাগপাশে পরাধীন, তার স্বাধীন সত্তাও অবলুপ্ত-প্রায়। ভারতের ঐতিহ্য, কৃষ্টি, আধ্যাত্মিকতা সব কিছু মন্দ এবং পাশ্চাত্যের যা কিছু সবই ভাল—এই চিন্তায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ভারতবাসী পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণে তৎপর হয়েছিল।

প্রাচ্য মনীষা ও অধ্যাত্ম-সাধনার প্রতিভূ ভারতবর্ষ। উৎকট ভোগবাদের করাল কবল থেকে জগৎকে রক্ষা করবার গুরুদায়িত্ব যেন ভারত-প্রতিভার উপর ন্যস্ত। ভারতের প্রাণ-পুরুষ জেগে উঠলেন। যখন ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখনই যে শ্রীভগবান আবির্ভূত হন! মানুষ লক্ষ্যচ্যুত হয়ে মানব-জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য ভুলে গেলে যুগে যুগে যাঁর আবির্ভাব হয়, তিনিই এবার ভারত তথা সমগ্র বিশ্বের কল্যাণের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণরূপে আবির্ভূত হলেন।

কলিকাতা মহানগরীর উপকণ্ঠে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ একের পর এক সাধনা করলেন। বৈজ্ঞানিক যুগে মানুষের মন বিচারশীল, সহজে কিছু বিশ্বাস করতে চায় না, তাই এত সাধনার প্রয়োজন হ'ল। সাধনা দ্বারা শ্রীরামকৃষ্ণ মৃন্ময়ী মূর্তিতে চিন্ময়ী জগজ্জননীকে প্রত্যক্ষ করলেন। নানা ধর্মের বিরোধে তখন চারিদিক মুখরিত। বিভিন্ন ধর্মের সাধনায় তিনি উপলব্ধি করলেন সর্ব ধর্ম সত্য এবং স্বার্থপূর্ণ ভোগবাদের জগতে যাপন করলেন অভূতপূর্ব নিঃস্বার্থ ও সম্পূর্ণ কামকাঞ্চনত্যাগের মহিমময় জীবন। সংশয়বাদের যুগে যথার্থ বিজ্ঞানীর মতো একটির পর একটি সাধনায় সিদ্ধিলাভ ক'রে সর্বসংশয়ের মূলোচ্ছেদ করলেন। যুগ-যুগ-প্রবাহিত 'বহু সাধকের বহু সাধনার ধারা' শ্রীরামকৃষ্ণে মিলিত হয়েছে। মনীষী রোঁমা রোঁলার ভাষায়: "Sri Ramakrishna was the consummation of two thousand years of the spiritual life of three hundred million people."—শ্রীরামকৃষ্ণ

ভারতের ত্রিশ কোটি লোকের দু-হাজার বছরের আধ্যাত্মিক পরিণতি।

**একটি জীবনে যেন অনন্ত জীবন!** যে শক্তি ত্রেতাযুগে শ্রীরামচন্দ্রে অভিনব দিব্যভাবে প্রকাশিত হয়েছিল, যে শক্তি দ্বাপরযুগে শ্রীকৃষ্ণে আবির্ভূত হয়ে গীতামৃত বর্ষণ করেছিল, যে শক্তি শ্রীবুদ্ধকে রাজ্যসুখ ভোগ করতে না দিয়ে করুণামৈত্রীর জীবন্ত মূর্তিতে পরিণত করেছিল, যে শক্তি যীশুখৃষ্ট ও শ্রীচৈতন্যের অন্তরে বৈরাগ্য ও প্রেমের অনির্বাণ অনল জ্বালিয়েছিল, সেই শক্তিই শ্রীরামকৃষ্ণ-বিগ্রহে পূর্ণভাবে বিদ্যমান।

শ্রীভগবান শ্রীরামকৃষ্ণরূপে যখন যুগলীলায় অবতীর্ণ হন, তখন কেউ বোঝেনি যে ইনিই তিনি—যিনি কম্বুকণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন কুরুক্ষেত্রের ধর্মমহাসমরে:

"যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥
জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন॥"

তাঁর কৃপায় যাঁরা দিব্য দৃষ্টি পেয়েছিলেন তাঁরাই বুঝেছিলেন, তাও অনেক পরে। যখন তাঁর অলৌকিক সাধনার ফল—সহস্রদল কমল পূর্ণভাবে বিকশিত, চতুর্দিক সৌরভে আমোদিত, তখন আর তিনি নিজেকে লুকিয়ে রাখতে পারলেন না, ভক্তের আকুতিতে ধরা দিলেন—স্বমুখে ঘোষণা করলেন স্বরূপ।

শ্রীরামকৃষ্ণ সত্যস্বরূপ বেদমূর্তি—তাঁর জীবনে বেদ-বেদান্ত মূর্ত—তাঁর জীবনালোকে শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম উদ্ঘাটিত। কায়মনোবাক্যে সত্যনিষ্ঠার নিখুঁত উদাহরণ তাঁর মহাজীবন। তিনি জগজ্জননীর শ্রীপাদপদ্মে সব সমর্পণ করেছিলেন, কেবল শুদ্ধা ভক্তি চেয়ে বলেছিলেন, "মা! এই নাও তোমার জ্ঞান, এই নাও তোমার অজ্ঞান, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও, মা; এই নাও তোমার শুচি, এই নাও তোমার অশুচি, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও, মা; এই নাও তোমার ভাল, এই নাও তোমার মন্দ, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও, মা; এই নাও তোমার পুণ্য, এই নাও তোমার পাপ, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও।" সব মাকে দিয়েছিলেন, দিতে পারেননি কেবল সত্য। সত্যে সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত তিনি, সত্যবিগ্রহ। মনে এক, বাইরে অন্য—এরূপ নয় এক মুহূর্তের জন্যও; শুদ্ধ মনে যা উঠেছে তাই করতে হয়েছে এমন ছোট-বড় অসংখ্য ঘটনা তাঁর জীবনে। 'অসত্যের অভিনয় পর্যন্ত নেই তিলমাত্র। 'যে রাম যে কৃষ্ণ, সে-ই ইদানীং রামকৃষ্ণ'—এ উক্তি সত্যমূর্তি রামকৃষ্ণেরই। বলেছেন 'মন মুখ এক করা'র কথা, 'সত্য কথাই কলির তপস্যা।'

অন্যান্য অবতারের ন্যায় বিশেষ ক'রে শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণের মতো শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবন আবাল্য অলৌকিকতায় ভরা নয়। শ্রীরামচন্দ্রের মতো তিনি ধনুকে টঙ্কার দেননি, শ্রীকৃষ্ণের মতো পাঞ্চজন্য বাজাননি। রাক্ষস বা অসুর নিধন করেননি, কিন্তু নিহত করেছেন মানুষের মনের সংশয়রূপী মহারাক্ষসকে, মোড় ফিরিয়ে দিয়েছেন তার রিপুদলের। মৃৎশিল্পী যেমন মাটি দিয়ে পুতুল তৈরী করেন, তিনি তেমনি মানুষের মন নিয়ে ইচ্ছামত ভাগবত ভাবের গড়ন দিয়েছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের মহাজীবনে অলৌকিকত্বের প্রকাশ কোথায়? তাঁর অলৌকিকত্ব সাধনায়, ত্যাগে, প্রেমে, পবিত্রতায়, লোকশিক্ষায়।

স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দর্শন ক'রে বলেছিলেন: "আমরা এত বেদ-

বেদান্ত পড়েছি, কিন্তু এই মহাপুরুষে তার ফল দেখছি; এঁকে দেখে প্রমাণ হ'ল যে, পণ্ডিতেরা কেবল শাস্ত্র মন্থন ক'রে ঘোলটা খান, এরূপ মহাপুরুষেরা মাখনটা সমস্ত খান।"

ইংরেজী বিদ্যায় সুপণ্ডিত বাগ্মী কেশবচন্দ্র সেন ঠাকুরকে দেখে ও তাঁর কথা শুনে অবাক্ হয়েছেন: "কি আশ্চর্য, এ যে ঠিক যীশুখৃষ্টের মতো কথা! গ্রাম্যভাষা। সেই গল্প ক'রে ক'রে বুঝানো—যাতে স্ত্রী পুরুষ ছেলে সকলে অনায়াসে বুঝতে পারে। যীশু 'ফাদার, ফাদার' (পিতা, পিতা) ব'লে পাগল হয়েছিলেন, ইনি 'মা, মা' ক'রে পাগল! শুধু জ্ঞানের অক্ষয় ভাণ্ডার নয়—ঈশ্বরপ্রেম 'কলসে কলসে ঢালে তবু না ফুরায়!' ইনিও যীশুর মতো ত্যাগী, তাঁরই মতো এঁরও জ্বলন্ত বিশ্বাস। তাই কথাগুলি এত জোর।···কি আশ্চর্য। কোনরূপ বিদ্বেষভাব নাই! সব ধর্মাবলম্বীদের আদর করেন—কারও সহিত ঝগড়া নাই।"

আচার্য বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী নানা তীর্থ দর্শন ক'রে, অনেক দেশ ঘুরে এসে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কাছে বসে বলেছিলেন: "কি ব'লবো! দেখছি, যেখানে এখন ব'সে আছি, এইখানেই সব। কেবল মিছে ঘোরা! কোন কোন জায়গায় এঁরই এক আনা, কি দুই আনা; কোথাও চারি আনা, এই পর্যন্ত; এইখানেই পূর্ণ ষোল আনা দেখছি।"

প্রসিদ্ধ শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত সাধক বৈষ্ণবচরণ সংস্কৃত ভাষায় স্তব রচনা ক'রে ভাবাবিষ্ট ঠাকুরের সম্মুখে তাঁর অবতারত্ব কীর্তন করেছিলেন।

বিখ্যাত সাধক পণ্ডিত গৌরীকান্ত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকট এসে কিছুকাল তাঁর পুণ্য সান্নিধ্যে অবস্থান করেছিলেন। শাস্ত্রের সঙ্গে ঠাকুরের অবস্থা মিলিয়ে শ্রদ্ধাবনত মস্তকে তিনি ঘোষণা করেন: শাস্ত্রে যে-সব উচ্চ আধ্যাত্মিক অবস্থার কথা আছে, সে-সবই সাক্ষাৎ তাঁতে বিদ্যমান, তাঁর অবস্থা বেদ-বেদান্তাদি শাস্ত্রসকল অতিক্রম ক'রে বহুদূর অগ্রসর হয়েছে, তিনি মানুষ নন, অবতারসকলের যাঁর থেকে উৎপত্তি হয়, সেই বস্তু তাঁর ভিতরে রয়েছে।'

শ্রীরামকৃষ্ণদেব নিজে ব্রহ্মোপলব্ধি ক'রে তদ্গতভাবে অবস্থান করলেও সাধারণ মানুষের সুখদুঃখ জ্বালাযন্ত্রণা শোকতাপ ও নানা সমস্যার কথা ভুলতে পারেননি, তাই বলেছিলেন, 'খালি পেটে ধর্ম হয় না।' শ্রীচৈতন্যদেবের মতো তাঁর তিনটি দশা হ'ত—অন্তর্দশা, অর্ধবাহ্যদশা, বাহ্যদশা। অন্তর্দশায় তিনি সমাধিস্থ থাকতেন, অর্ধবাহ্যদশায় তাঁকে ঐশ্বরিকভাবে বিভোর দেখা যেত; বাহ্যদশায় তিনি পরমার্থপ্রসঙ্গ করতেন, শোকসন্তপ্ত মোহগ্রস্ত মানুষকে দুর্লভ মানবজীবন মধুময় করবার পথের সন্ধান দিতেন। যে জড়বাদের যুগে মানুষ বুদ্ধিকে বড় ক'রে দেখতে অভ্যস্ত, সে যুগে তিনি এমন এক জগতের সন্ধান দিয়েছেন, যা পার্থিব জগতের বাইরে আর এক জগৎ- সে জগৎ হ'ল সত্যের জগৎ, অমৃতের জগৎ, আনন্দের জগৎ।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শিক্ষা কোন জাতি বা ধর্মের গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বিশ্বের প্রত্যেক নরনারীর অন্তর স্পর্শ করে তাঁর অমৃতময়ী বাণী। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব শুধু একটি দেশের কতকগুলি মানুষের জন্য নয়, তাঁর আবির্ভাব পৃথিবীর সকল মানুষের জন্য। শ্রীরামকৃষ্ণ সর্বভাবময়। তিনি এসেছিলেন সর্বধর্মসমন্বয় ক'রে সমগ্র মানবজাতিকে মুক্তির পথ দেখাতে। অসংখ্য সম্প্রদায়ে ভরা পৃথিবীতে আর একটি সম্প্রদায় গড়বার জন্য তিনি

আসেননি। দীনদুঃখী রিক্ত পতিত অবহেলিত মানুষের তিনি বড়ই আপনার জন। আবার জ্ঞানী গুণী এবং সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিরও তিনি আপন জন। তিনি সকলের সুখদুঃখের সাথী—নিরাশ্রয়ের আশ্রয়রূপে অবতীর্ণ হয়ে যথার্থ শান্তিলাভের পথ দেখিয়ে গেছেন। তিনি বলেছেন: "ঈশ্বর এক, তাঁর অনন্ত নাম ও অনন্ত ভাব; যার যে নামে ও যে ভাবে ঈশ্বরকে ডাকতে ভাল লাগে, সে সেই নামে ও সেই ভাবে আন্তরিকতার সহিত ডাকলে তাঁর দেখা পায়।"

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মূল কথা হচ্ছে—যদি সত্যনিষ্ঠা, সংযম, ভক্তি, বিশ্বাস ও ব্যাকুলতা থাকে, তবে যে-কোন পথ অবলম্বন করা যাক না কেন, সিদ্ধিলাভ হবেই।

জীবসেবার মহাবাণী শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শ্রীমুখেই প্রথম উচ্চারিত হয়েছিল—জীবে দয়া নয়, শিবজ্ঞানে জীবসেবা। সেবাব্রতের বীজও তিনি নিজহস্তে বপন করেছিলেন। তিনি তাঁর শুদ্ধসত্ত্ব কুমার বৈরাগ্যবান্ ত্যাগী সন্তানদের 'হোমাপাখীর দলকে' রেখে গিয়েছিলেন 'বনের বেদান্তকে ঘরে ঘরে পৌঁছে দেবার জন্য', তাঁর উদার মহাভাব প্রচারের জন্য। বিরাট সমাজ-জীবনে বেদান্তকে কার্যকর ক'রে তোলবার জন্য স্বামীজী সেবাব্রতকে স্বীয় সঙ্ঘের আবশ্যিক অঙ্গ ব'লে গ্রহণ করেছিলেন। 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ'—নিজের মুক্তি এবং জগতের কল্যাণ—শিবজ্ঞানে জীবসেবার মহান্ ভাবে নিহিত রয়েছে এই অপূর্ব তত্ত্ব।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শিক্ষাপ্রদানের প্রণালী ছিল অভিনব। তিনি কারও ভাব নষ্ট করতেন না। মানুষের বিচিত্র প্রকৃতি, বিচিত্র তার মনের গঠন। অসংখ্য মানুষের অসংখ্য ভাব। বিভিন্ন অধিকারীকে তিনি আধার অনুযায়ী উপদেশ দিতেন। জ্ঞান-পথের অধিকারীকে জ্ঞানপথ, ভক্তিপথের অধিকারীকে ভক্তিমার্গ, কর্মীকে নিষ্কাম কর্ম, যোগমার্গের অধিকারীকে যোগসাধনা শিক্ষা দিতেন। আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে নিম্নস্তরের অধিকারীকে, প্রবর্তককে তার মনের ভাব অনুযায়ী পথনির্দেশ দিতেন, তাকে ধাপে ধাপে চরম লক্ষ্যে, অপার আনন্দের রাজ্যে নিয়ে যেতেন। আবার যার মধ্যে যেটির অভাব থাকত, সেটি পূরণের জন্যও তার প্রতি তাঁর সজাগ দৃষ্টি থাকত। যাঁদের তিনি তাঁর যুগমহাভাবের ধারকরূপে তৈরি করে-ছিলেন, তাঁদের তিনি জ্ঞান-কর্ম-ভক্তি-সেবা—সর্বভাবের উপযুক্ত ক'রে গড়েছিলেন।

গৃহে থেকে কেমন ক'রে ভগবানে মন রাখা যায়, কেমন ক'রে জীবনে কৃতকৃতার্থতা লাভ করা যায়, তার জন্য তিনি আদর্শ গৃহস্থ জীবন যাপনের সন্ধান দিয়েছেন। তাঁর গৃহী ভক্তগণের অনাসক্ত ভক্তিময় জীবন দেখলেই তা বোঝা যায়। আবার মহিলাগণের জীবন কেমন হবে তা তাঁর মহিলা-ভক্তগণের জীবনীপাঠে জানা যায়। স্বামীজী বলেছেন: "There is no chance of welfare of the world unless the condition of women is improved."—নারীজাতির অভ্যুদয় না হ'লে জগতের উন্নতির কোন সম্ভাবনা নেই। "সেই জন্যই রাম-কৃষ্ণাবতারে 'স্ত্রীগুরু'-গ্রহণ, সেই জন্যই নারীভাব-সাধন, সেইজন্যই মাতৃভাব-প্রচার।"

আমরা খৃষ্টধর্মের ভ্রাতৃত্ববোধ ( Brotherhood of Christianity ) এবং ইসলামধর্মের ভ্রাতৃত্ববোধের ( Brotherhood of Islam ) কথা সকলেই জানি এবং তাঁদের ঐক্যের কথা ব'লে থাকি, কিন্তু এই উভয়ের দ্বারা brotherhood of man অর্থাৎ মানবীয় ভ্রাতৃত্ববোধ প্রতিষ্ঠিত হয়নি, কারণ খৃষ্টধর্মের ভ্রাতৃত্ববোধ

খৃষ্টানদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, তার বাইরে তাঁদের ভ্রাতৃত্ববোধের প্রসার ঘটেনি, তেমনি ইসলাম ধর্মের ভ্রাতৃত্ববোধও মুসলমানদের মধ্যে গণ্ডিবদ্ধ, তার বাইরে তার কোনরূপ প্রসার নেই। অতএব সব মানুষের মধ্যে প্রকৃত *ভ্রাতৃত্ববোধ জাগাতে হলে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের* যে মাতৃভাব, যে উদার সর্বজনীন মহান্ ভাব রয়েছে, তার মধ্য দিয়েই তা জাগবে এবং সম্ভব হবে। আমরা সকলেই জগন্মাতার সন্তান, অতএব আমরা ভাই ভাই। আমাদের মধ্যে বিদ্বেষভাব কেন থাকবে, dogmatism কেন থাকবে ? শ্রীরামকৃষ্ণের উদার মহাভাবে সমস্ত বিদ্বেষ প্রশমিত হবে, 'মতুয়ার বুদ্ধি'র অবসান হবে। তাঁর মহাভাবে আছে সর্বভাবের সমন্বয় ; tolerance নয়, acceptance—অর্থাৎ অপরের ধর্মের প্রতি শুধু সহিষ্ণুতা-প্রদর্শনই নয়, তাকে পরিপূর্ণ স্বীকৃতি দেওয়া। রুচি ও সামর্থ্য অনুযায়ী মা যেমন ছেলেদের আহার্য দেন, সেই মায়ের মতোই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শিক্ষা দেবার রীতি ; যার যেমন সামর্থ্য, যে যেমন অধিকারী তাকে তেমনিভাবে অভূতপূর্ব উপায়ে অনন্ত-ভাবময় শ্রীরামকৃষ্ণ চরম লক্ষ্যের দিকে নিয়ে চলেন।

'কথামৃত'কার শ্রীম বলেছেন : শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কষ্টিপাথর ভক্তি। তিনি কেবল দেখেন অন্তরে ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসা ও ভক্তি আছে কিনা। যদি তা থাকে, অমনি সে তাঁর পরম আত্মীয়—মুসলমানের যদি আল্লার উপর ভক্তি থাকে, সেও তাঁর আপনার লোক—খৃষ্টানের যদি যীশুর উপর ভক্তি থাকে, সেও তাঁর পরম আত্মীয়। সকল ধর্মাবলম্বীরই তিনি পরম আত্মীয়।

শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবে সত্যযুগের উৎপত্তি হয়েছে। স্বামীজী বলেছেন, "তিনি যেদিন থেকে জন্মেছেন, সেদিন থেকে সত্যযুগ এসেছে। এখন সব ভেদাভেদ উঠে গেল, আচণ্ডাল প্রেম পাবে। মেয়ে-পুরুষ-ভেদ, ধনী-নির্ধনের ভেদ, পণ্ডিত-বিদ্বান-ভেদ, ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল-ভেদ সব তিনি দূর ক'রে দিয়ে গেলেন। আর তিনি *বিবাদভঞ্জন—হিন্দু-মুসলমান-ভেদ, ক্রিশ্চান-*হিন্দু-ভেদ ইত্যাদি সব চলে গেল। ঐ যে ভেদাভেদে লড়াই ছিল, তা অন্য যুগের ; এ সত্যযুগে তাঁর প্রেমের বন্যায় সব একাকার।" তিনি যে "Love personified"—মূর্তিমান প্রেম।

স্বামীজী আরও বলেছেন : 'What our sages thought in ages, he lived in one life'. পূর্ব পূর্ব যুগে মুনি ঋষি ও অবতার-পুরুষগণ যা চিন্তা করেছিলেন, তিনি এক জীবনেই তা যাপন ক'রে গেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব হ'লেন যুগ-যুগান্তের অনন্ত আধ্যাত্মিক ভাবরাশির জমাটবাঁধা মূর্তি! তিনি হ'লেন পূর্বগ যুগধর্মপ্রবর্তকগণেরই বর্তমান যুগোপযোগী পুনঃসংস্কৃত প্রকাশ।—"The most recent or rather latest edition of the Vedas." এই জন্যই শ্রীরামকৃষ্ণদেব এ যুগের সকলের আরাধ্য দেবতা। তাঁকে অবলম্বন ক'রে অনন্ত ঈশ্বর সম্বন্ধে ধারণা হয়। তাই তাঁর বিশ্বব্যাপী আকর্ষণ! ধর্ম যে জাতির প্রাণ, ত্যাগ যে জাতীয় আদর্শ—এ ধারণা হবে তাঁর জীবন-অনুধ্যানে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের যুক্তাক্ষরবর্জিত 'যত মত তত পথ'—এই মহাবাণী দেশ-কাল-পাত্রের গণ্ডি অতিক্রম ক'রে সম্পূর্ণ সনাতন ও সার্বভৌম রূপ পরিগ্রহ করেছে। এ বাণীর আবেদন সার্বলৌকিক ও সার্বকালিক। এ বাণীর অনুধ্যানে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, অদ্বৈত, শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব প্রভৃতি সম্প্রদায়ের ভাবগত কলহের চির অবসান হয়। সর্বধর্মের

ও সর্বভাবের সমন্বয়সাধন শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য দিক। সমন্বয়াচার্য বলেই তিনি সর্বমানবের; কোন ব্যক্তির বা দেশ-বিদেশের সম্পত্তি নন তিনি। এইজন্যই তিনি পূর্ব পূর্ব মহাপুরুষগণ হতে সমধিক উজ্জ্বল প্রভায় মহিমান্বিত।

প্রকৃত সাম্য শুধু রাজনীতির দ্বারা হতে পারে না, রাজনীতির দ্বারা আংশিক লক্ষ্যে পৌঁছানো যেতে পারে, ধনবৈষম্য দূর করা যেতে পারে; কিন্তু তার দ্বারা অন্তরের বৈষম্য দূর হবে না। সব মানুষের মধ্যে যে সচ্চিদানন্দ রয়েছেন, এই ভাব যত প্রসার-লাভ করবে ততই প্রকৃত সাম্যের দিকে মনুষ্য-সমাজ অগ্রসর হবে সারা বিশ্ব হবে একটি পরিবার। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের 'যত মত তত পথ'—এই উদারতম বাণীর মধ্যে পাওয়া যায় প্রকৃত সাম্য ও মৈত্রী এবং পরম শান্তির সন্ধান।

## পূজা-পুষ্প

**মহাকবি জি. শংকর কুরুপ**

[ অনুবাদিকা : শ্রীমতী সুজাতা প্রিয়ংবদা ]

হে সত্য সৌন্দর্য !
তোমার প্রকাশে
সদা প্রফুল্ল হোক আমার জীবন !

আমার হৃদয়ে উদ্বেলিত হোক
তোমারই কল্পনার
সার-তত্ত্বের সরস মাধুরী !

সদানন্দ আমার এই জীবন-কমল থেকে
উদ্‌গত সেই
অনির্বচনীয় মকরন্দের সুরভি সঞ্চারে
উল্লসিত হোক চতুর্দিক !

তোমার ওই করুণার উজ্জ্বল দ্যুতি
চির-বর্ণাঢ্য করুক আমায় !

কভু যদি ঝ'রে যাই, ঝরি যেন
তোমার ওই পদমূলে পূজা-পুষ্প হয়ে !

* [ কবির "জ্ঞানপীঠ পুরস্কার" প্রাপ্ত মূল মলয়ালম কাব্যগ্রন্থ "ওটক্কুঝল" সঞ্চয়নের 'পূজাপুষ্পম্' কবিতা ( পৃঃ ১১১, ৫ম সংস্করণ, ১৯৬৭ ) হইতে অনূদিত ]

# স্বামী বিবেকানন্দের অনুবাদ-গ্রন্থ : 'শিক্ষা'

অধ্যাপক প্রণবরঞ্জন ঘোষ

স্বামী বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী উপলক্ষে নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে একটি শিক্ষা-বিষয়ক আলোচনা-চক্রের অনুষ্ঠান হয়েছিল। বাংলাদেশের নানা প্রান্তের শিক্ষাবিদেরা সে সম্মেলনে সমবেত হয়ে স্বামীজীর শিক্ষাচিন্তার উৎস ও প্রয়োগপদ্ধতি নিয়ে নানাদিক থেকে আলোচনা করেছিলেন। যতদূর জানি, সে সম্মেলনে স্বামীজীর শিক্ষাচিন্তা-প্রসঙ্গে উদ্বোধন ও অদ্বৈত-আশ্রম-প্রকাশিত বইগুলিই ছিল প্রধান অবলম্বন। সেইসঙ্গে প্রাচীন ও আধুনিক যুগের শিক্ষাপদ্ধতির তুলনামূলক আলোচনাও স্বাভাবিক কারণেই প্রাধান্য পেয়েছিল। হার্বার্ট স্পেন্সারের Education : Intellectual, Moral and Physical' নামে যে গ্রন্থখানি স্বামীজী তাঁর প্রথম জীবনে অনুবাদ করেছিলেন, সে বইখানি সম্বন্ধে কোনো আলোচনা তখন সম্ভব হয়নি। কারণ বসুমতী-প্রকাশিত স্বামী বিবেকানন্দের 'শিক্ষা'-গ্রন্থটিই যে হার্বার্ট স্পেন্সারের বইটির অনুবাদ তখনো সেকথা আমরা জানতাম না। অথচ বসুমতী-কার্যালয় থেকে এই বইখানির অনুবাদ 'শিক্ষা' 'স্বামী বিবেকানন্দ-প্রণীত' এই পরিচয়ে বহু আগে থেকেই মুদ্রিত হয়ে আসছে। বইখানি স্বামীজীর প্রণীত নয়, অনূদিত। তবু স্বামীজীর শিক্ষাচিন্তা-আলোচনায় গ্রন্থখানি অপরিহার্য। এ বিষয়ে সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সংক্ষিপ্ত পরিচায়িকা দেবার চেষ্টা আগে করেছি।[১] বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য যথাসম্ভব বিস্তারিত আলোচনা।

বিবেকানন্দ-দর্শনের মূল প্রতিজ্ঞা যে বেদান্তের অদ্বৈতবাদ, সে বিষয়ে নরেন্দ্রপুরে আয়োজিত স্বামীজীর শিক্ষাচিন্তা সম্বন্ধে আলোচনা-চক্রে যোগদানকারীরা মোটামুটি একমত হয়েছিলেন। বলা বাহুল্য, তাঁর শিক্ষা-দর্শনও এই অদ্বৈতবাদে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু তাঁর চিন্তাধারার ক্রমপর্যায়ে বিভিন্ন দার্শনিকদের প্রভাবও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। সেদিক থেকে ছাত্রজীবনে তাঁর সতীর্থকল্প[২] বন্ধুবর আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের স্মৃতিচারণ আমাদের অনেক পরিমাণে সহায়তা করে। তারপরেই উল্লেখযোগ্য স্বামীজীর মধ্যমভ্রাতা মহেন্দ্রনাথ দত্তের 'স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী।'

বিবেকানন্দ-মানসের গঠনপর্বের অন্যতম সাক্ষী আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথের কথায়—"খুব কম লোকেই তাঁর অন্তরের মানুষটির সংগ্রামের কথা জানতো, তাঁর অন্তরাত্মার সমস্ত বিক্ষোভ রূপ পেতো বেপরোয়া অস্থিরতায়।

মানস-ইতিহাসের এই সঙ্কটমুহূর্তেই তিনি আত্মসচেতন হয়ে উঠেছেন, স্থাপিত হয়েছে তাঁর ভবিষ্যৎ-ব্যক্তিত্বের ভিত্তি। ব্রাহ্মসমাজের বহিরঙ্গ অংশ থেকে যে বালকসুলভ আস্তিক্য ও সহজ বিশ্বাস তিনি লাভ করেছিলেন, জন স্টুয়ার্ট মিলের 'ধর্ম-সম্পর্কিত তিনটি প্রবন্ধ' (Three Essays on Religion) পড়ে তা

---

১ 'বিবেকানন্দ-সাহিত্যের একটি অনালোচিত অধ্যায়': প্রণবরঞ্জন ঘোষ: আনন্দবাজার পত্রিকা: ১০ই জানুআরি, ১৯৭০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

২ স্বামীজী বয়সে একটু বড়ো হলেও ব্রজেন্দ্রনাথ ক্লাশে তাঁর এক শ্রেণী উপরে পড়তেন।

বিপর্যস্ত হলো। সৃষ্টির উৎস সম্পর্কে হেতুবাদ এবং বিশেষ পরিকল্পনার ব্যাখ্যা তাঁর পক্ষে আর নির্ভরযোগ্য রইলো না। প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যে অমঙ্গলের অস্তিত্বের সমস্যা নিয়ে তিনি বিচলিত হয়ে পড়লেন; স্রষ্টার সর্বজ্ঞতা ও সর্বশক্তিমত্তার ধারণার সঙ্গে কিছুতেই এই অমঙ্গলবোধকে তিনি মেলাতে পারছিলেন না। জনৈক বন্ধু তাঁকে হিউমের সংশয়বাদ এবং হার্বার্ট স্পেন্‌সারের অজ্ঞেয়-বাদের সঙ্গে পরিচিত করে দেওয়ার পর তাঁর অবিশ্বাস ক্রমে দার্শনিক সংশয়বাদের রূপ ধারণ করল।[৩]"

মধ্যমভ্রাতা মহেন্দ্রনাথ দত্তের স্মৃতিকথা-অনুযায়ী স্বামীজীর দর্শন-চর্চা-প্রসঙ্গ—"কলেজে তিনি হ্যামিল্টনের 'মেটাফিজিক্স' পড়িয়াছিলেন। জন স্টুয়ার্ট মিল ও হার্বার্ট স্পেন্‌সার তিনি অতিশয় পড়িতেন। মিল ও স্পেন্‌সারের প্রভাব প্রথম অবস্থায় তাঁহার জীবনের উপর বিশেষ কার্য করিয়াছিল। তিনি হার্বার্ট স্পেন্‌সারের এডুকেশন পুস্তকখানি বাঙ্গালা ভাষায় অনূদিত করিয়াছিলেন। এই সময় হার্বার্ট স্পেন্‌সার নিজ হস্তে অনুবাদের অনুমতি প্রদান ও বিশেষ উৎসাহ দিয়া একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। কিন্তু সেই পত্রখানি তখন বিশেষ আদরের জিনিষ না বিবেচনা করায় যত্ন করিয়া রক্ষা করা হয় নাই…।"[৪]

আলোচ্য প্রবন্ধে আমরা মূলতঃ স্বামীজীর অনুবাদগ্রন্থটি সম্বন্ধেই বক্তব্য সীমাবদ্ধ রাখবো বলে তার দর্শনচিন্তার পটভূমি নিয়ে আর বিস্তৃত তথ্যে অগ্রসর হবো না। প্রধানতঃ যে কয়টি কারণে আমাদের কাছে স্বামীজীর অনূদিত 'শিক্ষা'-গ্রন্থটি বিশেষ মূল্যবান তা এই—(ক) বাংলাসাহিত্যের অনুবাদ-বিভাগে দর্শন-বিজ্ঞানের গ্রন্থাবলীর অনুবাদ যে বিশেষ প্রয়োজনীয় সেকথা স্বামীজী তাঁর তরুণ বয়সেই অনুধাবন করেছিলেন এবং মাতৃভাষাকে জ্ঞানসমৃদ্ধ করার কাজে ব্রতী হয়েছিলেন। আলোচ্য অনুবাদগ্রন্থ 'শিক্ষা' সে প্রচেষ্টার এযাবৎ প্রাপ্ত একমাত্র সম্পূর্ণ উদাহরণ।[৫] স্বামীজীর আর একটি অসম্পূর্ণ অনুবাদ আমাদের প্রত্যাশাভঙ্গের বেদনার কারণ—সেটি টমাস-আ-কেম্পিসের 'ঈশানুসরণ' ('ভাব্‌বার কথা' দ্রষ্টব্য)। (খ) বিবেকানন্দ-মানসে দার্শনিক স্পেন্‌সারের প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনার উপকরণরূপে এ অনুবাদগ্রন্থের বিশিষ্ট মূল্য। (গ) বিবেকানন্দ-শিক্ষা-দর্শনের অন্যতম প্রধান উপকরণরূপে হার্বার্ট স্পেন্‌সারের চিন্তাধারার পর্যালোচনা। (ঘ) সামগ্রিকভাবে বিবেকানন্দ-সাহিত্যের নবলব্ধ সংযোজনরূপে অনুবাদগ্রন্থ 'শিক্ষা'র তাৎপর্য।

হার্বার্ট স্পেনসারের Education (শিক্ষা) বইখানির প্রথম সংস্করণে দেখি প্রকাশক Williams And Nograte, London, বইটির পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৯০। বসুমতী-প্রকাশিত 'শিক্ষা' বইখানি ছোট আকারের মাত্র ৯৯ পৃষ্ঠার বই। মূল বইটির আক্ষরিক অনুবাদ স্বামীজী করেননি, মাঝে মাঝে বাদ দিয়ে গেছেন। কিন্তু আলোচনার মূল বক্তব্য কোথাও বাদ যায়নি এবং অনুবাদ যথাসম্ভব মূলানুগ।

---

৩ অদ্বৈত আশ্রম প্রকাশিত Life of Swami Vivekananda (বিবেকানন্দ-জীবনী): Eastern & Western Disciples (প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিষ্যবৃন্দ-রচিত); পঞ্চদশ সংস্করণ; পৃঃ ৭৭

৪ শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী: মহেন্দ্রনাথ দত্ত: দ্বিতীয় সংস্করণ: পৃঃ ১৬৩-১৬৪

৫ স্বামীজীর অনূদিত একাধিক গ্রন্থ থাকা আশ্চর্য নয়।

পাঠকমণ্ডলীর কৌতূহল-নিরসনের জন্য হার্বার্ট স্পেন্সারের গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদের প্রথমাংশ ও স্বামীজীর অনুবাদ উদ্ধৃত করছি—

Chapter—I

*What Knowledge Is of Most Worth ?*

It has been truly remarked that, in order of time, decoration precedes dress. Among people who submit to great physical suffering that they may have themselves handsomely tattooed, extremes of temperature are borne with but little attempt at mitigation. Humbolt tells us that an Orinoco Indian, though quite regardless of bodily comfort, will yet labour for a fortnight to purchase pigment wherewith to make himself admired; and that the same woman who would not hesitate to leave her hut without a fragment of clothing on, would not dare to commit such a breach of decorum as to go out unpainted. Voyagers find that coloured beads and trinkets are much more prized by wild tribes, than are calicoes or broadclothes. And the anecdotes we have of the ways in which, when shirts and clothes are given, savages turn them to some ludicrous display, show how completely the idea of ornament predominates over that of use."

স্বামীজীর অনুবাদ—

**শিক্ষা**

**প্রথম পরিচ্ছেদ**

**সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান কি ?**

কোন পণ্ডিত বলিয়াছেন, বসনের পূর্বে ভূষণের সৃষ্টি। ইহা অতি সত্য কথা। অসভ্যেরা সর্বাঙ্গে উল্কি ভূষিত করিবার তীব্র যাতনা বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া সহ্য করিবে, তথাপি নিদারুণ শীত হইতে আত্মত্রাণের কোনও চেষ্টা করিবে না। হম্বোল্ট একটি আদিম আমেরিকের বিষয় লিখিয়াছেন যে, সে সামান্য অলঙ্কারে অঙ্গ ভূষিত করিয়া, স্ব-সমাজে গৌরবলাভের আশায় দুই সপ্তাহ-কাল সকল প্রকার ক্লেশ তুচ্ছ করিয়া কঠিন শারীরিক পরিশ্রমে নিযুক্ত ছিল। তিনি আরও বলেন যে, যে-সকল অসভ্য স্ত্রীলোক চীরমাত্রবিরহিতা হইয়া অসঙ্কোচে গৃহের বাহিরে গমন করে, তাহারাও জনসমাজে অচিত্রিত বপু প্রদর্শন অতি লজ্জাকর মনে করে। সমুদ্রযাত্রীরা দেখিতে পান যে, অসভ্যেরা রঞ্জিত কাচখণ্ড অথবা সামান্য ক্রীড়া-অলঙ্কারের প্রতি মূল্যবান ক্যালিকো অথবা বনাত অপেক্ষা সমধিক সমাদর প্রদর্শন করে এবং কামিজ অথবা কোর্তার তাহারা যে প্রকার হাস্যাস্পদ ব্যবহার করে, তদ্দ্বারা প্রয়োজন অপেক্ষা ভূষণ যে তাহাদের সম্পূর্ণ মনোনীত, ইহা স্পষ্ট উপলব্ধি হয়।

( ক্রমশঃ )

# বার্ট্রাণ্ড রাসেল

## শিবদাস

'আধুনিক যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক, মানবদরদী' ও দার্শনিক এবং বিশ্বশান্তিকামী বার্ট্রাণ্ড রাসেল আজ আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন, কিন্তু রেখে গেছেন তাঁর অমর চিন্তারাশি।

তাঁর কথা 'ইউরোপের বিবেকের কণ্ঠস্বর' নামে খ্যাত। যুদ্ধ, পারমাণবিক অস্ত্র ও জাতিবিদ্বেষের বিরুদ্ধে তিনি প্রতিবাদ জানিয়ে গেছেন নির্ভীকভাবে। তাঁর চিন্তারাশি সুগভীর, বহু ক্ষেত্রে বিদ্রোহী এবং কোন কোন ক্ষেত্রে পরিবর্তনশীলও। ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে তিনি বলেছিলেন, 'যুদ্ধের অসংখ্য ক্ষয়ক্ষতি সত্ত্বেও যুদ্ধকে আমি সানন্দে বরণ করতে রাজী আছি, যদি কম্যুনিজমকে ধরাধাম থেকে নির্মূল করার জন্য যুদ্ধ হয়'; কিন্তু শেষ জীবনে তিনিই হয়ে ওঠেন তার সমর্থক। বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর চিন্তাধারার মূল ভিত্তি বোধ হয় তাঁর আত্মজীবনীতে লেখা এই কথাটি—"তিনটি প্রবৃত্তি আমাকে সারাজীবন তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে; একটি হল ভালবাসার তৃষ্ণা, দ্বিতীয়টি জ্ঞানের স্পৃহা এবং তৃতীয়টি হল মানুষের দুর্গতি দেখে অসহনীয় বেদনার অনুভূতি।"

বিট্রেনের বেডফোর্ডের বিখ্যাত রাসেল-পরিবারে ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ২৮শে মে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ১৭শ শতাব্দী থেকে এই পরিবারই বেডফোর্ডের ডিউক ছিল। বার্ট্রাণ্ড রাসেলের জনৈক পূর্বপুরুষ ২য় চার্লসের রাজত্বকালে রাজদ্রোহের অপরাধে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন; তাঁর পিতামহ ছিলেন মহারাণী ভিক্টোরিয়ার অন্যতম প্রধানমন্ত্রী।

তিনবছর বয়সেই বার্ট্রাণ্ড রাসেল পিতা-মাতাকে হারিয়ে পিতামহের কাছে মানুষ হতে থাকেন।

কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রিনিটি কলেজ থেকে তিনি অঙ্কশাস্ত্র ও নৈতিক বিজ্ঞানে কৃতবিদ্য হন এবং এই কলেজেই অধ্যাপনা শুরু করেন। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে তাঁকে 'ফেলো অব রয়্যাল সোসাইটি' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। তাঁর প্রতিভার প্রতি প্রদত্ত অন্যান্য সম্মানগুলির অন্যতম হল সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার। এইকালে রাজনীতির সঙ্গেও তিনি জড়িত হয়ে পড়েন; পার্লামেণ্টের সভ্য হওয়ার জন্য বার তিনেক ব্যর্থ চেষ্টাও করেছিলেন। রাজনৈতিক কারণে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় তাঁকে অধ্যাপকের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়; কিছুদিন কারাবাসেও রাখা হয়েছিল তাঁকে।

যুদ্ধ থেমে যাওয়ার পর বার্ট্রাণ্ড রাসেল ইংলণ্ডের শ্রমিকদলের সদস্যরূপে রাশিয়া যান। ফিরে আসার পর ট্রিনিটি কলেজ তাঁকে অধ্যাপকপদে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে চাইলেও তিনি তা প্রত্যাখ্যান করে পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েকটি বক্তৃতা দেবার জন্য ১৯২০ খৃষ্টাব্দে চীনদেশে চলে যান।

ভারতের স্বাধীনতাসংগ্রামে সহায়তার জন্য কিছুকাল তিনি ইংলণ্ডে 'ইণ্ডিয়া লীগের' চেয়ারম্যানও হয়েছিলেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কিছু পূর্বে তিনি চিকাগো এবং ক্যালিফর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দেবার জন্য আমেরিকা গমন করেন। সেখানে ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে তাঁকে নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকের পদও প্রদত্ত হয়। এ নিয়ে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে—তাঁর ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে লিখিত 'ম্যারেজ এণ্ড মর‍্যাল্স' বইটির জন্য পাদ্রীরা এই 'নাস্তিক ও নীতিবোধহীন' ব্যক্তিকে অধ্যাপকের পদে নিয়োগের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, এমন কি কোর্টে মামলাও জুড়ে দেন। অধ্যাপকের পদ ত্যাগ করে রাসেল ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে ফিরে আসেন। ট্রিনিটি কলেজ 'ফেলোশিপ' দিয়ে সসম্মানে তাঁকে গ্রহণ করেন।

পরবর্তীকালে বহুবিধ প্রণালীতে তাঁর কার্যধারা প্রবাহিত হতে থাকে।

সমগ্র মানবজাতির পক্ষে তাঁর মতে যা অন্যায় তার বিরুদ্ধে রাসেল বিভিন্ন সময়ে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন। রাশিয়ার ইহুদিদের প্রতি আচরণ, যুক্তরাষ্ট্রের পৌর অধিকার, পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানীর বিভিন্ন ঘটনা, পশ্চিম এশিয়ায় বৃটিশজাতির নীতি প্রভৃতি বিষয়ে তিনি নিঃসঙ্কোচে নিজমত প্রকাশ করেছেন। ১৯৬৪ খৃষ্টাব্দেও পর্তুগীজদের বন্দীদের প্রতি অন্যায় আচরণ, কিউবার ওপর দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের বিমান প্রেরণ, কেনেডি হত্যা সম্পর্কে প্রদত্ত ওয়ারেন কমিশনের রিপোর্ট প্রভৃতি বিষয়ে তিনি তীব্র মন্তব্য করেছেন।

তিনি চারটি বিবাহ করেছিলেন। তাঁর সন্তান তিনটি।

দর্শন, গণিত, সমাজসেবা, বিজ্ঞান, শিল্প, সভ্যতা প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে তিনি ৫০ খানির অধিক গ্রন্থ রচনা করে গেছেন। কিছু গল্পও লিখেছেন। আত্মচরিত লিখেছেন তিন খণ্ডে।

ট্রিনিটি কলেজে অধ্যাপনাকালে রাসেল অঙ্ক, দর্শন ও তর্কশাস্ত্রের কয়েকখানি অনবদ্য পুস্তক রচনা করেন। ব্রিক্স্টন জেলে বাসকালে জেলের জীবন সম্বন্ধে একখানি পুস্তক এবং 'ইন্ট্রোডাকশন টু ম্যাথম্যাটিক্যাল ফিলজফি'-র অধিকাংশই রচনা করেন। রাশিয়া সম্বন্ধে তাঁর অভিজ্ঞতা 'দি থিওরী অব বলশেভিজম্' গ্রন্থে বিধৃত। চীনের সমস্যা ও বিংশ শতাব্দীতে তার ভবিষ্য রাজনীতিক রূপ সম্বন্ধেও তিনি একখানি বই লেখেন। 'হিসট্রি অব্ দি ওয়েস্টার্ন ফিলজফি' লেখেন ৭৫ বৎসর বয়সের সময়। তাঁর অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে, 'হিউম্যান সোসাইটি ইন্ এথিক্স এণ্ড পলিটিক্স্', 'মাই ফিলজফিক্যাল ডেভেলপ্‌মেণ্ট', 'উইজ্‌ডম অব দি ওয়েস্ট', 'পলিটিক্যাল আইডিয়াজ' প্রভৃতি।

শিক্ষা বিষয়েও তাঁর গভীর চিন্তা ছিল। ইংলণ্ডের হ্যাম্পশায়ারের পিটার্সফিল্ড-এ তিনি ও তাঁর পত্নী ডোরা আধুনিক পদ্ধতিতে শিক্ষার একটি স্কুলও খুলেছিলেন।

গত ৩রা ফেব্রুআরি ১৯৭০, রাত্রি সাড়ে বারোটার সময় ওয়েলস-এর পোর্ট ম্যাডক শহরের নিকটস্থ নিজ বাসভবনে প্রায় ৯৮ বৎসর বয়সে বার্ট্রাণ্ড রাসেল শান্তিতে দেহত্যাগ করেন। তাঁর ইচ্ছামত তাঁর দেহ দাহ করা হয় এবং শেষকৃত্য করার সময় কোন ধর্মানুষ্ঠান করা হয়নি।

# জোসেফিন ম্যাক্‌লাউড

ব্রহ্মচারী শ্যামল

প্রায় চল্লিশ বছর আগেকার বেলুড় মঠ। শান্ত সকাল। শুধু মঠবাড়ীর দিকটাতে কিছু সোরগোল ও ব্যস্ততা চলেছে, কারণ চোর ধরা পড়েছে, গভীর রাত্রে গেস্ট হাউসের দোতলার ঘরে এক বিদেশিনী বৃদ্ধার গলা থেকে একটি সোনার হার নিয়ে পালাচ্ছিল, ধরা পড়ে গেছে। প্রেসিডেণ্ট পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজের ঘরে বিচারের ব্যবস্থা হচ্ছে। হঠাৎ দ্রুতপদে সেই ঘরে ঢুকে পড়লেন বৃদ্ধা বিদেশিনী। উন্নত ললাট, ঋজু দীর্ঘ দেহ, সর্বাঙ্গে পরিপূর্ণ আভিজাত্যের ছাপ, মুখে পবিত্র অনুপ্রেরণার আভা। মহারাজকে বললেন, "মহারাজ, আমার মনে হয় চোরটি ভক্ত। তা না হলে ঘরে কত জিনিস ছিল, সে-সব না নিয়ে আমার গলার নেক্‌লেস্‌টা নিতে যাবে কেন? আপনি তো জানেন, ঐ নেক্‌লেস্‌টার মধ্যে স্বামীজীর প্রদত্ত 'লকেট্‌টি' আছে। আমার বিশ্বাস সেই লকেট্‌টা নেওয়াই চোরটার মতলব ছিল।"[১] বৃদ্ধার সরল বিশ্বাসে সায় দিলেন স্বামীজীর গুরুভাই মহাপুরুষজী। চোর বেকসুর খালাস পেল। গঙ্গাস্নান করিয়ে, নতুন কাপড়-চাদর পরিয়ে এই অদ্ভুত ধরনের 'ভক্ত' চোরকে বিদায় দিয়ে মঠবাসীরা মর্যাদা দিলেন স্বামীজী-গতপ্রাণা এই বৃদ্ধাকে। স্বামীজীর দেওয়া, তাঁর দিব্যস্মৃতিবিজড়িত লকেট চুরি করার জন্য যে আসে, সে কখনও চোর হতে পারে না, বরং ভক্ত—এই তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস। কারণ, স্বামীজীর সামান্যতম সান্নিধ্যও মানুষকে মহত্তর ক'রে সত্যের পথে অনুপ্রাণিত করে। এ বিশ্বাসের শক্তিতেই সারা জীবন কাটিয়েছিলেন বিবেকানন্দগতপ্রাণা এই মার্কিন মহিলা জোসেফিন ম্যাক্‌লাউড অথবা স্বামীজীর প্রিয় 'জো'।

স্বামীজীর সান্নিধ্যে কি পেয়েছিলেন এই বিদেশিনী নারী যা তাঁকে সারা জীবন ধরে এক বিরাট অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল, তা আমাদের পক্ষে বোঝা দুঃসাধ্য। বয়সে স্বামীজীর থেকে বছর পাঁচেক বড় ছিলেন। জন্ম আমেরিকায় ইলিনয়েস্‌-এ ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে। পিতা ডেভিড্‌ ম্যাক্‌লাউড স্কটিস্‌ হাইল্যাণ্ড থেকে আমেরিকায় চলে এসেছিলেন নতুন ঘর বাঁধবার আশায়। উচ্চাকাঙ্ক্ষী ডেভিডের কাছে কোন কিছুই যথেষ্ট নয়। শুধু জাগতিক ব্যাপারে নয়, ধর্মের ব্যাপারেও ডেভিড কিছুটা বেশী উদারভাব পোষণ করতেন। মৃত্যুশয্যায় শুয়ে একদিন কনিষ্ঠা কন্যা জোসেফিনকে ভারতীয় বেদান্তধর্মের নতুন বই পড়তে দেখে আগ্রহান্বিত হয়ে সেই তত্ত্ব শুনেছিলেন। শোনা হয়ে গেলে বলেছিলেন, "জীবনে আজ প্রথম একটা বাণী শুনলাম।"[২] বালিকা জোসেফিন সেদিন বেদান্তধর্মের কি বই পড়ে পিতার মন হরণ করেছিলেন, তা আমাদের জানা নেই, তবু স্বামীজীকে দেখার আগেই জোসেফিন আর তাঁর বড় বোন 'বেটি' সম্পূর্ণ গীতা মুখস্থ করেছিলেন, এ কথা জো নিজেই তাঁর স্মৃতিতে উল্লেখ করেছেন।

### 'প্রকৃত জন্মদিন'

২৯শে জানুআরি, ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দ। নিউইয়র্কের

১ শিবানন্দ-স্মৃতিসংগ্রহ—দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৪৪

২ Late and Soon by Francis Legget, p. 46

55 West 33rd Street-এর একটি ছোট ঘরে বসে যুগপ্রাচীন বেদান্ত বিশ্লেষণ করছিলেন তরুণ হিন্দু সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ। ঘর, সিঁড়ি, বারান্দা সব পরিপূর্ণ করে বসে তাঁর কথা শুনছিলেন বিমুগ্ধ শ্রোতৃবৃন্দ। এঁদের মাঝখানে সেদিন প্রথম এসেছিলেন দুই বোন, জোসেফিন আর বেটি ম্যাক্‌লাউড, হাড্‌সন্ নদীপথে দীর্ঘ ৩০ মাইল পথ অতিক্রম করে। অপরিচিত এই হিন্দু সন্ন্যাসীর প্রথম দর্শনেই জো উপলব্ধি করেছিলেন, তিনি তাঁর জীবনের মহত্তম ব্যক্তির সান্নিধ্যে এসে পড়েছেন।[৩] বিস্মিত এবং গভীর শ্রদ্ধায় বিমুগ্ধ জো এই প্রথম দর্শন সম্বন্ধে পরবর্তীকালে যা লিখেছিলেন তা তাঁর স্মৃতি থেকেই তুলে ধরছি—"স্বামীজী সেদিন একটি ভাষণ দিচ্ছিলেন, সে ভাষণের সঠিক ভাষা আজ আর মনে নেই। তবে সেই মুহূর্তেই অনুভব করেছিলাম, এ বাক্যটি একটি সত্য। দ্বিতীয় বাক্যটি যা স্বামীজী উচ্চারণ করলেন তাও একটি সত্য, আর তৃতীয় বাক্যটিও সত্য। তার পর থেকে সাত বছর ধরে তাঁর কথা আমি শুনেছি। আর তিনি যা যা বলেছিলেন তাই আমার কাছে সত্য বলে প্রতিভাত হয়েছিল। সেই মুহূর্ত থেকে জীবনের অর্থটাই পালটে গিয়েছিল। আমাকে যেন তিনি অনুভব করিয়ে দিয়েছিলেন যে, আমি অনন্তের মধ্যেই আছি।"[৪]

প্রথম দর্শনের এই দিনটিকে জো-র জীবনের একটি বৈপ্লবিক দিন বললেও অত্যুক্তি হয় না। জড়বাদসর্বস্ব পাশ্চাত্যের দ্বারে স্বামীজী সেদিন এনেছিলেন অন্তর্জগতের দেবত্বের বাণী। মানুষের দুর্বলতা ও পাপ অলীক কল্পনা, তাঁর অন্তর্নিহিত দেবত্ব আর পূর্ণত্বটাই চিরন্তন সত্য। ধর্ম গির্জাতে নেই, গোঁড়ামিতেও নয়, তা রয়েছে সমস্ত জীবনে। মানুষের পূর্ণত্বের প্রকাশের মধ্যেই তার যথার্থ পরিচয়। জো লিখেছিলেন, "তিনি সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিয়ে দিতেন জীবনের কিছুই ধর্মের বাইরে নয়, সবটাই পবিত্র।" জো-কে আহ্বান করেছিলেন স্বামীজী অমৃতের সন্তান বলে, বলেছিলেন, "সব সময় মনে রেখো তোমার আসল পরিচয় হল তুমি চিরদিন ঈশ্বরের সন্তান, কেবল বাইরের দিক দিয়েই একজন আমেরিকান এবং নারী।" এ বিরাট আহ্বানের তাৎপর্য গ্রহণ করার মতো শক্তি সেদিন এই বিদেশিনীর ছিল বলেই মনে হয়। আর ছিল বলেই এমন ভাবে সাড়া দিতে পেরেছিলেন স্বামীজীর আহ্বানে। স্বামীজীকে সত্যস্বরূপ দেখেছিলেন জো। আর এ দেখার অর্থ হল জো-র কাছে—এই মহামানবের সেবার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করা। এই আত্মোৎসর্গের প্রেরণাতেই ঘরের, আত্মীয়স্বজনের, দেশের, বিবাহের সমস্ত বন্ধনকে উপেক্ষা করেছিলেন জো। প্রথম দর্শনের দিনটি থেকেই জো-র জীবনে এই বিরাট পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিল। জো তাই বিশ্বাস করতেন এই দিনটি তাঁর নব-জন্মের দিন। পরবর্তীকালে কোন কৌতূহলী জিজ্ঞাসু যখন বৃদ্ধা জো-র বয়স জিজ্ঞাসা করতেন, জো তাঁর বয়স গুণতেন এই দিনটি থেকে। কারণ জিজ্ঞাসা করলে জো বলতেন এইটিই তাঁর "real birthday" অর্থাৎ প্রকৃত জন্মদিন। আরও বলতেন, "After I met him I was never the same." অর্থাৎ "তাঁকে দেখার পর থেকে আমি আর আগের ব্যক্তি ছিলাম না।"[৫]

৩ Late and Soon by Francis Legget, p. 95.

৪ Reminiscences of Swami Vivekananda (2nd Ed.), p. 233

৫ Vedanta And The West—No. 158, P. 61

## মহাপুরুষ-সান্নিধ্যে

মনুষ্যত্ব, মুমুক্ষুত্ব, মহাপুরুষ-সংশ্রব—এ তিনটি সুযোগ জোসেফিনের জীবনে এসেছিল পূর্ণমাত্রায়। প্রথম দর্শনেই যুগাচার্য বিবেকানন্দকে সত্যস্বরূপ হিসাবে গ্রহণ করার ক্ষমতা জো-র যথার্থ সত্যানুসন্ধানের ফলস্বরূপ। স্বামীজীকে দেখার আগে বহু জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছেন জো সত্যের সন্ধানে; স্বামীজীর পদপ্রান্তে আসার পরে আর কারও কাছে যাবার প্রয়োজন মনে করেননি, বিবেকানন্দের মতো মহাপুরুষের সংশ্রবের দুর্লভ সুযোগও জো পেয়েছিলেন অভাবনীয়ভাবে বিভিন্ন সময়ে নিউইয়র্কে, রিজলী ম্যানরে, ক্যালিফোর্নিয়ায়, কাশ্মীরে এবং বেলুড় মঠে। জো-র দিক থেকে এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য রিজলী ম্যানরের দিব্য দিনগুলোর স্মৃতি, যেখানে স্বামীজী তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ আমেরিকান বন্ধু ও গুণগ্রাহী মিঃ ফ্রান্সিস্ লেগেটের আমন্ত্রণে দুবার পদার্পণ করেছিলেন।

আমেরিকার Catskill পর্বতের মধ্যস্থ ফ্রান্সিস (স্বামীজীর প্রিয় ফ্রাঙ্কিন্‌সেন্স)-এর রিজলী ম্যানর নামক এই নির্জন পার্বত্য নিবাসে প্রথমবার এসেছিলেন ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে মাত্র কয়েক দিনের জন্য, সেদিন তিনি বিশ্রামাকাঙ্ক্ষী রণক্লান্ত সৈনিক, অতিশয় পরিশ্রান্ত।

দ্বিতীয়বার এসেছিলেন চার বছর পরে ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মে। সেদিন স্বামীজীর জীবনে বহু পরিবর্তন এসেছে। স্বদেশে যুগাচার্যের আর বিদেশে 'Prophet'-এর সম্মান পেয়েছেন, স্বীয় গুরুর নামে সঙ্ঘ প্রবর্তন করেছেন এবং দেশবিদেশে নতুন আধ্যাত্মিকতার বাণী প্রচার শুরু করে দিয়েছেন। এবার সঙ্গে নিয়ে এসেছেন দুই গুরুভাই স্বামী তুরীয়ানন্দজী ও স্বামী অভেদানন্দজীকে এবং ভগিনী নিবেদিতা আর মিসেস্ ওলিবুল্‌কে। রিজলীর সেই অবিস্মরণীয় গ্রীষ্মকালটিতে ('Great Summer') দেশবিদেশের বহু লোক এসেছেন স্বামীজীর সান্নিধ্য ও বাণী লাভ করার জন্য। দুবারই সঙ্গে ছিলেন জো। তাঁর কাছে মনে হয়েছিল স্বামীজী তাঁর স্বরূপেই আছেন। অনেকখানি ভারমুক্ত হওয়াতে অপেক্ষাকৃত শান্ত, মৌন এবং গম্ভীর; কিন্তু সেই তরুতলবাসী, একাকী, আত্মানন্দে বিভোর, নিঃসঙ্গ সন্ন্যাসী—যিনি রিজলীর বিস্তীর্ণ তৃণভূমিতে একাকী পায়চারী করতেন আর সন্ধ্যায় ধ্যানতন্ময়তার মধ্যে নির্বাক বিমুগ্ধ শ্রোতৃবৃন্দের সম্মুখে ব্যাখ্যা করতেন বেদান্তের বাণী।

মিঃ ও মিসেস লেগেট্ (ইনিই জো-র বড় বোন বেটি) স্বামীজী, তাঁর গুরুভাই এবং অনুরাগী ভক্তবৃন্দের সেবার কোন ত্রুটি রাখেননি, কিন্তু জো-ই হয়েছিলেন স্বামীজীর সবচেয়ে কাছের মানুষ। ছোটখাট ব্যাপার থেকে সমস্ত বিষয়ে স্বামীজী সাহায্য চাইতেন অন্য কারও কাছে নয়, জো-র কাছে। বলতেন, "জো আমাদের মধ্যে সব চেয়ে মাধুর্যময় হৃদয়ের অধিকারিণী। (Joe is the sweetest spirit of us all)."[৬] দ্বিতীয়বার আমেরিকায় আসার সময় অতি সযত্নে জো-র জন্যে ভারতবর্ষ থেকে নিয়ে এসেছিলেন এক বোতল আচার।[৭] প্রয়োজনীয় চিঠিপত্র লিখতেন জো-কে। নিজের নির্ভীক সরলতা আর পবিত্র সেবাপরায়ণতার জন্য জো কোনদিন স্বামীজীকে ভয় পাননি, কখনও দূরত্ব অনুভব করেননি। স্বামীজীর বহু গভীর ভাবঘন দৈবমুহূর্তের সন্ধান আমরা তাই পাই জো-র স্মৃতি থেকে। আবার অদ্ভুত

---

৬ Reminiscences, 372
৭ " 271

বৈচিত্র্যময় এই মহাপুরুষটির শিশুসুলভ সরল হাস্যময় মুহূর্তের জো ছিলেন সাক্ষী। মাঝে মাঝে বড় বড় বক্তৃতা শেষ করে স্বামীজী ঘরে ফিরে "Prophet"-এর সমস্ত গাম্ভীর্য ভুলে গিয়ে নিজেই ঢুকে পড়তেন রান্না করবার জন্য। পোশাক-পরিচ্ছদ অপরিচ্ছন্ন হওয়ার কথা ভাবতেন না, অন্য কারও কথাও শুনতেন না। জো-ই এ সব দিনে স্বামীজীকে ধরে নিয়ে আসতেন। আবার ঈশদূত যীশুর সম্বন্ধে বক্তৃতাশেষে যেদিন স্বামীজী এক স্বর্গীয় আভায় ভরে উঠেছিলেন, সেদিন জো-ই ছিলেন ঐ ভাবঘন মুহূর্তের অন্তরঙ্গ সাক্ষী। মহাপুরুষ-সান্নিধ্যের এই দিব্য স্মৃতিগুলি জো-র অজ্ঞাতসারেই পরবর্তীকালে তাঁকে প্রভাবিত করেছিল এক ত্যাগসমুজ্জ্বল মহৎ জীবনের পথে।

## মুক্তিদাতা

লেগেট পরিবারের কাছ থেকে স্বামীজী পেয়েছিলেন যথেষ্ট সাহায্য, শ্রদ্ধা, বিশ্বাস এবং saint ( মহাপুরুষ )-এর সম্মান, কিন্তু জো-র কাছ থেকে পেয়েছিলেন এক সমুন্নতচরিত্রা নারীর নিঃস্বার্থ প্রেম ও পূর্ণ সেবাপরায়ণতা। মহাপ্রয়াণের দু' দিন আগে স্বামীজী ভগিনী নিবেদিতাকে জো-র সম্বন্ধে বলেছিলেন, "সে পবিত্রতার মতোই পবিত্র এবং প্রেমের মতো প্রেমস্বভাবা।"[৮] স্বামী বিবেকানন্দের অন্তরঙ্গ অনুরাগীদের মধ্যেও এত বড় ভক্তির অধিকারী জীবন অতি বিরল।

কোন্ দেবদুর্লভ আকর্ষণে এত বড় একটি চরিত্র স্বামীজীর জন্য আত্মোৎসর্গ করেছিলেন, এ প্রশ্নের উত্তরে জো-র নিজের কথাই বলতে হয়। স্বামীজীর তিরোধানের পর বেলুড় মঠ থেকে লিখিত একটি পত্রে জো লিখছেন, "স্বামীজীর জীবনের মধ্যে যে ভাবটি আমাকে ধরে রেখেছিল" সেটি হল তার "অসীমতা।... ও-রকম একটি জীবন মানুষকে কতখানিই না মুক্তস্বভাব করে তোলে! আমাকে মুক্ত করার জন্যই স্বামীজী এসেছিলেন। নিবেদিতাকে ত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষিত করার এবং মিসেস্ সা-র জীবনে অদ্বৈতের অনুভূতি দেওয়ার মতো, এটাও তাঁর জীবনের একটা ব্রত ছিল।"[৯]

"আমাকে মুক্ত করাব জন্যই স্বামীজী এসেছিলেন"—প্রত্যক্ষ অনুভূতিলব্ধ এ বিশ্বাসের খুঁটি জো-র জীবনে মুহূর্তের জন্যেও নড়েনি। আর 'মুক্তিদাতা' বিবেকানন্দের প্রতি এই প্রচণ্ড বিশ্বাসের মধ্যে লুকিয়ে ছিল জো-র অফুরন্ত আত্মত্যাগ এবং অমানুষিক জীবনীশক্তির মূল উৎস। আধ্যাত্মিকতার লক্ষণ হল তা মানুষকে শক্তি যোগায় এবং সমস্ত ভয় দুর্বলতা থেকে মুক্ত করে—স্বামীজীর মধ্যে জো এ দুটোই পেয়েছিলেন পরিপূর্ণভাবে। বিবেকানন্দ-চরিত্রের এই বিশেষ দিকটি সম্বন্ধে জো তাঁর স্মৃতিতে যা লিখেছেন তা শুধু মর্মস্পর্শীই নয়, জো-র নিজের আধ্যাত্মিক গভীরতার পরিচায়কও বটে। "অপরেব মধ্যেই যেন তিনি দেখতে পেতেন," জো লিখেছেন, "সমস্ত শক্তি, শ্রদ্ধা এবং গৌরবের মহিমা। যিনিই তাঁর সান্নিধ্যে এসেছেন তিনিই অনুভব করেছেন তাঁর নিজের মধ্যে যেন শক্তি সঞ্চারিত হচ্ছে, তাই যাঁরা তাঁর কাছে এসেছিলেন সকলেই নতুন উদ্দীপনা শক্তি আর ভরসা নিয়ে ফিরেছেন। সেইজন্য লোকে যখন আমাকে জিজ্ঞাসা করেছে, 'তোমার কাছে আধ্যাত্মিকতার অর্থ কি?' আমি সব সময়ই বলেছি, 'মহাপুরুষের সান্নিধ্যে এলে মানুষ যে শক্তি

৮ Reminiscences, p. 249

৯ Reminiscences, p. 250

অনুভব করে, তাই হল আধ্যাত্মিকতা।'"[১০]

স্বামীজীর দেবজীবনের সান্নিধ্যটাই জো-র কাছে ছিল বড় কথা। ভগিনী নিবেদিতা অথবা ক্রীষ্টিন-এর মত আনুষ্ঠানিকভাবে শিষ্যত্ব গ্রহণ করেননি জো স্বামীজীর কাছে। "আমি ছিলাম তাঁর বন্ধু, শিষ্য নয়।"[১১] বলতেন জো। তাই গুরুশিষ্যের দায়িত্ব ও আনুগত্য, ভার-সমর্পণ বা শাস্ত্রীয় রীতিনীতির বাঁধন তাঁকে স্বীকার করতে হয়নি। আর এই স্বাধীনতাটুকুর জন্য স্বামীজীর ঘনিষ্ঠতর সান্নিধ্য ও বহুতর সেবার সুযোগ পেয়েছিলেন এই অক্লান্তকর্মী আমেরিকান নারী।

## দয়াবতী বন্ধু

পাশ্চাত্যের দুটি উল্লেখযোগ্য গুণ—সাধারণ বুদ্ধিবৃত্তি এবং তীক্ষ্ণ কর্মতৎপরতা—জো-র মধ্যে পূর্ণমাত্রায় ছিল। আর এই প্রচণ্ড কর্মতৎপরতার সঙ্গে স্বামীজীর কাছ থেকে জো পেয়েছিলেন মুক্ত জীবনবোধ। এ গুণাবলীর জন্য বিভিন্ন সময়ে স্বামীজী যে জো-কে বিভিন্ন ব্যাপারে কতখানি বিশ্বাস করতেন, এ তথ্যের সাক্ষ্য আমরা পাই স্বামীজীর বহু পত্রে। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে ৬ই জুলাই লণ্ডন থেকে লেখা একটি পত্রে স্বামীজী লিখছেন, "আমি জো-র বুদ্ধিমত্তা এবং নীরব কার্যপ্রণালীর প্রশংসা না করে পারছি না। তাঁকে একজন সুচতুর রাজনীতিবিশারদ রমণী বলা যেতে পারা যায়। তিনি প্রয়োজন হলে একটা রাজ্য চালাতে পারেন। মানুষের মধ্যে এমন সব বিষয় ধরবার তীক্ষ্ণ সহজ বুদ্ধি, আবার উহাকে ভাল বিষয়ে প্রয়োগ করবার ক্ষমতা আমি খুব কমই দেখেছি।" ১৮৯৫ সালের ৫ই ডিসেম্বরে মিসেস লেগেটের কন্যা আলবার্টাকে লিখিত একটি পত্রে স্বামীজী জো-কে তাঁর "সবসময়ের দয়াবতী, সৎ এবং পবিত্রস্বভাবা বন্ধু" বলে অভিহিত করেছেন।

তীক্ষ্ণ সৎবুদ্ধি এবং বাস্তবানুগ কর্মশক্তির জন্য ছোটখাট ব্যক্তিগত ব্যাপার থেকে আরম্ভ করে আমেরিকায় এবং ইউরোপে বেদান্ত-প্রচারের বড় বড় কর্মোদ্যোগ ইত্যাদি সমস্ত ব্যাপারে জো হয়ে উঠেছিলেন পাশ্চাত্যে স্বামীজীর সবচেয়ে বিশ্বস্ত সাহায্যকারী। Ridgely Manor-এ একদিন হঠাৎ স্বামীজী বললেন, তিনি চলে যাবেন। কারণ জিজ্ঞাসা করাতে জো-কে বলেছিলেন, "আমার পরিষ্কার পোশাক পরিচ্ছদ নেই।"[১২] মিঃ লেগেটের উদার অতিথিপরায়ণতার মধ্য দিয়ে জো স্বামীজীর প্রয়োজন পূরণ করেছিলেন। আর একবার জীবনসায়াহ্নে বেলুড় মঠ থেকে জো-কে স্বামীজী জানালেন তাঁর কিছু অর্থের প্রয়োজন, কারণ যা ছিল সবই প্রায় নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে। বুঝে সুঝে খরচ করবার মত সাধারণ সাংসারিক মনোবৃত্তি স্বামীজীর কোনদিনই ছিল না। তাই প্রয়োজনীয় অর্থ পাঠিয়ে দিয়ে অভিভাবকসুলভ দায়িত্বের ভাষায় জানিয়েছিলেন, "২০০ ডলার পাঠালাম। মাসে ৫০ ডলারের বেশি খরচ করতে পারবেন না।" কিন্তু সে অর্থ শেষ হবার আগেই স্বামীজী মর্ত্যধাম থেকে বিদায় নিয়েছিলেন।

আমেরিকায় স্বামীজীর বেদান্তপ্রচারকার্যে সব সময় পশ্চাতে থেকে সাহায্য করেছেন জো, নিউইয়র্কের এবং লণ্ডনের বেদান্ত-কেন্দ্রের কাজে জো ব্যক্তিগতভাবে প্রভূত সাহায্য করেছেন স্বামীজীকে। জো-র প্রধান কাজ ছিল

১০ Reminiscences, p. 246

১১ " p. 248

১২ Late and Soon, P. 237

বেদান্তপ্রচারের ক্ষেত্র প্রস্তুত করা এবং সুধী-সজ্জনদের বিবেকানন্দের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত করা। লণ্ডনের ৬ই জুলাই, ১৮৯৬-এর পত্রে মিঃ লেগেটকে স্বামীজী লিখছেন, "গলসওয়ার্দিরা আমার প্রতি বড়ই সদয় ব্যবহার করেছেন। জো বড় অদ্ভুতভাবে তাদের এদিকে ফিরিয়ে দিয়েছেন।" নিউইয়র্ক বেদান্ত সোসাইটির গোড়ার দিকে মিঃ লেগেট যে অনেক ব্যক্তিগত সাহায্য করেছিলেন এবং পরে তিনি যে ঐ সোসাইটির সভাপতির দায়িত্ব বরণ করেন, এ ব্যাপারেও জো-র অবদান অনস্বীকার্য। প্যারীতে ধর্মসম্মেলনে যোগ-দানের জন্য স্বামীজী যখন যান তখন জো-র উদ্যোগে তিনি মিসেস লেগেটের অতিথি হয়েছিলেন এবং জো-র সাহায্যে প্যারীর বহু সুধী গুণগ্রাহীদের সঙ্গে পরিচিত হন। আমেরিকার পূর্ব উপকূলে স্বামীজীর বেদান্তপ্রচারকার্য শুরু হয়েছিল জোসেফিনের জীবনেরই একটি বিষাদময় অথচ নাটকীয় ঘটনার মধ্য দিয়ে।

Ridgely Manor-এ থাকাকালীন একদিন জো আর বেটি সংবাদ পেলেন তাঁদের একমাত্র ভাই Taylor লস্‌এঞ্জেলেসের মিসেস্‌ ব্লজেট নামক জনৈকা মহিলার গৃহে মৃত্যুশয্যায় শায়িত। তৎক্ষণাৎ বেড়িয়ে পড়লেন জো। যাত্রার পূর্ব-মুহূর্তে স্বামীজী সংস্কৃত মন্ত্র উচ্চারণ করে বললেন, "যাও, ক্লাসের ব্যবস্থা করো। আমি আসছি'।" দূরপথ অতিক্রম করে যেদিন অপরিচিতা প্রৌঢ়া মিসেস্‌ ব্লজেটের গৃহে পৌঁছালেন, জো দেখলেন বড় ভাই Taylor আসন্ন মৃত্যুর অপেক্ষায় শায়িত। হঠাৎ চোখে পড়ল জো-র—ভ্রাতার মৃত্যুশয্যায় শিয়রে টাঙানো রয়েছে বিরাট এক প্রতিকৃতি—স্বামী বিবেকানন্দের। বিস্মিত জো জিজ্ঞাসা করলেন বুড়ীকে—কি করে তিনি জানলেন বিবেকানন্দকে। শিকাগো ধর্মমহাসভার শ্রোতৃবৃন্দের অন্যতমা বুড়ী সগর্বে উত্তর দিলেন, "পৃথিবীতে যদি কোন দেবতা থেকে থাকেন, ইনিই সেই ব্যক্তি"।[১৩] তিন সপ্তাহ পরে টেলর চিরবিদায় নেন, এবং ছয় সপ্তাহ পরে বৃদ্ধা ব্লজেটের ভক্তি-বিশ্বাসকে পূর্ণ করে স্বামীজী তাঁর বাড়ীতে এসে হাজির হন। ক্যালিফোর্নিয়ায় বেদান্তপ্রচারের শুরু এইখানেই।

জাপানে যাওয়ার আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন স্বামীজী শিল্পী ওকাকুরার কাছ থেকে। শেষ দিনগুলোয় অসুস্থতাবশতঃ জাপান যাত্রা আর হয়ে ওঠেনি স্বামীজীর পক্ষে। গিয়েছিলেন জো এবং জাপানের কাছ থেকে ভারতবর্ষের অনেক কিছু শেখার আছে—এই মর্মে যে পত্র লিখেছিলেন স্বামীজী তাঁর উত্তরে এ মতের পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছিলেন। স্বামীজীর যাওয়া না হলেও ভারত-জাপান সাংস্কৃতিক মিলন ঘটেছিল; এবং তা হয়েছিল বেলুড়ের মঠ-প্রাঙ্গণে। শিল্পী ওকাকুরাকেই সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন জো স্বামীজীর কাছে মহাপ্রয়াণের বছরখানেক আগে।

উত্তরকালে বিশ্বের যে-কোন জায়গাতে—লণ্ডন, সানফ্রান্সিস্‌কো, প্যারি, ক্যালিফোর্নিয়া—রামকৃষ্ণ মিশনের বেদান্তপ্রচারকরা গিয়েছেন, জো গিয়ে হাজির হতেন তাঁদের সাহায্য করার জন্য। কৌতূহলী কেউ যখন জিজ্ঞাসা করতেন জো-কে, কেন তিনি ঘুরে বেড়ান এমন করে বিভিন্ন বেদান্ত কেন্দ্রে, গৌরবের সঙ্গে উত্তর দিতেন বৃদ্ধা, "To make lovers of Swamiji." অর্থাৎ "স্বামীজীর ভক্ত তৈরি করার জন্য।" ব্যক্তি বিবেকানন্দের অন্তরালে জো

---

১৩ Reminiscences P. 245

দেখেছিলেন নৈর্ব্যক্তিক যুগাদর্শের ঘনীভূত রূপ বিবেকানন্দকে। জো-র কাছে তাই স্বামীজীর ব্রত উদ্‌যাপনের কাজ দেহী বিবেকানন্দের সেবারই সমতুল। বেদান্তপ্রচারের মাধ্যমে প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে সাম্য, মৈত্রী, আধ্যাত্মিকতার নতুন প্লাবন এনে নতুন যুগের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করা—জো-র কাছে একাজ স্বামীজীকে তাঁর বৃহত্তর সত্তায় অনুধ্যান করারই পথ। এ বিশ্বাসের প্রতিধ্বনি করেই জো স্বামীজীর শিষ্য বিরজানন্দজীকে ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে স্বামীজীর বাণীপ্রচারের কাজে উৎসাহ দিয়ে লিখেছিলেন, "হিমালয় কেন্দ্রে আমাদের প্রভুর কাজ চালাবার জন্য উপযুক্ত একদল নতুন কর্মী গড়ে তোলা যেতে পারে। কী গৌরবময় এই কাজ!······এখনও হয়তো চল্লিশ বছর আমাদের এ কাজ করতে হবে। বেশ মজা লাগে যখন দেখতে পাই অন্তঃপ্রবাহিত স্রোত উপরে উঠে চোখের গোচরীভূত হচ্ছে। তাই নয় কি?·· ···আমার কাজ ছিল স্বামীজীকে চেনা। প্রথম যখন তাঁর দর্শন পেলাম তখনই যেন আমি সত্যকে দেখতে পেয়েছিলাম। আজও তাই দেখছি, সেই সত্যের মহিমান্বিত আলো কখনও কাঁপেনি, বাড়েনি বা কমেনি। সেইদিন থেকে আজ উনিশ বছর কেটে গেছে, আজ আমি এই কথা বলা শুরু করতে পারছি। কিন্তু তুমি? তুমি? তুমি তো তাঁর বাণী হাজার হাজার ব্যক্তির কাছে পৌঁছে দিয়েছ!"[১৪]

শিষ্য না হলেও, সত্যস্বরূপ বিবেকানন্দে এই অচঞ্চল বিশ্বাসের জন্য জো একটি বিশেষ স্থান পেয়েছিলেন ঋষি-বিবেকানন্দের অন্তরে, স্বামীজীর বহু পত্রে তার সাক্ষ্য রয়ে গেছে। ১৯০০, ১৮ই এপ্রিল আলামেডা থেকে লিখিত যে অবিস্মরণীয় পত্রটিতে শ্রীরামকৃষ্ণের 'নরেন', সপ্তর্ষির ঋষি তাঁর অন্তরের প্রকৃত স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করেছেন, সে চিঠি লিখিত হয়েছিল আর কাউকে নয় পবিত্রস্বভাবা জো-কে। নিজনিকেতনের আহ্বানে আকুল, নির্বাণস্বপ্নে বিভোর "ধ্যানসিদ্ধ" বিবেকানন্দ পরমাত্মীয়বোধে জো-র কাছে প্রকাশ করেছেন তাঁর অন্তরের গভীরতম আকৃতি :

"কর্ম করা সব সময়েই কঠিন। আমার জন্য প্রার্থনা কর, জো, যেন চিরদিনের তরে আমার কাজ করা ঘুচে যায়। ···যতই যা হোক, জো, আমি এখন পূর্বের বালক বই আর কেউ নই, যে দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটীতলায় রামকৃষ্ণের অপূর্ব বাণী অবাক হয়ে শুনত আর আর বিভোর হয়ে যেত।·· আমার সামনে অপার নির্বাণসমুদ্র দেখতে পাচ্ছি।···সেই অসীম অনন্ত শান্তিসমুদ্র—মায়ার এতটুকু বাতাস বা একটা ঢেউ পর্যন্তও যার শান্তি ভঙ্গ করছে না। ···শিক্ষাদাতা, গুরু, নেতা আচার্য বিবেকানন্দ চলে গেছে—পড়ে আছে একটা কেবল পূর্বের সেই বালক, প্রভুর সেই চিরশিষ্য, চিরপদাশ্রিত দাস।"

(ক্রমশঃ)

---

১৪ অতীতের স্মৃতি, পৃ. ১৭৭-৭৮

# সমালোচনা

**মহাপুরুষপ্রসঙ্গ** ( ১৬শ সংস্করণ )- স্বামী বিবেকানন্দ। প্রকাশক : উদ্বোধন কার্যালয়। ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা ৩। পৃষ্ঠা ২৩৪ ; মূল্য : তিন টাকা।

যুগনায়ক স্বামী বিবেকানন্দের 'মহাপুরুষ-প্রসঙ্গ' গ্রন্থের পরিচয়প্রদান অনাবশ্যক। রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধদেব, যীশুখৃষ্ট প্রভৃতি সম্বন্ধে স্বামীজীর চিন্তাধারার সহিত জনসাধারণ এই গ্রন্থের মাধ্যমে সুপরিচিত। বর্তমান সংস্করণটি শুধু পুনর্মুদ্রণ নয়, পাঠক-গণের নিকট ইহার বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। তিনটি বিষয় এই সংস্করণে সংযোজিত : পওহারী বাবা, বুদ্ধের বাণী, ভারতীয় মহাপুরুষগণ।

'পওহারী বাবা' মাদ্রাজ হইতে প্রকাশিত ইংরেজী 'ব্রহ্মবাদিন্' পত্রিকার জন্য ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে লিখিত প্রবন্ধ, 'বুদ্ধের বাণী' ১৯০০ খৃষ্টাব্দে ১৮ই মার্চ স্যানফ্রান্সিস্কোতে প্রদত্ত বক্তৃতার অনুবাদ এবং 'ভারতীয় মহাপুরুষগণ' মাদ্রাজে প্রদত্ত ইংরেজী ভাষণের অনুবাদ।

**সাধু নাগমহাশয়** ( ১১শ সংস্করণ )— শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী। প্রকাশক : উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা ৩। পৃষ্ঠা : ১৪৪ ; মূল্য : দুই টাকা।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আদর্শ গৃহস্থ ভক্ত নাগমহাশয় সম্বন্ধে মহাকবি গিরিশচন্দ্রের উক্তি প্রণিধানযোগ্য। গিরিশবাবু নাগ-মহাশয়ের নিরহঙ্কার ভাব দেখিয়া বলিয়া-ছিলেন : "…নাগমহাশয় এত ছোট হয়ে যান যে, মহামায়া তাঁকে বাঁধতেই পারেন না।"

নাগমহাশয়ের দেবোপম চরিত্রে সকলেই মুগ্ধ হইতেন। তাঁহার দীনতা, শ্রদ্ধাভক্তি, তপস্যা, কঠোরতা, তেজস্বিতা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। পুণ্যচরিত্রের অনুধ্যান আধ্যাত্মিক জীবনের পরম সহায়ক। আলোচ্য গ্রন্থখানিতে জন্ম হইতে মহাসমাধি পর্যন্ত এই মহাপুরুষের জীবনকাহিনী মনোজ্ঞ ভাষায় বর্ণিত।

**বিশ্বরূপিণী মা সারদা** : শ্রীমতী শুক্লা ঘোষ। শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ-প্রকাশিত। ১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা ৬। পৃঃ ২৮৮ ; মূল্য : আট টাকা।

শোভন প্রচ্ছদে ও নিপুণ মুদ্রণে আদ্যন্ত সুরুচিমণ্ডিত শ্রীরামকৃষ্ণসঙ্ঘজননী সারদাদেবীর এই নূতন জীবনীগ্রন্থখানি সরল ভক্তিমণ্ডিত ভাষায় বঙ্গসরস্বতীর উদ্দেশ্যে নিবেদন করে লেখিকা স্বয়ং কৃতার্থ এবং পাঠকেরাও যে নবযুগের মাতৃমহিমার প্রতি নতুন আলোক-পাতে আনন্দিত হবেন, সন্দেহ নেই। ভূমিকায় স্বামী প্রজ্ঞানানন্দজী ভারতীয় দর্শনচিন্তার পটভূমিকায় শ্রীরামকৃষ্ণশক্তিস্বরূপিণীর অলোক-মহিমার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে গ্রন্থটির গুরুত্ব বৃদ্ধি করেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের মাতৃ-আহ্বানের মহামন্ত্রে দক্ষিণেশ্বরের ভবতারিণী যেমন জাগ্রত হয়ে-ছিলেন, তেমনি জয়রামবাটীর রামচন্দ্র মুখুজ্জের মেয়ে সারদামণিরও আবির্ভাব ঘটে-

ছিল। সেই মহামাতৃশক্তি শ্রীরামকৃষ্ণ থেকে আরম্ভ করে স্বামীজী, স্বামী ব্রহ্মানন্দ, অভেদানন্দ, সারদানন্দ, প্রেমানন্দ, নিরঞ্জনানন্দ, রামকৃষ্ণানন্দ, অদ্ভুতানন্দ, তুরীয়ানন্দ, শিবানন্দ, অদ্বৈতানন্দ, ভক্ত গিরিশচন্দ্র, সাধু নাগমহাশয়, ভগিনী নিবেদিতা, গৌরী মা, যোগীন মা, গোলাপ মা, অঘোরমণি দেবী (গোপালের মা), লক্ষ্মীমণি দেবী প্রভৃতি বিভিন্ন সাধক ও মনীষীর দৃষ্টিকোণে কিভাবে ধরা দিয়েছিল, লেখিকা একুশটি অধ্যায়ে তারই তথ্য সংগ্রহ করে পাঠকদের উপহার দিয়েছেন। পড়তে পড়তে শ্রীশ্রীমায়ের দিব্যজীবনরূপ মহামন্দির-পরিক্রমার ভাবপরিমণ্ডল আপনি অন্তরে সৃষ্ট হয়।

বঙ্গসাহিত্য-প্রাঙ্গণে লেখিকার এই প্রথম প্রয়াস সর্বজনসমাদৃত হবে—এই আমাদের আশা ও বিশ্বাস।

—প্রণবরঞ্জন ঘোষ

**বরাহনগর আলমবাজার মঠ**:— শ্রীরমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য। প্রকাশক—শ্রীপ্রণবেন্দ্র ভট্টাচার্য, ২১বি, রতনবাবু রোড, কাশীপুর, কলিকাতা ২। প্রাপ্তিস্থান: মহেশ লাইব্রেরী, ২।১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২। পৃষ্ঠা ১০৪; মূল্য: ১'৭৫।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্তরঙ্গ লীলা-পার্ষদগণ তীব্র বৈরাগ্য, কঠোর ত্যাগ-তপস্যা সহায়ে নিঃসম্বল অবস্থায় কিভাবে বরাহনগর মঠ গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, কিভাবে আলমবাজার মঠ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহার চিত্তাকর্ষক কাহিনী পুস্তকখানিতে পাওয়া যাইবে। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের নানা পুস্তক হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া গ্রন্থকার বিভিন্ন সময়ে 'উদ্বোধন' পত্রিকায় কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন, সেই প্রবন্ধগুলি এবং আরও দুইটি প্রবন্ধ পুস্তকখানিতে স্থান পাইয়াছে। বরাহনগর ও আলমবাজার মঠ সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য অনেক বিষয় একত্র সন্নিবেশিত হওয়ায় পাঠক-সমাজে পুস্তকখানির সমাদর হইবে, আশা করি।

**বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউশন পত্রিকা** (ত্রিচত্বারিংশ বর্ষ, ১৩৭৬) শ্রীসুধাংশুশেখর ভট্টাচার্য কর্তৃক বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউশন, ৭৫ ও ৭৭, স্বামী বিবেকানন্দ রোড, হাওড়া ৪ হইতে সম্পাদিত ও প্রকাশিত। পৃষ্ঠা: ৮০।

এই বৎসরের পত্রিকাখানি মহাত্মা গান্ধী স্মরণে প্রকাশিত। গান্ধীজীর সম্বন্ধে অনেকগুলি লেখা স্থান পাইয়াছে। খান আবদুল গফ্ফর খান-এর গান্ধীজীর স্মৃতি (Bhavan's Journal পত্রিকায় প্রকাশিত ইংরেজী প্রবন্ধের অনুবাদ) বেশ উপভোগ্য। পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রের 'খাওয়ার ছড়া' কবিতা ও 'আমেরিকার স্কুলে একটি বছর' লেখাটি ভাল লাগিল। অন্য রচনাগুলিও সুসম্পাদিত। 'আমাদের কথা'য় বিদ্যালয়ের পড়াশুনা, খেলাধুলা এবং অন্যান্য বিষয়ের বিস্তারিত পরিচয় দেওয়া হইয়াছে।

# শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

**বেলুড় মঠে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব**

**বেলুড় মঠে** গত ১৬ই মাঘ ( ৩০.১.১৯৭০ ) শুক্রবার পুণ্য কৃষ্ণা সপ্তমী তিথিতে পরমপূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ মহারাজের শুভ ১০৮তম জন্মোৎসব মহা উৎসাহ ও আনন্দ সহকারে বিবিধ অনুষ্ঠানসূচী সহায়ে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

এই দিন ব্রাহ্মমুহূর্তে শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দিরে মঙ্গলারতির পর প্রত্যূষে স্বামীজীর মন্দিরে মঙ্গলারতি ও বেদ-আবৃত্তি হইয়াছিল। তৎপরে স্বামীজীর ঘরে ভজন হয়। সকাল ৭টা হইতে স্বামীজীর মন্দিরে বিশেষ পূজাদি ও শ্রীশ্রীচণ্ডী-পাঠ হইয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দিরেও বিশেষ পূজা-হোমাদি অনুষ্ঠিত হয়। বেলা ৯টা হইতে ১০টা নাটমন্দিরে কঠোপনিষৎ পাঠ এবং ১০টা হইতে ১২টা কালীকীর্তন হইয়াছিল। দ্বিপ্রহরে সমাগত প্রায় ছয় হাজার ভক্ত হাতে হাতে অন্ন-প্রসাদ গ্রহণ করেন। কয়েক সহস্র নরনারী এই দিন স্বামীজীর শ্রীচরণে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিতে বেলুড় মঠে সমবেত হইয়াছিলেন।

অপরাহ্ণ সাড়ে তিনটার সময় মঠ-প্রাঙ্গণে স্বামী গম্ভীরানন্দ মহারাজের সভাপতিত্বে একটি জনসভা অনুষ্ঠিত হয়; বক্তা অধ্যাপক শঙ্করী-প্রসাদ বসু, এবং অধ্যক্ষ অমিয়কুমার মজুমদার।

অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু বলেন, 'বিরাট কল্পনা ও তপস্যার তীর্থ স্বামী বিবেকানন্দ-প্রতিষ্ঠিত এই বেলুড় মঠ। প্রমিথিউসের মতো অসীম বেদনাকে বরণ করে নিয়েও তিনি মানুষকে ভালবেসেছেন, তাকে দেবত্বে উন্নীত করতে চেয়েছেন। আজ ধর্মের প্রতিবন্ধক তিনটি—ক্ষুধা, বিজ্ঞান ও সাম্প্রদায়িকতা। এই তিনটির বিরুদ্ধে লড়াই-এ জয়ী হবার জন্য তিনি যথেষ্ট চিন্তাসম্ভার দিয়ে গেছেন। বিপুল কর্মোদ্যম, বেদান্তের ভাবাবগাহন এবং বিভিন্ন মতবাদের ঊর্ধ্বে অবস্থিত ধর্মের সর্বজনীন ভাবগ্রহণের কথা বলে গেছেন তিনি, যা সব বাধা ঠেলে বিশ্বমানবকে দেবত্বে উন্নয়নের পথে বিশ্বভ্রাতৃত্বস্থাপনরূপ তাঁর বিরাট কল্পনাকে রূপ দিতে সক্ষম।' অধ্যক্ষ অমিয়কুমার মজুমদার বলেন, 'তরুণদের কাছে আজ প্রশ্ন—স্বামীজী যে অদ্বৈতবাদকে জীবনের সঙ্গে অভিন্ন করে রেখেছিলেন, সমাজসেবা ও রাষ্ট্রসেবার ক্ষেত্রে তার কোন প্রয়োজন আছে কি না? তরুণদের এই বিভ্রান্তির কারণ বার্ট্রাণ্ড রাসেলের একটি উক্তি—বর্তমানে মানব-জাতি স্বর্ণযুগের দোর-গোড়ায় পৌঁছেছে কিন্তু সেখানে তাকে ঢুকতে বাধা দিচ্ছে ধর্ম, এবং কার্ল মার্কস-এর একটি উক্তি—ধর্ম আফিমের মতো, মানুষকে ঝিমিয়ে রাখে। স্বামীজী পরিষ্কার বলে গেছেন ধর্মই মানব-জাতিকে স্বর্ণযুগে পৌঁছে দেবে, কারণ মানুষকে নিঃস্বার্থভাবে ভালবাসতে শেখাতে, মানুষকে যথার্থ উন্নত করতে পারে একমাত্র ধর্ম—অদ্বৈতভাবধারাই। স্বামীজী সেজন্য স্পষ্ট নির্দেশ দিয়ে গেছেন, আগে দেশকে উপনিষদের ভাবের বন্যায় ভাসিয়ে দিতে; আগে লোকের দুঃখ দূর করে পরে ধর্ম করতে নয়, ধর্মকে অবলম্বন করেই সে কাজ করতে; তাহলেই আমরা মানুষকে নিজের মতো দেখতে, মানব-সেবায় আত্মদান করতে সক্ষম হবো।' স্বামী গম্ভীরানন্দ সভাপতির ভাষণে বলেন, 'জীবন ও সমাজে, ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই স্বামীজী

এসেছিলেন। প্রাচীনপন্থীরা অনেকে ভাবেন, কেবল ধর্ম করলেই হবে, আর কোন কিছুর প্রয়োজন নাই। আবার প্রগতিবাদীরা অনেকে ভাবেন, স্বামীজী আসলে সমাজসেবার কথাই বলেছেন, তাঁর ধর্মের কথা গৌণ—ভারতের লোক ধর্ম ছাড়া কিছু বোঝে না বলেই ধর্মের কথার ভেতর দিয়ে তা বলে গেছেন। স্বামীজীর বিভিন্ন আংশিক উক্তিকে দু-দলই নিজ নিজ মতের সমর্থক বলে মনে করেন। ফলে অনেকেরই মনে এই ধারণা জন্মেছে যে, স্বামীজী যে শূদ্রজাগরণের কথা বলেছিলেন, যে সমাজবাদের কথা বলেছিলেন, সমাজবাদ যেভাবে আজ আমাদের সামনে এসেছে, সেইটাই স্বামীজীর কাম্য রূপ। এ ধারণা ভ্রান্ত—স্বামীজী ধর্মকে বাদ দিয়ে কোন কিছুই চাননি। তিনি সংস্কৃতিকে নষ্ট করে সকলকে এক করতে চাননি, সকলকেই উচ্চ-সংস্কৃতিমান করে এক করতে চেয়েছিলেন—শূদ্রকে ব্রাহ্মণত্বে উন্নীত করে এক করতে চেয়েছিলেন। তিনি তথাকথিত বিপ্লবের পথে ভেঙ্গেচুড়ে কেড়ে-কুড়ে নিয়ে সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে চাননি, চেয়েছিলেন স্বেচ্ছায় দেওয়ার মাধ্যমে, ভগবদ্বুদ্ধিতে মানবসেবার মাধ্যমে সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে। সমাজসেবা রাষ্ট্রসেবা সব কিছুই তিনি করতে বলেছেন ধর্মকে আঁকড়ে থেকে—বেদান্তের ইতি-বাচক ধর্মকে, যা সব মানুষের যথার্থ একত্বের সন্ধান দিয়ে মানুষকে সাম্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারে।

সন্ধ্যারাত্রিকের পর নাটমন্দিরে ভজনাদির ব্যবস্থা ছিল।

### দ্বারোদ্ঘাটন

**করিমগঞ্জ :** শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ গত ১৩ই জানুআরি করিমগঞ্জ রামকৃষ্ণ মিশনের নবনির্মিত বিবেকানন্দভবনের দ্বারোদ্ঘাটন করিয়াছেন।

### কার্যবিবরণী

**ভুবনেশ্বর** রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের এপ্রিল, ১৯৬৭ হইতে মার্চ, ১৯৬৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে।

মঠ বিভাগ : ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দ কর্তৃক ভুবনেশ্বরে মঠ প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে নিয়মিত পূজা, প্রার্থনা, ভজনাদি অনুষ্ঠিত হয়। এতদ্ব্যতীত প্রতিমায় শ্রীশ্রীকালী-পূজা, এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা সারদা-দেবী, স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী ব্রহ্মানন্দের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। বুদ্ধপূর্ণিমা, খৃষ্ট-জন্মদিন, আচার্য শঙ্করের জন্মতিথি এবং অন্যান্য মহাপুরুষের জন্মতিথি যথারীতি উদ্‌যাপিত হয়। মঠে এবং ভুবনেশ্বর ও কটক শহরের বিভিন্ন স্থানে সাপ্তাহিক ধর্মালোচনা ও সাময়িক বক্তৃতার মাধ্যমে ঠাকুর-স্বামীজীর ভাব প্রচার করা হয়। আলোচ্য বর্ষত্রয়ে এই সমস্ত কার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইয়াছে।

মঠ বিভাগে একটি গ্রন্থাগার আছে, এখানে অনেক তথ্য-পুস্তক রাখা হইয়াছে; এই পুস্তকগুলি সাধারণ গ্রন্থাগারের পুস্তকের মতো ব্যবহৃত হয় না। ওড়িয়া ভাষায় শ্রীরামকৃষ্ণের একটি ক্ষুদ্র জীবনী প্রকাশ করা হইয়াছে এবং শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-সাহিত্যের কতকগুলি পুস্তক পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে।

মিশন বিভাগ : সর্বসাধারণের জন্য বিবেকানন্দ গ্রন্থাগার ও অবৈতনিক পাঠাগার পরিচালিত হয়। ইহা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৬৩ খৃষ্টাব্দে, স্বামীজীর জন্মশতবার্ষিকী সময়ে। দরিদ্র ছাত্রদের জন্য পাঠ্যপুস্তকের একটি বিভাগ খোলা হইয়াছে। শিশুদের পড়াশুনায় উৎসাহ দিবার জন্য লাইব্রেরীর শিশুবিভাগটি

ভাল কাজ করিতেছে। বর্তমানে গ্রন্থাগারের পুস্তকসংখ্যা ৭,৮৬১। পাঠাগারে ৭টি দৈনিক এবং ৪৩টি সাময়িক পত্রিকা রাখা হয়। আলোচ্য সময়ে গ্রন্থাগারের গ্রাহকগণ কর্তৃক পঠিত পুস্তক-সংখ্যা ৩২,৩১০। মিশন কর্তৃক গ্রন্থাগার ও পাঠাগারের জন্য নির্মীয়মাণ নূতন ভবনটি সমাপ্তির পথে আগাইয়া চলিয়াছে।

মিশন-পরিচালিত বিবেকানন্দ এম ই স্কুল ও উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়: উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়টি দীর্ঘ ৩৪ বৎসর যাবৎ স্থানীয় দরিদ্র শিশুগণের মধ্যে শিক্ষাবিতরণকার্যে ব্যাপৃত রহিয়াছে। ১৯৬০ খৃষ্টাব্দে ইহা এম ই. স্কুলে উন্নীত হইয়াছে। ১৯৬৭ খৃষ্টাব্দের ৩১শে মার্চ উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মোট ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ২৬৪, তন্মধ্যে ছাত্র ১৯৪। এম ই. স্কুলের ছাত্র সংখ্যা ৩৫।

দাতব্য চিকিৎসালয়: ১৯১৯ খৃষ্টাব্দ হইতে মিশন কর্তৃক একটি অ্যালোপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালয় পরিচালিত হইতেছে। স্থানীয় ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের দরিদ্র জনসাধারণ এই ডিস্পেন্সারীর মাধ্যমে বিনামূল্যে ঔষধ ও চিকিৎসা লাভ করিতেছে। ভুবনেশ্বরতীর্থে আগত ভারতের বিভিন্ন অংশের তীর্থযাত্রীরা অসুস্থ হইয়া পড়িলে অসহায় অবস্থায় এখানে চিকিৎসালাভ করেন। ১৯৬৭-৬৮ ও ১৯৬৮-৬৯ খৃষ্টাব্দে মোট চিকিৎসিতের সংখ্যা যথাক্রমে ২১,৮১৬ ও ২১,৫৭৫।

## শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্য

**অন্ধ্রে ঘূর্ণিবাত্যা-বিপর্যস্তদের সেবা:** চিরালায় ৭০টি বাসগৃহ এবং একটি বিদ্যালয়-ভবনের নির্মাণকার্য প্রায় সম্পূর্ণ হইয়াছে এবং নির্ধারিত কর্মসূচীর কার্যাদি শীঘ্রই সমাপ্ত হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে।

**উত্তরবঙ্গে বন্যার্তসেবা:** জলপাইগুড়ি জেলায় ৩৭টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ২১৩টি বোর্ড, গ্লোব ইত্যাদি শিক্ষা-সরঞ্জাম দেওয়া হইয়াছে। জলপাইগুড়ি শহরের নিকটে মোহিতনগরে বাসগৃহনির্মাণের কাজ ভাল ভাবেই হইতেছে।

গত ১০ই জানুআরি গুজরাটের গভর্নর শ্রীশ্রীমন্নারায়ণ সুরাটে রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত বন্যার্তসেবা-কেন্দ্রের ক্যাম্প পরিদর্শন করেন।

## উৎসব-সংবাদ

**ফরিদপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের** কার্যনির্বাহক সমিতির উদ্যোগে গত ৩১শে ডিসেম্বর শ্রীশ্রীসারদাদেবীর শুভ জন্মতিথি পূজা-ভজনাদির মাধ্যমে উদ্‌যাপিত হইয়াছে। মধ্যাহ্নে সমবেত বহু নর-নারীর মধ্যে প্রসাদ বিতরিত হয়।

ফরিদপুরের মহিলাগণের উদ্যোগে শ্রীশ্রীমায়ের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয় গত ৯ই জানুআরি। ঐদিন শ্রীযুক্তা রমা লাহিড়ীর সভানেত্রীত্বে আহূত সভায় সর্বশ্রেণীর বহু মহিলা সমবেত হন। উদ্বোধন-সঙ্গীত পরিবেশন করেন মহাকালী পাঠশালার ছাত্রীগণ। শ্রীশ্রীসারদাদেবীর জীবনী সম্পর্কে প্রবন্ধ পাঠ করেন মীরা রায়। উৎসবকমিটির সভানেত্রী শ্রীযুক্তা সুকুমারী ভদ্র অসুস্থা থাকায় তাঁহার ভাষণ পাঠ করিয়া শুনান আভা অধিকারী। শ্রীশ্রীমায়ের সম্বন্ধে ভাষণ দেন শ্রীযুক্তা হেনা রায়। সভানেত্রীর ভাষণে শ্রীযুক্তা রমা লাহিড়ী অতি প্রাঞ্জল ভাষায় শ্রীশ্রীসারদা মায়ের জীবন-দর্শন আলোচনা করিয়া সকলকে পরিতৃপ্ত করেন। সমাপ্তি-সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রীযুক্তা ছবি বিশ্বাস। সর্বশেষে ফরিদপুর রামকৃষ্ণ মিশনের কার্যনির্বাহক সমিতির পক্ষ

হইতে সম্পাদক শ্রীসুধীররঞ্জন চক্রবর্তী সভানেত্রীকে ও উৎসব উদ্‌যাপন কমিটির মহিলাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সভার পর অনূ্যন তিন হাজার নর-নারী খিচুড়ি প্রসাদ পরিতৃপ্তি সহকারে গ্রহণ করেন।

উক্ত মহিলাগণের প্রচেষ্টায় ১০ই জানুআরি শনিবার সন্ধ্যায় আশ্রম-প্রাঙ্গণে শ্রীশ্রীসারদা-দেবীর জীবনী অবলম্বনে একটি "গীতি-আলেখ্য" অনুষ্ঠিত হয়।

## স্বামী ভীমানন্দের দেহত্যাগ

আমরা অত্যন্ত দুঃখিত চিত্তে জানাইতেছি, গত ২৭শে জানুআরি রাত্রি ৮টা ১৫ মিনিটের সময় স্বামী ভীমানন্দ (সুধীন মহারাজ) করোনারী থ্রম্বোসিসে আক্রান্ত হইয়া রাঁচি স্যানাটোরিয়ামে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার মাত্র ৪৫ বৎসর বয়স হইয়াছিল।

তিনি শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে তিনি সঙ্ঘে যোগদান করেন এবং ১৯৬০ খৃষ্টাব্দে শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজের নিকট সন্ন্যাস-দীক্ষা প্রাপ্ত হন।

সুদীর্ঘ ১৯ বৎসরকাল তিনি রাঁচি স্যানা-টোরিয়ামে থাকিয়া এই সেবাপ্রতিষ্ঠানটির উন্নতিসাধনে স্বীয় কর্মশক্তি নিয়োগ করিয়া-ছিলেন। স্বামী ভীমানন্দ কর্মঠ ও মধুরস্বভাব সন্ন্যাসী ছিলেন। অকালে তাঁহার দেহত্যাগে সঙ্ঘ ভবিষ্যৎসম্ভাবনাপূর্ণ একজন সন্ন্যাসীকে হারাইল।

তাঁহার আত্মা শ্রীরামকৃষ্ণ-পাদপদ্মে চির-শান্তি লাভ করিয়াছে।

## গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন

১। বছরের মাঝখানে ঠিকানা পরিবর্তিত হইলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এখান হইতেই হাতে লিখিয়া উহা পরিবর্তিত করিয়া দেওয়া হয়; ইহাতে অনেকের ধারণা হয়, বোধ হয় পুরাতন ঠিকানা হইতে 'রি-ডাইরেকটেড' হইতেছে। সত্যই 'রি-ডাইরেকটেড' হইল কিনা, তাহা ভাল করিয়া দেখিবার পর পত্র দিলে আমাদের কাজের সুবিধা হয়।

২। প্রেসের গণ্ডগোলের জন্য সম্প্রতি আমাদের পত্রিকা প্রকাশে খুবই বিলম্ব হইতেছে। দয়া করিয়া আমাদের এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি মার্জনা করিবেন এবং সময়মত পত্রিকা না পাইলে বাংলা মাসের ২৫ তারিখ পর্যন্ত দেখিবার পর পত্র দিবেন।

৩। চিঠিপত্র বাংলায় লেখাই বাঞ্ছনীয়। উত্তরের জন্য রিপ্লাই পোষ্টকার্ড প্রয়োজন।

# বিবিধ সংবাদ

## অখিল ভারত বিবেকানন্দ যুব-মহামণ্ডল

অখিল ভারত বিবেকানন্দ যুব-মহামণ্ডল আয়োজিত পাঁচদিনব্যাপী তৃতীয় বার্ষিক যুব শিক্ষণ শিবির ১০ই জানুআরি হইতে ১৪ই জানুআরি বজবজের নিকটবর্তী সারেঙ্গাবাদে সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা হইতে দুই শতাধিক শিক্ষার্থী এই শিবিরে যোগ দেন। শিক্ষার্থীদের মধ্যে ছিলেন ছাত্র, শিক্ষক, চাকরিজীবী, শ্রমিক, কৃষক প্রমুখ সমাজের সর্বস্তরের মানুষ।

শিবিরের নিয়মিত সূচী মনঃসংযোগ, ব্যায়াম, কুচকাওয়াজ, প্রাথমিক চিকিৎসা, খেলাধূলা, ব্রতচারী, স্কাউটিং, প্রার্থনা, ইত্যাদি ছাড়াও শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন দিনে 'ত্যাগ ও সেবার আদর্শ', 'বিবেকানন্দ ও যুবসমাজ', প্রভৃতি বিভিন্ন শিক্ষার আসরে যোগদান করেন। এইসব শিক্ষার আসরে স্বামী রঙ্গনাথানন্দ, স্বামী চিদাত্মানন্দ, স্বামী স্মরণানন্দ, স্বামী নিরাময়ানন্দ, স্বামী জয়ানন্দ, স্বামী রুদ্রাত্মানন্দ, ডঃ ক্ষেত্রপ্রসাদ সেনশর্মা, অধ্যক্ষ অধীরকুমার মুখোপাধ্যায়, ডঃ নীরদবরণ চক্রবর্তী, শ্রীনন্দদুলাল চক্রবর্তী, অধ্যাপক ত্রিপুরাশঙ্কর সেনশাস্ত্রী ও মহামণ্ডলের সভাপতি অধ্যক্ষ অমিয়কুমার মজুমদার মহাশয় ভাষণ দেন। ১০ই জানুআরি সন্ধ্যায় শিবিরের উদ্বোধন করেন স্বামী অনন্যানন্দজী।

শিবিরের দ্বিতীয় দিনে প্রায় একশত শিশু একদিনের জন্য ঐ শিবিরে যোগ দেন।

শিশিবের তৃতীয় দিনে শিক্ষার্থীরা সারেঙ্গাবাদ হাইস্কুল প্রাঙ্গণে কচুরিপানা-বোঝাই প্রশস্ত পুকুরটি পরিষ্কার করেন। চতুর্থ দিনটি অতিবাহিত হয় শিক্ষার্থী দিবস হিসাবে। এই দিন সকালে শিক্ষার্থিগণ স্থানীয় একটি রাস্তা মেরামত ও একটি পুকুরের কচুরিপানা পরিষ্কার করেন।

শিবিরের শেষ দিনটিতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ২৪ জন কেন্দ্রীয় ভ্রাম্যমাণ ব্লাড ব্যাঙ্কে রক্তদান করেন।

গত ১লা ফেব্রুয়ারি অখিল ভারত বিবেকানন্দ যুব-মহামণ্ডলের উদ্যোগে স্বামীজীর জন্মতিথি উপলক্ষে ময়দানে শহীদ-মীনারের পাদদেশে একটি যুবসমাবেশের আয়োজন করা হয়। দেশপ্রিয় পার্ক, এণ্টালী পদ্মপুকুর পার্ক, শ্রদ্ধানন্দ পার্ক ও শ্যাম স্কোয়ার হইতে চারটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা ময়দানে আসিয়া মিলিত হয়। ময়দানের সভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী লোকেশ্বরানন্দজী মহারাজ। বক্তাদের মধ্যে ছিলেন অধ্যাপক ত্রিপুরারি চক্রবর্তী, ডঃ হীরালাল চোপরা ও স্বামী পরহিতানন্দ। সভায় প্রায় দশ হাজার শ্রোতার সমাগম হইয়াছিল।

## তারাপুরে বিদ্যুৎ-উৎপাদনের পারমাণবিক কারখানা

গত ১৯শে জানুআরি ভারতের প্রধান মন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বোম্বাই শহর হইতে ৬৫ মাইল উত্তরে অবস্থিত তারাপুরে ভারতের প্রথম পারমাণবিক বিদ্যুৎশক্তি-উৎপাদনের কারখানাটির উদ্বোধন করিয়াছেন। কারখানাটি নির্মিত হইয়াছে সাত বৎসরের অক্লান্ত পরিশ্রমের

ফলে। এশিয়ার মধ্যে এটি পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনের বৃহত্তম কারখানা।

বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয় জেনারেটর চালাইয়া; পারমাণবিক শক্তিকে কাজে লাগাইবার পূর্বে জেনারেটর চালাইবার জন্য শক্তির উৎস ছিল স্বাভাবিক বা কৃত্রিম জল-প্রপাত, তেল ও কয়লা। পারমাণবিক চুল্লীতে পরমাণু ভাঙ্গার ফলে যে তাপ-শক্তির উদ্ভব হয়, সেই শক্তিকেই পারমাণবিক বিদ্যুৎ-উৎপাদনের কারখানায় কাজে লাগানো হয়। তারাপুরের এই কারখানায় প্রতিদিন ইউরেনিয়াম ভরা চুল্লী হইতে যে তাপশক্তি পাওয়া যায়, তাহা দ্বারা জলকে বাষ্পে পরিণত করিয়া সেই বাষ্প দ্বারা দুটি জেনারেটর চালানো হয়। জেনারেটর দুটির উৎপাদন-ক্ষমতা দুই লক্ষ করিয়া চার লক্ষ কিলোওয়াট। এই কাজে যদি পারমাণবিক শক্তি ব্যবহার না করিয়া কয়লা পুড়াইয়া শক্তি সংগ্রহ করিতে হইত, তাহা হইলে প্রতিদিন ১ কোটি কুড়ি লক্ষ টন করিয়া কয়লা লাগিত।

### উৎসব-সংবাদ

**খেপুত** শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ইং ২৯শে জানুআরি বিশেষ পূজা, হোম, ভোগরাগাদি, প্রসাদবিতরণ এবং জীবন ও বাণী আলোচনার মাধ্যমে যুগাচার্য শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের পুণ্য আবির্ভাবতিথি উদ্‌যাপিত হইয়াছে।

**সিমুলিয়া** শ্রীরামকৃষ্ণ শিশু মিলনীতে গত ২৯শে পৌষ, ১৩৭৬ বনগ্রাম সাধুজন পাঠাগারে শ্রীসুধীরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি প্রতিপালিত হইয়াছে।

**সুরবিতান** গত ৩১শে ডিসেম্বর এক নিষ্ঠাপূর্ণ অনুষ্ঠানে শ্রীশ্রীসারদামাতার শুভ আবির্ভাব-দিবস পালন করিয়াছে।

### পরলোকে শ্রীসুধাংশুমোহন দত্ত

বাগবাজার লক্ষ্মীনিবাসের ৺হরিপদ দত্তের পুত্র সুধাংশুমোহন দত্ত ৭৪ বৎসর বয়সে বিগত ১৭ই জানুআরি ১৯৭০ সজ্ঞানে শ্রীশ্রীমায়ের চরণে মিলিত হইয়াছেন। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে মহাষ্টমীর দিন তিনি শ্রীশ্রীমায়ের কৃপালাভে ধন্য হইয়াছিলেন। বাল্যকাল হইতে শ্রীশ্রীমায়ের বাটী ও বেলুড় মঠে তাঁহার যাতায়াত ছিল, এবং পূজ্যপাদ স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী প্রেমানন্দ, স্বামী সারদানন্দ, স্বামী তুরীয়ানন্দ প্রমুখ শ্রীরামকৃষ্ণসন্তানগণের সহিত ঘনিষ্ঠ মেলা-মেশার সৌভাগ্য তিনি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার আত্মা শ্রীশ্রীমায়ের চরণে চিরশান্তি-লাভ করুক—ইহাই প্রার্থনা।

## বিজ্ঞপ্তি

আগামী ২৫শে ফাল্গুন. ১৩৭৬ ( ৯. ৩. ৭০ ) সোমবার, শুভ শুক্লা দ্বিতীয়ায় বেলুড় মঠে ও অন্যত্র ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৩৫তম পুণ্য জন্মতিথি উপলক্ষে পূজা, পাঠ উৎসবাদি অনুষ্ঠিত হইবে এবং পরবর্তী রবিবার ১লা চৈত্র ( ১৫. ৩. ৭০ ) বেলুড় মঠে শ্রীশ্রীঠাকুরের আবির্ভাব-মহোৎসব উপলক্ষে সারাদিনব্যাপী আনন্দানুষ্ঠান হইবে।

# উদ্বোধন

## দিব্য বাণী

**মদ্‌গুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্বগুহাশয়ে।**
**মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ ॥ ১১**
**লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যুদাহৃতম্‌।**
**অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে ॥ ১২**

—শ্রীমদ্‌ভাগবতম্‌, ৩।২৯

ভগবদ্‌-গুণগান শোনামাত্র সারা মন যে পথ ধরিয়া
অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ আকারে
বয়ে গিয়ে মিশে যায় সবার অন্তরবাসী
আমাতেই, গঙ্গাধারা যেমন সাগরে,
সে পথ ত্রিগুণাতীত অহেতুকী ভক্তাত্তর,
চাহে না তা কোন প্রতিদান,
ভক্ত আর ভগবান পুরুষোত্তম মাঝে
রাখে না তা কোন ভেদ, কোন ব্যবধান ॥

**নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।**
**কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্য-নাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ ॥**

—শ্রীরূপগোস্বামী

পরম বদান্য যিনি কৃষ্ণপ্রেমদাতা
নমি সেই অবতীর্ণ শ্রীকৃষ্ণচরণে—
শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য নামে আসিলা যে ধরাধামে
উজলিয়া দশদিশি গৌরাঙ্গ কিরণে ॥

# কথাপ্রসঙ্গে

## ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

ভগবদ্ভক্তি শিখাইবার জন্য এক ফাল্গুনী পূর্ণিমায় নবদ্বীপধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ভগবান শ্রীচৈতন্যদেব, শচীমাতার নিমাই। ভক্তিশাস্ত্রে ভক্তির একটি সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে, "সর্বোপাধি-বিনির্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্মলম্। হৃষীকেন হৃষীকেশ-সেবনং ভক্তি-রুচ্যতে॥" দেহমন প্রভৃতিকে এবং জাতি-কুল-শীল প্রভৃতিকেও উপাধি বলে; এগুলিতে আমি বা আমার বোধ যাঁহার একেবারেই নাই, যাঁহার চিত্ত ভগবচ্চিন্তায় সদা মগ্ন থাকায় শুদ্ধ হইয়াছে, তাঁহার জ্ঞানেন্দ্রিয় সহায়ে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অধিরাজ শ্রীভগবানের যে সেবা, তাহাই ভক্তি। এরূপ ভক্তির অধিকারী গীতোক্ত শ্রেষ্ঠ ভক্ত—জ্ঞানী ভক্ত—যিনি অদ্বয়ানুভূতির পরও ভক্তিভাব লইয়া থাকেন। এরূপ ভক্তিই 'অহৈতুকী', 'অব্যবহিতা' ভক্তি; কারণ যাহা লাভ করিবার পর চাহিবার বা পাইবার আর কিছুই থাকে না, তাহা তাঁহারা লাভ করিয়াছেন এবং ভগবানের সঙ্গে নিজের ভেদরাহিত্যও উপলব্ধি করিয়াছেন। আমাদের চোখের সামনে এই ভক্তিরই রূপ তুলিয়া ধরিতে আসিয়াছিলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য। আমাদের ইহা শিখাইবার জন্যই তাঁহার সন্ন্যাস-গ্রহণ, নিজের প্রয়োজনে নয়। সব অবতারেরই জীবনের সব ঘটনাই অবশ্য তাই, শ্রীরামকৃষ্ণের কথায়, লোকশিক্ষার জন্য অভিনয়মাত্র।

তাঁহার আবির্ভাব-তিথিতে আজ সেরূপ ভক্তিলাভের জন্যই প্রার্থনা জানাই তাঁহার চরণে, যাহা ভক্তকে সর্বোপাধিবিনির্মুক্ত করে; প্রার্থনা জানাই ভগবদ্‌গুণগানে মতির জন্য, তাঁহারই ভাষায় 'যাহা পরাবিদ্যার জীবনস্বরূপ, যাহা শ্রবণমাত্র অন্তরে আনন্দাম্বুধি উদ্বেল হইয়া উঠে, যাহা প্রতিপদে পূর্ণামৃত আস্বাদন করায়, চিরশান্তিস্নাত করে।'

## শিব

### ( ১ )

দোল-দুর্গোৎসবাদি উপলক্ষে বছরে কয়েকটি দিন আসে, যাহা ধর্মপ্রাণ হিন্দুদের মনে সাড়া জাগাইয়া তোলে। শিবরাত্রি উহাদের অন্যতম। এই দিন ভারত জুড়িয়া লক্ষ লক্ষ চিত্তকে সর্বত্যাগী মহেশ্বরের চিন্তা দোলা দিয়া যায়। উপবাস, পূজা, পাঠ প্রভৃতির মাধ্যমে এইদিন অন্তরের শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করা হয় মহাদেবের চরণে। নিজ নিজ আকাঙ্ক্ষা মতো বিভিন্ন জন বিভিন্ন প্রার্থনা জানায় তাঁহার কাছে; কেহ চায় কোন জাগতিক কামনার বস্তু, কেহ বা উচ্চতর লোকে যাইবার জন্য পুণ্য, কেহ বা ভগবানলাভ বা জ্ঞানলাভের জন্য কৃপা। প্রার্থনা যাহাই হউক, সকলেরই বিশ্বাস, আন্তরিকভাবে যে যাহা চাহিবে তাঁহার নিকট হইতে সে তাহাই পাইবে। পাওয়া যায়ও।

আমাদের এই শিবঠাকুর কোন্ সুদূর অতীত হইতে ভারতের চিত্তে চিরস্থায়ী আসন পাতিয়াছেন কে জানে। তিনি অদ্বয়তত্ত্বের প্রতীক, আর উমা তাঁহার শক্তির প্রতীক। ব্রহ্ম ও তাঁহার শক্তি অভেদ হইলেও, ব্রহ্ম নামরূপা-তীত, মনবুদ্ধির অতীত হইলেও তাঁহাকে সাকার শিবরূপে ও তাঁহার শক্তিকে পৃথকভাবে উমারূপে কল্পনা করিবার আসল কারণ হইল—এরূপ না করিলে আমরা প্রায় সকলেই সে অদ্বয়তত্ত্ব

সম্বন্ধে কোন ধারণাই করিতে পারিব না। আমাদের ধারণার জন্য মনবুদ্ধি ধরিতে-ছুঁইতে পারে, এমন একটি কিছু চাই—নামরূপবিশিষ্ট কিছু চাই-ই। এরূপ কোন অবলম্বনের মধ্য দিয়া সত্যকে যতটা সম্ভব ধারণা করিবার চেষ্টা করিতে করিতেই, অসংখ্য চিন্তায় এলোমেলোভাবে ছড়াইয়া পড়া মনকে একটি ঈশ্বরীয় রূপের চিন্তায় একাগ্র করার চেষ্টা করিতে করিতেই ক্রমে মন যত শুদ্ধ হয়, ততই সে মনে সত্য অধিকতররূপে প্রকাশ পাইতে থাকে। শেষে এই চেষ্টার ফলে মন যখন সম্পূর্ণ শুদ্ধ, একাগ্র হয় তখন সত্য পূর্ণ-প্রকাশিত হয়। তখনই আমরা ঠিক ঠিক উপলব্ধি করিতে পারি শিব কি, শক্তি কি, অদ্বয়তত্ত্ব বলিতে, শিবশক্তি অভেদ বলিতে কি বুঝায়।

সেই মনবুদ্ধির অতীত সত্যকে আমাদের মনের নাগালের মধ্যে আনিয়া দিয়াছে অরূপের এই সব রূপ-কল্পনাগুলি; বিভিন্ন শাস্ত্রে এগুলি পাওয়া গেলেও আসলে এ রূপ-কল্পনা তাঁহারই—"সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা"—আমাদের ভগবানলাভ করাইবার জন্য, আমাদের হিতের জন্য তিনিই এসব রূপ গ্রহণ করিয়াছেন।

চরম সত্যকে আমাদের প্রত্যেকের হৃদয়-দুয়ারে আনিয়া দিয়াছে পুরাণগুলি। দেবী-ভাগবতে তাই নামরূপাতীত অদ্বয়সত্তার প্রথম রূপকল্পনা হইল অর্ধনারীশ্বর-মূর্তি—এক দেহের অর্ধেক শিব, অর্ধেক উমা। ধারণার জন্য অরূপকে রূপের মাধ্যমে উপস্থাপিত করিতে হইলেও ব্রহ্ম ও তাঁহার শক্তি যে অভেদ, ইহা যেন আমরা ভুলিয়া না যাই, সেজন্যই এই অর্ধনারীশ্বর-মূর্তি। তাহার পর উভয়কে পৃথক্ পৃথক্ রূপে দেখানো হইয়াছে।

( ২ )

আমরা মানুষ—যতক্ষণ না আমরা মনবুদ্ধির পারে যাইতে পারিতেছি, ততক্ষণ আমাদের ভগবান সম্বন্ধে ধারণা করিতে হইলে তাঁহাকে মানুষেরই মতো রূপ-ও গুণবিশিষ্ট, অন্ততঃ গুণবিশিষ্ট বলিয়া ভাবা ছাড়া গত্যন্তর নাই, যতই না আমরা দার্শনিক তত্ত্ব মুখে আওড়াই না। কাজেই শিবঠাকুরকে আমরা উত্তুঙ্গ অদ্বয়তত্ত্ব হইতে নামাইয়া আমাদের কুটির-প্রাঙ্গণে লইয়া আসিয়াছি। তাঁহার সংসার আছে, উমা তাঁহার গৃহিণী, কার্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতী তাঁহার সন্তান। তিনি ভাঙ খান, তিনি কোন কাজ করেন না, শুধু ধ্যান করেন। তাঁহার চেলাগুলিও তাঁহারই মত 'নিষ্কর্মা'। মা-উমাকে তাঁহাদের খাওয়াইতে হয়—তাই মা তাঁহাদিগকে মাঝে মাঝে কড়া কথাও শোনান। যেমন ঘটে আমাদের সংসারে। শিব কিন্তু সর্বাবস্থায় নির্বিকার। অতি অল্পে তুষ্ট, আর সদা কল্যাণকামী সকলের জন্য। দক্ষরাজা সব দেবতাদের সামনে শিবকে গালাগাল করিতেছেন, অজস্র কটূক্তি বর্ষণ করিতেছেন (শক্তিকে কখনো হিমালয়-দুহিতা উমারূপে, কখনো আদ্যাশক্তিরূপে, কখনো অন্নপূর্ণা, দুর্গা, কালী প্রভৃতি রূপে, কখনো দক্ষরাজার কন্যা সতীরূপে কল্পনা করা হইয়াছে); শিব তখন কি করিতেছেন? নির্বিকার চিত্তে বসিয়া আছেন। 'সহ্য করা' বলিতে যাহা বুঝি আমরা তাহাই করিতেছেন কি? না; মর্মর-মূর্তিতে বারিধারা-বর্ষণ যেমন কোন রেখাপাত করিতে পারে না, শিবের চিত্তেও দক্ষের কথাগুলি তেমনি কোন রেখাপাতই করিতে পারিতেছে না। তাঁহার দৃষ্টিও স্থির; একবার শুধু তাহা করুণামৃতবর্ষী হয়ে দক্ষের উপর

পড়িল—দক্ষের যেন কোন অকল্যাণ না হয়! এই অপরূপ পৌরাণিক কাহিনীর পাশাপাশি মনে ভাসিয়া উঠে আমাদেরই যুগের একটি শিবচরিত্রের বাস্তব ঘটনার ছবি—গিরিশ ঘোষের অকথ্য কটূক্তি শুনিয়াও নির্বিকারচিত্ত শ্রীরামকৃষ্ণ অযাচিতভাবে নিজেই গিরিশবাবুর বাড়ীতে চলিতেছেন তাঁহাকে কৃপা করিতে, তাঁহার যেন কোন অকল্যাণ না হয়—"ও আমাকে যাই বলুক, আমার 'মা'-কে তো কিছু বলেনি"।

এই হলেন আমাদের শিবঠাকুর—আমাদের হাতের নাগালে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের মধ্যেই আমাদেরই মতো একজন ভাবিয়া তাঁহাকে আমরা আপনজন করিয়া লইতে পারি, ভালোবাসিতে পারি নিজের মতো করিয়া, সর্বাবস্থায় ক্ষমা পাইতে পারি তাঁহার। আবার নিজেকে ক্রমোন্নত করিতে করিতে সেই শিবকেই অন্য মূর্তিতে দেখিতে দেখিতে তাঁহার অরূপসত্তাতেও পৌঁছুতে পারি, যাহা 'অবাঙ্‌মনসোগোচরম্‌', মনবাক্যের অতীত —চিন্তার মাধ্যমে ধরার ও ভাষার মাধ্যমে প্রকাশের অতীত হইলেও সব সংশয় নিঃশেষে মুছিয়া যায় সেই উপলব্ধিতে —কবির ভাষায় "সেই নৈশব্দ্যচূড়ায়, সকল সংশয় তর্ক যে মৌনের গভীরে লুকায়।" সেই নিঃশব্দ মৌন উপলব্ধি-হিমাচলের জ্ঞানতুহিনশুভ্র সর্বোচ্চ শিখরই শিবের সর্বোচ্চ আসন— সেখানে 'চিদানন্দরূপ' শিব আমাদের স্বরূপের সঙ্গে, জগতের স্বরূপের সঙ্গে অভেদ হইয়া আসীন।

( ৩ )

ভারতীয় জাতিকে যুগে যুগে কত পরিবর্তনের, কত ঝড়-ঝাপটার ভিতর দিয়া চলিয়া আসিতে হইয়াছে হাজার হাজার বছরের পথ অতিক্রম করিয়া। বর্তমান সময়েও তাহার বিশ্বাসের গগনে দুর্যোগের অন্ত নাই। কিন্তু শিবঠাকুর এই জাতির চিত্তাসনে সবসময় একই ভাবে বসিয়া আছেন। তাঁহাকে সরাইবার চেষ্টা কি হয় নাই কখনো? হইয়াছিল; এখনো তো হইতেছে। বিভিন্ন ধর্মমত, বিভিন্ন মতবাদ, জড়বিজ্ঞান, যুক্তি, প্রগতিপরায়ণতা, প্রভৃতি সে আসন একবার করিয়া নাড়া দিয়াছে ও এখনো দিতেছে পুতুলপূজা বলিয়া, কুসংস্কার বলিয়া, জ্ঞানহীনতা বলিয়া, আমাদের উন্নতির পরিপন্থী বলিয়া। কিন্তু ফল কি হইয়াছে? ভারতীয় জাতির চিত্ত হইতে শিবঠাকুরকে সরাইতে কেহ পারে নাই, পারিবেও না কোনদিন। স্বামীজীর ভাষায়, শিবঠাকুর এখানে ষাঁড়ে চড়িয়া এতদিন যেমন ডমরু বাজ'ইয়া বেড়াইয়াছেন, তেমনি চিরদিনই বেড়াইবেন।

সে ডমরু গম্ভীর নিনাদে আমাদের ডাকে জাগ্রত হইতে, উঠিয়া দাঁড়াইয়া চলা শুরু করিতে এবং তাঁর অদ্বয়স্বরূপে পৌঁছিবার আগে না থামিতে।

( ৪ )

সারা বছর শিবের কথা যাহারা ভাবে না, তাহাদের কেবল শিবরাত্রির দিন উপবাস করিয়া পূজাদি করিবার কোন সার্থকতা আছে কি?

আছে বৈকি। অন্য কথা ছাড়িয়া দিলেও ইহাতে জোর, ইচ্ছাশক্তি অনেকটা বাড়াইয়া দেয়, অনেকখানি আত্মবিশ্বাস আসে। মন যখন কিছু চায়, ইচ্ছা করিয়া তখন তাহাকে উহা না দিয়া মনের রাশ যতবার আমরা টানিতে পারি, ততবারই ইচ্ছাশক্তি ও

আত্মবিশ্বাস কিছুটা বাড়িবেই। খাবার সময় হইলেই মন খাইতে চাহিবে, সংকল্প লইয়া উপবাস করিলে মনের রাশ তখন টানিতেই হয়। এইরূপ বিশেষ দিন উপলক্ষে উপবাস করা আমাদের জাতীয় মানস গঠনের সহজ ও সাবলীল পদ্ধতিগুলির অন্যতম। বলা বাহুল্য উপবাস সম্পূর্ণ ইচ্ছাকৃত হওয়া চাই, নতুবা খাইতে না পাইয়া বা অন্য কোন কারণে হয়তো বাধ্য হইয়া উপবাস করিলাম, তাহাতে এ ফল পাওয়া যায় না।

দেহের ক্ষুধার মতো মনের ক্ষুধাও আছে—ভোগ্যবস্তুর চিন্তা ; সেখানেও তাহার রাশ টানিতে পারিলে ফল আরো অধিক পাওয়া যায়। ইহার ইতিবাচক উপায় হিসাবেই শিবরাত্রি প্রভৃতি বিশেষ দিনে সর্বক্ষণ সদ্‌গ্রন্থপাঠে, সৎকর্মে ও জপ-ধ্যান-পূজাদিতে মনকে ব্যাপৃত রাখার ব্যবস্থা। তাছাড়া শিবরাত্রিতে বা অন্যান্য পুণ্যদিনে উপবাসের অন্য উদ্দেশ্যও রহিয়াছে; দেহ হাল্কা থাকিলে তাহা মনকে একাগ্র করার, দীর্ঘকাল পূজা-জপধ্যানাদি করার বিশেষ সহায়ক হয়।

আরও একটি বড় দিক রহিয়াছে এই সব অনুষ্ঠানের। বছরে একদিনের জন্য হইলেও দেহের চাহিদাকে ও মনের চাহিদাকে অগ্রাহ্য করিয়া আন্তরিকভাবে আমরা যদি মনকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র রাখিবার ও একাগ্র করিবার চেষ্টা করি, তাহা হইলে বিষয়নিরপেক্ষ আনন্দের আস্বাদ—যত সামান্যই হউক—একটু পাওয়া যায়ই। এই জাতীয় স্মৃতি আমাদের মনে নিবিড়ভাবে সংশ্লিষ্ট থাকিয়া যায়, একটু শুভ সংস্কার সৃষ্ট হয় বলা চলে। যাঁহারা এসব কখনো করেন নাই, তাঁহাদেরও জীবনে অন্য কোন বিষয়ে, যেখানে মন খুবই একাগ্র হইয়াছিল, একদিনের এমন কোন ঘটনায় নিশ্চয়ই কিছু খুঁজিয়া পাইবেন, যাহার স্মৃতি আজীবন উজ্জ্বল থাকে। যে কোনও রূপ বিষয়ভোগ-জনিত আনন্দই হউক, বা শিল্প-অধ্যয়ন-অধ্যাপনা-গবেষণাদি সম্ভূত বুদ্ধিজ আনন্দই হউক, বা আধ্যাত্মিক আনন্দই হউক—সব আনন্দের দুয়ার খুলিবার চাবিকাঠি হইল একাগ্রতা। একাগ্রতা যেখানে যত গভীর, আনন্দ সেখানে তত অধিক। আনন্দের গভীরতা ও মনের উপর তাহার প্রভাব—কতখানি সময় তাহার স্থিতি, তাহার উপর নির্ভর করে না ; নির্ভর করে একাগ্রতার নিবিড়তার উপর। আমাদের ভিতরেই এই আনন্দের অফুরন্ত ভাণ্ডার রহিয়াছে, একাগ্রতা সর্ববিধ আনন্দলাভের ক্ষেত্রে তাহারই দ্বার কমবেশী উন্মুক্ত করিয়া দেয়। আমরা ভুল বুঝি পদে পদে, নিজের অন্তরে নিহিত এই ভাণ্ডারটিকে দেখিতে পাই না বলিয়া ভাবি, উহা বাহিরে বিষয়ে আছে।

শিবরাত্রি প্রভৃতি পর্বদিনে বহির্বিষয় হইতে আনন্দ আহরণে সাময়িকভাবে বিরত থাকিয়া সারাক্ষণ মনকে ঈশ্বরচিন্তায় একাগ্র করার প্রচেষ্টায় যখন বহির্বিষয়ের সংস্পর্শ ছাড়াও মন এই 'অকারণ আনন্দের' আস্বাদ পায়, তখন তাহার দৃষ্টি যায় অন্তরের এই আনন্দ-ভাণ্ডারটির, আনন্দের আসল অবস্থানটির দিকে—নিজের স্বরূপের দিকে, শিবেরই দিকে। এই সত্যদৃষ্টি ও আনন্দের আস্বাদলাভ কোন শুভ মুহূর্তে একবার হইলে তাহাই আমাদের ক্রমবর্ধমান আকর্ষণে টানিয়া তুলে এই চরম সত্যের উপলব্ধিতে—"চিদানন্দ-রূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্।"

# স্বামী প্রেমানন্দের অপ্রকাশিত পত্র

[ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লিখিত ]

১

শ্রীশ্রীগুরুদেবশরণম্

( বেলুড় ) মঠ
২২।৭।০৯

ভাই শশী,

তোমার পত্র পাইয়া আনন্দিত হইলাম। এখানকার সকলে ভাল আছে। ভক্তিমতী দেবমাতা দুই দিন এখানে এসেছিল। তার ভক্তি বিশ্বাস দেখে স্বামীজী যেমন বলেছিলেন যে তারা সিদ্ধা গোপী, ঠিক তাই—শ্রীশ্রীপ্রভুর ব্যবহৃত বস্ত্রাদি, তাঁর চুল, হাতের লেখা প্রভৃতি দেখে পরম আনন্দিত, দর দর নয়নাশ্রুপাত। কি ভক্তি হে, কে এসব শেখালে! এসব স্বামীজীর মহিমা, না তোমার? এখানে কি আছে তুমি তাহা নিখুঁত করে বলেছ। কি ত্যাগ, কি বৈরাগ্য! আজ এরা এখানে এসেছে। স্বামীজী থাকিলে কত যত্ন করিতেন, কত আনন্দিত হতেন! শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীকে দর্শন করে মহা আনন্দিত, যেন কতকালের পরিচিত! ঠিক তাই। তোমার ভক্তির কথা বলে শেষ করতে পারে না। তুমি ধন্য, ধন্য, ধন্য। আশীর্বাদ কর যেন তোমার মত একটু ভক্তি বিশ্বাস পাই। ইতি

দাস
বাবুরাম

২

শ্রীশ্রীগুরুপদ ভরসা

মঠ
১৩।৮।'০৯

ভাই শশী,

তোমার শরীর অসুস্থ শুনিয়া দুঃখিত হইলাম। এখন কেমন আছ লিখিয়া জানাইবে। এখানকার সকলে ভাল আছে। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী ভাল আছেন। তুমি কতদিনে তাঁর দর্শনে আসিবে?···দেবমাতা শ্রীশ্রীমার খুব সেবা কচ্ছে। কি বিশ্বাস, কি ভক্তি, ভাই! দেখে সবাই আশ্চর্য। শুকুল কবিরাজী ঔষধ খাচ্ছে, খারাপ নাই। দেবমাতার ভারী ইচ্ছে তুমি একবার এখানে আইস। তুমি আমাদের ভালবাসা ও প্রণাম জানিবে ও ভক্তদের জানাইবে। ইতি

দাস
বাবুরাম

৩

শ্রীশ্রীগুরুপদ ভরসা

মঠ
3rd September, 1909
শুক্রবার

ভাই শশী,

তুমি আমার ভালবাসা ও প্রণাম জানিবে। তুমি কেমন আছ কৃপা করে জানাইলে আনন্দিত হইব। দেবমাতা কেমন আছে, তাহাকে আমার ভালবাসা ও শুভেচ্ছা জানাইবে। তার কল্যাণ হউক প্রভুর কাছে এই প্রার্থনা করি। তাহার চিঠি পেয়েছি, তাহাকে কহিও অনুগ্রহ করে। তাহাকে বলিও শ্রীশ্রীমার ইচ্ছায় যা ভাল তাই হয়েছে, তাতে আমার কোন কষ্ট হয় নাই। গত কয়েক দিন ভয়ঙ্কর বন্যা হয়ে আমাদের ঘাট সব ভেসে গেছে, উঠানে এক হাঁটু জল। গরুদের আমাদের ঘরে এনে রাখা হয়েছে। দুটো পুকুরে অনেক মাছ ছিল, সব ভেসে গেছে। শাক, সবজি সব মাটি। গাছ-পালা অনেক যাবে দেখছি। দৈবের উপর হাত নাই। শুকুলের জ্বর হয়ে কলিকাতায় গেছে। আর সব ভাল আছে। তুমি আমার প্রণাম জানিবে ও ব্রহ্মচারীদের ভালবাসা জানাইবে। তোমার আসিবার কি হ'ল? ইতি　　দাস

বাবুরাম

৪

শ্রীশ্রীগুরুপদ ভরসা

মঠ
বুধবার
December 29, 1909

ভাই শশী,

মঙ্গলবার ২৮শে ডিসেম্বর বেলা ৪॥ ঘটিকার সময় গোপালদাদা স্বধামে গমন করেছেন। সামান্য জ্বর হয়েছিল মাত্র, কেহ ঠাওরাইতে পারে নাই যে এত শীঘ্র উনি দেহরক্ষা করিবেন। শেষ-সময়ের মুখ-কান্তি অতি সুন্দর। শ্রীশ্রীপ্রভুর ভক্তের লীলাই এক আশ্চর্য। সে সময়ে মতি ডাক্তার উপস্থিত ছিল। লেবু, দুধ খেলেন। মতিবাবুকে নমস্কার করে হাসিতে হাসিতে দেহত্যাগ। যখন এখানকার কেহ যাইবে তার মুখে শুনিও। তুমি আমার নমস্কার ও ভালবাসা জানিবে। ইতি　　দাস

বাবুরাম

( ৫ )

শ্রীশ্রীগুরুপদ ভরসা

মঠ
শুক্রবার
4-2-10

ভাই শশী,

তোমার প্রেরিত Path of Perfection পুস্তিকা পাইয়াছি। অতুলকে তোমার নিকট পাঠাইবার জন্য মহারাজকে লিখেছিলাম। কৈ, এখনও কি যায় নাই? 'সঙ্গী জুটে না জুটে, একাই কর মেলা, মন ক'রো না কাজে হেলা' (ও ভাই শশী, কাজে করো না হেলা)। আমারও এই দশা জানিবে। দাঁতের অসুখে কষ্ট পাচ্ছি তবু সবই কত্তে হচ্ছে। ভাল সঙ্গী মেলা দায়। গত ১০ই পৌষ গোপালদাদার উদ্দেশে বেশ এক মহোৎসব হয়ে গেছে। প্রায় ৪০০।৫০০ শত ভক্ত- ও গরীবনারায়ণ প্রসাদ পেয়েছে। গত মঙ্গলবার পূজ্যপাদ স্বামীজীর জন্মতিথিপূজাও মন্দ হয় নাই। কাঙ্গালী-ভোজন যেন নির্বিঘ্নে হয়ে যায়, এই প্রার্থনা। তারকদাদা এসেছেন। কালীকৃষ্ণ, অমূল্য ও গুরুদাস মঠে এসেছে। তুমি আমাদের ভালবাসা ও প্রণাম জানিবে। ইতি

দাস
বাবুরাম

( ৬ )

শ্রীশ্রীগুরুপদ ভরসা

The Ramakrishna Sevashram
Kankhal ( Hardwar )
Dist. Shaharanpur
Date 9-4-10

ভাই শশী,

প্রায় ১০।১২ দিন হইল কাশীধাম হয়ে ২।৩ দিন এখানে এসেছি। হরি মহারাজের খুব অসুখ হয়েছিল, এখন অনেক সেরেছেন। হরি ভায়াকে নিয়ে মঠে যাইবার ইচ্ছা আছে। আমি মন্দ নাই, তুমি কেমন আছ। পূজনীয়া শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী হরি ভায়ার কাছে একটি ছেলেকে পাঠাইয়াছেন; যদি তোমার দরকার হয় ঐ ছেলেটিকে তোমার কাছে পাঠান, তুমি লিখিও। তোমার শীঘ্র একবার বাঙ্গালোরে গমন বিশেষ আবশ্যক। তোমার শরীর ভাল হবে।…তুমি একবার শীঘ্র বাঙ্গালোরে যাইবে—ইহা আমার বিশেষ অনুরোধ। আমি বোধ হয় একমাস কাল এখানে থাকিব। তুমি আমার ভালবাসা ও প্রণাম জানিবে এবং রুদ্র ও আর আর ভক্তদের জানাইবে। ইতি

দাস
বাবুরাম

পুঃ—ঐ ছেলেটি ব্রাহ্মণ ও Entrance পাশ। বয়স কম, স্বভাব ভাল। ইতি

দাস
বাবুরাম

# মনের বাজে খরচ

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

মনের ষোলো আনা শক্তি ঈশ্বরলাভের জন্য খরচ করতে পারলে তবেই তাঁকে লাভ করা যায়। তিনি আমাদের ষোলো আনা মনই চান। গীতার পরম-তত্ত্ব তো অষ্টাদশ অধ্যায়ের দুটি শ্লোকে। আমরা কৃতার্থ হই শুধু ভগবানের অনুগ্রহে! এই অনুগ্রহ অন্য-নিরপেক্ষ। তাঁর করুণা বিত্তের অপেক্ষা রাখে না, পাণ্ডিত্যের অপেক্ষা রাখে না, বংশমর্যাদারও অপেক্ষা রাখে না। সেই পরমানন্দঘনমূর্তি অনন্ত ভগবানকে ভজনা করতে হয় অনুক্ষণ ভাবনার দ্বারা। উপরে গীতার যে দুটি শ্লোকের কথা বলা হয়েছে তার প্রথমটি শুরু হয়েছে 'মন্মনা ভব' দিয়ে। দ্বিতীয় শ্লোকটিব গোড়াতেই বলা হয়েছে: "সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য।" ঈশ্বরের শরণাগতি এবং তাঁর করুণা তো নিঃসংশয়ে আধ্যাত্মিক জীবনযাত্রায় আমাদের শেষ সম্বল। আমাদের অন্তরে কামনার এবং অহঙ্কারের অসুরটা খাড়া থাকতে দিব্য-জীবনযাপন অসম্ভব। কোন মানুষই জোর করে বলতে পারে না, সংসারসমুদ্রে আমার জীবনতরী চলবে আমারই ইচ্ছায়। ঈশ্বরের দরজায় পৌঁছানোর পথে রয়েছে একটা প্রকাণ্ড দুর্লঙ্ঘ্য গুঁড়ি এবং ঠাকুরের ভাষায় এই গুঁড়িটা হচ্ছে অহঙ্কার। তাই ঠাকুর বিশ্বাস এবং শরণাগতির উপরে এতটা জোর দিয়েছেন। বারংবার বলেছেন, ব্যাকুল হয়ে তাঁকে প্রার্থনা করো। বলেছেন, নাহং নাহং, তুহুঁ তুহুঁ।

কিন্তু 'মামেকং শরণং ব্রজ', শরণাগতি, ভগবদনুগ্রহ—এর সঙ্গে আর একটা সত্য অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে আছে: মন্মনা ভব। ভগবানের করুণার দরজা আমি ঢুকতে চাইলে খুলে যাবে ঠিকই, কিন্তু আমাকে সেই দরজায় আঘাত করতে হবে। খ্রীষ্টের কথায়, তুমি চাও, তবেই তো পাবে! ভগবানের অনুগ্রহ আমি পাবোই পাবো, কিন্তু সেই অনুগ্রহ চাইতে হবে আমাকেই। এইখানেই দৈব অনুগ্রহলাভের জন্য সাধনের সার্থকতার কথা এসে পড়ে। ভগবানের করুণা লাভ করতে হলে নিজেকে নিয়ত জাগ্রত এবং উদ্যত রাখার প্রয়োজন আছে। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের' পাতায় পাতায় যেমন শরণাগতির কথা আছে, তেমনি সাধনের কথাও আছে। নির্জনবাস এই সাধনের পক্ষে অনুকূল ব'লেই ঠাকুর বারংবার বলেছেন 'ঠাঁই-নাড়া' হ'য়ে বাস করতে। ঈশ্বরের রাস্তায় কেউ কারও হ'য়ে চলতে পারে না। কবি হুইট্‌ম্যানের ভাষায়:

Not I, not anyone else can
travel that road for you,
You must travel the road for
yourself.

আমি নিশ্চেষ্ট হ'য়ে বসে থাকবো আর ঈশ্বর আপনা থেকে আমার কাছে এসে ধরা দেবেন, এমনটি হ'তেই পারে না। ঠাকুর পুরুষকারের উপরে, কর্মের উপরে তাই কতই না জোর দিয়েছেন!

এই সাধন-ভজনের কথা যখনই এসে পড়লো তখনই প্রশ্ন উঠলো,—সাধন-ভজন বলতে আমরা কি বুঝবো? ঠাকুর সাধনের জন্য বলতেন মনের বাজে খরচ বন্ধ করতে। ঠাকুর বলতেন, 'কিছুদিন নির্জনে থাকতে হয়। কেন? কারণ সংসার করলে মনের বাজে খরচ হ'য়ে পড়ে।' মন নিয়েই তো সব। ঠাকুর বলতেন, 'মানুষ মনে বদ্ধ, মনে মুক্ত।' ধর্মসাধনার সমস্ত নাট্যলীলাই তো মনেরই রঙ্গমঞ্চে। এই মনের ক্রমাগত বাজে খরচ হয়ে যাচ্ছে। মন ছড়িয়ে আছে বিত্তে, খ্যাতিতে, ক্ষমতায়, আরও কত কিছুতে। এ সবই মনের বাজে খরচ। ইতস্তত: ছড়ানো মনকে কুড়িয়ে এনে ঈশ্বরের পাদপদ্মে জড়ো করতে না পারলে তো তাঁর কাছে কখনই পৌঁছানো যাবে না। গীতায় ভগবান বলছেন, 'মন্মনা ভব', অর্জুন, তোমার ষোলো আনা মন আমাকে দাও। তবেই আমাকে তুমি পাবে, মামেবৈষ্যসি, to me thou shalt come. এই মন্মনা শব্দটির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে শ্রীমধুসূদন সরস্বতী লিখেছেন, সর্বানাত্মচিন্তাশূন্যয়া মনোবৃত্ত্যা তৈলধারাবদবিচ্ছিন্নয়া সততং চিন্তয়। ভগবানের কাছে পৌঁছাতে হলে মনের বৃত্তি হওয়া দরকার তৈলধারার মতো অবিচ্ছিন্ন। চেতনার ক্ষেত্রে যে-চিন্তাপ্রবাহ বইতে থাকবে, তার মধ্যে এমন ক্ষুদ্রতম ছিদ্রও থাকবে না যে-ছিদ্রপথে বিষয়-চিন্তা ঢুকতে পারে ভাবনায়। ভজন বলতে মধুসূদন সরস্বতী অনুক্ষণ ভাবনার দ্বারা ভজনার কথাই বলেছেন। মনের ষোলো আনা শক্তি যদি বিষয়চিন্তা করতে করতেই ফুরিয়ে যায়, সেই শক্তির সবখানি যদি চেতনার ক্ষেত্রে ঈশ্বর-চিন্তাকে সর্বক্ষণের জন্য অনির্বাণ দীপশিখার মতোই অম্লান দীপ্তিতে জ্বালিয়ে রাখতে ব্যয়িত না হয় তবে ম্যামনের (mammon) অনুগ্রহ লাভ করা যেতে পারে, কিন্তু ঈশ্বরের নয়। তিনি আমাদের ষোলো আনা মনই চান, এক পাইও কম নয়। "Love thy Lord, thy God with all thy mind." —খ্রীষ্টের কথা।

শূন্যের প্রতি প্রকৃতির একটা বিতৃষ্ণা আছে, Nature abhors vacuum. কিন্তু ঈশ্বরের লোভ এই শূন্যতার প্রতি! আমাদের শূন্য হৃদয়ের দিকে তাঁর সদা জাগ্রত লুব্ধ দৃষ্টি। কবে আমরা বলতে পারবো, "দুঃখ-সুখের বিচিত্র এ জীবনে তুমি ছাড়া আর কেহ না রবে?" এই কথাটি শুনবার জন্য আমাদের হৃদয়ের দ্বারদেশে উৎকর্ণ হয়ে তিনি বসে আছেন যুগযুগান্ত ধ'রে। তিনি আমাদের শুধু ভালোবেসেই খুশী নন। আমাদের ভালোবাসা পাওয়ার জন্যও তাঁর ব্যাকুলতার অন্ত নেই। ঠাকুর বলতেন, 'আমরা এক পা এগিয়ে গেলে তিনি দশ পা এগিয়ে আসেন।' এখানে আর একটা কথা যোগ ক'রে না দিলে সত্য অসম্পূর্ণ থেকে যায়। কথাটা হচ্ছে: আমরা তাঁকে শুধু ভালোবাসবো না, ষোলো আনা হৃদয় দিয়ে, ষোলো আনা মন দিয়ে ভালোবাসবো তাঁকে। ঈশ্বর চান, ঈশ্বর আমাদের কাছে দাবী করেন, আমরা কেবল তাঁকেই ভালোবাসবো, আমরা আমাদের দিবারাত্রির ভাবনায় শুধু তাঁকেই রেখে দেবো, আমাদের হৃদয়-মন্দিরে কেবল তাঁরই আসনটিকে আমরা সযত্নে পেতে রাখবো। God is a jealous God. আমাদের হৃদয়ে তাঁর সাম্রাজ্য হওয়া চাই অসপত্ন। বক্ষের দরজায় নিশিদিন অপেক্ষা ক'রে তিনি বসে আছেন কখন আমরা দরজা খুলে অন্তরের মধ্যে তাঁকে গ্রহণ করবো।

"তাই তো তুমি রাজার রাজা হয়ে
তবু আমার হৃদয় লাগি
ফিরছো কত মনোহরণ বেশে,
প্রভু, নিত্য আছো জাগি।"
( গীতাঞ্জলি )

এ বিশ্বভুবনে তাঁর তো কোনো অভাব নেই। তিনি তো শুধু রাজা নন, রাজার রাজা। "কত মণি প'ড়ে আছে চিন্তামণির নাচ-দুয়ারে।" "চন্দ্র সূর্য পায়ের কাছে মালা হ'য়ে জড়িয়ে আছে।" এত ঐশ্বর্যের অধিকারী হ'য়েও মানুষের ভালোবাসা পাওয়ার জন্য তার বুকের দরজায় তিনি নিত্য জেগে আছেন! তাঁর জন্য অন্তরে তো কোনো জায়গা রাখিনি, ম্যামন হৃদয়ের সবখানি দখল ক'রে আছে, ধনে জনে মানে অনুক্ষণ জড়িয়ে আছি, কত রকমের আসক্তি হৃদয়কে কানায় কানায় পূর্ণ করে রেখেছে, জাগতিক সুখের কত কামনা মর্মের গভীরে গিজ্ গিজ্ করছে পায়রার গলায় মটরের মতো। "কত যে ভাঙা-চোরা ঘরেতে আছে পোরা, ফেলিয়া দিতে পারি না যে।" আর বসনাগুলোকে হৃদয়-মন্দির থেকে ফেলে দিতে পারছিনে ব'লেই ভগবান মন্দিরে ঢুকতে পারছেন না। হৃদয়কে একদম খালি ক'রে না ফেললে তিনি সেখানে ঢুকবেন কেমন ক'রে?

এই যে 'লক্ষ্যশূন্য লক্ষ বাসনা ছুটিছে গভীর আঁধারে'—এই বাসনাগুলোকে মন থেকে অপসারিত ক'রে মনটাকে খালি করতে পারলেই, বাস্। কেল্লা ফতে! ভগবানের লুব্ধ দৃষ্টি তো আমাদের ঐ খালি মনটার উপরে। মনে বিষয়-চিন্তার লেশমাত্র যখন থেকে আর রইলো না, মনের বাক্সে খরচ একদম যেই বন্ধ হয়ে গেল তখন থেকেই তো এই জন্মেই দিব্যজীবনের মধ্যে আত্মার জন্মান্তরের পালা শুরু হোলো। কামনার আবর্জনারাশিতে মন্দির ভ'রে ছিলো বলে যে-ভগবান হৃদয়ের দরজায় বহু ধৈর্যে অপেক্ষা করছিলেন ভিতরে প্রবেশ করতে, আর তো তাঁর কুণ্ঠার কোনো কারণ থাকতে পারে না। ভক্তকে তিনি তো প্রতিশ্রুতিই দিয়েছেন, 'মন্মনা ভব,—ষোল আনা মন আমাকে দাও, তা'হলেই আমাকে তুমি পাবে।' ভগবান সৎ। তিনি সত্যনারায়ণ। নারায়ণ কখনো সত্যভ্রষ্ট হ'তে পারেন? তাই মন থেকে সমস্ত বিষয়-চিন্তা স'বে গিয়ে সেই মন ঈশ্বর-চিন্তায় যখন কানায় কানায় ভ'রে গেলো তখন সে তো বৈকুণ্ঠে রূপান্তরিত হোলো। বৈকুণ্ঠে ঢুকতে ভগবান কুণ্ঠিত হবেন কেন? ভগবান হচ্ছেন সর্বাগ্রে ভক্তবৎসল ভগবান।

আহা, গীতার 'মন্মনা ভব' কথাটিরই তো প্রাঞ্জল ভাষ্য 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের' পাতায় পাতায় কোহিনূরের মতোই জল্‌জল্ করছে। মধুসূদন সরস্বতী ঐ 'মন্মনা' শব্দটির ভাষ্যপ্রসঙ্গে অবিচ্ছিন্ন তৈলধারার উপমা দিয়েছেন। উপমাটি খুবই লাগ-সই সন্দেহ নেই। কিন্তু 'কথামৃতের' উপমাগুলির বুঝি তুলনা নেই! সারাদিন শত কর্মের মধ্যেও অনুক্ষণ ভাবনায় ভগবানকে ধ'রে রাখতে হবে, ধর্মের এই পরম তত্ত্বটিকে জনসাধারণের হৃদয়গ্রাহী করবার জন্য ঠাকুর ছবির পর ছবি তুলে ধরেছেন! আমাদের গ্রাম্যজীবনে দৈনন্দিন যে সকল ঘটনা অহরহ ঘটে থাকে, সেই ঘটনাগুলিই ঠাকুরের উপমাগুলির মালমসলা। কষ্ট ক'রে তাঁকে কোনো কল্পনা করতে হোতো না। কোনো সত্য তাঁর চেতনায় উদ্ভাসিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সেই সত্যের প্রতিফলন তিনি দেখতে পেতেন বাহিরের প্রাকৃতিক ঘটনার মধ্যে। অনাসক্তির আদর্শের কথা মনে হতেই

তিনি দেখতে পেতেন পাঁকালমাছের ছবি। বিবেক-বৈরাগ্যহীন পাণ্ডিত্যের প্রতীক দেখতেন আকাশের শকুনিতে।

স্মরণমননের আদর্শের তিনি প্রতিফলন দেখেছিলেন বড়লোকের বাড়ীর দাসীতে যার মন দিবানিশি পড়ে আছে তার গাঁয়ের কুটিরে। 'মন্মনা' কথাটির ব্যাখ্যায় গ্রামের সেই ছুতারনীর দৃষ্টান্তটিও প্রচুর আলোকপাত করতে পারে। ছুতারনী ঢেঁকিতে চিঁড়া কুটছে, ছেলেকে মাই দিচ্ছে, খদ্দেরের সঙ্গে দর-কষাকষি করছে; কিন্তু মন তার পড়ে আছে ঢেঁকির ঐ মুসলের দিকে! হাতে পড়লে হাত ছেঁচে যাবে। গীতার পরমতত্ত্বের ব্যাখ্যা ঠাকুর যেমন উপমার পর উপমার সাহায্যে করেছেন, এমনটি কি আর কারও দ্বারা সম্ভব হয়েছে? স্বয়ং বাগ্বাদিনী পিছন থেকে বসে ঠেলে দিতেন বলেই হিন্দুদর্শনের গভীরতম সত্যগুলি এমন সহজবোধ্য সরলতম ভাষায় 'কথামৃতের' পাতায় পাতায় অনুপম ভঙ্গীতে প্রকাশ পেয়েছে।

আবার বলি, সাধনার প্রথম এবং শেষ কথা 'মন্মনা ভব।' ঈশ্বরলাভই যদি জীবনের চরম লক্ষ্য হয় তো সে লক্ষ্যে পৌঁছানোর অপরিহার্য পথ হচ্ছে অনুক্ষণ ভাবনার দ্বারা তাঁর ভজনা। সাধন মানেই স্মৃতিসাধন, নিরন্তর ঈশ্বরের স্মরণমনন। এটা খুবই কঠিন। মানুষের স্বভাবে শ্রেয়ঃ এবং প্রেয়ঃ—এ দুয়েরই অদ্ভুত মিশ্রণ। মানবপ্রকৃতিতে কিছুটা মাটি, কিছুটা নক্ষত্রখচিত আকাশ। তাই আমাদের মন শুধু যে ভূমার জন্য ক্ষুধিত, তা নয়। সেই মন মত্ত হস্তীর মতো দৌড়ে দৌড়ে বেড়াচ্ছে বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে যেগুলি নিতান্তই ক্ষণস্থায়ী! মাঠাকরুণ বলতেন, 'মন না মত্ত হস্তী! হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছোটে!' অর্জুন বলেছিলেন, 'মনকে সংযত ক'রে রাখা বায়ুকে শাসনে রাখার মতোই দুঃসাধ্য।' অথচ সমস্ত মনটা ভগবানে না দিলে তাঁর কাছে পৌঁছানো যাবে না! ভগবান অবশ্য অর্জুনকে অভয় দিয়ে বলেছেন, অভ্যাস এবং বৈরাগ্যের দ্বারা অবাধ্য মনকেও বশে আনা যায়।

তবেই দেখা যাচ্ছে ধর্মসাধনার সমস্তটাই মানুষের মনেরই ব্যাপার। অধ্যাত্ম-সাধনার সমস্ত নাট্যলীলার অভিনয় মনেরই মঞ্চে। চেতনার ক্ষেত্রে ঈশ্বরচিন্তার দীপশিখাকে অম্লান রাখার পুনঃপুনঃ প্রযত্নই অভ্যাস। কিন্তু কি কঠিন মনকে নিরবচ্ছিন্ন ঈশ্বরচিন্তার মধ্যে ডুবিয়ে রাখা। বাইরে থেকে বিষয়-চিন্তার ঝাপটা পড়ছে মনের উপরে আর সেই ঝাপটায় ঈশ্বর-চিন্তার দীপশিখা নিভে যাচ্ছে। 'যত বার আলো জ্বালাতে চাই, নিবে যায় বারে বারে।' কিন্তু খানদানী চাষী অনাবৃষ্টিতেও কখনো চাষ ছাড়ে না। সাধকও তেমনি নানা বিপর্যয়ের মধ্যেও সাধনায় অবিচলিত থাকবে। যেমন বাহিরের বাধার বিরুদ্ধে সংগ্রামে, তেমনি অন্তরের বাধার বিরুদ্ধেও সংগ্রামে জয়ের একই মন্ত্র: No resting on one's oars. মন না মত্ত হস্তী! —মাঠাকরুণের সেই কথা। মনকে শাসনে আনা যদি সহজসাধ্য হোতো তবে উপনিষদে দিব্যজীবনে পৌঁছানোর পথকে ক্ষুরের ধারের মতোই শানিত এবং দুর্গম বলার কোন হেতু ছিল না।

# জোসেফিন ম্যাকলাউড

[ পূর্বানুবৃত্তি ]

ব্রহ্মচারী শ্যামল

### যাযাবর "Tantine"

৪ঠা জুলাই, ১৯০২। রামকৃষ্ণের নরেন প্রভুর কাজ শেষ করে নিজনিকেতনে চলে গেছেন। বেলুড় মঠের গঙ্গাতীরে অগণিত অনুরাগীর স্তম্ভিত বেদনার মধ্যে মহাসমাধিমগ্ন বিবেকানন্দের মরদেহের উপর প্রজ্বলিত হুতাশন জ্বলে উঠেছে। সম্মুখে দাঁড়িয়েছিলেন নির্বাক ভগিনী নিবেদিতা। ভাবছিলেন জো-র জন্যে যদি স্বামীজীর শেষ স্মৃতি কিছু রাখা যেত। জো নেই, মাত্র দুমাস আগে চলে গিয়েছেন বিলাতে। চিন্তার মাঝখানেই লেলিহান অগ্নিশিখার মাঝখান থেকে উড়ে এল একটুকরো গৈরিক বস্ত্রাঞ্চল—জো-র জন্য শেষ আশীর্বাদ স্বামীজী দিয়ে গেলেন। নিবেদিতা পাঠিয়ে দিলেন জো-কে এই অমূল্য সম্পদ; লিখলেন, "তোমার জন্য স্বামীজীর শেষ বাণী।"[১৫]

"স্বামীজী চিরনির্বাণে সমাহিত হয়েছেন"—এ তার-সংবাদটি সেদিনই পেয়েছিলেন জো লণ্ডনে। মুহূর্তমধ্যেই সমস্ত আলো তাঁর কাছে নিষ্প্রভ মনে হয়েছিল। নিজের সমস্ত শক্তি আর প্রেরণার উৎসস্বরূপ এই সূর্যটি যে এত তাড়াতাড়ি নিষ্প্রভ হয়ে যাবে একথা জো স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি। বিলেত যাবার আগে জো-কে মঠের নিজের ঘরে দাঁড়িয়ে স্বামীজী বলেছিলেন, "আমি চল্লিশ পেরুচ্ছি না।" কিন্তু সে মর্মান্তিক সত্যকে বিশ্বাস করার কোন চিন্তাই সেদিন ওঠেনি জো-র মনে। কিন্তু এ সত্যের নির্ভুল পরিণতিতে যে আঁধার নেমে এল জো-র জীবনে তা থেকে আলোর সন্ধান পাবার জন্য দীর্ঘদিন ধরে কেঁদেছিলেন জো। অবশেষে হৃদয়ের রক্তমোক্ষণ করে আলোর সন্ধান পেয়েছিলেন মেটারলিঙ্কের একটি ছোট কথায়, "তুমি যদি কখনও কারও দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়ে থাকো তবে তা প্রমাণ করো অশ্রুবিসর্জন করে নয়, জীবনে রূপায়িত করে।"

আর অশ্রুবিসর্জন করেননি জো। করার সময়ও পাননি। স্বামীজীর ভালবাসাকে পরম-কৃতজ্ঞতাবোধে পরিশোধ করার জন্য নতুন করে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন জো, বিবেকানন্দের আরব্ধ বিশ্বজনীন কাজের জন্য আত্মোৎসর্গ করে। নিউইয়র্কের প্রথম দর্শনের দিনটির পর "Paris-dressed young lady"[১৬] (প্যারীর পোশাকে সজ্জিতা) জো-র রূপান্তর হয়েছিল স্বামীজীর "angel" (দেবদূত), "everlasting Joe" (চিরদিনের জো)-তে; বিবেকানন্দ প্রয়াণে নবতর রূপান্তর হল "Universal aunt" (সার্বজনীন পিসীমা) Tantine (টান্টিন)-এ, যে বহু পরিচিত নামে প্রায় এক অর্ধশতাব্দী ধরে জো বেঁচেছিলেন বিবেকানন্দানুরাগীদের মধ্যে বিবেকানন্দময় হয়ে। এ নামেই জো ঘুরে বেড়িয়েছিলেন দেশ থেকে দেশান্তরে গৃহহীন যাযাবরের মতো। তবে তফাতটা ছিল, এই যাযাবরের উদ্দেশ্য-হীনতার বদলে জো-র জীবনে এসেছিল

১৫ Late and Soon, p. 244

১৬ Late and Soon, p. 238

স্বামীজীর বিশ্বজনীন যুগাদর্শকে কার্যে পরিণত করার উন্মাদনা, যে উন্মাদনা জো-কে ধূমকেতুর মতো উড়িয়ে নিয়ে যেত স্থান থেকে স্থানান্তরে—আজ ইউরোপ, কাল আমেরিকা অথবা ভারতবর্ষ। "She rested best 'on wheels'."[১৭] অর্থাৎ "পথ চলাতেই তাঁর সবচেয়ে ভাল বিশ্রাম ছিল." একথা জো-র সম্বন্ধে বলেছিলেন বেটির কন্যা ফ্রান্স।

সাত বছরের বিবেকানন্দ সান্নিধ্যকে পরবর্তী সাতচল্লিশ বছর ধরে জো এ ভাবেই যাপন করেছিলেন। বাইরের দিক থেকে তাই তাঁকে আত্মীয়বর্গের কাছে এক অবাস্তব চরিত্র বলেই মনে হতো। Ridgely-র আত্মীয়স্বজন জো-কে "unreal" (অবাস্তব), "woman with a mission"[১৮] (মহদুদ্দেশ্য-প্রণোদিত নারী), এমন কি অতিমানবিক ইত্যাদি আখ্যাও দিয়েছিলেন। অথচ অনুপ্রাণিত হলেও কখনও স্বপ্নবিলাসী হননি জো ; বরং ঠিক তার বিপরীতই ছিলেন—কঠোর বাস্তববাদী। গভীর ভাবপ্রবণতার সঙ্গে কঠোর বাস্তবানুগ কর্মশক্তির এই সমন্বয়ের জন্য জো-প্রমুখ পাশ্চাত্য অনুরাগীদের স্বামীজী "living Vedantin"[১৯] বলে আখ্যা দিয়েছিলেন। তাদের সম্বন্ধে স্বামীজী বলতেন, "তোমরা যখন কোনকিছু বিশ্বাস কর, সে বিষয়ে তোমরা কেবল স্বপ্নই দেখ না, তাকে কার্যে পরিণত কর। এটাই তোমাদের শক্তি।"

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে যে কোন জায়গায় স্বামীজীর কাজের জন্য বেরিয়ে পড়বার একটা অবিশ্বাস্য রকমের প্রস্তুতি ছিল জোসেফিনের। কাঁধে ঝোলানো একটি স্যাময় চামড়ার ব্যাগের মধ্যে সব সময়ই থাকত ১০০০ ডলারের সমান বিভিন্নদেশীয় মুদ্রা—টাকা, লায়ার, স্টার্লিং, ড্রাক্‌মা ইত্যাদি। এমন কোনো টুপি ছিল না যেটা মাথায় দিয়ে জাহাজে অথবা ট্রেনে ঘুমোননি। Leopard skin-এর কোটটি যথেচ্ছ ব্যবহারের ফলে প্রায় পরিধানের অযোগ্য হয়ে পড়েছিল। খাবারের মধ্যে দুধ ছিল তাঁর সব সময়ের খাদ্য, যা পথের ধারে যে কোন station থেকে জো কিনে নিতেন। সৈনিকের মতো এক ডাকে বেড়িয়ে পড়ার প্রস্তুতিটাই ছিল বড কথা। বহুদিন হয়তো আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ নেই ; কোনো খবর না দিয়ে অপ্রত্যাশিতভাবে হঠাৎ একদিন জো হাজির হতেন Ridgely-র চায়ের টেবিলে। একবার পৃথিবী-ভ্রমণ শেষ করে, Hamlet-এর কথার প্রতিধ্বনি করে জো প্রায়ই বলতেন, "The readiness is all."[২০] অর্থাৎ 'প্রস্তুত থাকাটাই বড কথা'। 'চরৈবেতির' এই মন্ত্রই ছিল জো-র কাছে তাঁর আধ্যাত্মিক জীবনের মূলকথা।

বাইরেই হোক, ঘরেই হোক, স্বামীজীই জুড়ে ছিলেন জো-র এই বিরাট যাযাবর জীবনকে। Ridgely-র যে ঘর পরবর্তী জীবনে জো ব্যবহার করতেন, সেখানে টাঙানো থাকতো স্বামীজীর বড় রঙীন ছবিটি যেটি মিসেস ব্লজেটের বাড়ীতে প্রথম দেখেছিলেন জো। স্ট্রাট্‌ফোর্ড-অন্‌-এভনে যে বাড়ীটি Legget পরিবার কিনেছিলেন জো-র প্রভাবে সেখানেও নতুন গৃহদেবতা হয়েছিলেন স্বামীজী। Alabaster-এর একটি বড শ্বেতমূর্তি তৈরি করিয়েছিলেন জো। আর যে ঘরে স্বামীজীর

১৭ Late and Soon, p. 240

১৮ Late and Soon, p. 238

১৯ Reminiscences, p. 249

২০ Late and Soon, p. 239

এই ধ্যানমূর্তিটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন জো সে ঘরের নাম ছিল "Prophet's Chamber"[২১] অর্থাৎ "যুগাচার্যের ঘর।" এ ঘরটিতে জো সাজিয়ে রাখতেন গেরুয়া কাপড়ে বাঁধানো স্বামীজীর বিভিন্ন রচনাবলী।

## গঙ্গাতীরের বেলুড় মঠ

কিন্তু স্ট্রাট্‌ফোর্ড নয়, নিউইয়র্ক নয়, ক্যালিফোর্নিয়া অথবা প্যারিও নয়, এমন কি বহুস্মৃতিবিজড়িত রিজলীও নয়, গঙ্গাতীরের বেলুড় মঠই হয়েছিল Tantine জোসেফিনের শান্তিময় বিশ্রাম এবং ঈশ্বরসান্নিধ্যের স্থান। ঘরছাড়া জো-র ঘর বলে যদি কিছু থেকে থাকে তা হ'ল গঙ্গাতীরের স্বামীজীর এই মঠটি। বহুদিন আগে স্বামীজীকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন জো, "স্বামীজী, কিভাবে আপনাকে সবচেয়ে ভালভাবে সেবা করতে পারি?" চকিতে উত্তর দিয়েছিলেন স্বামীজী, "ভারতবর্ষকে ভালবাস।" কিন্তু সেদিনকার পরাধীন অনুন্নত ভারতকে সেবা করার জন্য যে মানসিক প্রস্তুতি দরকার সে সম্বন্ধে সাবধান করে দিয়ে স্বামীজী ভারতে আসার ব্যাপারে জো-কে লিখেছিলেন, "হ্যাঁ, আসতে পার, যদি দেখতে চাও আবর্জনাস্তূপ, অবনতি, দারিদ্র্য, আর কটিমাত্রবস্ত্রাবৃত সন্ন্যাসীর মুখে ধর্মের বাণী। যদি অন্য কিছু চাও তবে এসো না। আমরা আর একটিও সমালোচনা সহ্য করতে রাজী নই।"

বিনা দ্বিধায় প্রথম জাহাজেই জো ভারতে এসে হাজির হয়েছিলেন স্বামী সারদানন্দজী এবং ধীরামাতা মিসেস্ ওলিবুলকে সঙ্গে নিয়ে ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের প্রথম দিকে। আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন স্বামীজী অতিথিদ্বয়কে এবং অল্প কয়েকদিন পরে ভগিনী নিবেদিতা, জো এবং ধীরামাতাকে নিয়ে নিজেই বেরিয়ে পড়েছিলেন ভারত-দর্শনে। এ ভ্রমণের অবিস্মরণীয় স্মৃতি ভগিনী নিবেদিতা লিখে রেখেছেন তাঁর 'Notes on Wanderings' গ্রন্থে। ভারতকে যদি সেবা করতে হয় তবে তার রীতিনীতি, জীবনধারণ সব কিছুকে স্বীকার করে নিয়ে সেবিকার মতো সেবা করতে হবে, কিছুই ভাঙ্গা চলবে না—এই ছিল পাশ্চাত্য অনুরাগীদের প্রতি স্বামীজীর কঠোর আদেশ। তাই কাশ্মীরে যেদিন জো স্বামীজীর ভক্ত আলাসিঙ্গার কপালে বৈষ্ণব-তিলক দেখে অবজ্ঞাসূচক উক্তি করেছিলেন, তৎক্ষণাৎ দৃপ্তভাষায় তিরস্কার করে স্বামীজী বলেছিলেন, "চুপ কর। তুমি আমার জন্যে এমন কি করেছ?" তিরস্কারের প্রচণ্ডতায় জো সেদিন কেঁদে ফেলেছিলেন। পরে আলাসিঙ্গার অতুলনীয় গুরুভক্তির পরিচয় পেয়ে জো বুঝেছিলেন কেন স্বামীজী তাঁর প্রিয় শিষ্যের প্রতি সামান্য অবজ্ঞাতেও এত গভীরভাবে মর্মাহত হয়েছিলেন।

ভারতে এসে আর একবার স্বামীজীর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসার সুযোগ পেলেন জো। এবার দৃশ্যপট পরিবর্তিত—রিজ্‌লী নয়, গঙ্গাতীরের বেলুড় মঠ; স্বামীজীর শত আশা- ও স্বপ্ন-বিজড়িত জগদ্ধিতায় উৎসর্গীকৃত শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ। মঠের পাশে একটি পুরানো বাড়ী নতুন করে সারিয়ে নিলেন জো এবং ধীরামাতা। এ বাড়ীটিই পরবর্তীকালে মঠের লেগেট হাউস্ নামে সুপরিচিত। সম্মুখে প্রবহমাণ ভাগীরথী, সকাল-সন্ধ্যায় স্বামীজীর দিব্যসান্নিধ্য, মন্দিরে পূজা, আরতি, ধ্যান, গভীর দার্শনিক চিন্তা, আর অদূর ভবিষ্যতে বিশ্বজুড়ে স্বামীজী-প্রবর্তিত নূতন যুগধর্মপ্রচারের স্বপ্ন—এ সবের মাঝখানে

২১ Late and Soon, p. 241

এক নূতন জীবনের আস্বাদ পেলেন জো। মঠের সন্ন্যাসীরা হয়ে উঠলেন আপন জন, স্বামীজীর মঠটি হয়ে উঠল যাযাবর জো-র জীবনের সবচেয়ে স্থায়ী ঠিকানা যা স্বামীজীর মহাপ্রয়াণের পর থেকে জো-র জীবনের শেষদিন পর্যন্ত অপারবর্তিত ছিল।

বিবেকানন্দ-সান্নিধ্যে যে বেলুড় মঠ হয়ে উঠেছিল দিব্য আনন্দের বাসস্থল, তাঁর তিরোধানে তাই হয়ে উঠেছিল Tantine-এর ধ্যানক্ষেত্র। গেস্ট হাউসের দোতলায় প্রায় প্রতি শীতে এসে হাজির হতেন বৃদ্ধা তাঁর পৃথিবী ভ্রমণ শেষ করে। মঠবাসের দিনগুলো হয়ে উঠত কথায়, কাজে, চিন্তায়, ধ্যানে আর স্মৃতিচারণে বিবেকানন্দময়। বিশ্বাসের প্রচণ্ডতায় আর প্রেমের গভীরতায় স্বামীজীকে নতুন করে বাঁচিয়ে তুলতেন জো। সেদিনকার স্বল্প-পরিসর মঠের সন্ন্যাসীদের কাছে জো ছিলেন স্বামীজীর দূত। জো-র সান্নিধ্যে এসে *স্বামীজীর শক্তির এক জীবন্ত প্রকাশকেই* অনুভব করতেন সকলে; সরলতা, সপ্রেম ব্যবহার, তেজস্বিতা এবং কিছুটা রাজকায় ধরনের চালচলন নিয়ে বৃদ্ধা Tantine স্বামীজীর স্মৃতিকথায় মশগুল করে রাখতেন নবীন অনুরাগীদের; কখনও বা কোন নবীন সন্ন্যাসী যখন জো-কে অনুরোধ জানিয়েছেন স্বামীজীর কথা বলবার জন্য, অনুভূতির তীব্রতাকে গোপন করে উত্তর দিতেন বৃদ্ধা, "তোমরা কি বুঝবে স্বামীজীকে? তোমরা তো এখনও পরাধীন জাতি, স্বামীজীকে আমরাই বুঝেছি।"

মঠের পরিবেশে জো-র জীবনধারণও ছিল কিছুটা স্বতন্ত্র ধরনের। স্বামীজীর সময়কার ভাবেই থাকতে চাইতেন জো। পাশ্চাত্যবাসীরা এসে যাতে থাকতে পারেন, এ উদ্দেশ্যে মঠের গেস্ট হাউসটি নিজের অর্থানুকূল্যে তৈরি করিয়েছিলেন জো। নবনির্মিত এই গৃহে বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা হবে, জো কিন্তু কিছুতেই রাজী নন। স্বামীজী কি মঠে বৈদ্যুতিক আলো দেখে গিয়েছিলেন? নিজের প্রয়োজন না হলেও অপরের প্রয়োজন হতে পারে—এ কথা বুঝিয়ে দিতেই বৃদ্ধা আবার রাজী হয়েছিলেন। কিন্তু শর্ত হয়ে রইল তাঁর নিজের ঘরে কখনও বৈদ্যুতিক আলো জ্বলবে না, জ্বলবে তেলের প্রদীপ। তাই ব্যবস্থা হল। কিন্তু এক উৎসবের দিনে জনৈক ব্রহ্মচারী গিয়েছেন সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে Tantine-এর খোঁজে। আবছা অন্ধকারে ঘরে কাউকে না দেখে জ্বালিয়ে ফেলেছেন বৈদ্যুতিক আলো, সঙ্গে সঙ্গে তুমুলকাণ্ড বাঁধিয়ে দিয়েছিলেন জো এই অমার্জনীয় অপরাধের তীব্র প্রতিবাদ করে।[২২]

## নীরব কর্মী

সেদিনকার ক্রমবিস্তারশীল রামকৃষ্ণ মিশনের কার্যে গৌরব বোধ করতেন বৃদ্ধা ট্যান্টিন। স্বামীজীর আরব্ধ সেবাব্রতের আদর্শে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে গড়ে উঠেছে অনেক মঠ, মিশন, বহু শিক্ষাকেন্দ্র, সেবাসঙ্ঘ স্বামীজীরই অনুপ্রাণিত ত্যাগী সন্ন্যাসিবৃন্দের আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে। বৃদ্ধা পরিষ্কার দেখতেন স্বামীজীর স্বপ্নের ভারত গড়ে উঠছে, বেলুড় মঠে থেকে একটি চিঠিতে এ আনন্দের অভিব্যক্তি করে লিখেছিলেন, "ভারতবর্ষ সমৃদ্ধ হচ্ছে—এটি দেখা এবং এ কাজে মুক্তভাবে সাহায্য করা—এই হল আমার কাজ। আর এ কাজ আমার কতখানিই না প্রিয়! সংসার-অরণ্যের মাঝখান থেকে এই অগ্নিময় অনুপ্রাণিত সেবকদল কেমন করে নতুন মুক্তির পথ

২২ জনৈক প্রাচীন সন্ন্যাসি কথিত

তৈরি করছে··।”[২৩] মঠের ত্যাগী সন্ন্যাসীদের মধ্যে বৃদ্ধা জো নবযুগের পথপ্রদর্শকদেরই দেখতে পেতেন। আর তাঁদের পশ্চাতে থেকে নীরবে সর্বপ্রকার সাহায্য করাই ছিল জো-র পক্ষে স্বামীজীর সেবার সমতুল। মিশনের দল-মত-জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সেবাব্রতের বিভিন্ন কর্মপদ্ধতিতেই জো কেবল অনুপ্রেরণাই দেননি, অনেক সময় প্রথম আর্থিক সাহায্য এবং দেশী-বিদেশীকে সংঘের তথা ভারতের দিকে শ্রদ্ধান্বিত করে বিভিন্ন সময়ে প্রভূত সাহায্য করেছেন। জো-র প্রদত্ত ৮০০ ডলার দিয়েই স্বামীজী শুরু করতে পেরেছিলেন রামকৃষ্ণসংঘের বাংলা মুখপত্র 'উদ্বোধন'। আমেরিকায় স্বামীজীর প্রচারের জন্য তাঁর জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ, ভক্তিযোগ, রাজযোগ এবং দেববাণী ( Inspired Talks )-কে একত্র করে তিনটি খণ্ডে প্রকাশ করেছিলেন জো স্বীয় অর্থানুকুল্যে এবং একনিষ্ঠ আগ্রহে।[২৪] একবার মঠের জমির ওপর দিয়ে রেললাইন বসানোর ব্যবস্থা করেন তৎকালীন ইংরেজ সরকার। এ অভাবনীয় ব্যবস্থায় সেদিনকার মঠের যে বিপন্ন অবস্থার উদ্ভব হয়, তার থেকে উদ্ধারের ব্যবস্থা করেন বৃদ্ধা ট্যান্টিন্‌। বিলাতের লেডী স্যাণ্ডউইচ ( ইনিই পূর্বে বেটি ম্যাক্‌লাউডের কন্যা, স্বামীজীর প্রিয় আলবার্টা নামে পরিচিতা ছিলেন )-এর সঙ্গে যোগাযোগ করে বিলাতের সরকারের মারফত এ ব্যবস্থা বর্জন করান জো।

মনীষী রোঁমা রোঁলার প্রতি ভারতবাসীমাত্রেই চিরকৃতজ্ঞ থাকবে, কারণ তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের দুটি অমর জীবনীগ্রন্থ রচনা করে পাশ্চাত্যের সুধীজনকে শ্রদ্ধান্বিত করেছিলেন ভারতের সনাতন আধ্যাত্মিকতার প্রতি। কিন্তু সবার অলক্ষ্যে এই সাহিত্যসৃষ্টির পেছনে রোঁমা রোঁলাকে সবচেয়ে বড় অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন নীরব ভারতপ্রেমিক 'জো'।[২৫] আরও কতভাবে যে এই মহানুভবা বিদেশিনী স্বামীজীর সংঘ তথা ভারতবর্ষের জন্য সাহায্য করেছেন তার বহু তথ্য আজও পাওয়া যাবে সংঘের প্রাচীন সন্ন্যাসীদের কাছে। আজও তাঁরা জো-র কথা বলতে গিয়ে গভীর শ্রদ্ধায় অনুপ্রাণিত না হয়ে থাকতে পারেন না।

## 'চিরকালের জো'

বিবেকানন্দগতপ্রাণা বিদেশিনী এই বৃদ্ধার শেষ জীবনের বৈরাগ্যোজ্জ্বল, আনন্দময় মুহূর্তগুলি কেটেছে মঠের তাঁর প্রিয় গেস্ট হাউসটিতে, গঙ্গার ধারে স্বামীজীর সমাধিমন্দিরের অদূরে এই গেস্টহাউসের দোতলায় বসে জো লিখেছিলেন, "গেস্ট হাউসের ওপরের দুটো ঘর নিয়ে আমি অনেকখানি ফাঁকা জায়গা আর প্রাচুর্যের মধ্যে আছি। এমন প্রাচুর্যের স্বপ্নও আমি কোনদিন দেখিনি। অনাড়ম্বরের প্রাচুর্য—কোন আসবাবপত্রের যত্ন নিতে হয় না—শুধু একটি চায়ের সেট্‌। রকমারি জিনিসপত্রের বোঝা আর নেই। এটা করতে হবে, ওটা দেখতে হবে—এ সব ভাবনা হাওয়ায় উড়ে গিয়েছে। তবুও আমি কখনও নিঃসঙ্গ বোধ করি না···স্বর্গের পবিত্র আনন্দের জন্য মানুষকে এ দেহ ত্যাগ করতে হয় না।”[২৬]

নিউইয়র্কের প্রথম দর্শনের দিনটির পর থেকে যে নবজীবনে পদার্পণ করেছিলেন

২৩ Remlninscences, p. 251
২৪ Vedanta and the West, p. 29 ( Jan. Feb. 1950 )

২৫ Vadanta and the West, Jan-Feb., 1950. P. 29.

২৬ Reminiscences, P. 251

জোসেফিন, তারই শেষ পরিণতি এই বৈরাগ্যোজ্জ্বল ধ্যানময় নিঃসঙ্গ ঈশ্বরসান্নিধ্যের আর পবিত্র আনন্দের দিনগুলিতে। স্বামীজীই তাঁর কাছে সত্যস্বরূপ, প্রেমস্বরূপ। আর স্বামীজীর চিন্তাতেই তিনি একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন ধ্যেয় বস্তুর সঙ্গে। এই একাত্মবোধের রূপটি বড় সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে মহাপ্রয়াণের মাত্র দিন কুড়ি আগে (১৪ই জুন, ১৯০২) জো-কে লেখা স্বামীজীর একটি চিঠিতে। সম্ভবতঃ এইটিই স্বামীজীর কাছ থেকে পাওয়া শেষ চিঠি। স্বামীজী লিখছেন, "আমাদের জীবনে এত অভিজ্ঞতা হয়ে গেছে যে আমরা এখন আর ওর বুদ্বুদ-গুলিতে আকৃষ্ট হই না, তাই নয় কি জো? ...মা তার পথ করে নেবেন। তবে তোমাকে ও আমাকে একযোগে তিনি এই সংসার-সমুদ্রে ফেলে দিয়েছেন এবং একসঙ্গেই আমাদিগকে ভেসে চলতে হবে বা ডুবে মরতে হবে। আর নিশ্চিত জেনো—এতে কেউ বাধা দিতে পারবে না।"

স্বামীজীর কথাই সত্যি হয়েছিল। পরবর্তী জীবনে এই একাত্মবোধটি আরও গভীরতর ভাবেই জো-র জীবনে প্রতিফলিত হয়েছিল, সমাজের দেশের আত্মীয়স্বজনের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের কোন আকর্ষণই জো-কে স্বামীজীর ধ্যান আর তাঁর আরব্ধ কাজ থেকে টেনে নিতে পারেনি। বরং আরও প্রাণপণে আঁকড়ে ধরেছিলেন জো এই সত্যদ্রষ্টার আদর্শকে। জো-র নিকটতম আত্মীয়া বেটির কন্যা ফ্রান্স তাই বিস্ময়ে লিখেছিলেন, "জো সম্পূর্ণভাবে 'স্বামীজীময়' হয়ে গিয়েছিলেন।"[২৭]

এই একাত্মবোধটি অটুট ছিল বৃদ্ধার জীবনের শেষমুহূর্ত পর্যন্ত। "হাসপাতালে যারা দায়-সারা দিনে দুঘণ্টা কাজ করে চলে যান" তাদের মাঝখানে মরবার অনিচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন জো; চেয়েছিলেন শেষমুহূর্ত পর্যন্ত ভক্তসান্নিধ্যে থাকতে, জো-র এ ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছিল। দেহরক্ষার মাস ছয়েক আগে ১৯৪৯ সালের বসন্তে একানব্বই বছরের বৃদ্ধা একদিন তাঁর নিউইয়র্কের বাড়ী চিরদিনের মত ছেড়ে হাজির হয়েছিলেন হলিউড বেদান্ত-কেন্দ্রের আশ্রমে; বলেছিলেন, "I have come home to die"[২৮] অর্থাৎ "আমি মরবার জন্য নিজের বাড়ী এসেছি," বৃদ্ধার শেষ দিনগুলো কেটেছিল হলিউডের স্বামীজীর ব্যবহৃত এবং বহুপূতস্মৃতিবিজড়িত বাড়ীটিতে যেখানে পঞ্চাশ বছর আগে ১৮৯৯ সালে জো-র অনুরোধেই স্বামীজী প্রথম এসেছিলেন বেদান্ত-প্রচারের জন্য। বিবেকানন্দস্মৃতিবিজড়িত, তীর্থস্বরূপ এই বাড়ীটিতে ১৯৪৯ সালের ১৫ই অক্টোবর একানব্বই বছরের স্বামীজীগতপ্রাণা মহানুভবা নারী যেদিন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন সেদিন তাঁর পাশে ছিলেন হলিউড আশ্রমের বিবেকানন্দ-প্রেমিক সন্ন্যাসী ও ও ভক্তবৃন্দ।

রামকৃষ্ণের নরেন, সপ্তর্ষির ঋষি বিবেকানন্দ, আর পবিত্রস্বভাবা মহানুভবা জো—এ দুই মহাপ্রাণের সংযোগ বিবেকানন্দ-জীবনের এক স্মরণীয় অধ্যায়। জো-র স্বামীজী ছিলেন মুক্তিদাতা[২৯] যুগপুরুষ; আর স্বামীজীর জো ছিলেন "মঙ্গলময় দেবদূত," "সাদাসিদে ও স্নেহময়ী জো, আমাদের চিরকালের আপনার জো"।[৩০]

---

২৭ Late and Soon P. 238

২৮ Vedanta and the West, Jan-Feb. 1950, P 30

২৯ স্বামীজীর পত্র, ১৪ই জুন, ১৯০২

৩০ " ১৫ই মে, ১৯০২

# দুই আর এক

অধ্যাপক অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতীয় দর্শনের দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদের কথা ঠিক বলা হচ্ছে না এখানে; সেজন্য 'দুই আর এক' নাম দেওয়ার প্রয়োজন হল। সাধারণ মানুষদের তো বটেই, এমন কি ডাকসাইটে পণ্ডিতদেরও, দুই আর এক নিয়ে কলহ চলে আসছে আবহমান কাল। যেখানে দুই বলে প্রতীয়মান হচ্ছে তাও যে মূলতঃ এক, তা একটু ভেবে দেখলেই অনুধাবন করা যায়। তাতে অনেক অপ্রয়োজনীয় অবাঞ্ছিত বিসংবাদও দূর করে দেওয়া যায়। কিন্তু আমরা এমনই আংশিক দৃষ্টিতে বিশ্বাসী ও মুগ্ধ যে, সহজ বিষয়ে অনাবশ্যক জটিলতার আমদানী করি। কয়েকটি সাধারণ দৃষ্টান্ত নিলে বক্তব্য পরিষ্কার হবে মনে হয়।

গরম ও ঠাণ্ডা দুটি স্বতন্ত্র নাম। সাধারণভাবে এরা পরস্পর বিপরীতার্থক। একই সময়ে যেটা গরম সেটা ঠাণ্ডা নয় বা যেটা ঠাণ্ডা সেটা গরম নয়। সুতরাং তারা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। কিন্তু বাস্তবিকই কি তারা তাই? তারা কি সত্যিই দুটি আলাদা জাত? বেশি ভাবতে হয় না; সহজেই ধরা পড়ে যে, তাপমাত্রার পার্থক্যকেই আমরা ঠাণ্ডা-গরম বলছি। কখনো কখনো এই মাত্রার এত পার্থক্য হতে পারে যে, শ্রেণীগত পার্থক্য বলেই অনুভূত হবে। যেমন, জল বরফ ও জলীয় বাষ্প। দেখতে, শুনতে ও ফলাফলে এদের প্রভাব জীবজগতে নিঃসন্দেহে আলাদা। কিন্তু এও আমরা সবাই জানি (খুব বেশি বিজ্ঞানের জ্ঞানের দরকার হয় না) যে, একই বস্তু তাপমাত্রার পার্থক্যে কখনো জল, কখনো বরফ, কখনো বা জলীয় বাষ্প হচ্ছে (এখন স্কুলের নিম্নশ্রেণীর ছাত্ররাও freezing p int ও boiling point কত তাপমাত্রায় তা জানে)। সুতরাং জল ও বরফ আসলে দুই নয়, এক। অনুরূপভাবে বরফ ও জলীয় বাষ্প দুই নয়, এক। দুই হয়েও দুই নয়, বহু হয়েও বহু নয়; মূলে এক। নিশ্চয়ই একথা স্বীকার্য—"The difference of deg ee may be so great as it may appear to be almost a difference in kind." কিন্তু মানুষের বৈশিষ্ট্য যখন 'মত্বা কর্মাণি সীব্যন্তি' অর্থাৎ পরিণাম বিচার করে যে কাজ করতে পারে সেই মানুষ, তখন তাকে appearanceও জানতে হবে, realityও জানতে হবে। অর্থাৎ জল, বরফ ও জলীয় বাষ্প আলাদা কেন তাও জানতে হবে, তেমনই জানতে হবে যে, মূলতঃ তারা এক। তাহলেই পুরো জানা হল; নতুবা অর্ধদৃষ্টি, অর্ধসত্য ও তার বিড়ম্বনা অনিবার্যভাবে দেখা দেবে।

আর একটি অতি সাধারণ দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক। অদৃষ্ট ও পুরুষকার এই দুই নিয়ে দ্বন্দ্ব কতকাল ধরে যে চলে আসছে, তার হিসেব নেই। এখনো চলছে, ভবিষ্যতেও চলবে। কারণ মানুষের প্রবণতা দ্বন্দ্বের দিকে। Pair of opposites সে অনেক সময় ইচ্ছে করেই তার মনে রাখে, কারণ তাতে তার সহজাত জিগীষা ও জিঘাংসা অনেকাংশে চরিতার্থ হয়। অদৃষ্ট (বা দৈব) ও পুরুষকার নিয়ে সুন্দর সুন্দর গল্প আছে ভারত ও ভারতের বাইরে। এখনো হামেশাই রচিত হচ্ছে।

সেই সব গল্পের মূল সুর কিন্তু একই—এরা দুটি পরস্পরবিরোধী। কিন্তু তাই কি? 'অদৃষ্ট' কথাটি তো খুব সার্থক বলেই মনে হয়। আক্ষরিক অর্থে 'ন দৃষ্ট' অর্থাৎ যা আগে থাকতে দেখা যায়নি। এমন তো কাজ অহরহই হচ্ছে, যার ফল ফলতে দেরী হয় এবং ফল যখন ফলে তখন ধরা যায় না যে, ঐ পূর্বতন কর্মের জন্যই ফলটি ফলেছে। জন্মান্তরের কথা ছেড়েই দিলাম, কারণ সবাই ওতে বিশ্বাস করেন না। কিন্তু এক জীবনের মধ্যেই এমন সব ঘটনা ঘটে যা অদৃষ্ট বলে প্রতিভাত হয়। কোন সঙ্গত কারণ খুঁজে না পেলেই তা অদৃষ্টের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হয়। ছোট একটি উদাহরণ দিচ্ছি (এরকম উদাহরণ Neurologist, Psychiatristদের কাছে অজস্র জমা পড়ছে নিত্য)। একটি লোক খুব নিয়ম-মাফিক জীবনযাত্রা নির্বাহ করেন, ভাল উপায় করেন, নিটোল স্বাস্থ্যের অধিকারী, বছর পঞ্চান্ন বয়েস। হঠাৎ কিছুর মধ্যে কিছু নেই—তার পা দুটো ক্রমশঃ আড়ষ্ট হয়ে যেতে থাকল, ক্রমে আরো উঁচুতে কোমর পর্যন্ত, শেষে হাতও ধরল। বহু চিকিৎসায়ও কিছু ফল হচ্ছে না। রোগী শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছেন--অদৃষ্টের হাতে সঁপে দিয়েছেন নিজেকে এবং মৃত্যুর জন্য দিন গুণছেন। ভাবছেন (যদি সনাতনী হিন্দু হন), পূর্বজন্মের কোন কর্মদোষেই তার এই অদৃষ্ট। এখন মনে করা যাক, কোনো ভাল Neurologist তাকে দেখছেন। হাসপাতালে ভরতি করিয়ে myelography (মায়েলোগ্রাফি) করালেন এবং তাতে ধরা পড়ল যে, তার spinal column-এ meningial fluid-এ obstruction হচ্ছে বলেই এই পক্ষাঘাত। মেরুদণ্ডের হাড়ের একটা অতি ক্ষুদ্র অংশ বহুকাল আগে ভেঙে গিয়েছিল এবং তাই কালক্রমে (ভগ্ন অংশটি সামান্য মোটা হয়ে যাওয়াতে) স্নায়ু-মণ্ডলীর কাজকে ব্যাহত করাতে এই দুরবস্থা। রোগীকে ডাক্তার জিজ্ঞেস করলেন যে, তিনি কোনো দিন উঁচু থেকে পড়ে গিয়েছিলেন কিনা। রোগী প্রথমতঃ সরাসরি বলে বসলেন, 'না'। ডাক্তার তাকে সময় দিলেন চিন্তা করতে। দিন-দুয়েক বাদে রোগী স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে ডাক্তারকে বললেন, তার বছর-দশেক বয়সের সময় তিনি বেশ উঁচু একটা পেয়ারা গাছ থেকে পড়ে গিয়েছিলেন। তখন পিঠে খুব জোর চোট পেয়েছিলেন, কিন্তু মালিশ-টালিশ করাতে কয়েকদিন বাদেই ব্যথা কমে যায়। আর কোন উপসর্গ দেখা দেয়নি কখনো। তাই একদম ভুলেই গিয়েছিলেন; এখন অনেক চিন্তার পর স্মরণে আনতে পেরেছেন। কিন্তু তার সঙ্গে এই পক্ষাঘাতের কি সম্পর্ক? ডাক্তারের উত্তর হল, সম্পর্ক একেবারে অঙ্গাঙ্গী। তিনি এখন সঠিক কারণ খুঁজে পেয়েছেন এবং একটা ছোট অপারেশন করলে রোগী সম্পূর্ণ সেরে যাবেন। হলও তাই। তখন ডাক্তার রোগীকে সব খুলে বললেন কি হয়েছিল তার। এখন যিনি পুরোপুরি অদৃষ্টবাদী, তিনি বলবেন পড়ে যাওয়াটাও অদৃষ্ট। আর যিনি পুরুষকারে বিশ্বাসী, তিনি বলবেন পেয়ারার লোভে বাচ্চা ছেলে গাছে উঠেছিল—পা ফস্‌কে পড়ে যায় নীচে; বহুকাল বাদে তার পরিণাম হয় পক্ষাঘাত। এভাবে দেখলে চিরকালই অদৃষ্ট ও পুরুষকার আলাদা বলে মনে হবে; তারা স্বরূপতঃ ভিন্ন বলে মনে হবে। কিন্তু আর একদিক থেকে দেখলে দ্বন্দ্ব ঘুচে যায়। মানুষের জীবনে কর্ম আছে, তার ফলও আছে। কোন ফল হাতে হাতেই পাওয়া যায়; কোন

ফল পেতে দেরী হয়; এমন দেরীও হতে পারে যাতে কর্মটির সঙ্গে ফলটি যুক্ত করা সাধারণ বুদ্ধিতে কুলিয়ে ওঠে না—তখনই অদৃষ্টের দোহাই দেওয়া হয়। উপরের দৃষ্টান্ত তারই একটি নমুনামাত্র। আসলে একই বিষয়ের এপিঠ আর ওপিঠ হচ্ছে অদৃষ্ট ও পুরুষকার। পূর্বতন পুরুষকারের না-বুঝতে-পারা ফলকেই অদৃষ্ট বলতে পারি। সামগ্রিক বিচারে পুরুষকারেরই অদৃষ্ট, আবার অদৃষ্টেরই পুরুষকার। যেমন, পেয়ারা গাছে চড়ারূপ পুরুষকারের অদৃষ্ট হল পক্ষাঘাত; আর পক্ষাঘাতরূপ অদৃষ্টের পুরুষকার হল উপযুক্ত চিকিৎসা। কারণ কার্য, ফল একসূত্রে গাঁথা।

আরও একটি দীর্ঘস্থায়ী দ্বৈতের দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক। শিল্পকর্মের আঙ্গিক (art form) বড, না বিষয়বস্তু (art content) বড—এই নিয়ে বিদগ্ধ বিতণ্ডা সাহিত্যিক ও দার্শনিক আলোচনায় বহুকাল ধরে চলে আসছে। কেউ বলেছেন, আঙ্গিকই বড, বিষয়বস্তু গৌণ; কেউ-বা ঠিক উল্টোটা বলেছেন অর্থাৎ বিষয়বস্তুই বড, আঙ্গিক গৌণ। চরমপন্থীরা আরো এককাঠি ওপরে গিয়ে বলেছেন, আঙ্গিকই সব অথবা বিষয়বস্তুই সব। এই দ্বন্দ্বের আজও নিবৃত্তি হয়নি। যতদিন বিশ্লেষক-সমালোচকের এই দাবীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে ততদিন এ দ্বন্দ্ব থাকবেই। কিন্তু সার্থক শিল্পকর্মমাত্রই আঙ্গিক ও বিষয়বস্তুর এক বিস্ময়কর সমন্বয়, একথা নিরপেক্ষ বিচারে মানতেই হবে। উপযুক্ত বিষয়বস্তুবিহীন সুন্দর আঙ্গিক কি সত্যিই সম্ভব? সম্ভব হলেও তার মূল্য মাকাল ফলের বেশি নয়। উপযুক্ত আঙ্গিক ছাড়া কি সুন্দর বিষয়বস্তু ঠিক ঠিক প্রকাশিত হয় শিল্পকর্মে? প্রকাশিত হলেও তা' সার্থক শিল্পকর্ম হয় না; হয়ে ওঠে টেলিফোন গাইড বা দৈনিক সংবাদপত্র বা বড়জোর পরীক্ষার খাতার প্রবন্ধ। Art বা শিল্পকর্মের form বা আঙ্গিকও যেমন দরকার, content বা বিষয়বস্তুও তেমনই দরকার। এই দুইয়ে মিলিয়ে শিল্পকর্ম, কোনোটাকে বাদ দিয়ে নয়। কে বড, কে ছোট; কে মুখ্য, কে গৌণ—এ প্রশ্ন অবান্তর। আর এই অবান্তরকে নিয়েই আমাদের যত ঝগডা।

আলো ও অন্ধকার, দিন ও রাত্রি, ধর্ম ও অধর্ম, পাপ ও পুণ্য, ন্যায় ও অন্যায়—এরূপ বহু pair of opposites নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করা চলে। আমাদের সীমিত দৃষ্টিতে আমরা এদেরকে দুই বিপরীত মেরুতে স্থাপিত করে আলোচনা করি এবং তা' যথেষ্ট স্বাভাবিকও। ব্যবহারিক দিক থেকে এর প্রয়োজনও রয়েছে। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে যে, এর কোন জোড়াই দুটি স্বতন্ত্র সত্তা নিয়ে গঠিত নয়। একটি মুদ্রার যেমন দুটি পার্শ্ব; কিন্তু মুদ্রা একটিই। অনুরূপভাবে, অন্ধকারের কোলে আলো শোভা পায় আর আলোর বৈপরীত্যে অন্ধকার ঘনায়মান হয়। এখানে একেরই দুই, আবার দুইয়ে মিলিয়ে এক। দ্বৈত যেমন সত্য, অদ্বৈতও তেমনই সত্য। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর পূর্ণ, অখণ্ড, অপ্রতিরোধ্য দৃষ্টিতে বুঝি তাই দেখেছিলেন, "যাঁর নিত্য তাঁরই লীলা, যাঁর লীলা তাঁরই নিত্য।" কখনো মনে হবে গাছেরই বীজ, কখনো বা মনে হবে বীজেরই গাছ। আবার পূর্ণকে যখন উপলব্ধি করা যায় তখন দেখা যায় গাছও যে, বীজও সে। জীবন ও মরণকে উপনিষদের ঋষি এই শেষোক্ত দৃষ্টিতেই দেখেছেন—দুটি আলাদা কিছু ব্যাপার নয়, যাঁর ছায়া জীবন, তাঁরই রকমফের ছায়া হচ্ছে মরণ।

এই দৃষ্টিতে একই ( অদ্বৈত ) সত্য, দুই বা বহু ( দ্বৈত ) তার ছায়ামাত্র।

আর একটি দ্বৈত সংক্ষেপে আলোচনা করে এই ক্ষুদ্র রচনা সমাপ্ত করব। পাশ্চাত্য দর্শনে ভাববাদ ( Idealism ) ও বস্তুবাদ ( Materialism ) এর দ্বন্দ্ব বহুকাল ধরে চলে আসছে। আমাদের দেশেও ছিল এবং আছে। হাল আমলে বহু দেশে বস্তুবাদেরই প্রাবল্য। ভাববাদ-বস্তুবাদে মুখ দেখাদেখি পর্যন্ত নিষেধ। কিন্তু কতটা যুক্তিসহ এই দৃষ্টিভঙ্গী তা' বিচার করে দেখা প্রয়োজন। ভাববাদের মূলকথা হল, মনই সব; তার অবর্তমানে বস্তুজগতের কোন সত্তাই নেই। মন-নিরপেক্ষ কোন বস্তুই নেই; মন আছে বলেই বস্তু আছে, জীবজগৎ আছে। মনের লয়ে ওদেরও লয়। আর বস্তুবাদের মূলকথা হল বস্তুই সব, মন বলে আলাদা কিছু নেই-ই মোটে। যাকে মন বলা হয় তা' তো মস্তিষ্ক নামক বস্তুপিণ্ডের ক্রিয়া। একদল বলছেন, মনই সব, বস্তু নেই। আর একদল বলছেন, বস্তুই সব, মন নেই। দুই দর্শনের চরম রূপ হল এই। সমন্বয়ের চেষ্টা যে কখনো হয়নি তা' নয়; তবে বিরোধকে জীইয়ে রাখার চেষ্টাই হয়েছে বেশি। ফল হয়েছে মারাত্মক —সহিষ্ণুতা গিয়েছে কমে, বিবাদ গিয়েছে বেড়ে। সংকীর্ণতা এত দৃঢ়নিবদ্ধ হয়েছে মানবমস্তিষ্কে ও হৃদয়ে যে, দুই দুই-ই থেকে যাচ্ছে; বস্তুতঃ দুই যে একেরই দুইদিক মাত্র তা' একবারও মনে উদিত হচ্ছে না। গীতাতে মনকে ইন্দ্রিয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে ধরা হয়েছে। পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়কে যে ইন্দ্রিয় সংহত করে, সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করে তারই নাম মন। এও বস্তু, তবে এত সূক্ষ্ম যে, অন্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য না হলেই তার অনস্তিত্ব প্রমাণিত হয় না। কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতাই প্রমাণের মাপকাঠি হলে তো পরমাণু, নিউট্রন, পজিট্রন, ইলেকট্রনের অস্তিত্ব নেই; অস্তিত্ব নেই নভোমণ্ডলের বহু নক্ষত্রমণ্ডলীর; অস্তিত্ব নেই পৃথিবীর বহু ভৌগোলিক বিবর্তনের, এমনকি আমাদের বহু পূর্বপুরুষদেরও। সুতরাং সুস্থ মানসিকতা বলবে মন আর বস্তুকে স্বতন্ত্র দুটি শ্রেণীতে না ফেলে একই বস্তুর সূক্ষ্মরূপ ( এতো সূক্ষ্ম যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয় ) ও স্থূলরূপ বলে ধরলে বিরোধের নিরসন হয়। ভাববাদ ও বস্তুবাদ একই ভুয়োদর্শনের দুই শাখামাত্র মনে করা চলে তখন। যেমন, 'ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা' বললে পুরো বলা হল না; 'জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ' ওর সঙ্গে জুড়ে দিতেই হবে। নতুবা বলাও হয় আংশিক; বিরোধও লেগে থাকে নিত্য।

দুই যে দুই নয়, আসলে এক তা' কি করে জানা যাবে? একমাত্র সত্যসন্ধ বিজ্ঞানী দৃষ্টিলাভের নিরন্তর প্রয়াস করলে হবে, নচেৎ নয়—বিবাদের পথে নয়, আপসের পথে, স্বামীজী যাকে বলেছেন, অনন্ত পবিত্রতা, অনন্ত ধৈর্য, অনন্ত অধ্যবসায়, সর্বোপরি প্রেম—তাই থাকলে হবে; নিশ্চয়ই জানা যাবে যে, একই দুই বা বহু হয়ে আছেন। কবির ( রবীন্দ্রনাথ ) ভাষায় বলা যায়—

"বাজে বাজে রম্যবীণা বাজে—
অমলকমল-মাঝে, জ্যোৎস্নারজনী-মাঝে,
কাজলঘন-মাঝে নিশি-আঁধার-মাঝে
... ...
প্রেমে প্রেমে বাজে॥
...

... ...
জন্মমরণ নাচে, যুগযুগান্ত নাচে,
ভকতহৃদয় নাচে, বিশ্বছন্দে মাতিয়ে—
... ॥"

একই রম্যবীণা নিখিলবিশ্ব জুড়ে বাজছে—আমরা দেখছি বহু, শুনছি বহু।

# ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী

## স্বামী অচিন্ত্যানন্দ

ব্রহ্মসূত্রে (১।৩।২৬) বাদরায়ণ মুনি স্থির করিয়াছেন যে, ব্রহ্মজ্ঞানে কেবল যে মনুষ্যের অধিকার আছে তাহা নহে, তাঁহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জীব দেবতাদেরও ইহাতে অধিকার আছে। আচার্য শঙ্কর এই সূত্রের ভাষ্যে লিখিয়াছেন, '...ন তু মনুষ্যানেবেতীহ ব্রহ্মজ্ঞানে নিয়মোঽস্তি। তেষাং মনুষ্যাণামুপরিষ্টাদ্ যে দেবাদয়স্তানপ্যধিকরোতি শাস্ত্রমিতি বাদরায়ণ আচার্যো মন্যতে।' অর্থাৎ 'ব্রহ্মজ্ঞানে যে কেবল মনুষ্যের অধিকার—এমন কোন নিয়ম নাই। মনুষ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যে দেবতারা তাঁহাদিগকেও অধিকার শাস্ত্র দিয়াছেন, ইহা আচার্য বাদরায়ণ মনে করেন।' কারণ আচার্য শঙ্কর তাঁহার উক্ত ভাষ্যে বলিতেছেন, 'বিকারবিষয়বিভূত্যনিত্যত্বালোচনাদিনিমিত্তম্।' অর্থাৎ তাঁহাদের 'স্ব স্ব বিভূতিসকল বিকারপ্রাপ্ত হয়; সে-সকল অনিত্য এইরূপ আলোচনা (দেবতাদের) মনে উঠিতে পারে।' মনে ঐশ্বর্যাদিবিষয়ে অনিত্যত্ববুদ্ধি হইলে বৈরাগ্য হয়, বৈরাগ্য হইলে নিত্যবস্তু-ব্রহ্মবিষয়ে প্রশ্ন, সে বিষয়ে সাধনা ও শেষে ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার হয়। আচার্য শঙ্কর তাঁহার ভাষ্যে আরও বলিয়াছেন, 'মন্ত্রার্থবাদেতিহাসপুরাণলোকেভ্যো বিগ্রহবত্ত্বাদ্যবগমাৎ।' অর্থাৎ 'বেদ, অর্থবাদ, ইতিহাস, পুরাণ এবং লোকেদের নিকট হইতে জানা যায় যে, দেবতাদের শরীর আছে।' শরীর থাকিলেই তাহার ধ্বংস আছে—এই কথা মনে করিয়া দেবতাদের নিত্যবস্তু ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারের ইচ্ছা হওয়া স্বাভাবিক। এই সাক্ষাৎকারের জন্য বেদ হইতে ব্রহ্মবিদ্যা তাঁহারা শিক্ষা করিতে পারেন। এ-বিষয়ে উপনয়নবিধি তাঁহাদের পথরোধ করিতে পারে না। এই ভাষ্যে সেই জন্য আচার্য বলিয়াছেন, 'নচোপনয়নশাস্ত্রেণৈষামধিকারো নিবর্তেত, উপনয়নস্য বেদাধ্যয়নার্থত্বাৎ। তেষাঞ্চ স্বয়ম্প্রতিভাতবেদত্বাৎ।' অর্থাৎ উপনয়নশাস্ত্রের বিধি উল্লেখ করিয়া উপনয়নপূর্বক বেদ-অধ্যয়ন-বিধি, দেবতাদের উপনয়ন হয় না, এই জন্য তাঁহাদের বৈদিক ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা করিবার অধিকার নাই—এ কথা বলা যায় না, কারণ দেবতাদের নিকট বেদ স্বয়ম্প্রকাশ,' কাজেই তাঁহারা ইচ্ছা করিলেই সে বিদ্যা আয়ত্ত করিতে পারেন।

তাছাড়া উপনয়নাদিগ্রহণের কথাও আছে। এবিষয়ে আচার্য শঙ্কর এই সূত্রের ভাষ্যে বলিয়াছেন, 'অপিচ এষাং বিদ্যাগ্রহণার্থং ব্রহ্মচর্যাদি দর্শয়তি'—অর্থাৎ 'দেবতাদেরও উপনয়নগ্রহণপূর্বক ব্রহ্মবিদ্যাশিক্ষার জন্য ব্রহ্মচর্য-অবলম্বনের কথা শাস্ত্রে আছে।' যথা—'একশতং হ বৈ বর্ষাণি মঘবান্ প্রজাপতৌ ব্রহ্মচর্যমুবাস' (ছান্দোগ্য উপনিষদ ৮।১১।৩)। 'ভৃগুর্বৈ বারুণিঃ। বরুণং পিতরমুপসসার। অধীহি ভগবো ব্রহ্ম।' (তৈত্তিরীয়োপনিষদ—৩।১)। অর্থাৎ 'ব্রহ্মবিদ্যালাভার্থ ইন্দ্র একশত বৎসর প্রজাপতির নিকট ব্রহ্মচর্য অবলম্বনপূর্বক বাস করিয়াছিলেন।' (ছা- ৮। ১১৩)। আরও আছে, 'ভৃগু স্বীয় পিতা বরুণের নিকট গিয়া বলিয়াছিলেন, হে ভগবন্! আমায় ব্রহ্মবিদ্যা অধ্যয়ন করান। (তৈ—৩।১)।

এই সকল শ্রুতিবাক্য হইতে দেবতাদের বিধিপূর্বক ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করিয়া অর্থাৎ উপনয়নগ্রহণের পর আচার্যগৃহে বাসপূর্বক বেদবিদ্যা ও বেদ হইতে ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিয়া ব্রহ্মজ্ঞানের সাধনার কথা পাওয়া যায়। ঋষিদেরও ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার আছে, এই কথা আচার্য শঙ্কর এই সূত্রের ভাষ্যে বলিয়াছেন, যথা— ন ঋষীণামার্ষেয়ান্তরাভাবান্', 'ন ইতি ভৃগ্বাদীনাং ভৃগ্বাদিসগোত্রতয়া।' অর্থাৎ—'ঋষিদের অন্য ঋষিকোগোত্র নাই বলিয়া যাগযজ্ঞাদি কর্মে অধিকার নাই, কিন্তু সে জন্য ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার নাই বলা যায় না। ঋষিদের যাগযজ্ঞাদি করিবার প্রয়োজন নাই, এই জন্য ভৃগু প্রভৃতি ঋষিদের (অন্য ঋষি) গোত্র থাকিবার প্রয়োজন নাই। ব্রহ্মবিদ্যালাভ গোত্র না থাকিলেও হইতে পারে।

আচার্য্য বাদরায়ণ বলিয়াছেন, 'পশ্বাদিব্যক্তিবদ্দেবাদিব্যক্তয়োঽপি সন্তত্যোবোৎপদ্যের-ন্নিরুধ্যেরংশ্চ' (ব্রহ্মসূত্রভাষ্য, ১।৩।৩০) অর্থাৎ 'মনুষ্য পশু প্রভৃতির যেমন প্রবাহাকারে জন্মমৃত্যু হয়, দেবতা ঋষি প্রভৃতিরও সেইরূপ জন্ম ও মৃত্যু হয়।' এই জন্ম-মৃত্যুর হাত হইতে মুক্তিলাভ করিতে গেলে ব্রহ্মজ্ঞান আবশ্যক, তাহার জন্য ব্রহ্মবিদ্যা প্রয়োজন, তাহার জন্যই বেদ-অধ্যয়ন দেবতা এবং ঋষিদিগকেও করিতে হয়।

ব্রহ্মা, হিরণ্যগর্ভ, ঈশ্বর প্রভৃতির বিষয়ে এই (১।৩।৩০) সূত্রের ভাষ্যে আচার্য শঙ্কর বলিয়াছেন, 'অতীতকল্পানুষ্ঠিতপ্রকৃষ্টজ্ঞান কর্মণামীশ্বরাণাং হিরণ্যগর্ভাদীনাং বর্তমানকল্পাদৌ প্রাদুর্ভবতাং পরমেশ্বরানুগৃহীতানাং ···কল্পান্তরব্যবহারানুসন্ধানোপপত্তিঃ।' অর্থাৎ 'যাঁহারা পূর্বকল্পে উৎকৃষ্টতম জ্ঞান ও কর্ম (পুণ্য) বা অদৃষ্ট (সৎকর্মফল) অর্জন করিয়াছিলেন, তাঁহারা পরমেশ্বরানুগ্রহে ঈশ্বর, হিরণ্যগর্ভ প্রভৃতি রূপে প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন। সুতরাং তাঁহাদের কল্পান্তরীয় ব্যবহার (জন্মান্তরের কথা) স্মরণ হওয়া অসম্ভব নহে।' 'তথাচ শ্রুতিঃ—যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্বং যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ। তং হ দেবমাত্মবুদ্ধিপ্রকাশং, মুমুক্ষুর্বৈ শরণমহং প্রপদ্যে' (শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ ৬।১৮)। শ্রুতিও বলিয়াছেন, 'যিনি ব্রহ্মার জন্মদান করিয়াছেন, যিনি বেদ (ব্রহ্মাকে) প্রদান করিয়াছেন, মুক্তিলাভ করিতে ইচ্ছুক আমি সেই আত্মজ্ঞানপ্রকাশক দেবতার (পরব্রহ্মের) আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি।' ইহা হইতে ব্রহ্মারও জন্ম হয়, ইহা জানা যাইতেছে। জন্ম হইলে তাঁহারও জন্মান্তরের কথা স্মরণ হয়। ব্রহ্মা, হিরণ্যগর্ভ, ইঁহাদের জন্ম হয় অতএব মৃত্যু হয়, জন্মান্তর আছে। সুতরাং তাঁহাদের এই জন্মমৃত্যুর হাত হইতে নিষ্কৃতিলাভের জন্য ব্রহ্মজ্ঞানের প্রয়োজন আছে, সেই উদ্দেশ্যে ব্রহ্মবিদ্যা, বেদবিদ্যার আবশ্যক। তাঁহারা সে-সকল লাভও করিয়া থাকেন। কাজেই দেখা যাইতেছে তাঁহাদের সে সবে অধিকার আছে। এই কথাই ব্রহ্মসূত্রে বলা হইয়াছে। যথা, 'ভাবন্তু বাদরায়ণোঽস্তি হি' (ব্রহ্মসূত্র—১।৩।৩৩) অর্থাৎ দেবতাদের ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার আছে, ইহা বাদরায়ণ মুনি মনে করেন। ইহার ভাষ্যে শঙ্করাচার্য বলিয়াছেন, 'বাদরায়ণস্ত্বাচার্যো ভাবমধিকারস্য দেবাদীনামপি মন্যতে' অর্থাৎ বাদরায়ণাচার্য মনে করেন, দেবতাদেরও ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার আছে। এই দেবতাদের মধ্যে যেমন ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ, বায়ু প্রভৃতিকে গ্রহণ করা হইয়াছে, তেমনি ব্রহ্মা, হিরণ্যগর্ভ, ঈশ্বর ইঁহাদিগকেও

লাওয়া হইয়াছে। আচার্য শঙ্কর তাঁহার ভাষ্যে শ্রুতি উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন, "তদ্ যো যো দেবানাং প্রত্যবুধ্যত স এব তদভবৎ তথর্ষীণাং তথা মনুষ্যাণাম্" ( বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ ১।৪।১০ )। অর্থাৎ 'যে-যে দেবতা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন, সেই-সেই দেবতা তাহাই অর্থাৎ ব্রহ্মই হইয়া যান, ঋষিদের মধ্যে এইরূপ হয়, মনুষ্যদের মধ্যেও এইরূপই হয়।' ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইলে দেবতারা—ব্রহ্মজ্ঞানী ঋষি ও মনুষ্যের ন্যায়ই ব্রহ্ম হইয়া যান।

ব্রহ্মজ্ঞানলাভের ইচ্ছা যেমন মনুষ্যের হয়, সেইরূপ দেবতাদেরও হয়। এই বিষয়ে আচার্য শঙ্কর শ্রুতি হইতে প্রমাণ দিয়াছেন, "তে হোচুর্হন্ত তমাত্মানমন্বিচ্ছামো যমাত্মানমন্বিষ্য সর্বাংশ্চ লোকানাপ্নোতি সর্বাংশ্চ কামানিতিন্দ্রো··· ।" ( ছান্দোগ্য উপনিষদ্ ৮।৭।২ )। অর্থাৎ, 'সেই দেবতারা বলিলেন, আমরা সেই আত্মার অন্বেষণ করিব—যে-আত্মার অন্বেষণ করিলে যাবতীয় লোক ও যাবতীয় কাম্যবস্তু প্রাপ্ত হওয়া যায়।' এখানে আত্মা বলিয়া পরমাত্মার কথাই বলা হইতেছে। সর্বব্যাপী পরমাত্মা যাবতীয় লোক ও কাম্যবস্তু ব্যাপিয়া আছেন; সেই পরমাত্মাকে পাইলে লোক-ও কাম্যবস্তুসকল প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই জন্য তাঁহার অন্বেষণ দেবতারা করিতেছেন।

ব্রহ্মজ্ঞানলাভের জন্য দেবতাদের সন্ন্যাসগ্রহণের কথাও শ্রুতিতে আছে—যথা, "ইন্দ্রো হৈব দেবানামভিপ্রবব্রাজ" ( ছান্দোগ্য উপনিষদ্—৮।৭।২ )। অর্থাৎ 'দেবতাদের মধ্যে ( দেবরাজ ) ইন্দ্র ব্রহ্মজ্ঞানলাভার্থে সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়াছিলেন।'

ব্রহ্মজ্ঞানে দেবতাদের অধিকার আছে—ইহা আচার্য শঙ্কর বলিতেছেন ( পূর্বোক্ত ১।৩।৩৩ সূত্রের ভাষ্যের শেষের দিকে )—"তস্মাদুপপন্নো মন্ত্রাদিভ্যো দেবাদীনাং বিগ্রহবত্ত্বাদ্যবগমঃ। ততশ্চার্থিত্বাদিসম্ভবাদুপপন্নো দেবাদীনামপি ব্রহ্মবিদ্যায়ামধিকারঃ।" অর্থাৎ 'শ্রুতির বিভিন্ন মন্ত্র হইতে জানা যায় দেবতাদের শরীর আছে, সেই জন্য তাঁহাদের ব্রহ্মজ্ঞানের প্রার্থী হওয়া সম্ভব—সেই কারণে শ্রুতিবাক্য হইতে তাঁহাদের ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার আছে এবং ব্রহ্মজ্ঞানের সাধনার জন্য তাঁহারা চেষ্টা করিতেছেন—ইত্যাদি যাহা পাওয়া যায় সে-সকল যুক্তিযুক্ত।

দেবতাদের ন্যায় গন্ধর্বদের ব্রহ্মজ্ঞানে অধিকার আছে—এই কথা আচার্য শঙ্কর ব্রহ্মসূত্রের ( ১।৩।৩৩ ) ভাষ্যে একস্থানে বলিয়াছেন, যথা, "স্মার্তমপি চ গন্ধর্বযাজ্ঞবল্ক্যসংবাদাদি"—অর্থাৎ 'স্মৃতিতে কথিত গন্ধর্ব-যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদ হইতে জানা যায় গন্ধর্বদেরও ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার আছে।'

যাঁহারা বৈদিক সংহিতা ও ব্রাহ্মণের মন্ত্র দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারা ঋষি; তাঁহাদেরও ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার আছে—একথাও আচার্য শঙ্কর ঐ পূর্বোক্ত সূত্রের আর এক স্থানে বলিয়াছেন। যথা, "ঋষীণামপি মন্ত্রব্রাহ্মণদর্শিনাং সামর্থ্যম্" অর্থাৎ 'সংহিতা ও ব্রাহ্মণের মন্ত্রদর্শনকারী ঋষিদেরও ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার আছে।'

অসুরদেরও ব্রহ্মজ্ঞানে অধিকার আছে—ইহা আচার্য শঙ্কর শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন, যথা—"ইন্দ্রো হৈব দেবানামভিপ্রবব্রাজ বিরোচনোঽসুরাণাম্" ( ছান্দোগ্যোপনিষদ—৮।৭।২ )। অর্থাৎ 'দেবরাজ ইন্দ্র ও অসুররাজ বিরোচন ব্রহ্মজ্ঞানলাভার্থ সন্ন্যাসগ্রহণ করিলেন।' এখানে রাজা বলিয়া ইন্দ্রের বা বিরোচনের অপর সকল দেবতা ও অসুর হইতে কোন বৈশিষ্ট্য নাই—ইহা দেখাইবার জন্য শ্রুতি বলিয়াছেন, "ইন্দ্রো হৈব দেবানাম্"

"দেবতাদের মধ্যে ইন্দ্র" অর্থাৎ ইন্দ্র অপর দেবতাদের ন্যায়ই একজন দেবতা। সেইরূপ বিরোচন যে অপর অসুরদের ন্যায়ই একজন অসুর ইহা দেখাইবার জন্য শ্রুতি বলিয়াছেন, "বিরোচনোঽসুরাণাম্", অর্থাৎ, 'অসুরদের মধ্যে বিরোচন।'

"তৌ হাসংবিদানাবেব সমিৎপাণী প্রজাপতি-সকাশমাজগ্মতুঃ"। (ছান্দোগ্য—৮।৭।২) পূর্বোক্ত শ্রুতির শেষে এই অংশ আছে। ইহার অর্থ—'তাঁহারা পরস্পরকে সংবাদ না দিয়াই সমিধ হস্তে লইয়া প্রজাপতির নিকট উপস্থিত হইলেন।' সংবাদ না দিয়া অর্থাৎ পরামর্শ না করিয়া, একে অপরের দ্বারা অনুরুদ্ধ না হইয়া। দুই জনেরই সমান অধিকার, এইজন্য একে অপরের সহায়তানিরপেক্ষ হইয়া গমন করিলেন। ইহা হইতে সিদ্ধ হইতেছে, ইন্দ্র-প্রমুখ দেবতাদের যেমন অধিকার, অসুরদেরও সেইরূপ অধিকার থাকায় অসুরদের মধ্য হইতে বিরোচন ইন্দ্রের ন্যায় একই আচার্য প্রজাপতির নিকটে ব্রহ্মজ্ঞানলাভার্থে, ব্রহ্মবিদ্যা বেদবিদ্যা শিক্ষার উদ্দেশ্যে শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে গেলেন।

উক্ত শ্রুতিভাগে ইহার পরের মন্ত্রে আছে— "তৌ হ দ্বাত্রিংশতং বর্ষাণি ব্রহ্মচর্যমূষতুঃ" (ছান্দোগ্য—৮।৭।৩) "তাঁহারা, ইন্দ্র ও বিরোচন বত্রিশ বৎসর (প্রজাপতির নিকটে) ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করিয়া (বেদমন্ত্রশ্রবণ ও শিক্ষা এবং গুরুসেবাদি ব্রত অবলম্বন করিয়া) বাস করিলেন।' পরে আছে, "তৌ হ প্রজাপতি-রুবাচ কিম্ ইচ্ছন্তৌ অবাস্তম্ ইতি" (ছা ৮।৭।৩)। 'তোমরা কোন্ অভিলাষে এখানে এতদিন বাস করিলে—এই কথা প্রজাপতি ইন্দ্র এবং বিরোচনকে জিজ্ঞাসা করিলেন।' অর্থাৎ 'এতদিন তোমরা বেদমন্ত্রও শ্রবণ করিলে। আর কি চাই?' উত্তরে 'তাঁহারা বলিলেন, যে-আত্মা স্বরূপতঃ নিষ্পাপ, যিনি জরা-মৃত্যু-শোক-ক্ষুধা-বর্জিত ও পিপাসারহিত, যিনি সত্যকাম সত্যসঙ্কল্প, তাঁহারই অন্বেষণ করিবে, তাঁহাকেই জানিতে চাহিবে।' এই উপদেশ আছে—'যে সেই আত্মাকে আচার্য ও শ্রুতি হইতে জানিতে পারে, সে যাবতীয় লোক জয় করে, তাহার সর্বাভীষ্ট সিদ্ধ হয়।' এই কথাও আছে—'এই উপদেশ ও কথা আপনারই, ইহা আমরা জানি। সেই আত্মার সাক্ষাৎকারের ইচ্ছায় এতদিন বাস করিতেছি।' (ছান্দোগ্য—৮।৭।৩)। আমরা এখানে মন্ত্রের অর্থ দিলাম। এই মন্ত্র হইতে পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে যে, ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মজিজ্ঞাসা, ব্রহ্ম-বিদ্যা, বেদপাঠ, ব্রহ্মচর্য, আচার্যগৃহবাস, উপনয়ন ইত্যাদি বিষয়ে দেবতা ইন্দ্র ও অসুর বিরোচন উভয়ের সমান অধিকার। স্বয়ং প্রজাপতি সে-অধিকার দিতেছেন। এখানে মন্ত্রভাগ, যাহার অর্থ পূর্বে দেওয়া হইল, সুন্দর। যথা— "তৌ হোচতুর্য আত্মাঽপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্বি-শোকো বিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ, সোঽন্বেষ্টব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ স সর্বাংশ্চ লোকানাপ্নোতি সর্বাংশ্চ কামান্ যস্তমাত্মানমনুবিদ্য বিজানাতীতি ভগবতো বচো বেদয়ন্তে তমিচ্ছন্তাববাস্তমিতি" (ছান্দোগ্যোপনিষৎ—৮।৭।৩)।

প্রজাপতি দেবতা ইন্দ্র ও অসুর বিরোচনের ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিবার সমান অধিকার বলিয়া উভয়ের আচার্যত্ব স্বীকার করিয়াছেন, নিজের গৃহে ব্রহ্মচর্য অবলম্বনপূর্বক আচার্যগৃহবাস করিতে দিয়াছেন। তাহার পূর্বে উভয়ের উপনয়ন-সংস্কার করাইয়াছেন, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। ব্রহ্মচর্য-সময়ে উভয়কে বেদপাঠ করাইয়াছেন, ইহাও বেশ বোঝা যায়। এখন ব্রহ্মজ্ঞান-

লাভার্থে উভয়ে ব্রহ্মবিদ্যার অন্বেষণ করিতেছেন জানিয়া আচার্য প্রজাপতি সেই বিদ্যার উপদেশ দিতে লাগিলেন। যথা, "তৌ হ প্রজাপতিরুবাচ য এষোঽক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যতে এষ আত্মেতি হোবাচৈতদমৃতমভয়মেতদ্ ব্রহ্মেত্যথ যোঽয়ং ভগবোঽপ্সু পরিখ্যায়তে যশ্চায়মাদর্শে কতম এষ ইত্যেষ উ এবৈষু সর্বেষ্বন্তেষু পরিখ্যায়ত ইতি হোবাচ" ছান্দোগ্যোপনিষৎ ৮।৭।৪ )। অর্থাৎ 'উভয়কে (ইন্দ্র ও বিরোচনকে) প্রজাপতি বলিলেন, এই যে চক্ষুর মধ্যে পুরুষকে দেখা যায়, ইনিই আমার কথিত আত্মা, ইনিই অমৃত অভয়, ইনিই ব্রহ্ম। ( তখন উভয়ে প্রশ্ন করিলেন ), হে ভগবন! যাঁহাকে জলে দেখা যায়, আর যাঁহাকে দর্পণে দেখা যায় ইহার মধ্যে কোন্‌টি তিনি ( ব্রহ্ম )। উত্তরে প্রজাপতি বলিলেন, ইনিই ( ব্রহ্মই ), ( চক্ষু, জল, দর্পণ ইত্যাদি ) সকলের মধ্যে ( প্রতিবিম্বরূপে ) দৃষ্ট হন।"

এই প্রশ্ন-প্রতিবচন হইতে দেখা যায়, আচার্য প্রজাপতি দেবতা ইন্দ্র ও অসুর বিরোচনকে একই প্রকারের অন্তেবাসী ( আচার্যগৃহে অবস্থানকারী শিষ্য ) বলিয়া গ্রহণ করিতেছেন।

আমরা দেখিলাম, দেবতা গন্ধর্ব ঋষি ও অসুরদের ব্রহ্মজ্ঞানে সমান অধিকার আছে।

[ ক্রমশঃ ]

# প্রতীক্ষা

ডক্টর মতিলাল দাশ

আমারে তুমি করিবে শুচি সোনার মতো আগুনে জ্বালি
গড়িবে তুমি নূতন করি তোমার মতো ছাঁচে ঢালি !
　　তোমার গড়া আমার লাগি
　　জীবনে সদা রহিব জাগি
প্রদীপশিখা অমল রবে আঁধার এলে বিজন ঘরে,
নিশীথ রাতে যদি বা কভু এস হে কাছে করুণাভরে।

গরবে মম হৃদয় নাচে ললাটে আঁকা তোমার টীকা
আঁধার মম ভবন মাঝে জ্বলিছে আগমনীর শিখা।
　　তোমারে অতি আপন জানি
　　আঁকড়ি আছি তোমার বাণী
পুলকে তাই কাঁপিছে হিয়া, কাঁপিছে হিয়া পরম সুখে
জানি হে জানি হে মোর প্রিয়, আমারে তুমি নেবে যে বুকে।

# স্বামী বিবেকানন্দের অনুবাদ গ্রন্থ ঃ 'শিক্ষা'

[ পূর্বানুবৃত্তি ]

অধ্যাপক প্রণবরঞ্জন ঘোষ

'শিক্ষা' গ্রন্থের প্রথম অধ্যায় 'সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান কি?' এ সম্বন্ধে আলোচনা-প্রসঙ্গে প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতিতে জীবনোপযোগী শিক্ষার প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী যে আদিম নরনারীর মতোই বসনের অপেক্ষা ভূষণের বেশী পক্ষপাতী, সেকথা বোঝাতে গিয়ে স্পেন্সার যা বলেছেন, স্বামীজীর ভাষায় তার অনুবাদ —"সমুদ্র-যাত্রীরা দেখিতে পান যে, অসভ্যেরা রঞ্জিত কাচখণ্ড অথবা সামান্য ক্রীড়া-অলঙ্কারের প্রতি মূল্যবান ক্যালিকো অথবা বনাত অপেক্ষা সমধিক সমাদর প্রদর্শন করে এবং কামিজ অথবা কোর্তার তাহারা যে প্রকার হাস্যাস্পদ ব্যবহার করে, তদ্দ্বারা প্রয়োজন অপেক্ষা ভূষণ যে তাহাদের সম্পূর্ণ মনোনীত, ইহা স্পষ্ট উপলব্ধি হয়।"[১]

মূল গ্রন্থের ভাষা—"Voyagers find that coloured beads and trinklets are much more prized by wild tribes, than are calicoes or broadclothes And the anecdotes we have of the ways in which, when shirts and clothes are given, savages turn them to some ludicrous display, show how completely the idea of ornament predominates over that of use."[২]

'শিক্ষা' সম্বন্ধে এই ব্যবহারিক ও আলঙ্কারিক প্রয়োজনের তুলনামূলক চিন্তার দৃষ্টান্ত অবশ্য আমরা রাজা রামমোহনের চিন্তাধারাতে এর আগেই পাই। রামমোহন এক্ষেত্রে প্রভাবিত হয়েছিলেন বেকনের দ্বারা। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দের ১১ই ডিসেম্বর তারিখে লর্ড আমহার্স্ট'কে লেখা এই বিখ্যাত পত্রটি আধুনিক ভারতের শিক্ষা-চিন্তার ইতিহাসে অন্যতম দিক-নির্দেশক। তদানীন্তন সরকার বহু অর্থ-ব্যয়ে সংস্কৃত কলেজ-স্থাপনে উদ্যোগী হলে রামমোহন সংস্কৃত-শিক্ষার উপকারিতার কথা জেনেও আধুনিক কালের সঙ্গে তরুণ শিক্ষার্থীদের পরিচিত করবার জন্য বিজ্ঞান-ভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থার দাবী জানিয়েছিলেন লর্ড আমহার্স্টে'র কাছে। প্রাসঙ্গিকবোধে রামমোহনের এই পত্রটির অংশবিশেষ উদ্ধৃত করছি[৩]—"দেখতে পাচ্ছি, বর্তমানে সারা-দেশে অনুসৃত ও প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতির প্রসারের জন্যই সরকার এখন হিন্দু পণ্ডিতদের

১ শিক্ষা: স্বামী বিবেকানন্দ; বসুমতী সংস্করণ (মুদ্রাকর: শ্রীশশিভূষণ দত্ত) পৃঃ ২। এ পর্যন্ত 'শিক্ষা' বইটির যে কটি মুদ্রিতরূপ হাতের কাছে পেয়েছি, তার কোনটিতেই প্রকাশের তারিখ নেই এবং বইটি যে মৌলিক রচনা নয়, অনুবাদ - সে কথাও উল্লেখিত নেই। অবশ্য বিবেকানন্দ-জীবনী-পাঠকদের কাছে এ অনুবাদের কথা সুবিদিত। যদি নিঃসংশয়ে প্রমাণিত প্রথম সংস্করণ পাওয়া যায়, তাহলেই বোঝা যাবে, এ গ্রন্থ কখনো অনুবাদরূপে এর আগে পরিচায়িত হয়েছিল কি না।

২ Education: Intellectual, Moral and Physical by Herbert Spencer, 1861, Edition [ First Edition ]; p. 1.

৩ মূল পত্রটির জন্য The Life and Letters of Raja Rammohan Roy: Sophia Dobson Collet [ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ সংস্করণ, ১৯৬২ ] পৃঃ ৪৫০ দ্রষ্টব্য। অনুবাদ লেখককৃত।

অধীনে একটি সংস্কৃত-বিদ্যালয়-স্থাপনে উদ্যোগী হয়েছেন। এ প্রতিষ্ঠানটি (লর্ড বেকনের আগেকার আমলের ইউরোপীয় শিক্ষায়তন-গুলির মতো) তরুণদের শুধু কেবল ব্যাকরণ ও দর্শনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম চর্চা ও বিচারের দিকেই নিয়ে যাবে—যে ধরনের শিক্ষা তাদের নিজেদের বা সমাজের বিশেষ কোনো কাজেই লাগবে না। ভারতবর্ষের সর্বত্র যে ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত—দু'হাজার বছর আগে-কার লব্ধ বিদ্যা এবং অর্থহীন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচারের টীকাভাষ্যের ধারা—এই জাতীয় বিদ্যাই ছাত্রেরা সেখানে (সংস্কৃত কলেজে) পাবে।"

বলা বাহুল্য, রামমোহন নিজে সংস্কৃতে সুপণ্ডিত বলেই শাস্ত্র-অনুবাদ ও শাস্ত্র-বিচারে অসাধারণ নৈপুণ্য দেখাতে পেরেছিলেন। তবু সংস্কৃতে আবদ্ধ প্রাচীন জ্ঞানের ধারা ও পদ্ধতি—এ দুয়ের সম্বন্ধেই তাঁর মনে প্রশ্ন জেগেছিল। সমকালীন য়ুরোপের তরুণেরা গণিত, রসায়ন, শারীরবিদ্যা, প্রকৃতি-বিজ্ঞান প্রভৃতিতে যে দক্ষতা অর্জন করতো, রামমোহন তাঁর স্বদেশীয় তরুণদের মধ্যে সেই প্রয়োজন-মূলক শিক্ষাবিস্তারের পক্ষপাতী ছিলেন। সুতরাং ইংরেজ সরকার যেন শিক্ষাব্যবস্থার আধুনিকীকরণের জন্যই প্রধানত: অর্থব্যয় করেন—এই ছিল রামমোহনের আকাঙ্ক্ষা।

বেকনের যুগ থেকেই ইংল্যাণ্ডের শিক্ষা-ব্যবস্থায় এই আধুনিক যুগের সূচনা। উন-বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি, স্বামীজীর জন্মের প্রায় দু'বছর (মে, ১৮৬১) আগে লণ্ডনে বসে হার্বার্ট স্পেন্সার শিক্ষাপ্রসঙ্গে যে চিন্তা-রাশি লিপিবদ্ধ করছিলেন, তা বেকনের চিন্তাধারারই পরিণত ফল। এর মধ্যে ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন হয়েছে। স্পেন্সারের পরি-কল্পিত বিজ্ঞান-কেন্দ্রিক শিক্ষার প্রসার অবশ্য ইংল্যাণ্ডের শিক্ষাব্যবস্থাতেও ঠিক তাঁর ইচ্ছানুযায়ী হয়নি। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক থেকেই বৈজ্ঞানিক মনোভাবের প্রেরণা ইংল্যাণ্ডের মারফত ভারতীয় শিক্ষিত সমাজে অনেক পরিমাণে ছড়িয়ে পড়েছে। হিন্দুকলেজের প্রথম যুগের ছাত্রবৃন্দের মধ্যে রাধানাথ সিকদার, প্যারীচাঁদ মিত্রের সঙ্গে সমকালীন অক্ষয়কুমার দত্তের কথা আমাদের বিজ্ঞানচিন্তার ইতিহাসে সুবিদিত।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যাহ্নলগ্নে বিজ্ঞান-চেতনার প্রসারিত পটভূমিকায় হার্বার্ট স্পেন্সার বিজ্ঞানকেই জীবনের প্রধান প্রয়োজনীয় ও যথার্থ শিক্ষার বিষয় মনে করেছেন। জীবনধারণ ও জীবনযাপনের বিভিন্ন দিক পর্যালোচনার দ্বারা স্পেন্সার যে সিদ্ধান্তে উপনীত, স্বামীজীর ভাষায় তার অনুবাদ—"দেখিলাম, আমরা যাহা নির্ধারণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, যে শিক্ষার সর্বাপেক্ষা উপ-যোগিতা অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, সে প্রশ্নের সকল দিক হইতে একমাত্র উত্তর আসিল—বিজ্ঞান। যদি জীবন সুনিয়মে রক্ষা করিতে হয়, তবে শিক্ষা কর—বিজ্ঞান। যদি জীবিকানির্বাহরূপ অপরোক্ষ প্রাণরক্ষা শিক্ষা করিতে হয়, শিক্ষা কর—বিজ্ঞান। যদি সমাজের একটি প্রকৃত অঙ্গ হইতে চাও, তবে শিক্ষা কর—বিজ্ঞান। যদি প্রাণ-বিমোহন সঙ্গীত-শিল্পাদি শিখিতে চাও, তবে শিক্ষা কর—বিজ্ঞান।"[৪]

স্পেন্সারের মূল গ্রন্থ 'Education'-এর ভাষা—"Thus to the question we set out with—what knowledge is of most

৪ 'শিক্ষা': পৃ: ৪৫

worth?—the uniform reply is—Science. This is the verdict on all the counts. For direct self-preservation, on the maintenence of life and health, the all important knowledge is—Science. For that indirect self-preservation which we call gaining a livelihood, the knowledge of greatest value is—Science. For the due discharge of parental functions, the proper guidance is to be found only in—Science. For that interpretation of national life, past and present, without which the citizen cannot rightly regulate his conduct, the indispensable key is—Science. Alike for the most perfect production and highest enjoymet of art in all its forms, the needful preparation is still—Science. And for the purpose of discipline—intellectual, moral, religious—the most efficient study is, once more—Science"[৫]

মূল ইংরাজীর সঙ্গে স্বামীজীর অনুবাদ মেলালেই দেখা যাবে প্রয়োজনবোধে স্বামীজী স্পেন্সারের বক্তব্যকে সংক্ষেপিত করেছেন। আবার স্পেন্সারের ভাষাভঙ্গীর প্রাঞ্জলতা, উপস্থাপনা ও গতিবেগ—এ সবই স্বামীজীর গদ্যভঙ্গীতে যথাযথভাবে রূপায়িত। দার্শনিক বক্তব্যের অনুবাদে স্বামীজীর এই নৈপুণ্য তাঁর অনুবাদকালীন বয়ঃসীমার কথা মনে রাখলে বিস্ময়কর বৈ কি। সেই সঙ্গে এও বলা চলে যে, ভাষার সামান্য পরিবর্তনেই আধুনিক পাঠকের কাছে আর এ অনুবাদকে খুব দূরের জিনিস বলে মনে হবে না। স্বামীজীর নিজস্ব ভাষাভঙ্গীর বিবর্তনের ইতিহাসে এই অনুবাদ-গ্রন্থের ভাষা বিশেষভাবেই স্মরণীয়। আবার পরবর্তীকালে মননশীল গদ্যরীতির প্রবর্তনায় স্বামীজীর নৈপুণ্য যে স্বাভাবিক, এই অনুবাদের স্বচ্ছতা ও গভীরতা তার ইঙ্গিতবহ।

কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারে এই 'শিক্ষা'-গ্রন্থটির যে সংস্করণটি আছে, তা জাতীয় গ্রন্থাগারের তালিকা অনুসারে ১৯১৭ সালের। বইয়ের সূচনায় বা অন্য কোথাও কোনো তারিখ নেই। যদি প্রথম সংস্করণ হয়ে থাকে, তাহলে বলতে হয় প্রথম থেকেই বইটি যে অনুবাদ সেকথা বলা হয়নি। কিন্তু স্বামীজীর জীবিতকালে প্রকাশিত কোনো গ্রন্থে এমন অনুল্লেখ অসম্ভব। বিশেষতঃ স্বামীজী যখন স্পেন্সারের লিখিত অনুমতি নিয়েই এ অনুবাদ করেন। তাই মনে হয়, জাতীয় গ্রন্থাগারের বইটি পরবর্তী কোনো সংস্করণ। গ্রন্থাগারের তালিকায় উল্লেখিত '১৯১৭'—বইটি গ্রন্থাগারের তালিকাভুক্ত হওয়ার কাল এবং ঐ বৎসরে প্রকাশিত সংস্করণ হতে পারে॥

তরুণমননের উৎসাহে স্পেন্সারের এই বিজ্ঞানসর্বস্বতা স্বামীজী তাঁর অনুবাদের মাধ্যমে যেভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন, তাতে এমন মনে হতে পারে যে, স্বামীজী একদা নিজেও এজাতীয় মতে বিশ্বাস করতেন। কিন্তু স্পেন্সারের সমগ্র গ্রন্থটি পড়লে মনে হয়, আধুনিক শিক্ষাচিন্তার জগতে এই বইটির বিশেষ গুরুত্বের কথা উপলব্ধি করেই স্বামীজী অনুবাদে ব্রতী হয়েছিলেন। গ্রন্থকারের সমস্ত বক্তব্য সমর্থন করাই তাঁর অভিপ্রেত নাও হতে পারে। কিন্তু যেহেতু এ গ্রন্থের কোনো সংস্করণেই এ পর্যন্ত স্বামীজীর স্ব-লিখিত কোনো ভূমিকা পাওয়া যায়নি, সেজন্য অনুমান ছাড়া এ বিষয়ে কোনো নিশ্চিত সিদ্ধান্ত অসম্ভব। আর একটি বিষয়ও লক্ষণীয়। মূল গ্রন্থে স্পেন্সারের নিজস্ব ভূমিকাও স্বামীজীর

৫ 'Education': Herbert Spencer: p. 53

অনুবাদগ্রন্থে অনুপস্থিত। অবশ্য প্রথম সংস্করণে ছিল কি না, তা বলা যাচ্ছে না।

জগৎ ও জীবনের সর্ব বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত করে স্পেন্সার বিজ্ঞানের যে ব্যাপক তাৎপর্য আবিষ্কার করেছেন, তা কিছু পরিমাণে যান্ত্রিক মনে হলেও, অনেক ক্ষেত্রেই গভীরভাবে প্রণিধানযোগ্য। উত্তরকালে স্বামী বিবেকানন্দ বেদান্ত ও বিজ্ঞানের যে নিগূঢ় ঐক্য উপলব্ধির দ্বারা চারুকলা, বিজ্ঞান ও ধর্মের অন্তর্নিহিত সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন, সেই চিন্তাধারায় স্পেন্সারের প্রভাব কিছু পরিমাণে কার্যকরী, এ কথা বোধ হয় বলা চলে।

বন্ধু ও গুরুভ্রাতা উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় যদি 'শিক্ষা'-গ্রন্থের প্রথম প্রকাশক হয়ে থাকেন, তাহলে শ্রীরামকৃষ্ণ-সান্নিধ্যের দিনগুলিতে (পিতৃবিয়োগের পরে) অথবা সন্ন্যাসজীবনের সূচনায় এই অনুবাদগ্রন্থটি স্বামীজী লিখেছেন। এই সময়ে বিজ্ঞানের সর্বময় আধিপত্য মেনে নেবার কোনো কারণই স্বামীজীর ছিল না। সেই সঙ্গে এও স্মরণীয়, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানমাত্রকেই বৈজ্ঞানিক প্রতিপন্ন করার হাস্যকর চেষ্টাও স্বামীজী কখনো করেননি। এ বিষয়ে যথার্থ বৈজ্ঞানিকের মতো নিরপেক্ষ অথচ আগ্রহী অনুসন্ধিৎসুর ভাবই স্বামীজীর চরিত্রলক্ষণ। পরবর্তীকালেও দেখা যায়, বিজ্ঞানের অগ্রগতি ও জাতীয় জীবনে তার প্রয়োগ সম্বন্ধে তাঁর উৎসাহ সর্বদা সজাগ। ভগিনী নিবেদিতা যে আচার্য জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞান-সাধনায় উৎসাহদানে ব্রতী হয়েছিলেন, তারও মূলে স্বামীজীর বিজ্ঞান-নিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গী এবং জাতীয় জীবনে বিজ্ঞানচর্চার প্রসারে অমিত উৎসাহের প্রেরণা।

স্পেন্সারের গ্রন্থের শেষ অধ্যায় 'Physical Education'—'শারীরিক শিক্ষা'। এই অধ্যায়ে এসে দেখি, দেহ-মনের সুসমঞ্জস পরিণতিই স্পেন্সারের মতে আদর্শ শিক্ষাপদ্ধতি। আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় মূলতঃ গ্রন্থকীটরূপেই ছাত্রদের গড়ে তোলার যে মনোবৃত্তি, দেখা যায়, স্পেন্সার তার ভ্রান্তি দেখিয়ে ছাত্র-ছাত্রীনির্বিশেষে স্বাস্থ্যচর্চার উপরে জোর দিয়েছেন। পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য এবং পূর্ণাঙ্গ মননের এই আদর্শও তাঁর বিজ্ঞানদৃষ্টিরই স্বাভাবিক পরিণাম। এ অধ্যায়ের অনুবাদেও স্বামীজী কিছুটা সংক্ষেপিত করেছেন মূল গ্রন্থের বক্তব্য। অধ্যাত্মচিন্তার জগতে স্বামীজীও সর্বাগ্রে জোর দিয়েছেন আশিষ্ট, বলিষ্ঠ ও দ্রঢ়িষ্ঠ দেহের উপর। সাধারণতঃ ধর্মজগতের মহাপুরুষেরা শারীরিক যত্নবিষয়ে যে ঔদাসীন্য অবলম্বন করেন, স্বামীজীর চিন্তাধারায় তার ব্যতিক্রমই লক্ষণীয়।　　[ ক্রমশঃ ]

# নব বৃন্দাবন ও শ্রীরামকৃষ্ণ

## স্বামী চেতনানন্দ

এমন একখানি নাটকের মহাউদ্বোধন আমরা করতে যাচ্ছি—যেখানে অভিনেতা জগদ্বিখ্যাত কেশবচন্দ্র সেন ও স্বামী বিবেকানন্দ এবং দর্শক শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং। নাট্যশাস্ত্রে শিবকে নটরাজ, নটেশ, নটনাথ, মহানট, আদিনট প্রভৃতি নামে আখ্যাত করা হয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণকে তাই মহানট বলতে পারি, কারণ এই জগৎ-রঙ্গমঞ্চে সমস্ত অভিনয়ের পশ্চাতেই তো তিনি। তাঁর সামনে কোন অভিনয় যদি অনুরূপ না হত, তিনি বলে দিতেন—তা মঞ্চের উপরেই হোক বা দৈনন্দিন সংসার জীবনেই হোক। এই 'নব বৃন্দাবন' নাটকে তাঁর খুঁটিনাটি মন্তব্য আমাদের মুগ্ধ করবে।

পাঠক যদি 'নব বৃন্দাবন' দেখার আগে চোখ বুঁজে শ্রীরামকৃষ্ণের একটু অভিনয় দেখে নেন তবে প্রকৃত অভিনয় কি করে করতে হয় তার পরিচয় পাবেন এবং সে ভাবে 'নব বৃন্দাবনে'র রস আস্বাদ করতে পারবেন। "আমরা যখন ঠাকুরের নিকট যাই, ঠাকুরের বয়স তখন ঊনপঞ্চাশের কাছাকাছি। ঠাকুরের কাছে যাবার পূর্বে মনে হত ছোটছেলে নাচে অঙ্গভঙ্গী করে, তা লোকের বেশ লাগে। কিন্তু একটা বুড়ো মিন্‌সে, সাজোয়ান মরদ যদি ঐরূপ করে, তা হলে লোকের বিরক্তিকর বা হাস্যোদ্দীপকই হয়। 'গণ্ডারের খেমটা নাচ কি কারো ভাল লাগে'—স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন। কিন্তু ঠাকুরের কাছে এসে দেখি সব উল্টো ব্যাপার। বয়সে প্রৌঢ় হলেও ঠাকুর নাচেন, গান করেন, কত হাবভাব দেখান—কিন্তু তাঁর সকলগুলিই কী মিষ্টি! বাস্তবিক 'একটা বুড়ো মিনসেকে নাচলে যে এত ভাল দেখায়, একথা আমরা কখন স্বপ্নে ভাবিনি।'—গিরিশবাবু এ কথাটি বলতেন।" (লীঃ প্রঃ ৪।২৮৯)। প্রৌঢ় শ্রীরামকৃষ্ণের বালক বা স্ত্রীলোকের অভিনয় হুবহু হবার কারণ ভাবের সঞ্চার। তাঁর যখন যে ভাব হত সে ভাবের ষোল আনাই প্রকাশ পেত। তাতে কোন ভেজাল থাকত না—তাই তাঁর সব অভিনয় সর্বাঙ্গসুন্দর হত।

নাটক হচ্ছে যাতে কিছু আটক নেই। শ্রীরামকৃষ্ণের অভিনয়ে কোন আড়ষ্ট ভাব ছিল না। স্বামী বিবেকানন্দের অভিনয়ও ঐরূপ ছিল। ভগিনী নিবেদিতা বলতেন, "বিবেকানন্দ যেখানে অভিনেতা সেখানে প্রতিটি নাটকই মহানাটক। তাঁর অংশগ্রহণে প্রতিটি দৃশ্যই জীবন্ত।"

'নব বৃন্দাবনের' দৃশ্যগুলি ঊনবিংশ শতকের জনমানসের প্রতিচ্ছবি। পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান-কেন্দ্রিক ভোগময় জীবন কী করে ভারতে দ্রুত প্রবেশ করছিল এবং ভারতবাসী কী করে ঐ সব অনুকরণ করে সুমহান আর্যসভ্যতাকে ধিক্কার দিয়ে লালসা-মদিরাপূর্ণ সভ্যতাকে নিজের করে নিচ্ছিল এবং নিজেদের ধর্ম ছেড়ে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করছিল—এ নাটকে সে-সব আছে। 'নব বৃন্দাবন' ঐ সাইক্লোনের মুখে ছিল। সে যুঝছিল ঐ দুরন্ত ঝড়ের সঙ্গে। আমরা অগ্রে দেখাব 'নব বৃন্দাবন' দপ্‌ করে জ্বলেই নিভে গেল। কারণ তার বনিয়াদেই ছিল

একটা স্বদেশী-বিদেশী mixture: "The higest Christian ethics was combined with the deepest spirituality belonging to India, and the result was a combination..."—Liberal, Dec. 10, 1882. নাটকখানির প্রচ্ছদে লেখা আছে—'নব বৃন্দাবন বা ধর্মসমন্বয় নাটক'। এ নাটক যদি এখন অভিনীত হয় তবে প্রায় সমস্ত দর্শকই যে হতাশ হবেন—এ কথা সুনিশ্চিত। অথচ এইটিই ছিল আমাদের তদানীন্তন সমাজের প্রতিচ্ছবি।

কেশবচন্দ্র সেনের নববিধান ব্রাহ্মসমাজের ভাব নিয়ে 'নব বৃন্দাবন' রচনা করেন ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল। অবশ্য তিনি 'শ্রীচিরঞ্জীব শর্মা' এই ছদ্মনাম ব্যবহার করেন। ত্রৈলোক্যের নাম 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে' বহু জায়গায় আছে। তিনি সুকণ্ঠ ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর গান খুব পছন্দ করতেন। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে জানুআরি ব্রাহ্মদের আমন্ত্রণে কেশবের বাটীতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ঐ নাটকের অভিনয় দেখেন। 'The *Nava Brindaban* was again acted this afternoon January 25th, 1883, in connection with the 53rd Anniversary of the Brahmo Samaj and among those present we noticed the Venerable Paramhansa of Dakshineswar."—*The New Dispensation*, Feb. 18, 1883.

আমাদের হাতে 'নব বৃন্দাবনের' তিনটি সংস্করণ এসেছে। প্রথম সংস্করণের টাইটেল পৃষ্ঠাগুলি ছেঁড়া, তাই তার রচনাকাল গ্রন্থদৃষ্টে সম্ভব হল না। সুপ্রসিদ্ধ ব্রাহ্মনেতা শ্রীসতীকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের 'সমন্বয়মার্গ' গ্রন্থে রয়েছে—প্রথম সংস্করণ ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের মে মাসে প্রকাশিত হয়। উক্ত নাটকের প্রথম উদ্বোধন হয় লিলি কটেজে (কেশব সেনের বাড়ীতে) ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই সেপ্টেম্বর। ১৬ই সেপ্টেম্বর শনিবার ঐখানেই দ্বিতীয়বার অভিনয় হয়। ১৮৮২ খৃঃ ১লা অক্টোবর Liberal পত্রিকায় বেরিয়েছিল: Among the audience···we noticed the Maharajah of Kuch Behar, Maharajah Sir Jotindra Mohun Tagore, Hon'ble Kristo Das Pal, Rai Kannye Lal Dey Bahadur, Pandit Mohesh Chunder Nayaratna, Doctor Mohendra Lall Sircar, Kumar Surendra Mullick, B. L. Gupta, Esq , Abdur Rahman, Esq. There is a general complaint that the drama is a little too long. It is proposed to curtail it so long as to bring the representation on the stage within three or four hours." এই নাটক পরে পাথুরিয়াঘাটার রাজবাড়ীতে, শোভাবাজারের রাজবাড়ীতে, গ্রেট ইস্টার্ণ সার্কাস প্যাভেলিয়ান প্রভৃতি জায়গায় অভিনীত হয়। এতে অভিনয় করতেন ভাই প্রতাপচন্দ্র, মহেন্দ্রনাথ, উমানাথ, রমাচন্দ্র, কেদারনাথ, গৌরগোবিন্দ, ত্রৈলোক্যনাথ, দীননাথ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মগণ।

আমাদের হিসাব অনুযায়ী শ্রীরামকৃষ্ণ দ্বিতীয় সংস্করণের অভিনয় দেখেন। এই সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮০৫ শকের মাঘ মাসে অর্থাৎ ১৮৮৩ খৃঃ-এর জানুয়ারী নাগাত। খুব সম্ভব তখন ব্রাহ্মদের মাঘোৎসব। আমরা পূর্বেই The New Dispensation-এর বিবরণ উল্লেখ করে এসেছি। এই গ্রন্থ শ্রীরামসর্বস্ব ভট্টাচার্য কর্তৃক বিধান যন্ত্রে, ৬নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা হতে প্রকাশিত হয়। আর তৃতীয় সংস্করণ ১৮২৭ শকে অর্থাৎ ১৯০৫ সালে কোচবিহার রাজকীয় যন্ত্রালয়ে রাজকীয় সাহায্যে মুদ্রিত হয়। দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপনে লেখা আছে: "নব বৃন্দাবন, প্রথম

সংস্করণে যে-সকল গর্ভাঙ্ক ছিল তাহাদের কয়েকটি অভিনীত হইত না, এই জন্য তাহা এবার উঠাইয়া দেওয়া গেল।···গ্রন্থকারের অনুমতি ব্যতীত কেহ এই নাটক অভিনয় করিতে পারিবেন না।—গ্রন্থকার।"

পাঁচটি অঙ্কে বিভক্ত (প্রথম সংস্করণে ছয়টি এবং তৃতীয় সংস্করণে সাতটি) এই নাটকখানির বিষয়বস্তু সংক্ষেপে বিবৃত করবার পূর্বে গ্রন্থকারের মঙ্গলাচরণ উদ্ধৃত করছি: "জননী বাগ্দেবী, বিদ্বজ্জনমনোরঞ্জিনী এই 'নব বৃন্দাবন' রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া রসগ্রাহী কবিকুলের চিত্ত বিনোদন করুন। স্বদেশ মাতৃভূমির মঙ্গলোদ্দেশে তাঁর প্রেমলীলার অভিনয়ে প্রবৃত্ত হইতেছি, মা নিরাকারা জননীর প্রসাদে যেন আমরা শ্রোতৃবর্গের হৃদয়ে সাধুভাব উদ্দীপন করিতে সক্ষম হই। তাঁর পবিত্রপাদস্পর্শে এই রঙ্গভূমি পুণ্যতীর্থরূপে পরিণত হউক।—স্বস্তি স্বস্তি স্বস্তি।" এখানে লক্ষ্যের বিষয় ব্রাহ্মরা খ্রীষ্টানী ধাঁচে 'জগৎপিতা' মানত; কিন্তু পরে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাবে তা 'জগন্মাতা'তে রূপান্তরিত হয়েছে। এ নাটকে 'জগৎপিতা' ও 'জগন্মাতা' যে এক—তার উল্লেখ আছে।

হাওড়া রামকৃষ্ণপুরের বসু পরিবারের কাহিনী-অবলম্বনে এ নাটক। বাড়ীর কর্তা নরহরি বসু। তিন পুত্র—তিন রকম। জ্যেষ্ঠ পুত্র অবিনাশ পেশাদারী উকিল, মাতাল ও কুক্রিয়াসক্ত। মধ্যম পুত্র রাখালমাধব সস্ত্রীক সাহেবীভাবাপন্ন। সাহেবদের সঙ্গে মেশেন, থাকেন এবং দেশীলোকদের তীব্র ঘৃণা করেন। আর কনিষ্ঠ পুত্র হরিসুখ ধর্মপ্রাণ, সত্যবাদী ও নব ব্রহ্মজ্ঞানী।

নাটকের প্রথম অঙ্কে ফুটে উঠেছে সে সময়কার ছবি: "কুলধর্ম প্রাচীন রীতিনীতি কিছুই মানতে চায় না। সাহেব হওয়ার দিকে সকলের ঝোঁকটা বেশী।" "বরং বিজাতীয় প্রভুত্ব সহ্য হয়, কিন্তু হেরো-তেরো রাম-কেষ্টা যে লাট মেজেষ্টর হবে তা সইবে না।" "ইংরেজরা এ দেশের মঙ্গলের জন্যেই রাজা হয়েচে। ওরা বেশ রাজকর্ম কচ্চে, দেশ শাসনে রেখেচে, ওদের গায়ে খুব বলও আছে, ঐ বিষয় নিয়ে ওরা থাক; আমরা ফাঁকের ঘরে পরকালের কাজ গুচিয়ে নেই। ওরা ক্ষেত্রি (ক্ষত্রিয়) হয়ে দেশশাসন করুক, আমরা মুনি ঋষি হয়ে যোগসাধন করি। মিছে অসার বিষয় ভেবে কি হবে?" গৃহস্বামী নরহরিবাবু জবাবে বললেন: "বেশ কথা বলেচ। রাজা রামমোহন রায় ইংরেজদের যথেষ্ট মানতেন। তাঁর কাছে আমরা অনেক তত্ত্বজ্ঞান শিখেছি।" "কি গো কবিরত্ন মশায়, ইন্দুরের লেজের মত রিফাইণ্ড টিকি কোথায় পেলে?" "বেশী চালাকী কোরো না। এখনও ফোমেণ্ট কল্লে পেট থেকে মুরগীর ছানা বেরিয়ে পড়বে।" "আজকাল যে নানারকমের ব্রহ্ম-জ্ঞানী দেখতে পাই হে! রামমোহন রায়ের ধর্মটা নিয়ে ছোঁড়ারা যাচ্ছে তাই করে তুলেচে। খোল-কর্তালও বাজায়, বাইবেলও পড়ে, আবার নিরামিষও খায়। কালে কালে কতই হবে!" এর পরেই রয়েছে ক্লাইম্যাক্স—গুরু-পুত্রকে নিয়ে জ্যেষ্ঠপুত্র অবিনাশের মাতলামি। মাতালের মাথায় জল ঢালায়, "কে রে বাবা, এত রেতে ঠাণ্ডা জল দেও, দেখো যেন আমার নেশা ড্যামেজ না হয়।"

তদানীন্তন সমাজের মনোভাব, কাজকর্ম সব সাজান আছে। মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। পাঠক, কেবল চোখ বুঁজে চিন্তা করবেন—শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর সূক্ষ্ম নিখুঁত মন নিয়ে নাটক দেখছেন। তাঁর মন্তব্য এখন করব না, কারণ তাতে রসভঙ্গ হবে।

জ্যেষ্ঠপুত্র মাতাল অবিনাশের স্ত্রী চারুশীলা আদর্শ সতী নারী। স্বামীকে বিপথ থেকে ফিরাবার তাঁর কী প্রাণপণ চেষ্টা! স্বামী অনেক সময় বাড়ীতেই আসে না। কনিষ্ঠ ধর্ম-প্রাণ দেবর হরিমুখ মাঝে মাঝে বড় বৌদির খোঁজ নেন, তাঁর সঙ্গে ধর্মপ্রসঙ্গ করেন, বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ এনে পড়তে দেন। 'সুখী পরিবার' গ্রন্থখানি হাতে নিয়ে চারুশীলা বলছে, "ঠাকুরপো, এ যে কি বস্তু তার মর্ম জানলাম না।...মহর্ষি যিশুর জীবনচরিত পড়তে আমার বড় ইচ্ছা হয়।" তারপর ননদ এসে ভাগ্যহীনা বড় বৌকে উপদেশ দিয়ে বলল, "তুই বড় হাবা মেয়ে। ফিকির জানিস নে স্বামী কেমন করে বশ কর্তে হয়।" মেজজা হিরণ্ময়ী স্বামীর সঙ্গে মেম সেজে ঘোরেন। বড়জাকে দেখতে এসে বলছেন: "এখন সাহেবদের সঙ্গে বসে খেতে হয়। এই দেখ, এরূপ পোষাক পরতে হচ্ছে। কখনও ঘোড়ার ওপর চড়ি। টেবিলে কাঁটা চামচে ধরে খানা খাই। অন্য অন্য সবগুলো না একপ্রকার শিখিচি, কিন্তু ইংরেজী কথাটা মুখ দিয়ে ভাল বেরোয় না! হিন্দুর মেয়ে মেম সাজা ভাই বড় মুস্কিল।...কাঁচা গোরুর মাংসগুলো কি আর ভাল লাগে? গা যেন বোমি বোমি করে আসে। এখন তবু অনেকটা অভ্যেস হয়ে এসেছে। সাহেবদের ভেতর আবার এমন নিয়ম আছে যে, খেতে বসে যদি বোমি আসে তা অমনি গিলে ফেলতে হয়।" স্বামীর উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য ছাড়াছাড়ির আইন বলবৎ, তার উল্লেখ করলেন মেজবৌ: "মেয়েরা হলে কাছারিতে গিয়ে ত্যাগপত্র লিখে দিত।"

আমরা তদানীন্তন নারীসমাজের গতি-বিধির পরিচয় পেলাম।

খ্রীষ্টানদের বাড়ীতে নেমন্তন্ন, তারপর মদ খেয়ে টলতে টলতে অবিনাশ রাতে বাড়ী ফিরে সতী সাধ্বী স্ত্রীকে বলছে, "তুই নাচতে জানিস নে, গাইতে জানিস নে, একটু মদ তাও পেটে বরদাস্ত হবে না, পেঁয়াজের গন্ধে তোর বমি হয়। তোরে নিয়ে কোথায় বেড়াব?" জ্বরগ্রস্ত পুত্রকে মদ খাইয়ে ভাল করতে যাচ্ছে অবিনাশ। ঈশ্বর নেই বোঝাচ্ছে স্ত্রীকে! ঈশ্বরের কাছে সতীর প্রার্থনার উত্তরে অবিনাশ বলছে: "হাঁরে, তুই ভগবানকে ডাকছিস্ কি? তিনি যে মরেছেন। আহা! বিলাত থেকে সেদিন তার এসেছে তিনি নেই। বয়সও ঢের হয়ে-ছিল। বড় বড় পণ্ডিতেরা সব তাঁর শ্রাদ্ধ-ট্রাদ্ধ করে চুকেছে।"

তদানীন্তন কালে পাশ্চাত্য-জড়দর্শন ও বিজ্ঞানের কতদূর প্রভাব পড়েছিল ভারতীয় সমাজের উপর তার একটু নমুনা: "আজ ভাই, ল্যাবরেটরিতে এক মজার কথা শুনলেম—প্রাণকান্তবাবু বললেন, কুকুরের আত্মা ও মানুষের আত্মা একই জিনিস। তিনি একটা জ্যান্ত কুকুর কেটে দেখেছেন। সেদিন ডঃ ডক্কিন গোটা কতক পরমাণু নিয়ে কার্বন আর ফস-ফরাসের সঙ্গে মিশিয়ে, তাতে অ্যালকহল দিয়ে এমন আশ্চর্য আশ্চর্য মনোবৃত্তিসকল তৈয়ের করছিলেন যে, সকলে দেখে আমরা অবাক হয়ে গেলেম।...সায়েন্সের সঙ্গে হাসি তামাসা চলে না। আমাদের সিলি সাহেব বিলাত থেকে ফিরে আসবার সময় আফ্রিকা দেশের একটি নীল বাঁদর এনেছেন। সে হাসে মানুষের মত। সাহেব বলেছেন বাঁদরের ভেতর থেকে মানুষ বের করে দেখাবেন।...এ যে সায়েন্সের কথা গা—আদেশও নয়, ভক্তিপ্রলাপও নয়। মরাকাটার ঘরে আমরা স্বচক্ষে দেখেছি, মানুষের শরীরের মধ্যে আত্মা-টাত্মা কিছুই নেই। অণুবীক্ষণ দিয়ে সব দেখা হয়েছে। সিলি সাহেব আরও বলেছেন, ঠিক মাল-মসলার

যোগাড় হলে এবং মাপযোক বুঝতে পারলে তিনি মানুষ তৈয়ের করে তুলতে পারবেন।"

পাঠক, ভুলে যাবেন না—জগতের সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর এ সব অপূর্ব বিজ্ঞানের কথা বিভিন্ন বেশ-ধারী অভিনেতার মুখ থেকে শুনছিলেন। এ সব শুনে তিনি কী ভাবছিলেন—বলুন তো ???

বসুপরিবারে দুর্দিনের কালমেঘ ঘনিয়ে এল। বিপদ আসে দল বেঁধে। কনিষ্ঠপুত্র হরিসুখ ইংরেজ সরকারের শিক্ষা ও আবগারি পলিসির সমালোচনা করায় এবং স্কুলে ধর্মা-লোচনা করায় চাকরী হারালেন। মেজপুত্র রাধামাধব নাস্তিক সাহেবঘেঁসা হয়ে এবং "নেটিভ বড় পাজি জাত, এদেশের কিছুই ভাল নয়, আমার ইচ্ছে হয় ইংলণ্ডে গিয়ে বাস করি"—এ সব কথা বলে বেড়াতে লাগলেন। জ্যেষ্ঠপুত্র অবিনাশ জালিয়াতী ও খুনী মামলায় জড়িত হয়ে আন্দামানে দ্বীপান্তরিত হলেন। কর্তা নরহরি বসু পুত্রদের ব্যবহারে মর্মাহত হয়ে সস্ত্রীক কাশীবাসী হলেন।

আন্দামানে অবিনাশের অনুতাপ এল। জন্মজন্মান্তরের মনের গ্লানি অনুতাপ-অশ্রুতে ধুয়ে মুছে যায়। সাধ্বী স্ত্রীর প্রতি অত্যাচার এবং তার সদুপদেশে অবহেলা, পুত্র-কন্যার প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার, নিজের উচ্ছৃঙ্খল আচরণ—সব মিলে অবিনাশকে দাহ করতে লাগল। প্রচণ্ড দুঃখের পর বিধাতার কিঞ্চিৎ করুণা বর্ষিত হল অবিনাশের জীবনে। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জন্মদিনে অবিনাশ পেলেন মুক্তি। ফিরলেন দেশে। স্ত্রী চারুশীলা ও কনিষ্ঠ সহোদর শত দুঃখের মধ্যেও ধর্মের অচঞ্চল দীপশিখা জ্বালিয়ে রেখেছিলেন। ধর্মই ধার্মিককে রক্ষা করে—একথা খুবই সত্য।

অবিনাশ স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে সদ্‌গুরুর অন্বেষণে বেরুলেন। অবশেষে নীলগিরি উপত্যকায় যোগিবর স্বামী অভেদানন্দের সাক্ষাৎ পেলেন এবং তাঁকেই গুরুপদে বরণ করে নিলেন। পাঠক মনে রাখবেন—এই অভেদানন্দের ভূমিকায় অভিনয় করেন স্বামী বিবেকানন্দ (তখনকার নরেন্দ্রনাথ) এবং পাহাড়ীবাবার ভূমিকায় অভিনয় করেন কেশব সেন।

নব বৃন্দাবন নাটকে স্বামীজীর অভিনয়-প্রসঙ্গে 'সমন্বয়মার্গ' গ্রন্থের ১৫৫ পৃষ্ঠায় রয়েছে যে, তিনি "একবার ঋত্বিকের অংশ অভিনয় করেছিলেন।" শ্রদ্ধেয় গ্রন্থকারকে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বললেন যে, তিনি সঠিক বলতে পারেন না, স্বামীজী কোন্ ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। আরও জানালেন যে, লোকমুখে তিনি শুনেছেন যে, স্বামীজী বিবেকের ভূমিকায় অভিনয় করে-ছিলেন। কিন্তু স্বামী গম্ভীরানন্দ-প্রণীত 'যুগ-নায়ক বিবেকানন্দ' গ্রন্থের ৬৭ পৃষ্ঠায় রয়েছে: "নরেন্দ্রনাথ কেশবের সমাজে যখন ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল-প্রণীত 'নব বৃন্দাবন' নাটক অভিনীত হয়, তখন আমন্ত্রণ পাইয়া অভেদানন্দের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন।···গায়কের অভাব মিটাইবার জন্য সুগায়ক নরেন্দ্রনাথ নব বিধানের অনুরোধে ঐ যোগীর ভূমিকা গ্রহণ করেন।" 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে'ও এই অভিনয়ের উল্লেখ আছে। এ ছাড়া আমরা প্রত্যক্ষদর্শী স্বামী অদ্ভুতানন্দের কথা পরে উল্লেখ করব।

যাহোক, স্বামী অভেদানন্দ অধ্যাত্মপিপাসু দম্পতীকে ধর্মোপদেশ দিয়ে বললেন, "পাহাড়ী-বাবার নিকট তোমরা নব বিধানের বীজমন্ত্র পাবে।" নাট্যকার অভেদানন্দের মুখে বাইবেল, উপনিষদ, গীতা, ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্রের কথা লাগিয়ে একটা সমন্বয়ের ইঙ্গিত করেছেন। পরে শিষ্য-শিষ্যাকে আশীর্বাদ করে

বলছেন : "ঈশা, মুসা, নানক, চৈতন্য, জনক, যাজ্ঞবল্ক্য, শুক, মহম্মদ, শাক্যসিংহ, শংকরাচার্য, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র, পল, সক্রেটিস প্রভৃতি ভক্তসন্তানগণকে কোলে নিয়ে মা আনন্দময়ী জগদীশ্বরী তোমার হৃদয়মন্দিরে দর্শন দিবেন। এই তাঁর নবীন মূর্তি।"

অবিনাশ ও চারুশীলাকে গৃহস্থাশ্রমে সম্ভাবে জীবনযাপনের উপদেশ দিয়ে অভেদানন্দ বললেন, "আমি সম্প্রতি মেক্কা, জেরুসালেম তীর্থে গিয়েছিলাম। এরপর বৃন্দাবনে কিছুদিন থাকব।" তারপর গুহা থেকে উত্থিত হলেন পাহাড়ীবাবা। তিনি দীক্ষা ও উপদেশ দিয়ে বললেন : "তোমরা পরস্পরের দক্ষিণ হস্ত ধারণ কর। একহৃদয় হয়ে সংসারমধ্যে দ্বিজধর্ম পালন করবে। সুখ-সম্পদে, দুঃখ-বিপদে 'সচ্চিদানন্দ' এই মহামন্ত্র জপ করবে। তোমাদের বিপদ-পরীক্ষা এখনও শেষ হয়নি। সংসারের দুর্গম পথে বড় ভয়। সাবধান! বীজমন্ত্র ভুলো না।"

এখন কেশববাবুর নব বিধানের দু'চার কথা না বললে নাটকখানি কুহেলিকার মধ্যে থেকে যাবে। অভেদানন্দের কথাতে রয়েছে ঈশা-মুসা থেকে শঙ্কর-সক্রেটিস এবং অদ্ভুত তীর্থপরিক্রমাতেও রয়েছে মহাসমন্বয়ের কথা। তদানীন্তন ব্রাহ্ম আন্দোলনে প্রাধান্য পেয়েছিল—পাশ্চাত্যের যুক্তিসম্মত বৌদ্ধিক ধর্মের সঙ্গে ভারতের সগুণ নিরাকার ঈশ্বর; নৈতিকতা, নিয়মিত স্বাধ্যায়, ভজন-প্রার্থনা; পুরোহিতকুল, গুরুবাদ ও অবতারবাদের উচ্ছেদ; প্রতিমাপূজাবর্জন, বাল্যবিবাহ-নিরোধ, স্ত্রীস্বাধীনতা, জাতিবিভাগের উচ্ছেদ, বিধবাবিবাহের প্রচলন ইত্যাদি। ধর্মের সঙ্গে সমাজসংস্কারের একটা অদ্ভুত মিশ্রণ। এই নাটকে বিধবা-বিবাহের একটা সুন্দর মন্তব্য আছে : "বৃথা আন্দোলন করে কি হবে?" এ কথার উত্তরে পাড়ার নরকান্ত ডাক্তার বলছেন, "কেন? এই তো সেদিন আমার বিধবা জেঠাইমার বে দিলাম। সমাজ-সংস্কারের কাজ মন্দ কি চলছে?" এই নাটকে দেশী দেবতাদের পরিবর্তে মহাযোগী ঈশার উল্লেখের ছড়াছড়ি দেখা যায়। উপরন্তু ব্রাহ্ম আন্দোলনের মূল সূত্রগুলি সুস্পষ্ট ভাবে রয়েছে। আর আছে ব্রাহ্মদের ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন সংস্থার কথা—যেমন 'সুরাপান-নিবারণী সভা', 'আশালতা' প্রভৃতি।

খ্রীষ্টানদের 'পাপবাদ'টিও এ নাটকে বাদ যায়নি। গুরুর আশীর্বাদ নিয়ে গৃহে প্রত্যাগমনকালে অবিনাশ ও চারুশীলা বনের ভিতর পাপপুরুষ কর্তৃক প্রলুব্ধ হন। অবশেষে স্বর্গীয় দূতরূপে বিবেক-বৈরাগ্যের উপস্থিতি ও উপদেশে তাঁরা রক্ষা পান। বিবেকের উক্তি : "কে আছে হরিভক্তের প্রাণসংহার করতে পারে? সুবোধ ভক্ত, তোমাকে মহর্ষি ঈশা এই দুর্জয় অস্ত্র দান করলেন। এর অব্যর্থ সন্ধানে যুগে যুগে মহাযুদ্ধে অসংখ্য রিপুরা আহত হয়েছে। অতএব বিশ্বাস ও সাহসের সঙ্গে এই ধনু ধারণ কর, সমস্ত পৃথিবী তোমার বশীভূত হবে।" নাটকের এ দৃশ্যটা স্মরণ করিয়ে দেয় জন বুনিয়ানের বিখ্যাত রূপক-গ্রন্থ 'Pilgrim's Progress'কে।

কৃষ্ণবাবু ঐ পাপপুরুষের অভিনয় করেন। তা দেখে শ্রীরামকৃষ্ণ মন্তব্য করেছিলেন : "এমন কি যারা সৎ, অভিনয়েও তাদের মিথ্যাকথা বা কাজ ভাল নয়। কেশব সেনের ওখানে 'নব বৃন্দাবন' দেখতে গিছিলাম। কি একটা আনলে ক্রস! একজন দেখি মাতাল সেজে মাতলামি করছে। ভক্তের পক্ষে ওসব সাজাও ভাল নয়। ওসব বিষয়ে মন অনেকক্ষণ

ফেলে রাখায় দোষ হয়। মন ধোপাঘরের কাপড়, যে রঙে ছোপাবে সেই রঙ হয়ে যায়। মিথ্যাতে অনেকক্ষণ ফেলে রাখলে মিথ্যার রঙ ধরে যাবে।" ( কথামৃত, ১ম ভাগ, ১০৪ পৃ: )।

চরম দুঃখের পর মিলনসুখ বেশী অনুভূত হয়। রোগশয্যায় বা মৃত্যুকালেই মিলনের ঘটা বেশি দেখা যায়। বসুপরিবারে দীর্ঘ তমিস্রার পর অরুণোদয় হল। ধার্মিক হরিসুখকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠল নব বিধানের পরিকল্পিত 'সুখী পরিবার'। মেজপুত্র সাহেব-ঘেঁসা রাখালমাধব কোন একটি হোটেলে ঢুকে একজন ইংরেজের গুঁতো খেয়ে বিদেশীয়ানা ছেড়ে ছোট ভাইয়ের সঙ্গে ধর্মীয় জীবনে ফিরে এল এবং খোল বাজিয়ে কীর্তন শুরু করল।

সত্যি বলতে কি, প্রতিবেশীরা বসুপরিবারের ঐ নবীন ব্রাহ্ম মতটা যে কী, ধরতে পারত না। "মতটা যে কি, কিছুই বোঝবার জো নেই। ব্রহ্মও বলছে, হরি হরিও কচ্চে, আবার মা বলেও ডাকছে। কখনও দুর্গা, কালী, সরস্বতী, লক্ষ্মী, ঈশা, মুসা, নিতাই, গৌর, মহম্মদ, শুক, শিব, ধ্রুব, প্রহ্লাদ—যা মুখে আসে তাই বলে।" অপর প্রতিবেশী : "স্বদেশ-বিদেশের সমুদায় ধর্মশাস্ত্র, সাধু, সত্য, সুনিয়ম-সদাচার—সমস্তকে দেশীয়ভাবে হিন্দু আকারে পরিণত করছে। বেশ চুম্বুক ধর্ম বটে!" অপর প্রতিবেশী : "ওহে, আমি ঠিক বুঝতে পেরেছি। ও একরকম ঘাসিরামের গর্মাগরম চ্যানাচুর।"

ওদিকে পাপপুরুষের কবল থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে অবিনাশ ও চারুশীলা নিজেদের বাড়ী রামকৃষ্ণপুর ফিরে এলেন। তারপর তিন ভাই একত্র বধূদের নিয়ে পিতামাতার অন্বেষণে বেরুলেন। এখান থেকেই নাটকটি মিলনান্ত হতে শুরু করেছে। বসুপরিবারের গৃহস্বামী নরহরি বসু ও তাঁর স্ত্রী অলকাসুন্দরী যথাক্রমে চরণদাস বৈরাগী ও রাইবিলাসিনী নাম ধরে বৃন্দাবনধামে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। এখানে স্বামী অভেদানন্দের আশ্রমে আপন পুত্র ও পুত্রবধূদের সঙ্গে দৈবাৎ তাঁদের সাক্ষাৎ হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে কেশবের যখন খুব দহরম-মহরম—নব বৃন্দাবন সেই কালে লেখা। বৃন্দাবন দৃশ্যে নাট্যকার অবিনাশের সমাধি দেখিয়েছেন। অবশ্য সমাধি কথাটার প্রয়োগ না করে তিনি বৈষ্ণবী ভাষায় 'দশাপ্রাপ্তি এবং দর্শনানন্দের উচ্ছ্বাস' বলে উল্লেখ করেছিল। "আহা! মুখের কি শোভাই হয়েছে! নয়নদ্বয় স্থির অথচ প্রেমনীরে ঢলঢল, শরীরে পুলক যেন কদম্বাকৃতি। ললাটে পূর্ণচন্দ্রের উদয়।" এরূপ হুবহু জীবন্ত বর্ণনাদৃষ্টে মনে হয় নাট্যকার অবশ্যই শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবসমাধিকে ওখানে রূপ দিয়েছেন।

নব বিধানের প্রভাবে দুঃখী পরিবার সুখী পরিবারে পরিণত হল। স্বামী অভেদানন্দ ঐ পরিবারকে যুগধর্মলীলার মাহাত্ম্য প্রচার করতে নির্দেশ দিলেন। গেরুয়াধারী সৌম্যকান্তি সন্ন্যাসী অভেদানন্দের ভূমিকায় নরেন্দ্রনাথকে কেমন মানিয়েছিল তার বিবরণ দিয়েছেন প্রত্যক্ষদর্শী স্বামী অদ্ভুতানন্দ : "ব্রাহ্মসমাজে নাটক হয়েছিল। তাতে স্বামীজী সাধু সেজেছিল। ঠাকুর সেই নাটক দেখতে গিয়েছিলেন। স্বামীজী যখন সাধু সেজে প্লে করতে এল, ঠাকুর হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে স্বামীজীকে ঐ বেশেই নেমে আসবার জন্য বলতে লাগলেন। স্বামীজী ইতস্ততঃ করছে দেখে কেশব বাবু বললেন, 'উনি যখন বলছেন, নেমে এস না।' তারপর কাছে এলে ঠাকুর ভাবস্থ হয়ে স্বামীজীর হাত ধরে

বললেন—'এই ঠিক হয়েছে, এই ঠিক হয়েছে।" ( সৎকথা, পৃঃ ১১৪ )

প্রথম সংস্করণে নব বৃন্দাবনে হাল্কাভাব ঢোকেনি। কিন্তু দ্বিতীয় সংস্করণে বাজিকর চোবেজীর দ্বারা নব বিধানের ঐন্দ্রজালিক শক্তির প্রকাশ দেখাতে গিয়ে নাট্যকার একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছেন। বৃন্দাবনধামে সুখী পরিবার শুনলেন বাজিকরের ডাক: লাগ লাগ ভেল্কী লাগ। লাগ ভাঙ্গা ধর্ম জোড়া লাগ। নগরবাসী জাগ জাগ, ভেদাভেদ দূরে ভাগ। হরি সচ্চিদানন্দকী খেলা, নব বৃন্দাবনকী মেলা।

ম্যাজিসিয়ান চোবেজী সকলের অনুরোধে নব বিধানের অলৌকিক ইন্দ্রজাল দেখাতে শুরু করলেন। এ বাজি ভোজবাজি নয়। সর্ব-বস্তুতে ব্রহ্ম ও ধর্মসমন্বয়—এই ছিল চোবেজীর ইন্দ্রজালের বিষয়বস্তু। চোবেজী প্রথমে জড় কলাগাছের পাতায় হরিনাম দেখালেন। তারপর উপস্থিত মানুষের গায়ে হরিনাম দেখালেন। শুধু নামে তৃপ্ত না হয়ে কলাগাছ থেকে হরিপ্রেম-রস বের করে সকলকে আস্বাদন করালেন। বসুপরিবারের সঙ্গে বসে স্বামী অভেদানন্দও ঐ ইন্দ্রজাল দেখছিলেন।

এরপর চোবেজী ধর্মসমন্বয় শুরু করলেন: এই দেখুন, কত রঙের কাঁচ। লাল নীল সাদা সবুজ। এক এক ধর্মের এক এক রঙ। কিন্তু সকলি স্বতন্ত্র ও বিচ্ছিন্ন! এই নব বিধানের সুতা দিবামাত্র সকলি একত্র বদ্ধ হল। এই দেখুন। সকলে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে দেখতে লাগল।

চোবেজী শুরু করলেন: এই দেখুন—বেদ, বাইবেল, কোরান ও ললিতবিস্তর। এদের মধ্যে বড়ই বিরোধ। কিছুতেই মিল হয় না, কিন্তু নব বিধানের ঐন্দ্রজালিক বাক্স মধ্যে রাখামাত্র সংযুক্ত হয়। সঙ্গে সঙ্গে চারখানা গ্রন্থ এক হয়ে গেল।

আবার খেলা শুরু হল: আর একটা তামাসা দেখুন। হিন্দুদের ওঁকার, খ্রীষ্টানদের ক্রুশ, মুসলমানদের চন্দ্রাংশ, শৈবদের ত্রিশূল, বৈষ্ণবদের খুন্তি। এরা কি কখনও মিলেছে, না মিলতে পারে? কিন্তু নব বিধানের সম্মিলনী শক্তির কাছে এরা হার মেনেছে। চোবেজী ম্যাজিকের সাহায্যে এক করে দিলেন; আর কেউ টেনে খুলতে পারল না। সঙ্গে সঙ্গে করতালি পড়তে লাগল। তারপর চোবেজী ইংরেজদের ফ্লুট, হিন্দুর খোল, মুসলমানের সারেঙ্গ, বাঁশী, বেহালা প্রভৃতির সুর এক করে ব্রহ্মধ্বনিতে মিশিয়ে দিলেন।

এক মৃত কপোতের কাহিনী দিয়ে ইন্দ্রজাল শেষ হল। খ্রীষ্টানী ঢঙে উচ্চারিত হল 'ঐ স্বর্গরাজ্য আসছে।' চোবেজী একটা মৃত কপোতের প্রাণদান করে আকাশে ছেড়ে দিলেন। উড়ন্ত পক্ষীর গলায় দেখা গেল একটা পত্র। তাতে লেখা আছে: "নব বিধান সমুদায় ধর্মের সমন্বয় এবং পৃথিবীতে শান্তিধাম করবে।" ম্যাজিক শেষ। তারপর 'নব বৃন্দাবন' কবিতাপাঠান্তর নব বিধানের বিজয়-নিশান চতুর্দিকে সমুদায় ধর্মশাস্ত্র এবং সম্প্রদায়ের মিলন দেখিয়ে নাটকের উপর যবনিকা পড়ল।

নাটকের ইতিবৃত্ত বিবৃত করবার কালে আমরা বেশী কথাবার্তা বলার সুযোগ নেইনি। কারণ তাতে পাঠকের রসভঙ্গের সম্ভাবনা ছিল। এবার নব বৃন্দাবনের পরিপ্রেক্ষিতে সংক্ষেপে দুচার কথা বলব।

নাটক দেখার সময় পাশে বসে কেউ যদি গল্প করে তবে অন্যান্য দর্শক বিরক্ত হন।

শ্রীরামকৃষ্ণও বিরক্ত হয়েছিলেন। তাঁর নিজের কথায়: "একজন ডেপুটি আটশো টাকা মাইনে, কেশব সেনের বাড়ীতে ( নব বৃন্দাবন ) নাটক দেখতে গিছলো। আমিও গিছলাম; আমার সঙ্গে রাখাল, আরও কেউ কেউ গিছলো। নাটক শুনবার জন্য আমি যেখানে বসেছি তারা আমার পাশে বসেছে। রাখাল তখন একটু উঠে গিছলো। ডেপুটি এসে ঐখানে বসলো। ···যতক্ষণ নাটক হলো ডেপুটির কেবল ছেলের সঙ্গে কথা।···একবারও কি থিয়েটার দেখলে না।" কথামৃত, ৩য় ভাগ, পৃঃ ১৮১

পূর্বে আমরা ইঙ্গিত করেছি ব্রাহ্মমতগুলি 'নব বৃন্দাবনে' কি করে বিভিন্ন চরিত্রের মুখে বিবৃত হয়েছে। এবার নব বিধানের আর একটু ইতিহাস অনাবৃত করছি। শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে কেশবের সাক্ষাৎ ১৮৭৫ সালের মার্চ মাসে। কোচবিহারের রাজবাড়ীতে কেশবের কন্যার বিবাহ হয় ১৮৭৮ খৃঃ-এর ৬ই মার্চ। ঐ বিবাহ সমাজের নিয়মমাফিক না হওয়ায় ব্রাহ্মসমাজ দুভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। 'লীলা-প্রসঙ্গ'কার বলেন: "কেশববাবু ঠাকুরের 'সর্বধর্ম সত্য—যত মত তত পথ'-রূপ বাক্য সম্যক লইতে না পারিয়া নিজ বুদ্ধির সহায়ে সকল ধর্মমত হইতে সারভাগ গ্রহণ এবং অসার-ভাগ পরিত্যাগপূর্বক 'নব বিধান' আখ্যা দিয়া এক নূতন মতের স্থাপনে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। ঠাকুরের সহিত পরিচিত হইবার কিছুকাল পরে উক্ত মতের আবির্ভাবে হৃদয়ঙ্গম হয়—শ্রীযুক্ত কেশব ঠাকুরের সর্বধর্মমত-সম্বন্ধীয় চরম মীমাংসাটিকে ঐরূপ আংশিকভাবে প্রচার করিয়াছিলেন। ·· দক্ষিণেশ্বরে আগমনপূর্বক ( কেশববাবুকে ) 'জয় বিধানের জয়' বলিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিতে আমাদিগের অনেকে তাঁহাকে দেখিয়াছে।" লী. প্র. ২য় ভাগ, পৃঃ ৪০৪

আমরা ঐতিহাসিক সত্য উদ্ঘাটিত করলাম। শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন সর্বধর্মসমন্বয়ের মূর্ত বিগ্রহ। সুতরাং ঐভাব অবলম্বনে রচিত নাটক তাঁর তো ভাল লাগবার কথা। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের কথাবার্তায় যা প্রকাশ পেয়েছে তাতে মনে হয়, তাঁর ঐ নাটকখানি তত ভাল লাগেনি। আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের কথায় ফিরে যাই: "কেশব সাধু সেজে শান্তি জল ছড়াতে লাগলো। আমার কিন্তু ভাল লাগলো না। অভিনয় করে শান্তিজল!" ( কথামৃত, ৪র্থ ভাগ, পৃঃ ১০৪ )। পাপের অভিনয়ও ঠাকুরের ভাল লাগেনি—একথা আমরা পূর্বেই বলেছি। শ্রীরামকৃষ্ণ থিয়েটার-যাত্রার অদ্ভুত সমঝদার ছিলেন। স্টারে গিরিশের 'চৈতন্যলীলা' দেখবার কালে বিনোদিনীর চৈতন্যের অভিনয় দেখে ঠাকুর বলেছিলেন, "আসল নকল এক দেখলুম।"

'নব বৃন্দাবন' নাটক হিসাবে রসোত্তীর্ণ হয়েছে কিনা সেটা বড় কথা নয়। প্রকৃত বিষয় হল তার প্রয়োজনীয়তা। 'নব বৃন্দাবন' তদানীন্তন সমাজের সাময়িক প্রয়োজন মিটিয়েছে— একথা অনস্বীকার্য।

# 'নির্বাসনা হও'

শ্রীমতী সান্ত্বনা দেবী

'কি করে ভগবান লাভ হয়?'—কোনো এক মুমুক্ষু ভক্তের এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীমা একদা বলেছিলেন, "নির্বাসনা যদি হতে পার, এক্ষুনি হয়।" [ শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ২য় ভাগ, পৃঃ ২৮৬ ] 'নির্বাসনা হওয়া'—কিনা বাসনাশূন্য হওয়া। শব্দের লেশমাত্র আড়ম্বর নাই, ভাষার মার-প্যাঁচ নাই, যুক্তি-তর্ক-শাস্ত্র-প্রমাণের কচকচি নাই—অর্থবোধের জন্য খুঁজতে হয় না অভিধানের পৃষ্ঠা—সর্বজন-বোধগম্য সহজ সরল ভাষায় ছোট্টো একটি কথায় মুক্তিলাভের উপায়টি নির্দেশ করেছেন শ্রীশ্রীমা আর ভাবের গভীরে প্রবেশ না করে আমরাও হয়তো নিশ্চিন্ত হই—ভাবি 'মুক্তি-লাভের কি সোজা উপায়ের কথাই না বলেছেন আমাদের মা! নির্বাসনা হলেই তো হল।'

রাজরাজেশ্বরী হয়েও যিনি নিজের হাতে ঘর নিকোচ্ছেন, চাল ঝাড়ছেন, বাসন মাজছেন, অনন্তশক্তি-স্বরূপিণী হয়েও বাহ্যিক দৃষ্টিতে যিনি অতি সাধারণ দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারের এক গ্রাম্যবধূ মাত্র, তাঁর পক্ষে 'নির্বাসনা' কথাটি অতি সহজ হলেও আমাদের পক্ষে এই নির্দেশটি পালন করা সহজসাধ্য তো নয়ই বরং যথেষ্ট আয়াসসাধ্য বললেও অত্যুক্তি হবে না।

'মা' তাঁর সহজ সরল ভাষায় মুক্তিলাভের যে উপায়টি নির্দেশ করেছেন—শাস্ত্রাদি পর্যালোচনা করলেও আমরা বারংবার সেই কথাটিরই উল্লেখ দেখতে পাই—বন্ধো হি বাসনাবন্ধো মোক্ষঃ স্যাদ্ বাসনাক্ষয়ঃ, [ মুক্তিক উপনিষদ্, ৬৬ শ্লোক ]। শ্রীশ্রীঠাকুরও তাঁর অনুপম ভাষায় বলেছেন—"কি জান, একটু কামনা থাকলে ভগবানকে পাওয়া যায় না, ধর্মের সূক্ষ্ম গতি, ছুঁচে সুতা পরাচ্ছ—কিন্তু সুতার ভিতর একটু আঁশ থাকলে ছুঁচের ভেতর প্রবেশ করবে না।····· কামনা থাকতে যত সাধন কর না কেন সিদ্ধিলাভ হয় না।" আবার বলেছেন—"বাসনা থাকলেই শরীর-ধারণ হয়। বাসনায় আগুন দিতে হয়, তবে ত।" ( 'কথামৃত', তৃতীয় ভাগ )

'বাসনাক্ষয় না হলে মুক্তি অসম্ভব'—এ কথাটি সর্বশাস্ত্রসম্মত এবং অবিসংবাদিত ভাবে সত্য বটে, কিন্তু বাসনার স্বরূপ কি অর্থাৎ এক কথায় বাসনা কাকে বলে, সে সম্বন্ধে সুস্পষ্ট জ্ঞান না থাকলে 'নির্বাসনা' বা বাসনাক্ষয় কথাটিই অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়, কেন না কোনো বস্তুর স্বরূপ অবগত না হলে সেই বস্তুটির বিনাশসাধন করা অসম্ভব। শত্রুর সঙ্গে যার কোনো পরিচয় নাই—শত্রুর গতি-প্রকৃতি-অবস্থান সম্পর্কে যার কোনো ধারণা নাই সে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে কেমন করে?···

সাধারণভাবে 'বাসনা' বলতে আমরা আমাদের স্থূলকামনাগুলিকেই বুঝি, যেমন—যশ, বিত্ত, পুত্রাদি লাভের ইচ্ছা ইত্যাদি।

বশিষ্ঠদেব বাসনার স্বরূপ নির্দেশ করে বলেছেন—

"দৃঢ়ভাবনয়া ত্যক্তং পূর্বাপরবিচারণম্।
যদাদানং পদার্থস্য বাসনা সা প্রকীর্তিতা॥"

[ যোগবাশিষ্ঠ, উপশম প্রকরণ, ৯১।২৯
( মুক্তিকোপনিষদ্-৫৫ ) ]

অর্থাৎ পূর্বাপর বিচার না করে পূর্বজন্মার্জিত দৃঢ়সংস্কারের বশবর্তী হয়ে লোকে যে দেহ ইত্যাদিকে 'আমি' বলে মনে করে এবং তদনুযায়ী কাজ করে সেইটিকেই বলা হয় 'বাসনা'। যোগবাশিষ্ঠের টীকাকার বলেন—"বাসয়তি ইতি বাসনা", 'বাস' শব্দটির অর্থ আবরণ বা আচ্ছাদন, 'বাসয়তি' অর্থাৎ যা বস্ত্রের ন্যায় আবৃত বা আচ্ছাদিত করে রাখে। 'বিচারশূন্য দেহাদিভাব' আত্মার স্বরূপকে আবৃত করে রাখে বলেই একে বাসনা বলা হয়।

অপরিসীম শক্তিশালী এই বাসনা, শ্রীশ্রীমায়ের উক্তিতেই পাই 'বাসনা থেকেই সব।…বাসনাটি সূক্ষ্ম বীজ। যেমন বিন্দু-পরিমাণ বটবীজ হতে কালে প্রকাণ্ড বৃক্ষ হয়, তেমনই বাসনা থাকলে পুনর্জন্ম হবেই।' মাদক-দ্রব্যের প্রভাবে মত্ত ব্যক্তির যেমন যথার্থ বিচার-শক্তি বিলুপ্ত হয়, 'বাসনাবিবশীকৃতঃ' পুরুষও তেমনই বাসনা-মদে মত্ত হয়ে বস্তুর স্বরূপ উপলব্ধি করবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে আর যথাযথ বিচার-শক্তি না থাকায় বাসনামত্ত পুরুষ যখন বিচার করার চেষ্টা করে তখনও যথার্থ জ্ঞানলাভে অসমর্থ হয়ে "সর্বং সদ্‌বস্ত্বিতি বিমুহ্যতি" অর্থাৎ যা কিছু আছে সবই সৎ অতএব উৎকৃষ্ট ব'লে নশ্বর দ্রব্যাদিতেই আসক্ত হয় এবং তার ফলস্বরূপ মোহগ্রস্ত মানব 'গতাগতং কামকামা লভন্তে' অর্থাৎ জন্মমরণরূপ গতাগতিই লাভ করে।

স্থূলসূক্ষ্মভেদে এই বাসনা আবার দ্বিবিধ—শুদ্ধ বাসনা ও মলিন বাসনা। পুনর্জন্মনাশের হেতু, জ্ঞাতব্য সৎ বস্তু বা স্বরূপ সম্বন্ধে জ্ঞান-লাভের যে ইচ্ছা তাকে অর্থাৎ মুক্তিকামনাকে বলা যায় শুদ্ধ বাসনা। পুনর্জন্মের কারণ যে বাসনা—তাই মলিন বাসনা। "অজ্ঞানসুঘনাকারা ঘনাহংকারশালিনী। পুনর্জন্মকারী প্রোক্তা মলিনা বাসনা বুধৈঃ॥" [ যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ, বৈরাগ্য প্রকরণ—৩।১২, মুক্তিক উপনিষদ্, ৬০ ]

মলিন বাসনা কিরূপ?—'অজ্ঞানসুঘনাকৃতিঃ' অর্থাৎ অজ্ঞানের দ্বারা বিশেষরূপে ঘনীভূত আকৃতি। অজ্ঞান কি? জড় ও চেতনের—দেহ এবং আত্মার ভেদজ্ঞানের অভাবই হল অজ্ঞান। জড় এবং চৈতন্যের এই তাদাত্ম্যাধ্যাস হেতুই 'আমি ও আমার'-রূপ অহঙ্কার জন্মে আবার অজ্ঞানজাত এই মিথ্যা-অহঙ্কার হেতু কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদি বুদ্ধি অনাত্মা অচেতন জড় দেহে আরোপিত হয় এবং একান্তরূপে সৎ, নিত্য বর্তমান, চেতন, আনন্দস্বরূপ আত্মার স্বরূপ বিস্মৃত হওয়ায় দেহকেই আত্মা বলে ভ্রম হয়। মলিন বাসনা শুধু যে অজ্ঞানের দ্বারা আবরিত তা' নয়—বহু জন্মের সংস্কারের ফলে অজ্ঞানের দ্বারা ঘনীভূত। বাশিষ্ঠ রামায়ণের টীকাকারও বলেছেন যে, বাসনাবীজ অঙ্কুরিত হবার পক্ষে অজ্ঞানই প্রকৃষ্ট ক্ষেত্র। নিবিড় অহংকার তার উপসেচক, যেমন ক্ষেত্র ব্যতীত বীজ অঙ্কুরিত হতে পারে না তেমনই আবার জলসেচনাদি কর্মের জন্য ক্ষেত্রিক না থাকলে বীজ হতে বৃক্ষাদির উৎপত্তি সম্ভবপর নয়। তাই মলিন বাসনার স্বরূপ বোঝাতে গিয়ে কেবল-মাত্র 'অজ্ঞানসুঘনাকারা' বলা হয়নি, 'ঘনাহংকারশালিনী'ও বলা হয়েছে সঙ্গে সঙ্গে; ক্ষেত্র-ক্ষেত্রিকের ন্যায় অজ্ঞান এবং অহংকার পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠসম্বন্ধযুক্ত। অজ্ঞান থেকেই অহংকার জন্মে, আবার অহংকারের ফলেই তত্ত্বজ্ঞানোদয় হয় না।

অজ্ঞান দ্বারা ঘনীভূত-আকৃতি-নিবিড় অহঙ্কারযুক্ত এই মলিন বাসনা স্বীয় স্বভাব-বশতই জ্ঞানের অত্যন্ত বিরোধী হওয়ায় পুন-

র্জন্মের কারণ হয়। মলিন বাসনাকেই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ আসুরীসম্পদরূপে বর্ণনা করে এটিই যে পুনর্জন্মের হেতু তা বলেছেন—"আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি, মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং গতিম্।" [ গীতা, ১৬।২০ ]

এই মলিন বাসনাকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়—(১) লোকবাসনা, (২) শাস্ত্রবাসনা ও (৩) দেহবাসনা। আমরা প্রথমতঃ 'লোকবাসনার' কথাই আলোচনা করতে পারি। 'লোকবাসনা' নেই—এমন ব্যক্তি এ সংসারে বিরল। লোকবাসনা কি? না,—মান-যশাদির আকাঙ্ক্ষা। জগতে যশ কে না চায়? লোকে যেন আমার সকল প্রকার কার্যের, সকল আচরণের প্রশংসা করে, আমি যেন কারও নিন্দাভাজন না হই—এরূপ প্রবল ইচ্ছার নাম 'লোকবাসনা'।

এই 'লোকবাসনা' হেতু লোকে সৎ কার্যাদিতে প্রবৃত্ত হয় বলে আপাতঃ দৃষ্টিতে লোকবাসনাকে শুভকরী বলেই আমাদের মনে হতে পারে। কিন্তু একটু গভীরভাবে চিন্তা করলেই দেখা যায় যে, এ বাসনার পূর্তি কোন দিন সম্ভব নয়; তাই এ বাসনা শুধুমাত্র 'পুনর্জন্মকারী' মলিন বাসনা।

আপাতঃ শুভবেশধারী এই বাসনা পূরণ করা মানুষের পক্ষে শুধু যে দুঃসাধ্য তা' নয়, অসম্ভব। ইতিহাস, পুরাণ, মহাপুরুষ-জীবনী প্রভৃতি পর্যালোচনা করে এই সিদ্ধান্তেই আমরা পৌঁছুতে বাধ্য হই। কেন না তা' না হলে অপাপবিদ্ধা পবিত্রতা-স্বরূপিণী রামগতপ্রাণা স্বয়ং সীতাদেবীকে লোকাপবাদ সহ্য করতে হত না। শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীচৈতন্য, যীশুখৃষ্ট, বুদ্ধদেব, শ্রীরামকৃষ্ণদেব প্রমুখ অবতারপুরুষগণকেও দেহধারণ-কালে কত না লোকনিন্দা সহ্য করতে হয়েছে! শুধু নাই নয়—অবতারপুরুষগণের একজনের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাভাবপোষণ হেতু অপরের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করেন—এরূপ ব্যক্তি এখনও জগতে বিরলদৃষ্ট নন। 'অখণ্ডের ঘর হতে যার আগমন'—'সপ্তর্ষির একজন' শিবসদৃশ স্বামীজীর চরিত্রেও মিথ্যা কলঙ্ক আরোপ করতে কুণ্ঠিত হয়নি স্বার্থপরায়ণ ঈর্ষাতুর ইহসর্বস্ব অজ্ঞ মানব

বস্তুতঃ সকল ব্যক্তির মনের গঠন সমান নয় এবং কার্যকালে প্রত্যেকে তার নিজের বিশেষ মানসিক গঠনানুযায়ী অপরের কাজের বিচার করে। শাস্ত্র তাই বলেছেন—"বিদ্যতে ন খলু উপায়ঃ সর্বলোকপরিতোষকরো যঃ।" সুতরাং 'সর্বজনপ্রশংসিত আচরণ' করার বাসনা অতি উত্তম বলে মনে হলেও এই বাসনার নিবৃত্তি কখনও সম্ভব না হওয়ায় তা' কেবলমাত্র দুঃখপ্রদ পুনর্জন্মেরই কারণ হয়ে থাকে। এই লোকবাসনার নিবৃত্তির উপায় হল—বিবেক-বিচার আর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের 'লোক না পোক' উপদেশটির অনুধ্যান। গীতামুখেও শ্রীভগবান যোগীর লক্ষণ নির্দেশ-কালে বারংবার 'তুল্যনিন্দাস্তুতি'র কথা বলেছেন। সমনিন্দাস্তুতি কি না লোকবাসনা-পরিত্যাগ।

(২) দেহবাসনা—'অচেতন-অনিত্য জড় দেহই চৈতন্যময় সৎস্বরূপ আত্মা'—এই ভ্রান্ত ধারণা দৃঢ়ভাবে পোষণ ও তদনুযায়ী কাজ করার ফলেই হয় 'দেহবাসনা'র উদ্ভব।

দেহবাসনাকে তিনভাগে ভাগ করা যায়—(ক) দেহাত্মবুদ্ধি, (খ) গুণাধান ভ্রম (গ) দোষাপনয়ন ভ্রম।

(ক) দেহাত্মবুদ্ধি—অস্থি-চর্ম-শোণিত-মেদ-মজ্জাদির সমবায়ে গঠিত এই জড়দেহ অন্যান্য

জড় পদার্থাদির ন্যায় অচেতন। এই দেহের নিজস্ব কোন চৈতন্য নাই—চৈতন্যস্বরূপ আত্মার চৈতন্যেই দেহকে 'চেতনবৎ' মনে হয়, যেমন চন্দ্রের নিজস্ব আলো নাই, সূর্য-কিরণ চন্দ্রে প্রতিবিম্বিত হয় এবং যথার্থ জ্ঞানের অভাবহেতু আমরা সেই আলোকেই 'চাঁদের আলো' বলে মনে করি। তেমনই যথার্থ জ্ঞানের অভাবহেতু অর্থাৎ অজ্ঞানতাবশতঃ আমরা সাধারণ মানুষ এই দেহকেই চেতন আত্মা বলে মনে করে ক্ষণিক আনন্দের জন্য, দৈহিক সুখ-স্বাচ্ছন্দের জন্য কত না প্রয়াস করি! অনিত্য-অচেতন জড়দেহে আসক্তির ফলে চিত্তে অহঙ্কার, মমতা, দম্ভ, দর্প-অভিমানাদি আসুর সম্পদের উদয় হয়। এই আসুরী সম্পদই পুনর্জন্মের কারণ। সুতরাং পয়োমুখ বিষকুম্ভের ন্যায় দেহাত্মবুদ্ধির ফলে আপাততঃ দৈহিক সুখসম্ভোগ সম্ভব হলেও পরিণামে তা' অশেষক্লেশপ্রদ পুনর্জন্মের কারণ হওয়ায় এ বাসনা যে অতি মলিন বাসনা তাতে সন্দেহের অবকাশমাত্র নাই।

(গ) গুণাধান ভ্রম যে-সমস্ত দৈহিক গুণাবলী লোকসমাজে আদৃত, সেগুলি লাভ করার চেষ্টাকে বলা হয় গুণাধান ভ্রম। এই ভ্রমটিও দেহ-বাসনার অন্তর্গত, কেন না দেহে আত্মবুদ্ধি হেতুই মানুষ প্রশংসাযোগ্য শারীরিক গুণাবলীর অধিকারী হতে চেষ্টা করে। আলোচনার সুবিধার জন্য এই গুণাধান ভ্রমকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায়—(ক) লৌকিক গুণাধান ও (খ) শাস্ত্রীয় গুণাধান।

(ক) লৌকিক গুণাধান—সুকণ্ঠ গায়ক বা পাঠক সর্বত্র সমাদৃত হন। সেজন্য সুকণ্ঠ-লাভের ইচ্ছায় অনেকে মরিচভক্ষণ, ঔষধ-সেবনাদি নানা উপায় অবলম্বন করেন। কমনীয় সুগঠিত দেহলাভের জন্য লোকে নানা-বিধ পুষ্টিকর দ্রব্যাদি সেবন করে, বিশেষ বিশেষ নিয়ম পালন করে, শরীর-চর্চায় অমূল্য মানব-জীবনের প্রায় সকল সময়ই ব্যয় করে।

কিন্তু দেখা যায় বিশেষ প্রযত্ন করা সত্ত্বেও সকলেই সুকণ্ঠের অথবা কমনীয় ত্বকের বা সুগঠিত শরীরের অধিকারী হতে পারে না। আবার কেউ কেউ সাময়িকভাবে দৈহিক পুষ্টি-লাবণ্যাদি সম্পাদনে সমর্থ হলেও নানা কারণেই অর্জিত লাবণ্য, স্বাস্থ্যাদির ক্ষয় হতে পারে। সুকণ্ঠ গায়কেরও স্বরভঙ্গ হয়, লাবণ্যময়ী সুন্দরী নারীও জরা-ব্যাধি-শোকের কবলে প'ড়ে হারান তাঁর রূপ-লাবণ্য, আধি-ব্যাধি-জরা জীর্ণ করে সুগঠিত তনুকে—আবার কালবশে মানুষ হয় আয়ুহীন। প্রাণহীন দেহ পরিগণিত হয় অশুচি বলে। দৈহিক রূপ-গুণ-স্বাস্থ্য কোনটিরই আর সমাদর থাকে না তখন।

বিচার করলে দেখি বাস্তবিক পক্ষে দৈহিক গুণাধানের প্রয়াস কার্যে পরিণত করা অসম্ভব —এ প্রয়াস কেবল দেহবাসনাকেই সুদৃঢকারী পুনর্জন্মের কারণ ছাড়া আর কিছুই নয়।

অত্যন্তমলিনো দেহো দেহী চাত্যন্তনির্মলঃ।
উভয়োরন্তরং জ্ঞাত্বা কস্য শৌচং বিধীয়তে॥
(মুক্তিক উপনিষদ্, ৬৭)

(খ) গঙ্গাস্নান, যাগ-যজ্ঞ ব্রতনিয়মাদির পালন প্রভৃতি শাস্ত্রোক্ত পুণ্য কর্মসমূহের অনুষ্ঠান সহায়ে পুনর্জন্মের প্রচেষ্টাকে বলা হয় শাস্ত্রীয় গুণাধান। লৌকিক গুণাধানের ন্যায় শাস্ত্রীয় গুণাধানও বাস্তবিক পক্ষে কার্যে পরিণত করা অসম্ভব। কেননা প্রথমতঃ শাস্ত্রোক্ত সকল আচার-অনুষ্ঠান বিধিমত যথাযথ পালন করা বর্তমান যুগে অসাধ্যপ্রায়। তাছাড়া শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানাদির ব্যাপারে নানা মুনির নানা মত হওয়ায় কোন্ মতটি যে ব্যক্তি-বিশেষের পক্ষে গ্রহণযোগ্য আর কোন্‌টি ত্যাজ্য সে বিষয়ে নিঃসংশয় হওয়া যায় না। তৃতীয়তঃ

শাস্ত্রোক্ত যাগযজ্ঞ ব্রত উপবাসাদি পুণ্যার্জনের সহায়ক হলে তা' কখনও মানুষকে মুক্তিপথের সন্ধান দিতে পারে না।

দোষাপনয়ন ভ্রম—যে-সকল দোষ নিন্দনীয় বলে ইহলোকে প্রসিদ্ধ সেগুলি দূর করার ইচ্ছাই হল দোষাপনয়ন বাসনা। প্রকৃতিভেদে এই বাসনা আবার দ্বিবিধ—লৌকিক ও বৈদিক। তাম্বুলাদি চর্বণ, ঔষধ বা সুগন্ধী-অনুলেপনাদির ব্যবহার প্রভৃতির দ্বারা দেহের শুচিতা আনয়নের প্রচেষ্টা দ্বারা লৌকিক দোষাপনয়ন বাসনা এবং আচমন, শৌচাদির দ্বারা বৈদিক দোষাপনয়ন বাসনা পূরণ করার প্রয়াস ইহজগতে দৃষ্ট হয়।

কিন্তু যথাসাধ্য প্রযত্ন করা হলেও প্রকৃত-পক্ষে দোষাপনয়ন বাসনা পূরণ করা অসম্ভব। অজ্ঞানতাবশতই লোকে এরূপ অলীক বাসনা করে। কেননা নবদ্বারবিশিষ্ট ঘৃণ্য শোণিত অস্থি-মেদ-মজ্জা-শ্লেষ্মাদির সমবায়ে গঠিত মলমূত্রাদির আধার এই দেহের শৌচাদি অসম্ভব আর দেহী—যিনি নিত্যশুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব—তাঁর শুদ্ধিতা-সম্পাদনের কথা সূর্যকে দীপালোকে আলোকিত করার ন্যায় বাতুলের প্রলাপ মাত্র।…

প্রকৃতপক্ষে যে-দেহের পুষ্টি-সম্পাদন, অশুচিতা-নিবারণ প্রভৃতির জন্য অজ্ঞ মানবের অন্তহীন প্রয়াস—সেই দেহ স্বরূপতঃ চৈতন্যময় নিত্য বস্তু তো নয়ই বরং নির্দ্বিধায় একথা বলা যায় যে, তার মত নিকৃষ্ট বস্তু আর দ্বিতীয় নাই। যে পুরীষ-মূত্র-শোণিতাস্থি প্রভৃতিকে আমরা অশুচি ও ঘৃণ্য বলে মনে করি—সেই সকল অশুচি দ্রব্যের সমবায়েই এই দেহ গঠিত।

দেহই যখন অশুচি তখন সেই নিকৃষ্টতম দেহ-সম্বন্ধীয় সকল প্রকার বাসনাই যে অতি মলিন বাসনার মধ্যে পরিগণিত হবে তাতে আর সন্দেহ কি। সেইজন্য শাস্ত্র বারংবার বলেছেন—'সা ত্যাজ্যা সর্বযত্নেন।'

শাস্ত্রবাসনা—শাস্ত্রাদি পাঠ এবং শাস্ত্রানু-যায়ী আচারাদি পালন করার ইচ্ছার নাম 'শাস্ত্রবাসনা।' শাস্ত্রবাসনাকেও তিন ভাগে ভাগ করা যায়—(ক) পাঠব্যসন, (২) শাস্ত্র-ব্যসন, (৩) অনুষ্ঠানব্যসন।

শাস্ত্রাদি পাঠের প্রবল ইচ্ছা বা শাস্ত্রাদিতে অতি-অনুরাগেরই নামান্তর পাঠব্যসন। আপাত-দৃষ্টিতে পাঠব্যসনকে মলিন বাসনার অন্তর্গত বলে মনে হয় না—কারণ শাস্ত্রপাঠাদি তো বিবেকবুদ্ধি জাগ্রত করে, মনকে ঈশ্বরাভিমুখী হতে সাহায্য করে, সাধু-মহাপুরুষগণও স্বাধ্যায়ের উপদেশ দেন আত্মজ্ঞানলাভেচ্ছু ব্যক্তিকে। বেদও বলেছেন—'স্বাধ্যায়াৎ মা প্রমদিতব্যম্।' উপরোক্ত যুক্তিগুলি সবই সত্য। শাস্ত্রাদির আলোচনা ঈশ্বরচিন্তার, মনোমল মার্জনার সহায়ক বটে কিন্তু শাস্ত্রপাঠে অত্যন্তা-নুরাগ হেতু অনেক সময় আমরা এই সহায়ক বা উপায়টিকেই উদ্দেশ্য বলে ভুল করি। ফলে শাস্ত্রপাঠাদি তখন সাধকের অনুকূল না হয়ে প্রতিকূলই হয়ে দাঁড়ায়, কেননা শাস্ত্রাদিতে পথনির্দেশ করা আছে মাত্র—নির্দেশিত পন্থা অনুসরণ না করে কেবলমাত্র পথটির সম্বন্ধে যত জ্ঞানই অর্জন করি না কেন, তা কখনই আমাদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছুতে সাহায্য করবে না—লক্ষ্যস্থল থেকে যতদূরে আছি ততদূরেই থাকব।

'প্রথমে সব শাস্ত্রাদিপাঠ সমাপ্ত করে তারপর শাস্ত্রনির্দেশিত পথে চলব'—এরূপ চিন্তা করাও অর্থহীন। বেদাদি শাস্ত্ররাজি এত বিপুল যে, স্বল্পায়ু মানব-জীবনে এক জন্মে সর্বশাস্ত্রপাঠ শেষ করা সম্ভব নয়। ফলে এই বাসনা শুধুমাত্র পুনর্জন্মেরই কারণ হয়—যে

উদ্দেশ্যে শাস্ত্রপাঠ সেই উদ্দেশ্যটিই হয় ব্যর্থতায় পর্যবসিত। কথিত আছে—তিন জন্ম বেদাধ্যয়নে রত থেকেও ঋষি ভরদ্বাজ অধ্যয়ন সমাপ্ত করতে পারেননি—তাঁর পাঠব্যসনও বিদূরিত হয়নি। পরে তাঁর চৈতন্যোদয়ের জন্য ইন্দ্র যখন তিনটি সুবিশাল পর্বতসদৃশ পুস্তকরাশি দেখিয়ে বললেন—"এই পর্বতসমূহের প্রতিটি ধূলিকণাও বেদ', তখন দুষ্পূরণীয় বাসনার স্বরূপ বুঝতে পেরে ঋষি ভরদ্বাজ শাস্ত্রপাঠেচ্ছা ত্যাগপূর্বক সাধনায় মগ্ন হলেন। পূজ্যপাদ স্বামী তুরীয়ানন্দজীর জীবনেও প্রায় অনুরূপ একটি ঘটনার উল্লেখ দেখা যায়। স্বামী তুরীয়ানন্দ ছিলেন আশৈশব ব্রহ্মচারী—নিষ্ঠাবান বেদান্তবিচারপরায়ণ জিতেন্দ্রিয় ব্রাহ্মণকুমার। একদা বেদান্তাদি শাস্ত্রচর্চায় বিশেষ রত থাকায় তিনি কিছুদিন শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে যেতে পারেননি। শ্রীশ্রীঠাকুর খোঁজ নিয়ে জানলেন যে, উপনিষদ্-বেদান্তাদি-চর্চায় রত থাকায় তিনি আর পূর্বের ন্যায় দক্ষিণেশ্বরে আসতে পারছেন না। কয়েকদিন পর স্বামী তুরীয়ানন্দ (তখন হরিনাথ চট্টোপাধ্যায়) দক্ষিণেশ্বরে আসামাত্রই শ্রীশ্রীঠাকুর বলে উঠলেন—"তুমি নাকি খুব বেদান্ত-চর্চা করছ? তা বেদান্ত আর কি—'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা'—এই তো বেদান্ত, না আর কিছু।'

সরল প্রাণস্পর্শী এই কথায় হরি মহারাজের চমক ভাঙল শাস্ত্রচর্চায় অত্যন্তাসক্তিরূপ সাধনপথের বিঘ্ন দূর হল।

(খ) শাস্ত্রব্যসন—শাস্ত্র যে আবার সর্বদাই এককথা বলছেন তা' নয়। 'নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্' বলেছিলেন ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির। সত্যই নানা মুনির নানা মত। গন্তব্যস্থল এক হলেও নানা জনে নানা পথ অনুসরণ করেছেন। মতের পার্থক্য হেতু সাংখ্য, ন্যায়, যোগ, বেদান্তাদি শাস্ত্রও বহুবিধ। অপরা এবং পরা—উভয় বিদ্যারই অসংখ্য বিভাগ রয়েছে। এই বিবিধ বিদ্যাসক্তিই হল শাস্ত্রব্যসন। স্বভাবতই এ বাসনা মলিন বাসনা, কেননা একজন মানুষের পক্ষে এককালে বিবিধ বিদ্যায় পারঙ্গম হওয়া সুদুষ্কর; এবং কোনরূপে দৈববশে নানাশাস্ত্রে পারঙ্গম হলেও সাধন ব্যতীত মুক্তিলাভ অসম্ভব—"অধীত্য চতুরো বেদান্ ধর্মশাস্ত্রাণ্যনেকশঃ। ব্রহ্মতত্ত্বং ন জানাতি দর্বী পাকরসং যথা।" (মুক্তিকোপনিষৎ)

(গ) শাস্ত্রোক্ত অনুষ্ঠানাদি যথাযথভাবে পালন করবার ইচ্ছাই হল অনুষ্ঠানব্যসন। অনুষ্ঠানব্যসনও মলিন বাসনার অন্তর্ভুক্ত। কেননা পূর্বেই বলা হয়েছে এরূপ বাসনার কখনই নিবৃত্তি হয় না—প্রথমতঃ, বিপুলতাহেতু সকলশাস্ত্রোক্ত অনুষ্ঠানাদি স্বল্পায়ু মানবজীবনে যথাযথভাবে পালন করা সম্ভব নয়—দ্বিতীয়তঃ, শাস্ত্রোক্ত অনুষ্ঠানাদি সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের সর্বদা মতৈক্য না হওয়ায় সাধারণ লোককে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করতে হয়—আবার অনুষ্ঠানে অত্যন্ত শ্রদ্ধা পরিণামে শ্রদ্ধাজড়তায় পরিণত হয়। সর্বোপরি কেবলমাত্র শাস্ত্রোক্ত যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান কখনই মোক্ষপ্রাপ্তির সাধন হতে পারে না—"প্লবা হ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপাঃ।"

এভাবে পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে, লোকবাসনা দেহবাসনা ও শাস্ত্রবাসনা থাকলে মানুষ কখনই প্রকৃত জ্ঞানের—'মুক্তির' অধিকারী হতে পারে না। মুক্তিকোপনিষদ তাই বলেছেন, "লোকবাসনয়া জন্তোঃ শাস্ত্রবাসনয়াপি চ। দেহবাসনয়া জ্ঞানং যথাবন্নৈব জায়তে॥"

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে—বাসনার স্বরূপ, তার প্রকৃতি সম্বন্ধে কিছু জানাই তো যথেষ্ট

নয়। এই বাসনার নিবৃত্তি হয় কিরূপে? অবয়বী পদার্থেরই বিনাশ হয়। কিন্তু বাসনার তো সেরূপ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কোন অবয়ব আমরা অনুভব করি না, সুতরাং অবয়বহীন বাসনার 'বিনাশ' কথাটিও অর্থহীন। তদুত্তরে বলা যায় যে, এরূপ আশঙ্কা অমূলক। কেননা ব্রতাদি পালনের সময় উপবাস জাগরণাদি বিধি পালন করি অর্থাৎ সাময়িকভাবে ক্ষুধা-নিদ্রাদির ভাব ত্যাগ করি। উপবাস অর্থাৎ ভোজনেচ্ছাত্যাগ, জাগরণ অর্থাৎ নিদ্রাত্যাগ—এস্থলে ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য স্থূল অবয়ব না থাকা সত্ত্বেও যদি ত্যাগ সম্ভব হয় তবে 'বাসনার' ক্ষেত্রেই বা হবে না কেন? প্রথমোক্ত ব্যাপারে অন্ন-ব্যঞ্জন-শয্যাদি স্থূলবিষয় ত্যাগের ন্যায় বাসনার 'বিষয়সমূহ' ত্যাগ করা চলে। আবার ক্ষুধানিদ্রাদিত্যাগে সহায়তা করার জন্য যেমন ভজন, পাঠ, পূজাদি বিকল্প-গ্রহণের ব্যবস্থা করা হয়, 'বিষয়-বাসনা'-ত্যাগস্থলেও তেমনি ভগবদনুরাগ, মৈত্র্যাদি অমল বাসনা প্রভৃতি দ্বারা চিত্তের উপলালনের ব্যবস্থা করা সম্ভব।

বশিষ্ঠদেব বাসনাক্ষয়ের ছয়টি সোপান বা ক্রমের কথা বলেছেন। তার মধ্যে প্রধান দুটি হল—(১) বিষয়-বাসনা-ত্যাগ (২) মানস-বাসনা-ত্যাগ।

বিষয়-বাসনা কিনা বিষয়-সংসর্গজনিত বাসনা। বিষয়সংসর্গহেতু জাত দম্ভ-দর্প-মমত্ব-অভিমান-অহঙ্কারাদি আসুরী সম্পদকে বিষয়-বাসনা বলতে পারি। শ্রীমদ্ভবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন:

"ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽ-
ভিজায়তে॥
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥
২য় অধ্যায়, ৬২।৬৩

অর্থাৎ 'বিষয়-চিন্তা থেকেই বিষয়ে আসক্তি আসে, আসক্তি থেকে আসে কামনা; কামনা প্রতিহত হলেই ক্রোধ; ক্রোধ থেকে জন্মায় মোহ (অবিবেক); মোহের পর আসে স্মৃতিবিভ্রম, তারপর ঘটে বুদ্ধিনাশ; শেষে মানুষ একেবারে পশু হয়ে যায়'—(সৎপ্রসঙ্গ, ১ম খণ্ড, পৃ: ৪৩)। বিবেক-বিচারাদি দ্বারা এই বিষয়-বাসনা ত্যাগ করতে হয়। সাধুসঙ্গ, স্বাধ্যায় প্রভৃতি বিবেক-বিচার জাগ্রত করার প্রকৃষ্ট উপায়।

ভোগ্য বিষয়ের কামনা করা কালীন মনে যে অতি সূক্ষ্ম অথচ অত্যন্ত দৃঢ় সংস্কার জন্মে সেটিই 'মানসবাসনা' নামে প্রসিদ্ধ। মানস-বাসনা পরিত্যাগ করলে মন তার প্রধান অবলম্বন হারায়, বৃত্তিশূন্য হয়ে পড়ে। কিন্তু মন সম্পূর্ণরূপে আলম্বনহীন বা বৃত্তিশূন্য সহজে হতে পারে না। তাই মানসবাসনা-ত্যাগের সহজ উপায় হল মৈত্র্যাদি অমল বাসনা গ্রহণ। পাতঞ্জল যোগসূত্রে বলা হয়েছে—"মৈত্রী-করুণামুদিতোপেক্ষাণাং সুখদুঃখপুণ্যাপুণ্য-বিষয়াণাং ভাবনাতশ্চিত্তপ্রসাদনম্' (১।৩৩)। অর্থাৎ সুখিতের প্রতি মৈত্রী, দুঃখিতের প্রতি করুণা, পুণ্যবানের প্রতি মুদিতা, পুণ্যহীনের প্রতি ঔদাসীন্য পোষণ করলে চিত্ত প্রসন্ন থাকে।

রাগ-দ্বেষাদিহেতুই চিত্ত কলুষিত বা অপ্রসন্ন হয়। রাগ কি? সুখের প্রতি অত্যন্তাসক্তি হেতু মনে সুখলাভেচ্ছারূপ যে বৃত্তির উদয় হয় সেইটিই রাগ। আর যখন চিত্তবৃত্তি দুঃখের অনুশায়িনী হয় অর্থাৎ 'দুঃখ যেন আমাকে ভোগ করতে না হয়'—এরূপ আকার ধারণ করে তাকে বলা হয় দ্বেষ। অবিমিশ্র সুখলাভ বা সর্বদুঃখনিবারণ মানুষের পক্ষে অসম্ভব হওয়ায় রাগদ্বেষাদিজনিত অপূর্ণ

বাসনা চিত্তকে কলুষিত করে। কিন্তু সুখিতের প্রতি মৈত্রী-ভাবনা করলে অর্থাৎ অপরে যে সুখ অনুভব করছে তা' যেন আমার নিজেরই হয়েছে ভেবে অপরের সুখে সুখী হলে সুখ-বিষয়ে অত্যন্তাসক্তি বা রাগ নিবৃত্ত হয়। দুঃখবিষয়ে দ্বেষও অনুরূপভাবে নিবারণ করা যায়। আমাকে যে দুঃখ ভোগ করতে হচ্ছে অপরে যেন সেরূপ দুঃখ ভোগ না করে—এরূপ ভাবলে অথবা অপরের দুঃখে আন্তরিক দুঃখবোধ করলে মনে যে দয়া বা করুণার উদয় হয় তার ফলে 'দ্বেষ'ভাব দুর হয় ও রাগ-দ্বেষাদি দ্বারা বিক্ষিপ্ত না হওয়ায় চিত্তহ্রদে তরঙ্গ ওঠে না, চিত্ত প্রসন্ন হয়। শাস্ত্র তাই বলেছেন, "শুভাশুভাভ্যাং মার্গাভ্যাং বহন্তী বাসনাসরিৎ। পৌরুষেণ প্রযত্নেন যোজনীয়া শুভে পথি॥" শুভ এবং অশুভ উভয় পথেই বাসনানদী প্রবাহিত হয়। পৌরুষ-প্রযত্ন সহকারে এই বাসনা-নদীকে শুভপথে পরিচালিত করাই মানুষের কর্তব্য।

মৈত্র্যাদি অমল বাসনা সহায়ে মলিন বাসনাগুলি যখন সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত হয় তখন এই বাসনাকেও পরিত্যাগ করে কেবলমাত্র চিন্মাত্র বাসনা নিয়ে—চৈতন্যেরই বাসনা-পরায়ণ হয়ে অর্থাৎ একমাত্র ঈশ্বরলাভের বাসনা নিয়ে থাকতে হয়। পুনর্জন্মের বীজ-ধ্বংসকারী এই বাসনা শুদ্ধ বাসনা, এতে কোনও ক্ষতি হয় না, শ্রীশ্রীঠাকুর যেমন বলতেন, "মিষ্ট খারাপ জিনিস, অম্ল হয়, কিন্তু মিছরীতে বরং উপকার হয়; হিঞ্চে শাক শাকের মধ্যে নয়"—তেমনি ভক্তি-কামনাও ঠিক কামনার মধ্যে নয়।

সর্বশেষে জীব যখন স্ব-স্বরূপ উপলব্ধি করে, যখন ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি, তখন আর কোনো বাসনাই থাকে না, অবশ্য অবতার-পুরুষ বা ঈশ্বরকোটির কথা স্বতন্ত্র, কারুণ্য-ও প্রেমপরবশ হয়ে তাঁরা লোককল্যাণার্থে অবতীর্ণ হবার জন্য সামান্য কামনা স্বেচ্ছায় রেখে দেন। তবে সাধারণ জীবের ক্ষেত্রে মলিন বাসনা পরিত্যাগের জন্য প্রয়োজন শুদ্ধ বাসনা। পরিশেষে তাও পরিত্যাজ্য; এই দুরূহ তত্ত্বটিকে শ্রীশ্রীঠাকুরের অনুপম ভাষায় বলা যায় 'একটি কাঁটা দিয়ে আরেকটি কাঁটা তুলে শেষে দুটিই ফেলে দিতে হয়। জ্ঞান-অজ্ঞানের পারে যেতে হবে।' শুভাশুভ সকল বাসনাকে সম্পূর্ণ নিঃশেষও করতে হবে ভৃষ্ট বীজের ন্যায়, নতুবা বিন্দুমাত্র বাসনা থাকলে শরীরধারণ করতেই হবে।

শ্রীশ্রীমায়ের অমৃতময়ী উপদেশবাণীর মধ্যে প্রচ্ছন্ন রয়েছে এই দুরূহ সাধনার ইঙ্গিত—"ভগবানের কাছে কোন্ জিনিসটা প্রার্থনা করতে হয়?……এক কথায় বলতে গেলে, নির্বাসনা প্রার্থনা করতে হয়, কেননা বাসনাই সকল দুঃখের মূল আর মুক্তিপথের অন্তরায়।" ( শ্রীশ্রীমায়ের কথা )

# বিবেকানন্দ সোসাইটিতে স্বামীজীর জন্মোৎসব

গত ২৮শে ফেব্রুআরি কলিকাতায় ১৫১ নং বিবেকানন্দ রোড-স্থিত বিবেকানন্দ সোসাইটি কর্তৃক 'স্বামী বিবেকানন্দ স্মৃতিমন্দির'-এ স্বামী বিবেকানন্দের ১০৮তম জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে আয়োজিত সভায় পৌরোহিত্য করেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়।

সোসাইটির সভাপতি স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ সকলকে স্বাগত সম্ভাষণ জানাইবার এবং সেক্রেটারী শ্রীপ্রকাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সোসাইটির কার্যবিবরণী পাঠ করিবার পর স্বামী শুদ্ধসত্ত্বানন্দ ও অধ্যক্ষ অমিয়কুমার মজুমদার স্বামীজীর স্বদেশপ্রেম ও আধ্যাত্মিকতাভিত্তিক সমাজচিন্তার কথা আলোচনা করেন। পরে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায় সভাপতির ভাষণে বলেন:

"বীর সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের ১০৮ তম জন্মোৎসবের সভাপতিরূপে আমি প্রথমেই তাঁর পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে আমার অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করি। আপনাদের সঙ্গে একত্র হয়ে এই শ্রদ্ধানিবেদনের সুযোগ যাঁরা আমাকে দিয়েছেন স্বামীজীর পুণ্যস্মৃতিতে নিবেদিত সেই বিবেকানন্দ সোসাইটির কর্তৃপক্ষকেও আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।...

"স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, আমাদের এই পুণ্য মাতৃভূমি ধর্ম ও দর্শনের দেশ—বড় বড় ধর্মবীরগণের জন্মস্থান, ত্যাগধর্মের প্রচারক্ষেত্র। তাঁর এ উক্তির মধ্যে যে কোন অতিরঞ্জন নেই তার প্রমাণ তিনি নিজে। উনবিংশ শতাব্দীতে আমাদের জাতীয় জীবনের এক যুগসন্ধিক্ষণে আবির্ভূত তাঁর গুরু শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ এবং তিনি নিজে নৈরাশ্যক্ষুব্ধ ও তিমিরপঙ্কে নিমজ্জিত গোটা জাতিকে যেভাবে আত্মস্থ হতে সাহায্য করেছিলেন, ইতিহাসে সেরূপ নজির খুব বেশি পাওয়া যায় না। নির্ভীক ত্যাগব্রতী সাধনার মাধ্যমে তাঁরা যে ভাব-পরিমণ্ডল সৃষ্টি করেছিলেন তারই ফলস্বরূপ বিংশশতাব্দীর মধ্যভাগে আমরা পেয়েছিলাম স্বাধীনতা।

"স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন একাধারে মহাকর্মী, মহাযোগী ও মহাত্যাগী। এমন দুর্লভ আদর্শ চরিত্র ভারতবর্ষে কেন পৃথিবীর ইতিহাসেও মুষ্টিমেয়। মাত্র ৩৯ বৎসরের জীবনে তিনি যে অসাধ্য সাধন করে গেছেন সে-কথা ভাবলেও বিস্মিত হতে হয়। এই স্বল্পস্থায়ী জীবনে তিনি শুধু পরাধীন দরিদ্র ভারতকেই শক্তি ও মুক্তিমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করে যাননি—গোটা পৃথিবীর জনসমাজের কাছে পৌঁছিয়ে দিয়ে গেছেন ভারতের সনাতন ধর্মের ত্যাগ তিতিক্ষা ও মুমুক্ষার বাণী। তিনি ছিলেন সহায়সম্বলহীন সন্ন্যাসী। একক প্রয়াসে তাঁর এ বিশ্ববিজয় একেবারে রূপকথার মত।

"আমাদের কাছে স্বামী বিবেকানন্দের সর্বাপেক্ষা বড় শিক্ষা এই যে, তিনিই সর্বপ্রথম আমাদের ভগবান, দেশ ও মানুষ—এই তিনটিকে এক করে দেখতে শেখান। ভগবৎ-প্রেমকে কি করে দেশসেবা ও মানবকল্যাণের সঙ্গে সম্মিলিত করতে হয় তার জ্বলন্ত উদাহরণ স্বয়ং বিবেকানন্দ। তাঁর প্রচারিত মতবাদ ইতিহাসের কোন পরিত্যক্ত বস্তু নয়, আমাদের বর্তমান ও ভবিষ্যতের উপর সে মতবাদের প্রভাব অপরিসীম। ভবিষ্যদ্‌দ্রষ্টা স্বামীজী

মানবসমাজ ও রাষ্ট্র সম্বন্ধে যে সব উক্তি করে গেছেন, যত দিন যাচ্ছে ততই সে-সব উক্তির যৌক্তিকতা আমরা উপলব্ধি করছি।

"আমাদের স্বাধীনতা-অর্জনের ৪৫ বৎসর পূর্বে স্বামীজী দেহরক্ষা করেন। অথচ ভারতের স্বাধীনতা ও তার সুমহান ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তিনি ছিলেন নিঃসংশয়। তাই এ অভীঃ-মন্ত্রের সাধক উদ্দাত্তকণ্ঠে দেশবাসীদের বলতে পেরেছিলেন, 'আগামী পঞ্চাশ বর্ষ ধরিয়া সেই পরম জননী মাতৃভূমি যেন তোমাদের আরাধ্যা দেবী হন, অন্যান্য অকেজো দেবতাগণকে এই কয়েক বর্ষ ভুলিলে কোন ক্ষতি নাই। অন্যান্য দেবতারা ঘুমাইতেছেন, এই দেবতাই একমাত্র জাগ্রত—তোমার স্বজাতি—সর্বত্রই তাঁহার হস্ত, সর্বত্র তাঁহার কর্ণ, তিনি সকল ব্যাপিয়া আছেন।' স্বামীজীর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে এই সময়-সীমার মধ্যেই কি আমরা স্বাধীনতা পাইনি?

"স্বদেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে স্বামীজীর ছিল সুগভীর আস্থা। তিনি বলেছেন—'বিশ্বাস কর, বিশ্বাস কর ভারতের উন্নতি হইবেই হইবে, সাধারণ এবং দরিদ্র ব্যক্তিরা সুখী হইবে আর আনন্দিত হইবে। তোমরাই তাঁহার কার্য করিবার নির্বাচিত যন্ত্র।' গত ২২ বৎসরের স্বাধীন ভারতে আমরা স্বামীজীর এই সুগভীর বিশ্বাসের মর্যাদা রক্ষা করে চলতে পেরেছি কি না সে কথা আমাদের ভেবে দেখতে হবে।

"সমাজে ও রাষ্ট্রে শূদ্রশক্তির অভ্যুদয় স্বামীজী স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিলেন। তাঁর এই শূদ্রশক্তি আজকের নির্যাতিত শ্রমিক ও কৃষক সমাজ। এই ঐতিহাসিক অভ্যুদয়কে তিনি স্বাগত জানিয়েছিলেন এবং এই অভ্যুদয়ের মধ্যেই দেখেছিলেন মানবসমাজের মহামুক্তি।

"প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মহামিলন ছিল স্বামীজীর অন্যতম জীবনব্রত। তিনি প্রায়ই বলতেন যে এমন দিন আসবে যখন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের কোন ভেদরেখা থাকবে না। তাঁর মতে সার্বজনীন মানব-সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত সনাতন ধর্মের মধ্য দিয়ে এই মহামিলন সম্ভব হয়ে উঠবে। এ বিষয়ে ভারতের একটি বড় আধ্যাত্মিক ভূমিকা আছে—এই ছিল তাঁর বিশ্বাস। তাঁর সে বিশ্বাসের কতখানি মর্যাদা আমরা রাখতে পেরেছি সে কথা আজ ভেবে দেখার সময় এসেছে।

"তিরোধানের অব্যবহিত পূর্বে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, 'ভারতবর্ষ যদি তার ভগবদ্-জিজ্ঞাসাকে অব্যাহত রাখে তো তার মৃত্যু নাই। যদি সে রাজনীতি বা সামাজিক সংঘর্ষে ডুবে যায় তার মৃত্যু নিশ্চিত।' আমরা আজ অন্যান্য দেশের অন্ধ অনুকরণ করতে গিয়ে রাজনীতি ও সামাজিক সংঘর্ষের পথ বেছে নিয়ে সেই মৃত্যু বরণ করতে চলেছি কি না একথা গুণী জনের বিচার্য। দেশের দরিদ্র, নিরক্ষর, নির্যাতিত মানুষের কল্যাণ ছিল স্বামীজীরও জীবনব্রত—তবে সেটা সংঘর্ষের পথে নয়, আধ্যাত্মিক শুভবুদ্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত মহামিলনের পথে। স্বামীজীর এই কর্মনীতি মহাত্মা গান্ধীর উপরও গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। স্বামীজী-প্রদর্শিত সেই পথ থেকে বিচ্যুত হলে বিশ্বের মানবসমাজকে শোনাবার মত কোন আধ্যাত্মিক বাণী কি আমাদের অবশিষ্ট থাকবে?......"

সভায় উদ্বোধন-সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রীনীলমণি পাল এবং সভান্তে ধন্যবাদ জানান সোসাইটির সহ-সভাপতি স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ।

# প্রেমের ঠাকুর

[ গান ]

শ্রীপ্রীতীশ মিত্র

এসেছে প্রেমের ঠাকুর
দেখবি যদি আয় চলে।
সে যে, হাসে, কাঁদে, থির হয়ে যায়,
আপন মনে কি বলে॥

বলে বুঝি, আমার কথা শোন্,
ওরে ওরে বিশ্বজন,
তোরা, মা নামটি বীজ-মন্ত্র করে
কাম কাঞ্চন যা দলে॥

মা যে জগৎ-তারিণী,
জীবধাত্রী, পালিনী,
মায়ের, পায়ের ছোঁয়ায় তরে যে যায়
দুঃখী, তাপী, সকলে॥

তার যে পূজা বোঝাই ভার,
এমন, দেখি নাই তো আর,
সে যে মায়ের পূজার ফুলের ডালি
আপন অঙ্গে দেয় ঢেলে॥

বলে, টাকায় কিবা হয়,
অসার মাটি বৈ তো নয়।
এই না বলে' টাকা মাটি
অগাধ জলে দেয় ফেলে॥

বলে, নারীর আসল রূপ—
সে যে জননীস্বরূপ,
তাই, আপন জায়ার পায়ে লুটায়
জগৎ-জননী বলে॥

অন্য কাউকে চেনে না,
মুখে সদাই মা, মা, মা।
বলে, মা যদি না দেয় দেখা তো
জীবন বিফলে॥

এমন কে দেখেছিস্ আর,
যেমন রামকৃষ্ণ অবতার।
তার ভাবের শেষ পেতে মহা-
যোগীর মাথা যায় টলে॥

# সমালোচনা

**গীতায় শ্রীরামকৃষ্ণ**— বিজয়গোপাল। প্রকাশক—শ্রীদিলীপ রায় চক্রবর্তী, ২ নন্দন বাগান স্ট্রীট, কলিকাতা ৪। পৃষ্ঠা ১৮৩, মূল্য চার টাকা।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার মূর্তবিগ্রহ। গীতোক্ত সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চন শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে 'টাকা মাটি মাটি টাকায়' অভিনবভাবে রূপায়িত। "দশবার 'গীতা গীতা' বললে যা হয় তা-ই গীতার সার। অর্থাৎ 'ত্যাগী'। হে জীব, সব ত্যাগ ক'রে ঈশ্বরের আরাধনা কর।"—শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এই অমৃতবাণীর মাধ্যমে সমগ্র গীতাগ্রন্থের মর্মবাণী মানুষের হৃদয় স্পর্শ করে।

'গীতায় শ্রীরামকৃষ্ণ' পুস্তকখানিতে গীতার বাণীর সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ-বাণীর মিল, ভাবগত ঐক্য, উভয়ের তাৎপর্য সুপরিস্ফুট। প্রকাশ-ভঙ্গী সহজ সরস। ভক্তগণের হাতে দিবার উপযোগী গ্রন্থ।

**শেষরশ্মি**—বিজয়গোপাল। প্রকাশক—শ্রীনারায়ণ সাহা, ২ নন্দনবাগান স্ট্রীট, কলিকাতা ৪। পৃষ্ঠা ৮৭ ; মূল্য দুই টাকা।

'শেষরশ্মি' কবিতা-গ্রন্থ। গ্রন্থকার শিক্ষক-কবি। বহু বৎসর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতায় তিনি জানেন ছাত্রজীবনে কিরূপ কবিতা ভাল লাগে এবং কি প্রকারের কবিতা তাহাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করা প্রয়োজন। ত্রিশটির বেশী কবিতা এই পুস্তকে পরিবেশিত, সবগুলিতেই ভাব ভাষা ও ছন্দের সামঞ্জস্য বিদ্যমান। বয়স্ক ব্যক্তিগণেরও পুস্তকখানি ভাল লাগিবে, বিশেষ করিয়া ভক্তিরসাত্মক কবিতাগুলি।

**গীতিরূপা**—বিজয়গোপাল। প্রকাশক—শ্রীদিলীপ রায় চক্রবর্তী, ২, নন্দনবাগান স্ট্রীট, কলিকাতা ৪। পৃষ্ঠা ৬৩ ; মূল্য এক টাকা।

৬০টি গানের সমষ্টি 'গীতিরূপা'। ভাষা, ভাব ও ছন্দ বেশ সুন্দর। গানগুলি পড়িয়া খুব ভাল লাগিল, তবে রসোত্তীর্ণ কিনা গায়ক-কণ্ঠে ধরা পড়িবে।

**তন্ত্র-পরিচয় :** সত্যবান। লিপিকা, ৩০।১ কলেজ রো, কলিকাতা ৯। পৃষ্ঠা ১৯২ ; মূল্য সাত টাকা।

তন্ত্র-পরিচয় গ্রন্থখানি আকর্ষণীয় হইয়াছে। বিরাট তন্ত্রশাস্ত্রের সহিত পরিচিত হওয়া বহু অধ্যয়ন-সাপেক্ষ। সংক্ষেপে অথচ সুষ্ঠুভাবে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি এই গ্রন্থে পাঁচটি পর্বে আলোচিত হইয়াছে : শক্তিপূজা ও তন্ত্রমতের প্রাচীনতা ও বিস্তার, শক্তির উপলব্ধি ও দেহ-তত্ত্ব, শক্তির রূপকল্পনা, শক্তিপূজা-পদ্ধতি বা প্রাণতত্ত্ব, দেবী দুর্গা। এতদ্ব্যতীত পরিশিষ্টে আলোচিত বিষয় : শ্রীশ্রীচণ্ডী সপ্তশতী-পাঠের রহস্য ও শ্রীশ্রীদশমহাবিদ্যা-রহস্য।

দুরূহ বিষয়বস্তুকে সহজ-সরলভাবে প্রকাশ করিবার কৃতিত্ব গ্রন্থমধ্যে রহিয়াছে। যাঁহাদের তন্ত্রসম্বন্ধে জানিবার অনুসন্ধিৎসা আছে, তাঁহারা পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আনন্দ লাভ করিবেন।

**ধর্মপরিচয় :** শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র লাহিড়ী। শ্রীবিজয়কৃষ্ণ প্রকাশনী, ৮১বি, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা ৯। পৃষ্ঠা ১১২ ; মূল্য চার টাকা।

ধর্ম বলিতে কি বুঝায়, বর্তমানে মানুষের ধর্মভাবের কতখানি প্রয়োজনীয়তা—এই উভয় দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া গ্রন্থখানি রচিত হইয়াছে মনে হয়। গ্রন্থকারের প্রচেষ্টাও অনেকাংশে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে, এরূপ মনে করিলে ভুল হইবে না। ধর্মের উৎপত্তি ও বিভিন্ন ধর্ম, হিন্দুধর্মের বিবর্তন, বৌদ্ধধর্ম, জৈন-ধর্ম, শিখধর্ম, কনফিউসিয়াসের ধর্ম, জোরাথুস্ট্রার ধর্ম—বিভিন্ন পরিচ্ছেদে আলোচিত বিষয়গুলি সুলিখিত।

# শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

## বেলুড় মঠে শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব

বেলুড় মঠে গত ২৫শে ফাল্গুন, ১৩৭৬ (৯. ৩. ৭০) সোমবার, শুভ শুক্লা দ্বিতীয়ায় ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৩৫তম পুণ্য জন্ম-তিথি উৎসব মহানন্দে ও ভাবগম্ভীর পরিবেশে উদ্‌যাপিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে ব্রাহ্মমুহূর্তে মঙ্গলারতি, বেদপাঠ, উষাকীর্তন, পূর্বাহ্নে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিশেষ পূজা, হোম প্রভৃতি, শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ পাঠ, কালীকীর্তন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। সহস্র সহস্র ভক্ত নরনারী মঠে সমাগত হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণ-পাদপদ্মে ভক্তি-অর্ঘ্য নিবেদন করেন। প্রায় ১৫ হাজার ভক্ত হাতে হাতে প্রসাদ গ্রহণ করেন।

অপরাহ্নে মঠ-প্রাঙ্গণে আয়োজিত সভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী রঙ্গনাথানন্দ। বক্তা ছিলেন স্বামী ভাস্থানন্দ, স্বামী বুধানন্দ ও ডক্টর নরম্যান অ্যাডম্‌স্।

সভারম্ভে স্বামী ভাস্থানন্দ ও চিকাগো কেন্দ্রের ব্রহ্মচারিগণ কর্তৃক শান্তিপাঠ ও স্বামী তপনানন্দ কর্তৃক উদ্বোধন-সঙ্গীত গীত হইবার পর শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণীর আলোচনা শুরু হয়।

স্বামী ভাস্থানন্দ বলেন, "বর্তমান যুগ শত-সমস্যাজর্জরিত। এ সব সমস্যারই সমাধান রয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণীতে। পাশ্চাত্য মানসে শ্রীরামকৃষ্ণের যে বাণীগুলি সর্বাধিক প্রভাবশীল তাহা হইল: ভগবান লাভের প্রচেষ্টা চাই—তাঁকে দেখা যায়; মানুষ স্বরূপতঃ ভগবান—জীব আসলে শিবই; ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্নিহিত একত্ব—ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্যন্ত সবই নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে একই নিয়মাধীনে, ভগবানের দৃষ্টিতে সবাই সমান; সর্ব-ধর্ম-সমন্বয়—মত ধর্ম নয়, মত বহু, বিভিন্ন পথমাত্র, লক্ষ্য সব পথেরই এক।" স্বামী বুধানন্দ বলেন, "শ্রীরামকৃষ্ণ 'চির-উন্মদ প্রেমপাথার'। আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের চরণে আসতে পারি না, তিনিই তাঁর প্রেমে আকর্ষণ করে নেন আমাদের। তাঁর এই প্রেম ছিল প্রথমে ঈশ্বরা-ভিমুখী; বাল্যকাল থেকেই তার প্রকাশ দেখা যায়, দক্ষিণেশ্বরে দেখা যায় তার বিপুল উচ্ছ্বাস —'মা দেখা দে' ব'লে কেঁদে কেঁদে মাটিতে মুখ ঘষছেন, মাকে পেলাম না ব'লে দেহত্যাগে উদ্যত হচ্ছেন। মাকে পাবার পর এই প্রেমই ছুটলো মানবাভিমুখী হয়ে, তখন মানবকল্যাণ সাধনের যন্ত্রস্বরূপ যুবক ভক্তদের জন্য দক্ষিণেশ্বরে কুঠির ছাদের ওপর উঠে কাঁদছেন, 'ওরে তোরা সব কে কোথায় আছিস আয়রে!' শ্রীরাম-কৃষ্ণভক্তগণকেও হতে হবে মানবপ্রেমিক।"

ডক্টর নরম্যান অ্যাডাম্‌স্ বলেন: "মানব-জাতিকে আজ একসূত্রে গ্রথিত হতেই হবে। সে সূত্র দিয়ে গেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। খৃষ্টান, মুসলমান প্রভৃতি মতেও সাধন করে তিনি ধর্মের মধ্যে ও মানুষের মধ্যে বিভেদ ঘুচিয়ে দিয়ে গেছেন।"

স্বামী রঙ্গনাথানন্দ সভাপতির ভাষণে বলেন, "শ্রীরামকৃষ্ণ মানুষের কাছে প্রেমের বাণী, মিলনের বাণী রেখে গেছেন। তিনি কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন না, রেঁামা রেঁালার ভাষায় তিনি ছিলেন বিশ্বাত্মা। শ্রীরামকৃষ্ণ শুধু তত্ত্বালোচনার কথা বলেননি, জোর দিয়ে গেছেন সত্যকে জীবনে রূপায়িত করবার প্রচেষ্টার ওপর। ভারতকে আজ তাঁর বাণী অনুধাবন করতে হবে, জাতীয় জীবনে

রূপায়িত করতে হবে; কেবল দৈহিক ও বৌদ্ধিক উৎকর্ষ নয়, সেই সঙ্গে আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সাধনের জন্যও সমানভাবে সচেষ্ট হতে হবে। যে অদ্বয় মহান সত্য বিশ্বের সর্বত্র ওতপ্রোত, তার বিভায় অনুরঞ্জিত করতে হবে জীবনের সবকিছুকে।"

রাত্রে শ্রীশ্রীদশমহাবিদ্যার পূজা, শ্রীশ্রীকালীমাতার বিশেষ পূজা ও হোম হয়। রাত্রিশেষে পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ ১৫ জনকে সন্ন্যাসব্রতে ও ১৯ জনকে ব্রহ্মচর্যব্রতে দীক্ষিত করেন।

## শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্য

**অন্ধ্রে ঘূর্ণিবাত্যা বিপর্যস্তদের সেবা:** গুন্টুর জেলার কুরথালার ঘূর্ণিবাত্যা-বিপর্যস্ত জনগণের জন্য চিরালায় ৭০টি বাসগৃহের একটি নূতন কলোনী, একটি বিদ্যালয়ভবন এবং একটি কম্যুনিটি-হল মিশন কর্তৃক নির্মিত হইয়াছে। গত ৭ই ফেব্রুআরি, ১৯৭০ কলোনী ও ভবনগুলির উদ্বোধন-কার্য সুসম্পন্ন হয়।

## লখনৌ সেবাশ্রমে পলিক্লিনিক

গত ১৮ই ফেব্রুআরি, ১৯৭০ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ লখনৌ রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে নবনির্মিত বিবেকানন্দ পলিক্লিনিকের শুভ উদ্বোধন করিয়াছেন। এই উপলক্ষে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান আয়োজিত হইয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের প্রায় ১৫০ জন সন্ন্যাসী এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে উপস্থিত থাকিয়া আশ্রম-প্রাঙ্গণকে কয়েকদিন আনন্দমুখরিত করিয়া রাখিয়াছিলেন।

## কার্যবিবরণী

**কনখল** রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের ৬৭তম বর্ষের (এপ্রিল ১৯৬৮ হইতে মার্চ ১৯৬৯) কার্যবিবরণী আমাদের হস্তগত হইয়াছে।

এই সেবাশ্রম হিমালয়ের পাদদেশে হরিদ্বারের নিকটে মনোরম স্বাস্থ্যকর স্থানে এবং পবিত্র পরিবেশে অবস্থিত। রামকৃষ্ণ মিশনের প্রাচীন সেবাশ্রমগুলির অন্যতম কনখল সেবাশ্রমটি যুগনায়ক স্বামী বিবেকানন্দের জীবৎকালেই ১৯০১ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে ইহা রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকেন্দ্ররূপে অন্তর্ভুক্তি লাভ করে।

সেবাশ্রমের প্রধানতঃ দুইটি বিভাগ: ইনডোর ও আউটডোর।

ইনডোর হাসপাতাল: আলোচ্য বর্ষে ৫০টি শয্যাযুক্ত অন্তর্বিভাগীয় হাসপাতালে মোট ১,৪৮১ জন রোগী চিকিৎসা লাভ করে, তন্মধ্যে নূতন রোগীর সংখ্যা ১,৪৫৩। বর্ষশেষে ১,২৯০ জন রোগমুক্ত হইয়া হাসপাতাল হইতে চলিয়া যায় এবং ৪৮ জন চিকিৎসাধীন থাকে। গড়ে দৈনিক ৪৪.৭টি শয্যা রোগীদের দ্বারা অধিকৃত থাকে। অন্তর্বিভাগে ২১৭টি অস্ত্রচিকিৎসা করা হয়।

আউটডোর ডিসপেন্সারী: আলোচ্য বর্ষে বহির্বিভাগে মোট চিকিৎসিতের সংখ্যা ১,২৬,৪৫৭ (নূতন—৩৫,২৪৩); অস্ত্রচিকিৎসা ৫,২৯৮, দন্তচিকিৎসা ১৯৪, চক্ষু এবং কর্ণনাসিকা ও গল চিকিৎসা ৩,৯৪৬।

ল্যাবরেটরিতে ৬,৮৩৬টি স্পেসিমেন পরীক্ষা করা হয়। ইলেক্‌ট্রোথেরাপি বিভাগে চিকিৎসিতের সংখ্যা ৪৫১। এক্স-রে বিভাগে ১,২০৭টি এক্স-রে তোলা হয়।

গ্রন্থাগারে ৪,৩৫৪ খানি পুস্তক আছে, ৫টি দৈনিক ও ৪৭টি সাময়িক পত্রিকা রাখা হয়।

মন্দিরে প্রতিদিন পূজাদি এবং একাদশীতে রামনাম অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি এবং অন্যান্য পুণ্য

তিথিগুলি সুষ্ঠুভাবে উদ্‌যাপিত হয়।

প্রতিষ্ঠাকাল হইতে কনখল সেবাশ্রম জাতিধর্মনির্বিশেষে আর্ত নারায়ণের অকুণ্ঠ সেবায় রত। হরিদ্বার হৃষীকেশ প্রভৃতি তপঃ-ক্ষেত্রের সাধুসন্তগণও পীড়িত অবস্থায় এখানে সুচিকিৎসা ও সেবা যত্ন লাভ করিয়া থাকেন; যুগাচার্য স্বামীজীরই নির্দেশে পুণ্যভূমি কনখলে সেবাশ্রম স্থাপিত হইয়াছিল।

### উৎসব-সংবাদ

**ফরিদপুর** রামকৃষ্ণ মিশন কার্যনির্বাহক সমিতির উদ্যোগে গত ৩১শে জানুআরি স্বামী বিবেকানন্দের ১০৮ তম জন্মতিথি উৎসব পূজা, পাঠ, ভজন ও প্রসাদ-বিতরণের মাধ্যমে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

এই উপলক্ষে গত ২০শে ফেব্রুআরি শুক্রবার অপরাহ্ণে স্থানীয় রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের ভক্তগণের প্রচেষ্টায় একটি আলোচনা-সভা আয়োজিত হয়। সভাপতিত্ব করেন ফরিদপুরের জেলা জজ মাননীয় ইকবাল হোসেন চৌধুরী সাহেব এবং প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন শ্রদ্ধেয় ডাঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী। রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত মহাকালী পাঠশালার ছাত্রীগণ প্রথমে স্তব পাঠ করিয়া সভার উদ্বোধন করেন। পরে সঙ্গীতাদির পর স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের বিভিন্ন দিক আলোচনা করেন ডাঃ প্রফুল্লকুমার রায় ও শ্রীত্রিবেদী। ইঁহাদের এবং ডাঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী ও সভাপতি মহাশয়ের ভাষণ খুবই মর্মস্পর্শী হয়। ফরিদপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের পক্ষ হইতে সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন কার্যনির্বাহক সমিতির সভাপতি রায় বাহাদুর বিনোদলাল ভদ্র।

# বিবিধ সংবাদ

### উৎসব-সংবাদ

**চাঁদপুরস্থ** শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কল্পতরু-উৎসব এই বৎসর ১লা হইতে ৪ঠা জানুআরি পর্যন্ত সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ১লা জানুআরি ভগবান রামকৃষ্ণ-দেবের, ২রা জানুআরি শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর, ৩রা জানুআরি স্বামীজীর পূজা, হোম এবং প্রসাদবিতরণ করা হয়। ঐ তিন দিবস অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকা হইতে রাত্রি ১০ ঘটিকা পর্যন্ত ভগবান রামকৃষ্ণদেবের, শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর এবং স্বামীজীর লীলাপ্রসঙ্গে বক্তৃতা হয়। ৪ঠা জানুআরি মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। তদুপলক্ষে প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার স্ত্রী-পুরুষ ভক্তবৃন্দ বসিয়া খিচুড়ি ও মিষ্টান্ন প্রসাদ গ্রহণ করেন।

ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, বরিশাল, খুলনা, বাগেরহাট ও হবিগঞ্জ হইতে ভক্তবৃন্দ এই উৎসবে যোগদান করেন। শঙ্কর মঠের স্বামী জ্যোতীশ্বরানন্দ গিরি, নারায়ণগঞ্জ রামকৃষ্ণ মঠের স্বামী যোগদানন্দ, ঢাকা মঠের ব্রহ্মচারী দেবব্রত, বাগেরহাট আশ্রমের ব্রহ্মচারী বিদেহচৈতন্য, হবিগঞ্জ মিশনের হরিবোল ব্রহ্মচারী এবং কুমিল্লা আশ্রমের কানু মহারাজ প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন।

**ভোপাল** রামকৃষ্ণ আশ্রমের উদ্যোগে যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দের ১০৮ তম জন্মোৎসব সুন্দরভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে গত ৩০শে জানুআরি পূজা, পাঠ,

হোম ও ভজনাদি অনুষ্ঠিত হয়। ১লা ফেব্রুআরি দরিদ্রনারায়ণ-সেবা হয়, ১,৫০০ জন পরিতোষ সহকারে প্রসাদ গ্রহণ করেন। আয়োজিত সভায় বিশিষ্ট বক্তাগণ ভাষণ দেন। বক্তৃতার বিষয় ছিল: 'বর্তমানে স্বামী বিবেকানন্দের বাণীর প্রয়োজনীয়তা'।

**বড় আন্দুলিয়া:** প্রতি বৎসরের ন্যায় এ বৎসরেও পবিত্র মাঘী পূর্ণিমায় পরমপুরুষ যুগাবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের পুণ্য জন্মতিথি উপলক্ষে বড় আন্দুলিয়া লোকসেবা শিবিরে ৮ দিন (২০শে—২৭শে ফেব্রুআরি) ব্যাপী 'গদাধরের মেলার' আয়োজন করা হইয়াছিল। মেলার বিশেষ আকর্ষণ ছিল ৮ রাত্রি যাত্রা প্রতিযোগিতা, হা-ডু-ডু প্রতিযোগিতা, বাউল গান, তরজা গান, প্রদর্শনী, আলোচনা প্রভৃতি। প্রায় ১৫ হাজার হিন্দু-মুসলমান-খ্রীষ্টান নরনারীর সমাগমে মেলা-প্রাঙ্গণ মুখরিত হইয়া উঠে।

২০শে ফেব্রুআরি বৈকাল ৩ ঘটিকায় মেলার উদ্বোধন করেন শ্রীসত্য চক্রবর্তী। পরে মেলার উদ্দেশ্য বর্ণনা করেন মেলা কমিটির সভাপতি কবি বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় এবং কমিটির অন্যতম যুগ্ম-সম্পাদক অধ্যক্ষ বিজয়কৃষ্ণ চক্রবর্তী।

২১শে ফেব্রুআরি বৈকাল ৪ ঘটিকায় আলোচনা-অনুষ্ঠানে স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন-দর্শনের বিভিন্ন দিক আলোচনা করেন। ২০শে এবং ২১শে ফেব্রুআরি সন্ধ্যায় 'স্বামী বিবেকানন্দ' ও "শ্রীশ্রীমা" শীর্ষক দুইটি চলচ্চিত্র প্রদর্শনের আয়োজন করা হয়।

২২শে ফেব্রুআরি দিনটি 'কস্তুরবা দিবস' রূপে পালিত হয়। ২৭শে ফেব্রুআরি একটি অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে কৃতী প্রতিযোগীদের পুরস্কৃত করা হয়। ২৫শে ফেব্রুআরি এক মনোহর বাসন্তী-সন্ধ্যায় আয়োজিত কবি-সম্মেলনে নদীয়ার প্রবীণ ও নবীন কবিরা মিলিত হন।

**হালিসহর**—রামপ্রসাদ বিদ্যাপীঠ প্রাঙ্গণে ২০, ২১ ও ২২শে ফেব্রুআরি তিনদিন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-স্মরণোৎসব পালিত হয়।

২০শে ফেব্রুআরি বৈকালে শ্রীমতী কান্তিলতা দেবী কর্তৃক শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ এবং সন্ধ্যায় নাট্যানুষ্ঠান হয়।

২১শে ফেব্রুআরি পূর্বাহ্ণে উষাকীর্তন, পূজাদির পর বৈকালে শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী কর্তৃক রামায়ণ গান পরিবেশিত হয়।

২২শে ফেব্রুআরি শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজান্তে দুপুরে দেড় সহস্রাধিক ভক্ত নরনারীকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

২১শে ও ২২শে দুদিনই বৈকাল ৪টা'য় ধর্ম-সভা হয়। উভয় দিনই সভাপতিত্ব করেন স্বামী সম্বুদ্ধানন্দজী। ২১শে ও ২২শে প্রধান অতিথি ছিলেন যথাক্রমে শ্রীমৎ স্বামী প্রেমানন্দ গিরি (ভোলাগিরি আশ্রম) ও শ্রীসুধীর-রঞ্জন দাশগুপ্ত। তাঁহাদেরও ভাষণ কালোপ-যোগী হইয়াছে।

২১শে ও ২২শে সন্ধ্যায় শিবপুর শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির কর্তৃক "কুরুক্ষেত্র" ও "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ" এবং "হৈমবতী উমা" ও "সাধক রামপ্রসাদ", যাত্রাভিনয় হয়। উভয় দিনই যাত্রাভিনয় সার্থক হওয়ায় সমবেত ভক্তবৃন্দ যথেষ্ট আনন্দ-লাভ করিয়াছে।

প্রতিদিন ৫।৬ হাজার ভক্ত নরনারী এই উৎসবে যোগদান করিয়াছে।

**নববারাকপুর**—বিবেকানন্দ সংস্কৃতি পরিষদের গত ১লা মার্চ রবিবার নিজস্ব ভবনে শ্রীশ্রীসারদাদেবীর শুভ জন্মোৎসব সারাদিন-ব্যাপী কর্মসূচীর মাধ্যমে উদ্‌যাপিত হয়। সন্ধ্যায় আয়োজিত এক জনসভায় শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী ও বাণী আলোচনা করেন স্বামী জ্যোতিরূপা-নন্দ সভায় পৌরোহিত্য করেন পরিষদের সভাপতি ডক্টর মহেন্দ্রচন্দ্র মালাকার।

**'সুরবিতান', খিদিরপুর:** গত ৯ই মার্চ অপরাহ্ণে 'সুরবিতানে' এক মনোজ্ঞ অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরম-হংসদেবের আবির্ভাব-তিথি উৎসব উদ্‌যাপিত হইয়াছে।

# উদ্বোধন

## দিব্য বাণী

ক্ষীরযোগাদ্ যথা নীরং ক্ষীরবৎ দৃশ্যতে তথা।
আত্মযোগাদনাত্মায়মাত্মবদ্দৃশ্যতে মুধা ॥ ৭৭
নীরাৎ ক্ষীরং পৃথক্‌কৃত্য হংসো ভবতি নান্যথা।
স্থূলাদেঃ স্বং পৃথক্‌কৃত্য মুক্তো ভবতি নান্যথা ॥ ৭৮
ক্ষীরনীরবিবেকজ্ঞো হংস এব ন চেতরঃ।
আত্মানাত্মবিবেকজ্ঞো যতিরেব ন চেতরঃ ॥ ৭৯

'অদ্বৈতানুভূতিঃ'—শঙ্করাচার্য

জলে দুধ মিশালে যেমন
দেখায় তা দুধেরই মতন,
সেইরূপ অনাত্মাতে, অচেতন দেহাদিতে
চৈতন্যের, আত্মার সংযোগে
'সে সকলও আত্মা বলি', সে-সবও চেতন বলি'
ভ্রান্ত বোধ জাগে ॥ ৭৭
মেশা দুধ-জল হতে দুধটুকু পৃথক করিতে
পারিলেই তবে তার 'হংস' পরিচয়;
স্থূলদেহ-আদি হতে আপনারে পৃথক করিতে
পারিলেই তবে জীব মুক্ত হয়ে যায়,
নহে অন্যথায় ॥ ৭৮
দুধে জলে পার্থক্য কোথায়—
কেবল হংসেরই আছে সে-বিবেক, অন্য কারো নাই;
অনাত্মা দেহাদি হতে আত্মা যে পৃথক—এই জ্ঞান,
এ বিবেক আছে যার যতি বলে তাহাকেই,
যতি নয় অন্য কোন জন ॥ ৭৯

# কথাপ্রসঙ্গে

## ভগবান বুদ্ধ ও আচার্য শঙ্কর

ভারতে সনাতন ধর্মে যখনই গ্লানি আসিয়াছে, ভগবান অবতীর্ণ হইয়া তখনই তাহা দূর করিয়াছেন। কিন্তু জগতের নিয়মই হইল, কোন কিছুই স্থায়ী হয় না সেখানে। তাই একবার কোন অবতার বা আচার্য আসিয়া ধর্মকে গ্লানিমুক্ত করিয়া যাইবার কয়েক শতাব্দী পরেই আবার তাহার মধ্যে মালিন্য আসিয়া দেখা দেয়, মানুষ ধর্মের মূল কথা আবার ভুলিয়া যায়। তাই যুগে যুগে অবতীর্ণ হইতে হয় ভগবানকে—আমাদেরই মতো মানুষ হইয়া আসিয়া জীবনে বাস্তবরূপায়িত করিয়া দেখাইতে হয় মানুষ কেমন করিয়া ধর্মের মূল লক্ষ্য সত্যলাভের দিকে অগ্রসর হইবে।

তবে প্রতি অবতারে তাঁহারা একইরূপ জীবন দেখান না কেন, একই কথা বলেন না কেন? আপাতদৃষ্টিতে প্রকাশের প্রকারভেদ থাকিলেও আসলে একই জীবন তাঁহারা দেখান, একই কথাই বলেন; কারণ মূল সত্য কখনো পরিবর্তিত হয় না, উহা লাভ করিবার মূল উপায়ও একটিই—বহির্বিষয়ে ছড়ানো মনকে ফিরাইয়া আনিয়া সত্যে একাগ্র করা। তবে যুগে যুগে মানুষের চিন্তাধারা ও জীবনধারা পরিবর্তিত হয় বলিয়া তৎকালীন জীবনোপযোগী হয় তাঁহাদের বহির্জীবন, কিন্তু সর্বক্ষেত্রেই সে জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য থাকে ভগবানলাভ; আর যুগোপযোগী চিন্তাধারায় অভ্যস্ত মানুষের বোধগম্য ভাবেই তাঁহারা কথা বলেন, কিন্তু সে কথার তাৎপর্য সর্বক্ষেত্রেই এক, যাহা ব্যাসদেব 'ভারত সাবিত্রী'তে সংক্ষেপে বলিয়াছেন: "ন জাতু কামান্ন ভয়ান্ন লোভাদ্ধর্মং ত্যজেজ্জীবিতস্যাপি হেতোঃ। নিত্যো ধর্মঃ সুখদুঃখে ত্বনিত্যে জীবো নিত্যো হেতুরস্য ত্বনিত্যঃ॥"—জীবনের সুখ-দুঃখ অনিত্য, কিন্তু ধর্ম নিত্য; যে-দেহ অবলম্বনে, যে দেহের মধ্যে থাকিয়া, যাহার মাধ্যমে আমরা জীবনের সুখ-দুঃখ উপভোগ করি তাহা অনিত্য, কিন্তু আমরা, দেহীরা, জীবেরা নিত্য—আমরা জন্ম-জন্মান্তরে বহু দেহ, বহু জীবন উপভোগ করিযাছি, কিন্তু দেহের বিনাশে আমাদের বিনাশ হয় নাই, আমাদের বিনাশ বলিয়া কিছু নাই-ই। কাজেই জীবনপথে সর্বদা ধর্মকে আঁকড়াইয়া থাকিয়া চলিবে—অনিত্য সুখ-লাভের কামনায়, লোভে, বা দুঃখকে এড়াইবার ভয়ে, এমন কি জীবনরক্ষার জন্যও কখনো কোন অবস্থাতেই নিত্য ধর্মকে ত্যাগ করিও না। এখানে যে আসল মানুষের কথা বলা হইয়াছে, তাহাকে চিনিতে আমাদের কাহারো কোন অসুবিধা নাই, আমি বলিতে আমরা যাহা সকলেই বুঝি তাহাই—কেবল স্থূলদেহটি বাদ দিয়া। মৃতদেহের মতো, মাটি-জল-আলো-হাওয়ার মতো যে বেহুঁস নয়, যে চেতন, যে চিন্তা করে, বিচার করে, সুখ-দুঃখ অনুভব করে, স্বপ্ন দেখে, সেই আমি, তাকেই জীব বলে। একটি দেহ যখন নষ্ট হয়, স্থূলদেহ না থাকিলেও এই মন-বুদ্ধি, এই চিন্তা-অনুভবাদি সবই আমাদের যেমন আছে তেমনি থাকে—সেগুলির সঙ্গে জড়িত থাকিয়াই আমরা আবার একটি নতুন স্থূলদেহে প্রবেশ করি—একটি নবজাতক আসে পৃথিবীতে। ইহাকেই আমরা আমাদের জন্মমৃত্যু বলিয়া ভাবি—আসলে ইহা স্থূলদেহেরই

জন্মমৃত্যু, আমাদের নয়; যেন, গীতার ভাষায়, পুরাতন পোষাক ছাড়িয়া নতুন পোষাক পরা। তফাত শুধু, আগের স্মৃতি আমাদের মনের উপরে থাকে না, অবচেতনে লুকাইয়া থাকে।

মানুষ বলিতে আমরা তাহার স্থূল দেহকেই এবং তাহার মধ্য দিয়া তাহার মনবুদ্ধি ও চেতনার যেটুকু বিকাশ দেখা যায় সেটুকুকেই বুঝি, সেটুকু লইয়াই তাহার সম্বন্ধে ধারণা করি, তাহার ভাল মন্দ নির্ণয় করিতে চাই। সত্যদ্রষ্টারা কিন্তু মানুষ বলিতে দেহের অভ্যন্তরস্থ আসল মানুষটিকেই দেখেন, দেহীকে, জীবকে, মনবুদ্ধ্যাদিজড়িত চেতনাকেই দেখেন, এবং তাহার উন্নতির পরিপ্রেক্ষিতেই তাহার কল্যাণ-অকল্যাণের পথ-নির্দেশ করেন। একটা দেহের, একটা পোষাকের, স্থূল বিষয় গ্রহণের উপযোগী একটা স্থূলযন্ত্রের স্থায়িত্বকে—একটা জীবন যাহাকে বলি আমরা তাহাকেই—দেহীর সর্বস্ব বলিয়া কখনো দেখেন না তাঁহারা, তাহার অসংখ্য জীবনের একটি মাত্র বলিয়াই প্রত্যক্ষ করেন। তাই দেহীর কল্যাণকেই আমাদের যথার্থ কল্যাণ জানিয়া, আমরা যাহাতে সে-কল্যাণসাধনে আগ্রহী হই এমন কথাই বলেন। কারণ এজীবনে আমাদের মনবুদ্ধিকে আমরা যে রঙে রাঙাইয়া লইব পরজন্মে সে-রঙ্ই তো সঙ্গে যাইবে।

সত্যের এই প্রথম ধাপ পর্যন্ত বুদ্ধদেবের বা আচার্য শঙ্করের বা সনাতন ধর্মের কোন আচার্য বা অবতারের কথায় মূলতঃ কোন পার্থক্য নাই। স্থূলদেহের অভ্যন্তরস্থ দেহীর এভাবে অবিনাশিত্ব পৃথিবীর সব ধর্মেই স্বীকৃত, কিন্তু এই জন্মান্তরবাদ স্বীকৃত কেবল ভারতীয় ধর্মে—হিন্দুধর্মের সব সম্প্রদায়ে এবং তাহারই 'বিদ্রোহী' বা অনুরূপ বৌদ্ধ বা জৈন ও শিখ ধর্মে। পৃথিবীর আর সব প্রধান ধর্মের মতে পৃথিবীতে স্থূলদেহে আমরা একবার মাত্র থাকিতে পারি—পৃথিবীতে এই জীবনই আমাদের শেষ।

কিন্তু দেহীর এই জীবত্ব এই জন্মে-জন্মে দেহ-দেহান্তরগ্রহণও তো চরম সত্য নয়—ইহাও আপেক্ষিক সত্য, প্রথম ধাপ মাত্র। চরম সত্য লাভ করিতে হইলে ইহারও উপরে উঠিতে হইবে—স্থূল দেহ হইতে আমি আলাদা এটুকুমাত্র প্রত্যক্ষ করিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না; মনবুদ্ধি প্রভৃতিও যে আমাদের স্থূল দেহের মতোই দেহ, (যদিও তাহা অপেক্ষা অনেক সূক্ষ্ম) এবং আমরা দেহীরা সে সূক্ষ্মদেহ হইতেও পৃথক, ইহাও প্রত্যক্ষ করিতে হইবে। যেমন স্থূলদেহ হইতে নিজেকে পৃথক বলিয়া প্রত্যক্ষ করিলে সে দেহের সুখদুঃখ আমাদের আর স্পর্শ করিতে পারে না, তেমনি মন-বুদ্ধি প্রভৃতি দিয়া গঠিত সূক্ষ্ম দেহ হইতেও নিজের পৃথক অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে পারিলে মনবুদ্ধির সুখদুঃখ-বেদনাদি কোন পরিবর্তনই আর 'আমার পরিবর্তন' বলিয়া অনুভূত হয় না; কাজেই আমাদের জন্ম-মৃত্যু সুখ-দুঃখ-ভয় বলিয়া কোন বেদনাই আর থাকে না তখন। কারণ এসব বোধ ওঠে আমাদের দেহমনবুদ্ধিকে আশ্রয় করিয়াই, সব পরিবর্তন ঘটে সেখানেই। আমরা যতক্ষণ সেগুলির সহিত নিজেকে জড়াইয়া রাখি, আমি বলিতে দেহমনবুদ্ধি সব জড়াইয়া বা সূক্ষ্মদেহে থাকাকালে (স্বর্গাদি সূক্ষ্মলোকে) কেবল মনবুদ্ধি প্রভৃতিকে জড়াইয়া সেই জড়িত অস্তিত্বকেই 'আমি', আমার অস্তিত্ব মনে করি, তখনই ভাবি আমার সুখ দুঃখ হইতেছে, আমার জন্মমৃত্যু হইতেছে, বা আমিই যেন জন্মে জন্মে দেহ পাল্টাইতেছি—যেমন পোষাক পাল্টাই।

এই চরম অনুভূতি যখন আসে, আমরা

আসলে যাহা, আমাদের যাহা স্বরূপ তাহা যখন উপলব্ধি করি, আমার তখন কি থাকে? কি রকম সে উপলব্ধি? তাহা ইতিবাচক কিছু দিয়া বোঝানো যায় না, ভাষায় বলা যায় না, মনবুদ্ধি দিয়া ধারণা করা যায় না, কারণ যাহা ধারণা করার বা কথা বলার মাধ্যম সেই মনবুদ্ধিরই অতীত তাহা। কিন্তু এবিষয়ে এই-সত্যের প্রচারকগণ সবাই একমত যে, নেতিবাচক ভাবে তাহার কথা বলা যায়; আমরা যাহা কিছু দেখি, শুনি, অনুভব করি বা করিতে পারি, তাহার কিছুই তখন থাকে না—মনবুদ্ধির ভিতর দিয়া প্রকাশিত চেতনার আলোক, মন-বুদ্ধির দর্পণে প্রতিবিম্বিত চেতনা-সূর্য আমাদের পরিচিত চিন্তা-বেদনাদিসমন্বিত 'আমি,'—আমাদের পরিচিত ধারণার বা কল্পনার সব আলোক-শিখাই নির্বাপিত হইয়া যায় তখন।

এই পর্যন্তই, এই নির্বাণের কথাই বুদ্ধদেব বলিয়াছেন। যেটুকু যুক্তিতে বুদ্ধিতে অন্ততঃ ধরা-ছোঁয়া যায়, সেটুকুই বলিয়াছেন।

কিন্তু, বলা না যাইলেও কিছু একটা থাকে তো তখন? না সব শূন্য হইয়া যায়? বুদ্ধদেব এবিষয়ে নীরব ছিলেন, কিছুই বলেন নাই।

আমাদের সনাতন ধর্মের মূল শাস্ত্র বেদান্তের ভিত্তিতে আচার্য শঙ্কর কিন্তু জোর দিয়া বলিতেছেন—শূন্য হইতে কিছুই সৃষ্ট হইতে পারে না, কোন কিছুকেই শূন্য করিয়াও দেওয়া যায় না, (এ সত্যটি আধুনিক জড়-বিজ্ঞানেও স্বীকৃত) কাজেই মন-বুদ্ধিও যখন থাকে না, তখন সত্তা কিছু একটা থাকিবেই—যাহা হইতে মন-বুদ্ধি উদ্ভূত হইয়াছিল, যাহা বুদ্ধিরও কারণ (শাঙ্করভাষ্য, কঠোপনিষদ্, ২।৩।১১); তাহাই আমাদের স্বরূপ, জগতের স্বরূপ, ব্রহ্ম, সচ্চিদানন্দ—অস্তিত্ববান চেতন আনন্দময় সত্তা। তবে 'সচ্চিদানন্দ' বা 'ব্রহ্ম' তো শব্দ মাত্র—আসলে তাহা কি? তাহার উত্তর: তাহা নিজে উপলব্ধি করা ছাড়া সোজাসুজি বুঝিবার বা বুঝাইবার কোন ভাষা নাই, উপায় নাই—'যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।'

আচার্য শঙ্কর- ও বুদ্ধদেব-প্রচারিত সত্য মূলতঃ একই, পার্থক্য শুধু এইটুকুই।

এই সত্যে উপনীত হইবার পথও মূলতঃ একটিই: বাসনা ত্যাগ করা, মনকে সত্যে একাগ্র করা। তাহারই প্রকারভেদ দেখাইয়াছেন বুদ্ধদেব ও শঙ্করাচার্য যুগ-প্রয়োজনে একটি বিশেষ দিকে জোর দিয়া, একটি বিশেষ দিককে অস্বীকার করিয়া। আবার শুধু জ্ঞানের পথের নয়, যোগের পথেরও, ভক্তির পথেরও মূল কথা এইটাই। সত্য সম্বন্ধেও বিভিন্ন যুগে মানুষের প্রয়োজনবোধে যে ধাপ পর্যন্ত যতটুকু বলা, যেভাবে বলা প্রয়োজন হইয়াছে তাহাই বলিয়াছেন বিভিন্ন সত্যদ্রষ্টাগণ।

বৈশাখী পূর্ণিমা ও বৈশাখী শুক্লা পঞ্চমী তিথি আজও আমাদের হৃদয়দ্বারে বুদ্ধদেব ও আচার্য শঙ্করের পুণ্য আবির্ভাবের, তাঁহাদের লোককল্যাণে উৎসর্গীকৃত জীবনের বার্তা বহন করিয়া আনে। অসত্য হইতে সত্যে, অন্ধকার হইতে আলোকে উত্তীর্ণ হইবার জন্য উদ্বুদ্ধ হইতে আজ আশীর্বাদ প্রার্থনা করি তাঁহাদের কাছে, আমাদের মন-বুদ্ধিতে প্রতিফলিত 'আমি'র শিখা চিরনির্বাপিত হউক, উদ্ভাসিত হউক চৈতন্যালোকের নিত্য উৎস।

# স্বামী প্রেমানন্দের অপ্রকাশিত পত্র

[ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লিখিত ]

( ১ )

শ্রীশ্রীগুরুপদ ভরসা

The Ramakrishna Advaita Ashrama
Benares City
বিজয়া দশমী
The October 13th, 1910

ভাই শশী,

সুরেন্দ্রবিজয়ের মুখে তোমার অসুখের বিষয় শুনিয়া দুঃখিত হইলাম। এখন কেমন আছ জানিলে আনন্দিত হইব।

আমি ও শ্রীযুক্ত তারকদাদা প্রায় ২০।২৫ দিন হইল এখানে এসেই জ্বরে পড়েছিলাম, এখন অনেক ভাল হয়েছি। এখানে কিছুদিন থাকিয়া পরে মঠে যাইব।

তুমি আমার ৺বিজয়ার প্রণাম, উদ্দেশে আলিঙ্গনাদি জানিবে। রুদ্র ও প্রকাশকে আমার ভালবাসা ও সাদর সম্ভাষণাদি জানাইবে।

শ্রীযুক্ত গিরিশবাবু কয়েকদিন হ'ল কাশী আসিয়াছেন। এখানে এসে কিছু ভাল আছেন। তারকদা শীঘ্র দার্জিলিং যাইবেন। চন্দ্র এখানে বাতে পঙ্গু হয়ে পড়ে আছে। আর সকলে ভাল আছে।

কলিকাতায় শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী অনেক সুস্থ আছেন। সাণ্ডেলের মুখে শুনিলাম। সাণ্ডেল ৩।৪ দিন হইল এসেছে। তোমার কুশলাদি লিখবে। শ্রীযুক্ত হরি মহারাজ সিমলায় পূর্ণভায়ার কাছে আছেন। ভাল আছেন শুনেছি। তুমি আমার ভালবাসা জানিবে। ইতি—

দাস বাবুরাম

( ২ )

শ্রীশ্রীগুরুপদ ভরসা

The Ramakrishna Advaita Ashrama
Benares City
22. 10. 10

ভাই শশী,

তোমার অসীম স্নেহ, অপার করুণা ও অকৃত্রিম ভালবাসাপূর্ণ পত্র পাইয়া অতিশয় আনন্দিত হইলাম।

আমরাও তোমাকে শ্রীশ্রীবিজয়ার নমস্কার দিয়া এক চিঠি লিখেছি, তাহা কি তুমি পাও নাই?

অমরনাথ দুর্গম তীর্থ সন্দেহ নাই, তবুও সৎসঙ্গে পড়ে গিয়েছিলাম। সুখে দুঃখে দর্শন করে প্রায় মাসাধিক হইল এখানে এসেই জ্বরে পড়ি। এখন অনেক সুস্থ।

আমি অমরনাথে ঘোড়ায় চড়ে গিয়েছিলাম। অবশ্য অনেক স্থলে হাঁটিতেও হয়েছিল। তিন দিনের রাস্তায় পশু পক্ষী বৃক্ষাদি কিছুই নাই। মানুষ সে স্থলে বসবাস করিতে পারেই না। দুরন্ত শীত। চারিদিকে তুষারমণ্ডিত পর্বত। Season flower-এর উপর দিয়া ঐ তিন দিন যেতে হয়। দৃশ্য অতি মনোহর। সঙ্গে আমাদের তাঁবু বাঁধিবার বাউন ও রসদ ছিল। সুতরাং বিশেষ কষ্ট হয় নাই। তবে প্রভুর কৃপায় বৃষ্টি না হওয়ায় রক্ষা, নতুবা শীতে …জমে যেতুম আর কি?

আমি অমরনাথ হ'তে নেবেই খঠম নামক স্থান হতে তোমার জন্য মান্দ্রাজ ঠিকানায় এক চিঠি ও তাহার মধ্যে প্রসাদী বিভূতি পাঠাইয়াছিলাম। তুমি কি তাহাও পাও নাই? পাইলে উত্তর লিখিতে। তবে মনে করেছিলাম তুমি অন্যত্র গিয়াছ কিম্বা অসুস্থ। পরে শরৎ ভায়ার চিঠিতে কনখলে জানিলাম যে তোমার অসুখ হওয়ায় বাঙ্গালোরে গিয়াছ। সুরেন্দ্রের মুখে তোমার অসুখের খবর সব পাইয়া দুঃখিত হইলাম। আরও কিছুদিন বাঙ্গালোরে থাকিলে না কেন? শরীর ভাল থাকিলে তবে ত কাজ। শ্রী হরি মহারাজ অমরনাথ হইতে ফিরিয়া সিমলায় শ্রীপূর্ণভায়ার কাছে গিয়াছেন। বোধ হয় শীঘ্রই তথা হ'তে কনখলে আসিবেন। গুরুদাস কনখলেই আছে। আমরা কনখলে ১৪।১৫ দিন থাকিয়া প্রায় একমাস শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ-ধামে এসেছি।

ব্রহ্মচারী জ্ঞান শ্রীবৃন্দাবন দর্শন করে এখানে একদিন মাত্র থাকিয়া কলিকাতায় পূজার পূর্বেই গিয়াছে।

আমি ঘুরে ঘুরে বড়ই বিরক্ত হয়েছি, সে জন্য তোমার আদরের আহ্বান রক্ষা করিতে অসমর্থ। অপরাধ ক্ষমা করিও। আর মাদ্রাজ অনেক দূর। তোমার দয়ায় ওদিক দর্শন হয়ে গেছে।…

বসন্তকে আমার বিজয়ার ভালবাসা ও স্নেহ-সম্ভাষণ জানাইবে। দেবমাতা এখন কোথায় ও কেমন আছে, তাহাকেও আমার বিজয়ার সম্ভাষণ দিও, অমরনাথ যাত্রার বিষয় জানাইও।

প্রকাশ রুদ্র ও আর আর ভক্তদের আমার ভালবাসা ও সাদর সম্ভাষণাদি জানাইবে। আমারও ইচ্ছা তোমায় দেখি, কিন্তু রেলে বিতৃষ্ণা জন্মেছে। যদি পরে ইচ্ছা হয় তোমায় জানাইব। তুমি আমার প্রণাম ভালবাসা ইত্যাদি জানিবে। তুলসীর কাজ বেশ চলিতেছে জানিয়া আনন্দিত হইলাম। ডাক্তার হেলককে দেখিলে কেমন? ইতি—

তোমার দাস
বাবুরাম

( ৩ )

শ্রীশ্রীগুরুপদ ভরসা

The Ramakrishna Advaita Ashrama, Benares City
4. 12. 10.

ভাই শশী,

অনেক দিন তোমার কোন খবর পাই নাই, কেমন আছ লিখিবে। আমরা ভাল আছি। হরি মহারাজ প্রায় একমাস হইল এখানে আসিয়াছেন। তিনি বেশ সুস্থ আছেন। মহারাজ মঠে আসিয়াছেন, শুনিলাম। তাঁর এখানে আসিবার কথা আছে। যদি না আসেন তাহলে আমরাই শীঘ্র মঠাভিমুখে যাইব। Dr Hallock শুনিলাম তোমার ওখানে আসিয়াছে। তাহার শরীর কেমন আছে জানাইলে সুখী হইব।

শ্রীযুক্ত গিরিশবাবু কাশীতেই আছেন। তাঁর শরীর অনেক সুস্থ হইতেছে। আমরা নিত্যই প্রায় তাঁর কাছে গিয়া থাকি। আহা! তাঁর স্বভাব কি চমৎকারই হয়েছে! শ্রীশ্রীপ্রভুর কথা ছিল "তোমায় দেখে লোকে অবাক্ হবে।" ঠিক তাই ফুটে বেরুচ্ছে। কি চমৎকার কথাই তাঁর কাছে শুনি—যেমন উদারতা তেমনই শ্রীশ্রীপ্রভুর [ প্রতি ] নিষ্ঠা। অভিমান, লোকমান্যি তাঁর কাছে থ্যাক্ থু হয়েছে। অনেকানেক সাধুরও অমন স্বভাব দেখি নাই। পরশ-পাথর ছুঁয়ে সোনা হয়েছেন, তাই প্রত্যক্ষ কচ্চি। আর আমাদের উপর কি অকৃত্রিম স্নেহ ও ভালবাসা! ৬৮ বৎসর বয়েস, কিন্তু বালকের মত স্বভাব দেখচি! তুমি যদি এখানে থাকিতে, কত আনন্দ হ'ত। শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা ও স্বামীজীর কথায় একেবারে মাতোয়ারা। ইচ্ছা হয়, তোমরাও এসে এ আনন্দে যোগ দাও। আমাদের পেলে যেন আর এক মানুষ হয়ে যান। তাঁর চাকর-বাকর পর্যন্ত শ্রীশ্রীঠাকুরের ভক্ত হয়েছে। সব প্রভুর মহিমা। প্রভুর কৃপায় এ সব দর্শন হচ্ছে। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর আজ কোঠার যাইবার কথা শুনিয়াছি। রামের মা ও আমার মা এখানে ছিলেন। তাঁরা ৮।৯ দিন হইল গিয়াছেন। রামের মা পরম-পূজনীয়া শ্রীশ্রীমার সহিত কোঠার যাইবেন। তাঁরা তোমার দয়া ও ভালবাসার কথা এক মুখে বলে শেষ করতে পারতেন না। শান্তিরামও তাঁদের সঙ্গে গিয়াছে।······

দেবমাতার খবর কি? তাহাকে আমার ভালবাসা জানাইবে। তুমি উদ্বোধনে আর কিছু লিখ নাই কেন? তুমি অবশ্য অবশ্য স্বামীজীর সহিত কালনায় যাত্রার কথা লিখিও। অতি চমৎকার হবে। আর শরৎ ভায়ার অনেক আসান হবে। শরতের লিখা কেমন হচ্ছে? তুমিও যা জান কেন লিখতে থাক না। আমার একান্ত ইচ্ছা তুমি শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা ও স্বামীজীর বিষয় ধারাবাহিকরূপে লিখিতে থাক। তোমায় অনুরোধ করছি—লিখিও। লোকের এবার এখন শ্রীশ্রীঠাকুরের দিকে খুব আকর্ষণ পড়েছে। আমায় মূর্খ করেছেন তাই ও রূপে বঞ্চিত। একটু ভক্তি বিশ্বাস হয় এই মাত্র প্রার্থনা। ইতি—　　　দাস বাবুরাম

পুনশ্চ: পূর্ণভায়া সিমলা হতে ফিরিবার সময় আমাদের দর্শন দিয়া গিয়াছে। কি চমৎকার স্বভাব! হরি মহারাজ তাঁর সঙ্গে দুই মাস থেকে তাঁর কথা একমুখে শেষ করতে পারে না। এসব শ্রীশ্রীপ্রভুর মহিমা। তুমি আমার আন্তরিক ভালবাসা ও প্রণাম জানিবে। আর

ওখানকার সকল ভক্তদের আমার ভালবাসা ও সাদর সম্ভাষণাদি জানাইবে। শ্রীনারায়ণ আয়েঙ্গার কেমন আছে? তাহাকে আমার ভালবাসা জানাইবে। ধন্য, প্রভুর কার্যে এত অনুরাগ! ইতি—

দাস বাবুরাম

# আবেদন

## [ হাসনাবাদ ও বসিরহাটে পূর্বপাকিস্তান হইতে আগত উদ্বাস্তুদের জন্য রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্য ]

পূর্বপাকিস্তানের খুলনা জেলা হইতে বাস্তু ত্যাগ করিয়া প্রতিদিন দলে দলে বহু নরনারী হাসনাবাদ ও বসিরহাটে সমবেত হইতেছেন। ইতিমধ্যে প্রায় পাঁচ হাজারের বেশী লোক আসিয়া অনাহারে নিরাশ্রয় অবস্থায় খোলা জায়গায় পড়িয়া আছেন। গত ১৩ই এপ্রিল, ১৯৭০ রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক সেখানে সেবাকার্য ( relief-work ) শুরু করা হইয়াছে; দৈনিক প্রায় ১৫ কুইন্ট্যাল চাল এবং তৎসহ প্রয়োজন মতো ডাল, সব্জী ও লবণ বিতরণ করা হইতেছে। এইভাবে বাস্তু ত্যাগ করিয়া ক্রমাগত আরো লোক আসিতে থাকিলে সেখানে মহামারী আকারে কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি রোগের প্রাদুর্ভাব হইবার সমূহ সম্ভাবনা। রামকৃষ্ণ মিশন এই সেবাকার্যে খাদ্যদ্রব্য, দুগ্ধ, ঔষধ এবং অস্থায়ী বাসস্থান নির্মাণের জন্য জিনিসপত্রের প্রয়োজন বিশেষভাবে অনুভব করিতেছেন। গবর্ণমেণ্ট অবশ্য উদ্বাস্তুদিগকে দলবদ্ধভাবে স্থানান্তরিত করিতেছেন, তবু এই সুযোগ পাওয়ার জন্য যাঁহাদের অপেক্ষা করিতে হইতেছে, তাঁহাদের সংখ্যাও নগণ্য নয়।

বলা বাহুল্য, পরিস্থিতি যেরূপ গুরুত্বপূর্ণ, তাহাতে দরিদ্র দুঃস্থ ভ্রাতাদের দুর্গতি লাঘবের জন্য সহৃদয় জনসাধারণের নিকট হইতে অতি সত্বর সাড়া পাওয়া প্রয়োজন।

এই সেবাকার্যের জন্য সমস্ত দান ধন্যবাদের সহিত নিম্নলিখিত ঠিকানায় গৃহীত হইবে। "RAMAKRISHNA MISSION"— এই নামে চেক কাটিবেন।

(১) সাধারণ সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন, পোঃ বেলুড় মঠ, হাওড়া

(২) অদ্বৈত আশ্রম, ৫ ডিহি এণ্টালি রোড, কলিকাতা-১৪

(৩) উদ্বোধন, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা-৩

(৪) রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিট্যুট অব কালচার, গোলপার্ক, কলিকাতা-২৯

(৫) রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, টাকী, ২৪-পরগনা।

১৫. ৪. ১৯৭০
বেলুড় মঠ, হাওড়া

স্বামী গম্ভীরানন্দ
সাধারণ সম্পাদক,
রামকৃষ্ণ মিশন

# নবযুগের নূতন পুণ্যব্রত

স্বামী রঙ্গনাথানন্দ

আজ ভারতবর্ষের প্রধানতম সমস্যা— মানুষ। আজ এদেশে ব্যাপকভাবে মানুষের সার্বিক অধঃপতন চোখে পড়ছে। তার কারণ আমরা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মানুষকে অবহেলা করে এসেছি।

স্বামী বিবেকানন্দ ঘোষণা করেছেন, মানুষ স্বরূপতঃ দেবতা। তিনি মানুষের এই দেবত্বের পরিচয়ই তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। অন্যান্য ধর্মনেতাদের মুখে আমরা মন্দিরের দেবতা, তীর্থের দেবতার কথা শুনেছি, স্বামীজীর মুখে শুনলাম মানুষের মধ্যে যে দেবতা বাস করেন, সেই পরম দেবতার কথা।

কেবল মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের পূজা করা তাঁদের পূজার যথার্থ পদ্ধতি নয়। আমাদের দেশে প্রাচীন কাল হতে তেত্রিশ কোটি দেবতা পূজিত হয়ে আসছেন। সেই তেত্রিশ কোটি দেবতার সঙ্গে আর একজন-দুজন নূতন দেবতাকে যুক্ত করবার জন্যে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আবির্ভূত হননি। মানুষের সেবাই তাঁর পূজা। যেদিন মানুষের সব দুঃখ, সব দুর্গতি, সব অকল্যাণ দূর করবার প্রয়াস করা হবে, তখনই ঠিক ঠিক রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের পূজা করা হবে।

খুবই আনন্দের কথা, শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের এরূপ যথার্থ অর্চনা করতে অগ্রণী হয়ে এসেছে নবসৃষ্ট বিবেকানন্দ যুব মহামণ্ডল ও নিবেদিতা ব্রতী সঙ্ঘ, মানুষের দুর্গতি দূর করার মহান ব্রতই যাদের ব্রত।

বহু প্রাচীন কাল হতে আমাদের দেশে নারীগণ নানারূপ ব্রত-অনুষ্ঠান পালন করে আসছেন। নিবেদিতা এক নূতন ধরনে পুণ্য ব্রত পালন করেছিলেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ নিবেদিতার কথা বলতে গিয়ে বলেছিলেন— "নিবেদিতা আধুনিক যুগের সতী।" পুরাণের সতী শিবের জন্য দুশ্চর কঠোর তপস্যা করেছিলেন। আধুনিক সতী নিবেদিতাও তাই করেছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁর শিবকে দেখেছিলেন দুঃখ-তাপিত মানুষদের মধ্যে। পুরাণের সতীর মতোই তিনি তাঁর এই শিবের জন্য অতি উগ্র তপস্যা করেছিলেন, চরম কৃচ্ছ্র বরণ করেছিলেন। তাঁর এই তপোমহিমা পুরাণের সতীর তপোমহিমা হতে কোন অংশে নূতন নয়। কিন্তু তাঁর সকল কৃচ্ছ্রসাধন ছিল নরের মধ্যে নারায়ণের উদ্বোধনের জন্যে। এ বিষয়ে নিবেদিতা আশ্চর্যভাবে কাজ করেছিলেন,—অক্লান্তভাবে প্রচার, অসীম ধৈর্য ও দক্ষতার সঙ্গে সংগঠনকার্য ও নিরলস সেবানুষ্ঠান করেছেন।

স্মরণ রাখতে হবে নিবেদিতা ভারতের প্রতি কি এক আশ্চর্য শ্রদ্ধা বহন করতেন। সে-শ্রদ্ধা শুধু ভৌগোলিক ভারতের প্রতি উৎসারিত ছিল না, সে-শ্রদ্ধা উৎসারিত হয়েছিল চিন্ময় আত্মিক ভারতের প্রতি। সেই শ্রদ্ধাই তাঁকে ভারতের অগণিত আর্ত মানুষদের সেবায় আত্মদান করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। এই শিবরূপে জীবসেবাব্রতে তাঁকে দীক্ষিত করেছিলেন ভারতাত্মা স্বামী বিবেকানন্দ। বিবেকানন্দ আবার এই ব্রতে

* নিবেদিতা ব্রতী সংঘের প্রতিষ্ঠা-দিবস উপলক্ষে প্রদত্ত ইংরেজী ভাষণের অনুবাদ। অনুলেখন ও অনুবাদ : অধ্যাপিকা সান্ত্বনা দাশগুপ্ত

দীক্ষালাভ করেছিলেন তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে। গুরুপ্রদত্ত সেই মহান ব্রত অক্লান্তভাবে অনুষ্ঠান করতে করতে অকালে ১৯১১ সালে নিবেদিতার জীবন-অবসান ঘটে। জীবন আহুতি দিয়েই তিনি এই মহান ব্রতানুষ্ঠান সম্পন্ন করেছেন।

এই মহান ব্রতে আজ যারা নূতন করে দীক্ষিত হচ্ছেন, তাঁরাই রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের প্রকৃত ভক্ত। ঈশ্বরের প্রকৃত ভক্ত কে? যে ঈশ্বরের প্রকৃত ভক্ত, সে নিশ্চেষ্ট নিষ্ক্রিয় স্থাণু গৃহকোণবাসী হতে পারে না। যে ঈশ্বরের প্রকৃত ভক্ত, সে সতত সচেষ্ট হবে সর্বতোভাবে সমাজের সকল অমঙ্গল দূর করতে, সর্বদা সক্রিয় হবে মানুষের দুঃখ-দুর্গতি দূর করতে।

গত সহস্র বৎসর ধরে আমরা কত না পূজা-পার্বণ, ব্রত-অনুষ্ঠান পালন করে আসছি, তাতে কি সমাজের অমঙ্গল দূর হয়েছে? তা হয়নি। কারণ আমাদের পূজাপদ্ধতি পূর্ণাঙ্গ হয়নি। কারণ আমরা নিশ্চেষ্ট, নিষ্ক্রিয়, উদাসীন, স্থাণু, গৃহকোণে পলাতক, জড়বৎ ছিলাম। আমরা তখন ভক্ত নামধেয় ছিলাম, প্রকৃত ভক্ত ছিলাম না। জড়তার আবরণে আবৃত তথাকথিত আধ্যাত্মিকতা আধ্যাত্মিকতাই নয়, আধ্যাত্মিকতার ছদ্মবেশে তামসিকতা মাত্র। তার পরিবর্তে এক সক্রিয় শক্তি-সমন্বিত (dynamic) আধ্যাত্মিকতা আজ আমাদের চাই এবং এরূপ আধ্যাত্মিকতা জগৎকে দিতেই রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আবির্ভাব। আজ গৃহকোণে বসে কেউ যদি দিনভোর রাতভোর শ্রীরামকৃষ্ণের জয়ধ্বনি করেন, দিনরাত পূজা-অর্চনা, ব্রত-উপবাস অনুষ্ঠান করেন, অথচ জড়তা কাটিয়ে উঠতে না পারেন, তাহলে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণভক্ত নন। শ্রীরামকৃষ্ণভক্তের মধ্যে কোন জড়ত্ব থাকবে না, সে হবে সতত সক্রিয়ভাবে মানবসেবায় তৎপর। নরনারায়ণসেবাই শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তের মুখ্য ধর্মাচরণ।

নিবেদিতা ব্রতী সঙ্ঘের নামটি সেজন্য খুবই তাৎপর্যপূর্ণ, খুবই অর্থবহ। তাঁর নামের মধ্যে নূতন যুগের এই নূতন ধরনের মহাপুণ্য-ব্রতানুষ্ঠানের সঙ্কেত রয়েছে। অগণন দুঃখী মানুষের অশ্রুজলমোচন, তাদের প্রাণে আনন্দামৃত-পরিবেষণ—এই-ই নূতন যুগের সর্বসিদ্ধিপ্রদ মহাপুণ্যব্রত।

আজও যে-সব ভক্ত এ বিষয়ে নিশ্চেষ্ট হয়ে আছেন, তাঁদের প্রত্যেককে সমাজের প্রতি তাঁদের দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন হতে হবে, নিযুক্ত হতে হবে সক্রিয়ভাবে দুঃখী মানুষের দুঃখ দূর করার মহান কার্যে—শিবের সেবায়, প্রত্যক্ষ শিবের সেবায় অগ্রসর হয়ে আসতে হবে।

আজ সমাজের সর্বত্র মানুষের কী অপরিসীম দুঃখ! হাজার হাজার মানুষ নিদারুণ দুঃখ-পঙ্কে নিমজ্জিত—দারিদ্র্য, বেকারত্ব, শিক্ষার অভাব তাদের নিয়ত পীড়িত করছে। এই যে হাজার হাজার শিশু বস্তীতে বেড়ে উঠছে, তারাও ত মানবশিশু—অথচ তাদের ক্ষুধায় অন্ন নেই, পরনে বস্ত্র নেই, নেই শিক্ষার সুযোগ, মানুষের মতো বেঁচে থাকবার কোন উপায়ই তাদের নেই। তাদের শিক্ষা দেওয়া, তাদের মানুষের মত বাঁচবার সুযোগ করে দেওয়া, তাদের মুখে অন্ন তুলে দেওয়া—এর চেয়ে বড় ধর্ম আর কি হতে পারে?

শ্রীরামকৃষ্ণের নাম নিয়ে কেবল পূজা-অর্চা, নিয়মপালন ইত্যাদি নিয়ে থাকলেই চলবে না, মানবসেবাতেও ব্রতী হতে হবে।

বেদান্ত সর্বশাস্ত্রসার। বেদান্ত বলেন—সকলের সঙ্গে একত্ব-অনুভবেই প্রকৃত ধর্মানুষ্ঠান। আর সর্বমানবের সেবানুষ্ঠান এই একত্ব-অনুভবেরই পথে এগিয়ে দেয়। সেজন্য শুধু সন্ন্যাসীকেই নয়, ভক্ত গৃহস্থকেও প্রকৃত ধর্ম লাভ করাবে এই সেবাব্রত-পালন।

পুনরায় বলি, ধর্ম স্থাণুত্ব নয়, জড়ত্ব নয়, আচার-অনুষ্ঠান নয়। ধর্ম হল আত্মবিকাশ, এ হল হওয়া ( being and becoming )। গৃহস্থকেও যদি ধার্মিক হতে হয়, তাহলে তারও মধ্যে আত্মবিকাশ ঘটা চাই, তাকেও 'হতে' হবে। জড়ত্বনাশই ধর্ম। মানব-সেবাই সকল মানুষের সঙ্গে একত্ব-উপলব্ধির একটি রাজপথ। গৃহস্থকেও এই পথ দিয়ে ধর্মজীবনে অগ্রসর হয়ে চলতে হবে। এই সেবাব্রতের পথেই আত্মিক বিকাশ ঘটবে, সর্বভূতে একত্ব দর্শন হবে, মায়ার অপসরণ ঘটবে। সেজন্য মানব-সেবাব্রতই প্রকৃত ধর্ম।

স্মরণ রাখতে হবে যে, আধ্যাত্মিকতা একটি প্রচণ্ড শক্তি—শারীরিক শক্তির মতোই এ শক্তি বাস্তব, এর প্রচণ্ডতা আরো বেশী। আধ্যাত্মিকতা আমাদের দেয় নিষ্ঠা, শ্রদ্ধা, অমিত প্রেম, বীর্য, জ্ঞান, মঙ্গলসাধনের দুর্জয় শক্তি, জীবনদান করবার অমিত শক্তি। এইরূপ আধ্যাত্মিকতায় মানুষের পরম প্রয়োজন রয়েছে। মানুষের পরম প্রয়োজনীয় ও প্রার্থিত এই বস্তুটি দান করতেই এসেছিলেন শ্রীশ্রীঠাকুর-স্বামীজী ও শ্রীশ্রীমা।

স্বামীজী কখনও পাশ্চাত্যের সংস্কৃতি-সম্পদকে প্রত্যাখ্যান করতে বলেননি। হিন্দু নারীকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় সংস্কৃতিরই শুভকরী দিকগুলির সমন্বয়ে গঠিত এক অতি মহান সংস্কৃতিতে দীক্ষিত করতেই স্বামীজী চেয়েছিলেন। সেজন্যই নিয়ে এসেছিলেন পাশ্চাত্যের মেয়ে নিবেদিতাকে এ দেশের মেয়েদের শিক্ষা দিতে। নিবেদিতার মধ্যেই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সার্থক সমন্বয় ঘটেছে। নিবেদিতা নিঃসন্দেহে আধুনিক নারীর সর্বাঙ্গসুন্দর আদর্শ।

নিবেদিতার কর্ম, সেবাব্রত স্বামীজী-কথিত বাস্তব-রূপায়িত বেদান্তকে জীবন্ত করে তুলেছিল। তাঁর সে ব্রত আজ যারা উদ্‌যাপনে প্রবৃত্ত, তাদের কর্মধারা শ্লাঘার বস্তু। এখানে পরিমাণগত প্রশ্নের অপেক্ষা গুণগত প্রশ্নের গুরুত্ব অধিক। অপরের কল্যাণ-সাধনের যে-শক্তি আজ নারীসমাজের মধ্যে অঙ্কুরিত হয়েছে, সেটি খুব বড় কথা। ছোট ছোট কেন্দ্রে দশ-বার জন করেও এরূপ কল্যাণব্রতী যদি তৈরী হয়, তারা আবার প্রত্যেকে আরও দশ-বার জনকে প্রবুদ্ধ করবে। এমনি করেই তারা ছড়িয়ে পড়বে। ক্রমে সারা দেশে বিপুল শুভ কর্মশক্তি, কল্যাণ-কর্মপ্রবাহ উদ্ভূত হবে।

লক্ষণীয় যে, আধুনিক তরুণী নারীগণ এই কল্যাণ-ব্রতানুষ্ঠানে উদ্বুদ্ধ হচ্ছেন। আজকের তরুণী নারী পুরোনো ধরনের ব্রতনিয়ম উদ্‌যাপনে আকৃষ্ট না-ও হতে পারে। এই নূতন পুণ্যব্রতই তাদের আকৃষ্ট করতে পারে। তার প্রমাণ আজ আমরা প্রত্যক্ষ করছি এই ধরনের ব্রতে ব্রতী সংগঠনের কর্মধারায়। গৃহস্থ তরুণী, বধূ, জননী, চাকুরিজীবী নারীরা কঠিনসাধ্য কল্যাণকর্ম করছেন। সম্প্রতি বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলে এই ধরনের ব্রতী দল যে সেবানুষ্ঠানের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখেছেন তা দেখে এর সত্যতা উপলব্ধি করা যায়। এ বড়ই প্রেরণাপ্রদ। এই প্রেরণা-সঞ্চারের মধ্যেই এই সব সংগঠনের সার্থকতা। এই প্রেরণা ছড়িয়ে দিতে হবে গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন তাঁকে সকলের মধ্যে পূজা করতে। ভাগবতেও শ্রীভগবান বলেছেন :

অথ মাং সর্বভূতেষু ভূতাত্মানং কৃতালয়ম্।
অর্হয়েদ্দানমানাভ্যাং মৈত্র্যাভিন্নেন চক্ষুষা॥

—শ্রীমদ্‌ভাগবতম্, ৩।২৯।২৭

অর্থাৎ আমি সর্বভূতে অবস্থিত, সর্বভূতের অন্তরাত্মা ; একথা জেনে দান, মান, মৈত্রী ও সমদর্শিতার দ্বারা সকলের অর্চনা করবে—উহা আমারই পূজা।' সুতরাং সর্বজীবের সেবাই ভগবানের শ্রেষ্ঠ পূজা। সুতরাং দরিদ্র শিশুদের শিক্ষা দেওয়া, বেকারত্ব দূর করার প্রয়াস, দরিদ্রের দারিদ্র্যদুঃখ ঘোচাবার প্রয়াস শ্রেষ্ঠ পূজাকর্ম। আজ ভারতের মধ্যবিত্তদের সামনে একটি দারুণ পরীক্ষা এসেছে। স্বামীজী বলেছিলেন, বিত্তহীনের বন্ধু হয়েই তারা বেঁচে থাকতে পারে। দেখা যাচ্ছে শিবজ্ঞানে মানব-সেবাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম, শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রসেবাও। এই শ্রেয়ের পথে আজ যে পথিকেরা চলতে প্রয়াস করছেন তাঁদের সকলকেই জানাই আমাদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। প্রার্থনা করি, তাঁদের মহান কর্মব্রত প্রতিদিন প্রসার লাভ করুক।

# সহিষ্ণুতা

শ্রীকানাইলাল সামন্ত

মহান্ দীক্ষায় তব দীক্ষিত হে আমি
হে সর্বসৃজনকর্তা চরাচরস্বামি!
চঞ্চল হৃদয় মোর ক্ষুব্ধ মুহ্যমান
মিথ্যা শোক তাপে নিত্য, সমুদ্র সমান
ক্ষিপ্ত মৃদু বায়ু স্পর্শে ; শ্রীনাম তোমার
বিস্মৃত ; তাহারে দাও তব আঙিনার
সকল সন্তাপহারী পূর্ণ মহিমায়
একটি আসন প্রভু ; শিখাও তাহায়
তব সহিষ্ণুতা-মন্ত্র, যার পুণ্যবলে
অচঞ্চল রহি' নিত্য অটবীসকলে
পরিহসি' প্রভঞ্জনে প্রশান্ত বদনে
যথাকালে সঁপি' দেয় তোমার চরণে
পত্রপুষ্পে সুশোভিত রচি' মাল্যহার,
আনত শিরেতে আনে অর্ঘ্য উপচার।

# ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী

[ পূর্বানুবৃত্তি ]

স্বামী অচিন্ত্যানন্দ

এখন মানুষের ব্রহ্মজ্ঞানে অধিকার বিষয়ে আলোচনা করা যাক। বেদান্তসূত্রের ১।৩।৩৪-এর ভাষ্যে আচার্য শঙ্কর বলিয়াছেন, 'উপনয়নপূর্বকত্বাদ্বেদাধ্যয়নস্য, উপনয়নস্য চ বর্ণত্রয়বিষয়ত্বাৎ।' অর্থাৎ 'উপনয়নসংস্কার ( যজ্ঞোপবীতধারণ ) হইলে বেদ অধ্যয়নের অধিকার হয় এবং ব্রহ্মবিদ্যা শ্রবণ ও শিক্ষা করিতে পারে, আর বর্ণত্রয়ের ( ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণের ) উপনয়নসংস্কারগ্রহণের অধিকার আছে।'

বেদান্তসূত্রের ১।৩।৩৬ সূত্রে বলা হইয়াছে, 'সংস্কারপরামর্শাৎ' অর্থাৎ 'সর্বত্রই ব্রহ্মবিদ্যাগ্রহণের নিমিত্ত উপনয়নসংস্কারের কথা আছে।' ইহার ভাষ্যে আচার্য শঙ্কর বলিয়াছেন, 'বিদ্যাপ্রদেশেষূপনয়নাদয়ঃ সংস্কারাঃ পরামৃশ্যন্তে'। অর্থাৎ 'যেখানে যেখানে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশপ্রসঙ্গ আছে, সেখানেই উপনয়নসংস্কার, বেদাধ্যয়ন, গুরুশুশ্রূষা ইত্যাদি পূর্বক বিহিত আছে।'

শ্রুতিতেও আছে, "তংহোপনিন্যে ( শতপথ ব্রাহ্মণ—১১।৫।৩।১০ ), "অধীহি ভগব ইতি হোপসসাদ" ( ছান্দোগ্য ৭।১।১ ), "ব্রহ্মপরা ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ পরং ব্রহ্মান্বেষমাণা এষ হ বৈ তৎ সর্বং বক্ষ্যতীতি তে হ সমিৎপাণয়ো ভগবন্তং পিপ্পলাদমুপসন্নাঃ" ( প্রশ্নোপনিষৎ ১।১ ), অর্থাৎ বেদ বলিতেছেন, 'তাঁহাকে ( ব্রহ্মবিদ্যাভিলাষীকে ) উপনয়নসংস্কার ( আচার্য ) দান করিলেন' আরও দুইটি শ্রুতিভাগে আছে—'হে ভগবন! আমায় অধ্যয়ন করান ( বলিয়া নারদ আচার্য সনৎকুমারের ) উপসদনে ( গৃহে গমন করিয়া শিষ্য হইলেন )' এবং ব্রহ্মে ( বেদে ) পারদর্শী ব্রহ্মনিষ্ঠাসম্পন্ন, পরব্রহ্ম-অন্বেষণকারী ( ঋষিগণ )—ইনি ( আচার্য পিপ্পলাদ ) আমাদিগকে সেই ( পরব্রহ্ম ) বিষয়ে সমস্ত কথা বলিবেন স্থির করিলেন—অনন্তর তাঁহারা সমিৎ ( যজ্ঞীয় কাষ্ঠ ) হস্তে লইয়া ভগবান পিপ্পলাদের উপসদনে ( গৃহে ) ( উপদেশগ্রহণের জন্য ) উপস্থিত হইলেন।' উদ্ধৃত শ্রুতিমন্ত্রসকল হইতে পাওয়া যাইতেছে যে, ব্রহ্মবিদ্যালাভের জন্য যথারীতি আচার্যের গৃহে যাইতে হয়। এই রীতি হইতেই ধরিয়া লওয়া যায় আচার্যগৃহে যাইবার পর—উপনয়নসংস্কারগ্রহণ, ব্রহ্মচর্যপালন, বেদশ্রবণ ইত্যাদি যথাক্রমে হইয়া থাকে। পূর্বে বলা হইয়াছে, ব্রহ্মসূত্রের ( ১।৩।৩৪-এর ) ভাষ্যে এক স্থানে আচার্য শঙ্কর বলিয়াছেন, 'উপনয়নপূর্বকত্বাদ্বেদাধ্যয়নস্য উপনয়নস্য চ বর্ণত্রয়বিষয়ত্বাৎ।' অর্থাৎ 'উপনয়ন ( আচার্যগৃহবাস, ব্রহ্মচর্য ইত্যাদি ) পূর্বক বেদাধ্যয়ন ( এবং ব্রহ্মবিদ্যালাভ ) হইয়া থাকে, আর বর্ণত্রয়ের ( ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের ) উপনয়ন হইয়া থাকে ( এবং আচার্যগৃহবাস, ব্রহ্মচর্য, বেদাধ্যয়ন ও ব্রহ্মবিদ্যা লাভ হয় )।' মানুষের মধ্যে বর্ণত্রয়ের ব্রহ্মবিদ্যাশিক্ষার ও ব্রহ্মজ্ঞানলাভের অধিকার আছে, ইহা সিদ্ধ হইল।

এখন চতুর্থ বর্ণ শূদ্রের ব্রহ্মজ্ঞানে অধিকারবিষয়ে শাস্ত্র কি বলিতেছেন দেখা যাক। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায়, "চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ। তস্য কর্তারমপি মাং

বিদ্ধ্যকর্তারমব্যয়ম্।"—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৪।১৩, এই কথা বলিয়াছেন। অর্থাৎ 'আমি পরিমাণমত গুণ ও কর্ম দিয়া চারিটি ( ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র ) বর্ণের সৃষ্টি করিয়াছি। তাহাদের ( চারিটি বর্ণের ) ( সৃষ্টির ) কর্তা আমি। তাহা হইলেও আমাকে অকর্তা ও অবিনাশী বলিয়া জানিও।' এখানে ভগবান চারিটি বর্ণের কথা একসঙ্গে বলিয়াছেন। শূদ্রের কথা পৃথক্ করিয়া বলেন নাই। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রবর্ণের সৃষ্টি, তাহাদের পরিমাণমত গুণ ও কর্মের বিধান তিনিই করিয়াছেন বলিতেছেন, সে-সকলের কর্তৃত্ব স্বীকার করিতেছেন। ভগবান জাতিসৃষ্টির কথা বলেন নাই। এখানে বর্ণ বলিতে শ্রেণী, সমধর্মবিশিষ্ট ব্যক্তিদের শ্রেণী—জাতি কিন্তু একটি। এই শ্লোকের ভাষ্যে শঙ্করাচার্য যাহা বলিয়াছেন সেভাবে সত্ত্বগুণ প্রধান, রজোগুণ ও তমোগুণ অপ্রধান যাঁহাদের মধ্যে, তাঁহারা এক শ্রেণীর—নাম দেওয়া হইল ব্রাহ্মণ। রজোগুণ প্রধান, সত্ত্বগুণ ও তমোগুণ অপ্রধান যাঁহাদের, তাঁহারা আর একশ্রেণীর—নাম হইল ক্ষত্রিয়। রজোগুণ প্রধান, কিন্তু ক্ষত্রিয়শ্রেণীর ন্যায় নহে, সত্ত্বগুণও ক্ষত্রিয়দের অপেক্ষা কম, আর তমোগুণ অপ্রধান যাঁহাদের, তাঁহাদের শ্রেণী হইল বৈশ্য। তমোগুণ প্রধান আর সত্ত্বগুণ ও রজোগুণ অপ্রধান যাঁহাদের, তাঁহাদের শ্রেণী হইল শূদ্র। ব্রাহ্মণের কর্ম হইল তপস্যা যজন যাজন অধ্যয়ন অধ্যাপন। ক্ষত্রিয়ের কর্ম হইল রাজকার্য-পরিচালনা, যুদ্ধ-বিগ্রহ। বৈশ্যের কর্ম হইল কৃষিকর্ম, গো-পালন ও বাণিজ্য। শূদ্রের কর্ম হইল দাসত্ব। এই যে শ্রেণীগত শূদ্র তাহাদের মধ্যে সাধারণতঃ গুণ ও কর্মের হীনতাবশতঃ ব্রহ্মবিদ্যা-বিষয়ে আকাঙ্ক্ষা থাকিতে পারে না। কিন্তু তাহাদের কাহারও সাধনার দ্বারা সে হীনতা যদি চলিয়া যায়, তাহা হইলে তিনি গুণাধিক্যবশতঃ উচ্চ-শ্রেণী বৈশ্য, ক্ষত্রিয় বা ব্রাহ্মণ যে-কোন শ্রেণী-ভুক্ত হইবেন। তখন তাঁহার ব্রহ্মবিদ্যায় আকাঙ্ক্ষা আসিবে এবং তিনি তাহার অধিকারী হইবেন। শূদ্রশ্রেণীভুক্ত ব্যক্তি যেমন অধিক-গুণসম্পন্ন হইলে গুণের তারতম্য অনুযায়ী বৈশ্য বা ক্ষত্রিয় বা ব্রাহ্মণশ্রেণীভুক্ত হন, সেইরূপ বৈশ্যশ্রেণীভুক্ত ব্যক্তির ক্ষত্রিয় বা ব্রাহ্মণশ্রেণীভুক্ত এবং ক্ষত্রিয়ের—ব্রাহ্মণশ্রেণীভুক্ত হওয়া সম্ভব। আবার হীন গুণ ও কর্মসম্পন্ন হইলে তারতম্য অনুযায়ী ব্রাহ্মণ নামিয়া গিয়া ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য বা শূদ্রশ্রেণীভুক্ত হইতে পারেন, ক্ষত্রিয় নামিয়া গিয়া বৈশ্য বা শূদ্রশ্রেণীভুক্ত এবং বৈশ্য নামিয়া গিয়া শূদ্রশ্রেণীভুক্ত হইতে পারেন। শূদ্র-শ্রেণীতে নামিয়া গেলে ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যের ব্রহ্মজ্ঞানের আকাঙ্ক্ষা চলিয়া যায় এবং যতই তাঁহারা সে অধিকার হইতে বিচ্যুত হন।

এতক্ষণ আমরা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি চারি বর্ণের বা শ্রেণীর অধিকার-আলোচনামুখে শূদ্রের ব্রহ্মজ্ঞানে অধিকারের কথা বিচার করিয়া দেখিলাম। কিন্তু সাধারণতঃ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারিটি জাতি বলিয়া সকলে জানে এবং ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য-জাতির উপনয়ন-সংস্কার হয়, সেইজন্য তাঁহারা দ্বিজাতি। দ্বিজাতির ব্রহ্মজ্ঞানে, ব্রহ্মবিদ্যায়, বেদবিদ্যায় অধিকার আছে। শূদ্রের উপনয়ন হয় না, এইজন্য তাহারা দ্বিজাতি নয়, একজাতি—একজাতির ব্রহ্মজ্ঞানে, ব্রহ্মবিদ্যায়, বেদ-বিদ্যায় অধিকার নাই, এই কথা বলা হইয়া থাকে। আচার্য শঙ্কর তাঁহার ব্রহ্মসূত্রের ( ১।৩।৩৪ ) ভাষ্যে এই কথাই বলিয়াছেন।

এবিষয়ে শাস্ত্র কি বলিয়াছেন দেখা যাক। ছান্দোগ্য উপনিষদে ( ৪।২।১ ) আছে—রাজা

পৌত্রায়ণ জানশ্রুতি বহুবিধ উপহার লইয়া ব্রহ্মজ্ঞানী রৈক্কের নিকট গিয়া সেই-সব উপহার তাঁহাকে দিয়া ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ ভিক্ষা করিলে, ( ছা—৪।২।২ ) রৈক্ক জানশ্রুতিকে বলিয়াছিলেন "তমু হ পরঃ প্রত্যুবাচাহ হারেত্বা শূদ্র তবৈব সহ গোভিরস্ত্বিতি" ( ছা ৪।২।৩ ) অর্থাৎ 'তাঁহাকে ( জানশ্রুতিকে ) অন্য ( রৈক্ক ) উত্তরে বলিয়াছিলেন, রে শূদ্র ! এইসকল গাভী সহিত ( যাবতীয় উপহার সামগ্রী ) তোমারই থাকুক' ( ছা—৪।২।৩ )। পুনরায় দেখা যায় এই শ্রুতিভাগেই আছে, "আজহারেমাঃ শূদ্র, অনেনৈব মুখেনালাপয়িষ্যথা ইতি," ( ছা—৪।২।৫ ) অর্থাৎ '( রৈক্ক রাজা জানশ্রুতিকে ) বলিলেন, হে শূদ্র ! ( তুমি ) এই যে ( উপহার ) সকল আনিয়াছ, এই উপায়েই ( আমায় ) কথা বলাইবে' ( ছা—৪।২।৫ )। পরে এই শ্রুতিতে দেখা যাইতেছে যে, রৈক্ক জানশ্রুতিকে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ দিলেন। যাহাকে শূদ্র বলিয়া বার বার সম্বোধন করিতেছেন, তাহাকে শূদ্র বলিয়াই রৈক্ক জানেন, জানিয়াও ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ দিলেন। শূদ্রের অধিকার আছে বলিয়াই দিলেন। এই শ্রুতিভাগ শূদ্রের ব্রহ্মবিদ্যায় যে অধিকার আছে তাহা স্পষ্ট করিয়াই বলিতেছেন।

কেহ কেহ বলেন রাজা জানশ্রুতি ক্ষত্রিয় ছিলেন—এ বিষয়ে তাঁহারা প্রমাণও দেন, কিন্তু দেখিলেই বোঝা যায়—সে প্রমাণ কষ্টকল্পনামাত্র। আবার কেহ মনে করেন যেহেতু জানশ্রুতি রাজা ছিলেন, সেই হেতু ধরিয়া লইতে হইবে তিনি ক্ষত্রিয় ছিলেন। মহাভারতে এবং রামায়ণে অনেক শূদ্র রাজার কথা আছে। উড়িষ্যায় এক সময়ে শবররা রাজা ছিলেন—বর্তমানে সে দেশে যে-সকল মন্দির আছে, তাহার মধ্যে অনেক মন্দির সেই শবর রাজারা নির্মাণ করাইয়াছিলেন। শবররা জাতিতে শূদ্র ছিলেন। এইসকল হইতে দেখা যাইতেছে, শূদ্ররাও রাজা হইতেন এবং লোকেরা তাহা মানিয়া লইতেন। রাজা হইলেই ক্ষত্রিয় হইবেন, এমন কোন কথা শাস্ত্রে কোথাও নাই। সুতরাং জানশ্রুতি রাজা হইলেও জাতিতে শূদ্র ছিলেন, এই জন্যই রৈক্ক তাঁহাকে শূদ্র বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন—ইহাই বুঝিতে হইবে।

এখন আমরা সত্যকাম জাবালের প্রসঙ্গে শ্রুতি কি বলিয়াছেন দেখিব। শ্রুতিতে আছে, "সত্যকামো হ জাবালো জবালাং মাতরমামন্ত্রয়াঞ্চক্রে ব্রহ্মচর্যং ভবতি বিবৎস্যামি কিংগোত্রো ন্বহমস্মীতি" (ছান্দোগ্য উপনিষদ্ ৪।৪।১)। অর্থাৎ "জবালার পুত্র সত্যকাম মাতা জবালাকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, 'হে পূজনীয়ে (আমি) আচার্যগৃহে ব্রহ্মবিদ্যালাভের উদ্দেশ্যে ব্রহ্মচর্যবাস ( বেদাধ্যয়নাদির নিমিত্ত বাস ) করিব, আমি কোন্ গোত্রের ( ইহা আমায় বলুন )। উত্তরে "সা হৈনমুবাচ নাহমেতদ্বেদ তাত যদ্গোত্রস্ত্বমসি বহ্বহং চরন্তী পরিচারিণী যৌবনে ত্বামলভে, সাঽহমেতন্ন বেদ যদ্গোত্রস্ত্বমসি জবালা তু নামাহমস্মি সত্যকামো নাম ত্বমসি স সত্যকাম এব জাবালো ব্রবীথা ইতি।"—(ছান্দোগ্য, ৪।৪।২ )। অর্থাৎ তিনি ( জবালা ) ইহাকে ( পুত্র সত্যকামকে ) বলিলেন, বৎস ! তুমি যে গোত্রের তাহা আমি জানি না, আমি যৌবনে বহু ( গৃহে ) বিচরণ করিয়া পরিচারিকার কার্য করিতাম, তখন তোমায় লাভ করিয়াছিলাম, সেই ( পরিচারিকা ) আমি ইহা জানি না তুমি যে গোত্রের, আমি হইতেছি জবালা নাম্নী ( মহিলা ), আর তুমি হইতেছ সত্যকাম নামক ( আমার পুত্র )। সেই তুমি সত্যকাম জাবাল ( এই পরিচয়ই

আচার্যকে ) বলিবে।" এখানে বেশ স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, জবালা বলিতেছেন তিনি পরিচারিকা অর্থাৎ ঝি, দাসী বা চাকরানী, অল্প বয়সে যখন সামর্থ্য ছিল সংসার প্রতি-পালনের জন্য অনেক বাড়ীতে চাকরানীর বা ঝি-এর কাজ করিতেন। স্বামী হয়ত দূরে কোথাও উপার্জন-উদ্দেশ্যে থাকিতেন, হয়ত ভৃত্য বা চাকরের কাজ করিতেন, ছুটি পাইতেন কম, বহুকাল পরে অল্প সময়ের জন্য আসিতেন, তখন পুত্রের মুখও দেখিতেন, কয়েকদিন পরেই কিন্তু চলিয়া যাইতে হইত। এ অবস্থায় পুত্রের জন্মকাল হইতে মাতাই তাহার লালনপালন এবং সামান্য অবসরকালে সৎশিক্ষাদান করিয়াছিলেন। সেইজন্য মাতার পরিচয়েই পুত্রের পরিচয় ছিল। মাতা সেই পরিচয়—সত্যকাম জাবাল এই পরিচয় দিতে বলিলেন। পরিচারিকা বা ঝি বা চাকরানীরা শূদ্রাণী, তাঁহারা গোত্রের খবরের কোন প্রয়োজন বোধ করেন না। স্বামী হয়ত তাহা জানিতেন, কিন্তু প্রয়োজনবোধ না থাকায় এবং অনেক গৃহে কর্ম করিতে হইত বলিয়া জবালা সে খবর জানিবার সময় পাইতেন না। স্বামী আসিলে যেটুকু সময় পাইতেন স্বামীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-বিধানেই নিয়োগ করিতেন, তাহাতেই ছিল তাঁহার আনন্দ। এখানে জবালার সৎসাহস লক্ষ্য করিবার বিষয়। তিনি বলিতেছেন, তিনি পরিচারিকা শূদ্রাণী, চাকরানীর কাজ করেন, তাঁহার পুত্র সত্যকাম, এই পরিচয় আচার্যকে দিতে বলিতেছেন।

আলোচ্য শ্রুতির এইরূপ ব্যাখ্যা করা আমাদের সমীচীন মনে হয়। ইহাতে কোন দোষ থাকে না। জবালা যেরূপ নির্দোষ ও নির্ভীক ভাবে নিজের পরিচয় দিতেছেন, তাহা দেখিয়া এইরূপ ব্যাখ্যাই মনে লাগে। আজকালও কোথাও কোথাও এইরূপ দেখা যায়। মাতা সংসারপ্রতিপালনের জন্য অনেক বাড়ীতে ঝি-এর কাজ করিতেছেন। পিতা দূরে কোথাও উপার্জন উদ্দেশ্যে থাকেন, অল্পই বেতন পান, তাহা হইতে সামান্য ঘরে পাঠান। অল্প দিনের ছুটি পান, অল্প সময়ের জন্য আসেন। ছেলেমেয়েদের মাতার নামেই পরিচয়। বিদ্যালয়ে পড়ার সময় অভিভাবক বলিয়া মাতার নামই লেখা থাকে। মাতা হাড়ভাঙা খাটুনি খাটিয়া অনেক বাড়ী কাজ করিয়া যাহা উপার্জন করেন, তাহা দিয়া কষ্টেসৃষ্টে ছেলেমেয়েদের মানুষ করেন, বিদ্যালয়ে পড়ান।

এখন আচার্যগৃহে কি হইল, আমরা শ্রুতি হইতে দেখিব। সত্যকাম আচার্যগৃহে গেলেন—"স হ হারিদ্রুমতং গৌতমমেত্যোবাচ ব্রহ্মচর্যং ভগবতি বৎস্যাম্যুপেয়াং ভগবন্ত-মিতি॥" ( ছান্দোগ্য উপনিষদ্, ৪।৪।৩ )। অর্থাৎ "তখন গোতমবংশীয় হরিদ্রুমের পুত্র হারিদ্রুমত ( নামক ) আচার্যের নিকটে গিয়া সেই সত্যকাম বলিলেন, হে ভগবান! আপনার ( গৃহে ) ব্রহ্মচর্যব্রত অবলম্বন করিয়া বাস করিব; হে ভগবন্! ( আপনার নিকটে ) শিষ্যরূপে আসিয়াছি।"

তখন "তং হোবাচ, কিংগোত্রো নু সোম্যাসীতি।" ( ছান্দোগ্য—৪।৪।৪ ), অর্থাৎ ( "আচার্য ) তাহাকে বলিলেন, হে সৌম্য! ( তুমি ) কোন্ গোত্রসম্ভূত?" "স হোবাচ নাহমেতদ্বেদ ভো যদ্গোত্রোঽহমস্মি অপৃচ্ছং মাতরং সা মা প্রত্যব্রবীদ্ বহ্বহং চরন্তী পরিচারিণী যৌবনে ত্বামলভে, সাঽহমেতন্ন বেদ যদ্গোত্রস্ত্বমসি, জবালা তু নামাহমস্মি সত্যকামো নাম ত্বমসীতি; সোঽহং সত্যকামো

জাবালোহস্মি ভো ইতি।"—( ছা—৪।৪।৪ )। অর্থাৎ, 'সে বলিল, মহাশয়! আমি কোন্ গোত্রসম্ভূত তাহা জানি না, মাতাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তিনি আমাকে উত্তরে বলিয়াছিলেন—আমি বহু (গৃহে গিয়া) পরিচারিকার কর্ম করিতাম, ( সেই অবস্থায় ) যৌবনে তোমায় লাভ করিয়াছিলাম। সেই ( পরিচারিকা ) আমি ইহা জানি না, তুমি যে গোত্রভুক্ত, আমি হই জবালা নাম্নী ( মহিলা ) আর তুমি হও সত্যকাম নামক ( পুত্র )। মহাশয়। সেই আমি হইতেছি সত্যকাম জাবাল।'

এই কথা শ্রবণ করিয়া, "তং হোবাচ নৈতদব্রাহ্মণো বিবক্তুমর্হতি সমিধং সোম্যাহরোপ ত্বা নেষ্যে ন সত্যাদগা ইতি।" ( ছা, ৪।৪।৫)—অর্থাৎ 'তিনি ( হারিদ্রুমত ) বলিলেন, এইরূপে সব কথা খুলিয়া বলা ব্রাহ্মণ না হইলে সম্ভব হয় না, হে সৌম্য! সমিধ্-কাষ্ঠ আনয়ন কর, আমি তোমায় উপনয়ন ( সংস্কার ) দান করিব, তুমি সত্য হইতে স্খলিত হও নাই।' ( তুমি আচার্যগৃহে ব্রহ্মচর্যব্রত অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মবিদ্যালাভার্থ বাস করিতে পারিবে।) এখানে আচার্য হারিদ্রুমত, "নৈতদব্রাহ্মণো বিবক্তুমর্হতি।" অর্থাৎ 'এইরূপে নিজের কথা এমনভাবে খুলিয়া ব্রাহ্মণ না হইলে কেহ বলিতে পারে না' বলিয়া সত্যকাম জাবাল যে ব্রাহ্মণগুণ-সম্পন্ন তাহাই বলিতেছেন। সে গুণ কি তাহা আচার্য নিজেই পরে বলিতেছেন, "ন সত্যাদগা ইতি" অর্থাৎ 'সত্য হইতে স্খলিত হও নাই, সত্য গোপন কর নাই।' মাতা শূদ্রাণী, তিনি শূদ্রাণীর কর্মই করেন। সেই শূদ্রাণীর গর্ভসম্ভূত সত্যকাম এই সকল কথাই আচার্যকে খুলিয়া বলিয়াছিলেন। সত্যকাম গোত্রকুলশীল কিছুই জানিতেন না। এইরূপ অজ্ঞাতকুলশীল শূদ্রের আচার্যগৃহে ব্রহ্মবিদ্যালাভার্থ উপনয়ন-সংস্কার হওয়া বা ব্রহ্মচর্য অবলম্বনপূর্বক বাস করা সাধারণ দৃষ্টিতে সম্ভব না হইবার কথা। কিন্তু সে সকলই হইল, উপনয়ন হইল, ব্রহ্মচর্যবাস হইল, বেদবিদ্যা এবং ব্রহ্মবিদ্যালাভও হইল। কারণ সত্যকাম ব্রাহ্মণগুণসম্পন্ন, ইহা আচার্য হারিদ্রুমত পরিষ্কার বুঝিতে পারিয়াছিলেন। সেই জন্য তিনি সে সকলই সত্যকামকে দিয়াছিলেন।

"চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ"—

( গীতা, ৪।১৩ )

এই শ্লোকের ভাষ্যে আচার্য শঙ্কর বলিয়াছেন —চাতুর্বর্ণ্যং চত্বার এব বর্ণাশ্চাতুর্বর্ণ্যং, ময়া ঈশ্বরেণ সৃষ্টমুৎপাদিতম্। গুণকর্ম-বিভাগশঃ গুণবিভাগশঃ কর্মবিভাগশশ্চ। গুণাঃ সত্ত্বরজস্তমাংসি। তত্র সাত্ত্বিকস্য সত্ত্ব-প্রধানস্য ব্রাহ্মণস্য। অর্থাৎ 'ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিটি বর্ণই চাতুর্বর্ণ্য— আমার (ঈশ্বরের) দ্বারা সৃষ্ট উৎপন্ন হইয়াছে। ( এই সৃষ্টি ) গুণকর্মবিভাগের দ্বারা - গুণ-বিভাগ ও কর্মবিভাগের দ্বারা ( হইয়াছে )। সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ—এইসকল হইল গুণ। সত্ত্বগুণ প্রধান, সাত্ত্বিক গুণ ব্রাহ্মণের।' অর্থাৎ এই গুণ থাকিলে ব্রাহ্মণ বলিয়া সেই ব্যক্তি গণ্য হইবেন। আচার্য হারিদ্রুমত একটি বিশেষ গুণ ব্রাহ্মণের থাকিবে বলিয়া নির্দেশ করিলেন—তাহা হইতেছে সত্য হইতে বিচলিত না হওয়া। সত্যকামের সে গুণ ছিল, সেইজন্য সে শূদ্র হইলেও তাহাকে আচার্য ব্রাহ্মণ বলিলেন। আচার্য শঙ্কর আলোচ্য গীতার (৪।১৩) শ্লোকের ভাষ্যে, 'ব্রাহ্মণস্য শমোদমস্তপ ইত্যাদীনি' অর্থাৎ 'শম দম তপস্যা ইত্যাদি'

ব্রাহ্মণের কর্ম বলিয়া নির্দিষ্ট করিয়াছেন। এ সকল কর্মের উদ্দেশ্য হইতেছে ব্রহ্মজ্ঞান-লাভ। সত্যকাম ব্রহ্মজ্ঞানলাভরূপ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য সেইসকল শমদমাদি কর্ম করিবেন বলিয়া আচার্যগৃহে ব্রহ্মচর্যব্রত অবলম্বনপূর্বক বাস করিতে চাহিলেন। অতএব দেখা যাইতেছে সত্যকাম শূদ্র হইলেও ব্রাহ্মণের গুণ তাহার রহিয়াছে, ব্রাহ্মণেব কর্ম করিবার ইচ্ছা তাহার আছে, এই জন্য সে ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী। অর্থাৎ এইসকল গুণবিশিষ্ট হইলেও এইসব কর্ম করিলে চারিটি বর্ণের যে-কোন ব্যক্তি ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী হয়, আর এইসকল গুণ না থাকিলে ও এইসব কর্ম না করিলে চারি বর্ণের কেহই ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী হয় না।

শূদ্রের ব্রহ্মজ্ঞানে অধিকাব জানশ্রুতি রৈক্ক ও সত্যকাম জাবালের প্রসঙ্গে শ্রুতি নিজেই স্থাপন কবিলেন।

মনুষ্যদের মধ্যে পুরুষের যেমন ব্রহ্মজ্ঞানে অধিকার আছে, সেইরূপ স্ত্রীলোকেরও আছে। মধ্বাচার্য তাঁহাব পরাশরস্মৃতি-ভাষ্যে লিখিয়াছেন,

"পুরাকল্পে কুমারীণাং মৌঞ্জীবন্ধনমিষ্যতে।
অধ্যাপনঞ্চ বেদানাং সাবিত্রীবচনং তথা॥"

—Bombay Sanskrit series,
edition of Parashar Smriti
Bhasya by Madhvacharyya, P. 83

অর্থাৎ 'প্রাচীনকালে কুমারীদের মৌঞ্জ্য মেখলা ধারণ ( উপনয়ন-সংস্কার গ্রহণ ) করিবার বিধি ছিল। তাঁহারা বেদ ( পড়াইতে ), অধ্যাপন করাইতে এবং সাবিত্রীবচন বলিয়া প্রসিদ্ধ বেদ-মন্ত্র আবৃত্তি করিতে পারিতেন।' ইহা হইতেই পাওয়া যাইতেছে, স্ত্রীলোকদের উপনয়ন-সংস্কার-গ্রহণ, ব্রহ্মচর্য অবলম্বনপূর্বক বেদবিদ্যালাভার্থে আচার্যগৃহে বাস, বেদ অধ্যয়ন ও আবৃত্তি এবং বেদ অধ্যাপন ইত্যাদি অধিকার ছিল। সুতরাং তাঁহাদের বৈদিক ব্রহ্মবিদ্যালাভ ও ব্রহ্মজ্ঞানের সাধনা করিয়া ব্রহ্মজ্ঞানলাভেরও অধিকার ছিল। স্ত্রীলোকেরা প্রকাশ্য সভায় ব্রহ্মতত্ত্ব-বিষয়ে বেদবিচার করিতেছেন, ইহা শ্রুতিতে পাওয়া যায়। গার্গী-যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদে ( বৃহদারণ্যক উপনিষদ্, ৩।৬।১ এবং ৩।৮।১-১২) দেখা যায়, বচক্নু ঋষির কন্যা গার্গী মহারাজ জনকের আয়োজিত প্রকাশ্য সভায় অপর বৈদিক ব্রাহ্মণদের সহিত বসিয়া, সেই ব্রাহ্মণদের দ্বারা উৎসাহিত হইয়া যাজ্ঞবল্ক্যের সহিত দুই দুইবার বেদবিচার, বৈদিক ব্রহ্মবিদ্যা বিষয়ে বিচার করিতেছেন। অপর ব্রাহ্মণেরা একবার বিচার করিয়াই নিরস্ত হইতেছেন, কিন্তু গার্গী দুই দুইবার বিচার করিতেছেন। শেষবার বিচারের পর আর কেহ যাজ্ঞবল্ক্যকে বিচারে পরাস্ত কবিতে পারিবেন না—ইহা সেই সভায় সমবেত ব্রাহ্মণদের বলিয়া দিতেছেন। আর তাহাই পরে ঘটিল, ইহাও দেখা যাইতেছে। তথায় গার্গী ব্রহ্ম বিষয়ে, বেদ বিষয়ে তাঁহার জ্ঞানের পরিচয় ভাল কবিয়াই সভাস্থ সকলকে দিয়াছিলেন। শুধু তাহাই নহে, তিনি সেই সভায় যাজ্ঞবল্ক্যের প্রতিদ্বন্দ্বী ব্রাহ্মণদের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন, ব্রাহ্মণেরা স্বেচ্ছায় সে নেতৃত্ব গার্গীকে দিয়াছিলেন। এইসকল শাস্ত্র হইতে দেখা যায়, স্ত্রীলোকদেব উপনয়ন-সংস্কারগ্রহণ, ব্রহ্মচর্যব্রত অবলম্বনপূর্বক আচার্যগৃহে বাস, যাহা করিলে বেদ অধ্যয়ন, বেদ অধ্যাপন, বেদ আবৃত্তি, ব্রহ্মবিদ্যা বেদ হইতে লাভ করা সম্ভব হইত এবং সে বিষয়ে প্রকাশ্য সভায় বিচার ও সেই বিচারে অপর বেদজ্ঞদের নেতৃত্ব করা চলিত—এ সবের অধিকার পুরুষদের ন্যায়ই ছিল।

শ্রুতিতে স্ত্রী ঋষির কথাও আছে। শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠের সময় যে দেবীসূক্ত পাঠ করা হয়, ইহা ঋগ্‌বেদের মন্ত্র। অম্ভৃণ ঋষির কন্যা বাক্ এই মন্ত্র কয়টি দর্শন করিয়াছিলেন—তিনিই ইহার ঋষি। অপরে এই মন্ত্র তাঁহার নিকট হইতে শ্রবণ করিয়াছিলেন—তাঁহাদের নিকট হইতে অন্যেরা আবার ইহা শ্রবণ করিয়াছিলেন, এইভাবে পরম্পরাক্রমে এই মন্ত্র শ্রবণ করা চলিতেছিল—এইজন্য ইহা শ্রুতি, বেদের অন্তর্গত মন্ত্র।

যে স্ত্রীলোকদের কথা আলোচনা করা হইল তাঁহারা সকলেই ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী বা ব্রহ্মজ্ঞানী। অতএব স্ত্রীলোকদের ক্ষেত্রেও ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—যে-কোন বর্ণের যে-কেহ যথোচিত গুণসমন্বিত হইলে এবং কর্ম করিলে পুরুষদের ন্যায়ই ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী।

এখন আমরা কোথায় কিভাবে ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার হয় তাহা আলোচনা করিয়া এই প্রবন্ধের শেষ করিতেছি।

শ্রুতিতে আছে :

'যথাদর্শে তথাত্মনি যথা স্বপ্নে তথা পিতৃলোকে।
যথাপ্সু পরীব দদৃশে তথা গন্ধর্বলোকে
ছায়াতপয়োরিব ব্রহ্মলোকে ॥"
( কঠোপনিষদ্—২।৩।৫ )

অর্থাৎ—'দর্পণে যেরূপ নিজ অবয়ব স্পষ্ট দর্শন করা যায়, সেইরূপ মনুষ্য নিজ হৃদয়ে স্পষ্ট ব্রহ্মসাক্ষাৎকার করিতে পারে।

স্বপ্নকালে স্বপ্নের বিষয়গুলি যেরূপ দেখা যায়, পিতৃলোকে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার সেইরূপ হয়।

জলে যেরূপ নিজ অবয়ব দেখা যায়, গন্ধর্বলোকে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার সেইরূপ হয়।

ছায়ার তুলনায় সূর্যের কিরণ যেরূপ স্পষ্ট, ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার সেইরূপ স্পষ্ট হয়।'

এই সব জানিয়া মনুষ্য-শরীরেই ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারের চেষ্টা করা কর্তব্য।

# 'শুভ শুক্রবার' স্মরণে

শ্রীক্ষিতীশ দাশগুপ্ত

প্রেমের দেবতা তুমি সবাকার প্রিয়,
জনমিলে বেথেলের দীন অশ্বশালে।
ক্রুশবিদ্ধ হয়ে প্রাণ দিলে বরণীয়
অমর বিভায় জ্বলে চন্দ্রিমাটি ভালে।

বাহিরের অত্যাচার বেত্রাঘাত শত
বিসর্জিয়া পূত তনু সকলের তরে
স'য়েছিলে কৃপাসিন্ধু দুঃখ অবিরত,
তবুও বোঝেনি ওরা বিদায়-বাসরে।

তোমারে হারায়ে আজি অশ্রুবিসর্জন
করে সবে, স্মরে তব প্রেম নিরন্তর।
মহাঋষি, অবতার, আপনার জন
মরণের মাঝে তাই হয়েছ অমর।

আজি শুভ শুক্রবারে জানাই প্রণাম
সবারে ক্ষমিয়া আলো দিলে গুণধাম।

# স্বামী বিবেকানন্দের অনুবাদ গ্রন্থ : 'শিক্ষা'

[ পূর্বানুবৃত্তি ]

অধ্যাপক প্রণবরঞ্জন ঘোষ

তৈত্তিরীয় উপনিষদে ব্রহ্মানন্দ-উপলব্ধির কথা পর্যায়ক্রমে বোঝাতে গিয়ে উপনিষৎ-প্রবক্তা ঋষি বলেছেন, "যুবা স্যাৎ সাধু যুবাঽধ্যায়কঃ। আশিষ্ঠো দ্রঢিষ্ঠো বলিষ্ঠঃ। তস্যেয়ং পৃথিবী সর্বা বিত্তস্য পূর্ণা স্যাৎ। স একো মানুষ আনন্দঃ।"[১]

"কেউ যদি বয়সে যুবক হয়, শুধু যুবক নয়, যদি সাধুপ্রকৃতি, অধীতবেদ, শ্রেষ্ঠ শাসক, সুদৃঢ়শরীর এবং সবচেয়ে বলবান হয়, যদি পৃথিবীর সমস্ত সম্পদ তার অধিগত হয়, তবে তার যে আনন্দ, তা-ই মানুষের পক্ষে শ্রেষ্ঠ আনন্দ।"

সুদৃঢ় বলবান দেহের প্রয়োজন শুধু স্থূল ইন্দ্রিয়ময় জীবনের জন্য নয়। সূক্ষ্মতর চিন্তাজগতেব প্রয়োজনেও দ্রঢিষ্ঠ বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের বিশেষ সার্থকতা। আমাদের মনন-প্রধান শিক্ষাদর্শে সাধারণতঃ দেহগত পটুতা উপেক্ষিত। কিন্তু স্বামীজীর সামগ্রিক দৃষ্টিতে 'গীতাপাঠ' এবং 'ফুটবলখেলা'—কোনোটিই অবহেলার বিষয় নয়।

'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ'-গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে স্বামীজীর দু'-চারটি মন্তব্য লক্ষণীয়। "'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ'—শরীরে মনে বল না থাকলে আত্মাকে লাভ করা যায় না। পুষ্টিকর উত্তম আহারে আগে শরীর গড়তে হবে, তবে তো মনে বল হবে। মনটা শরীরেরই সূক্ষ্মাংশ। মনে মুখে খুব জোর করবি।"[২]

"এখন রজোগুণেরই দরকার। দেশের যে-সব লোককে এখন সত্ত্বগুণী ব'লে মনে করছিস, তাদের ভেতর পনেরো আনা লোকই ঘোর তমোভাবাপন্ন। এক আনা লোক সত্ত্বগুণী মেলে তো ঢের। এখন চাই প্রবল রজোগুণের তাণ্ডব উদ্দীপনা। দেশ যে ঘোর তমসাচ্ছন্ন, দেখতে পাচ্ছিস না? এখন দেশের লোককে মাছ মাংস খাইয়ে উদ্যমী করে তুলতে হবে, জাগাতে হবে, কার্যতৎপর করতে হবে।"[৩]

'উদ্বোধন'-পত্রিকার মাধ্যমে সমগ্র দেশের মানুষের মধ্যে স্বামীজী নবজীবনপ্রবাহ সঞ্চার করতে চেয়েছিলেন, সে সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি শিষ্যকে মনে করিয়ে দিয়েছেন, "শরীরটাকে খুব মজবুত করতে তোকে শিখতে হবে ও সকলকে শেখাতে হবে। দেখছিসনে এখনও রোজ আমি ডামবেল করি। রোজ সকাল সন্ধ্যায় বেড়াবি; শারীরিক পরিশ্রম করবি। Body and mind must run parallel. (দেহ ও মন সমান ভাবে চলা চাই)। সব বিষয়ে পরের উপর নির্ভর করলে চলবে কেন? শরীরটা সবল করার প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারলে নিজেরাই তখন ঐ বিষয়ে যত্ন করবে। সেই প্রয়োজনীয়তা-বোধের জন্যই এখন education-এর (শিক্ষার) দরকার।"[৪]

এর তিন বছর আগে লণ্ডন থেকে আলাসিঙ্গা পেরুমলকে চিঠি লেখার সময়ে

১ তৈত্তিরীয়োপনিষৎ : ২।৮।১ : স্বামী গম্ভীরানন্দ-সম্পাদিত উপনিষৎ-গ্রন্থাবলী (১ম) দ্রষ্টব্য

২ স্বামি-শিষ্য-সংবাদ : স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা : নবম খণ্ড : ১ম সংস্করণ : পৃঃ-৯৫

৩ তদেব : পৃঃ-১৫২

৪ তদেব : পৃঃ-১৭৭ দ্রষ্টব্য

স্বামীজী মনে করিয়ে দিয়েছেন—'...আমি চাই এমন লোক—যাদের পেশীসমূহ লৌহের ন্যায় দৃঢ় ও স্নায়ু ইস্পাতনির্মিত, আর তার মধ্যে থাকবে এমন একটি মন, যা বজ্রের উপাদানে গঠিত। বীর্য, মনুষ্যত্ব—ক্ষাত্রবীর্য, ব্রহ্মতেজ!'[৫]

আশৈশব খেলাধূলা ও ব্যায়ামে পরিপুষ্ট-দেহ নরেন্দ্রনাথ আপন স্বভাববশেই দেহ-মন-আত্মার সর্বাঙ্গীণ সমুন্নতি চাইবেন—এ কোনো আশ্চর্য তত্ত্ব নয়। কিন্তু এ বিষয়ে তাঁর তরুণ-মানসে যাঁরা প্রভাব বিস্তার করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে ভিনদেশী দার্শনিক হার্বার্ট স্পেন্সারও অন্যতম। স্পেন্সারের Education (শিক্ষা) গ্রন্থের শেষ অধ্যায়টির নাম 'Physical Education'; স্বামীজীর অনুবাদে 'শারীরিক শিক্ষা'।

শিক্ষাপদ্ধতিকে বিজ্ঞানভিত্তিক করতে হার্বার্ট স্পেন্সার স্বভাবতঃই ছাত্রছাত্রীদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে পাঠকবর্গকে বিশেষভাবে সচেতন করতে প্রয়াসী। পাঠ্যপুস্তকের গুরুভারে অল্পবয়স্ক শিশুদের স্বাস্থ্যহানি সম্বন্ধে আমরা আজও সচেতন হয়েছি কি না সন্দেহের বিষয়। একশো বছরেরও আগে স্পেন্সার ইংল্যাণ্ডের শিক্ষাব্যবস্থায় শরীরচর্চার প্রতি অবহেলার যে শোচনীয় উদাহরণ দেখেছিলেন, আজকের ভারতবর্ষেও অনেকটা সেইজাতীয় শিক্ষাদর্শই প্রচলিত। ছাত্রদের মধ্যে তবু শারীরিক শিক্ষার কিছুটা প্রচলন আছে, ছাত্রীদের ক্ষেত্রে তা প্রায় অনুপস্থিত। এমন কি, ছাত্রীদের পক্ষে শরীরচর্চার ততটা প্রয়োজন নেই, এ ধারণাও প্রচলিত। একদা যেমন ইংল্যাণ্ডে উচ্চবংশের মেয়েদের শুধুমাত্র কোমল পেলব বিলাসকলানিপুণা হওয়াই আদর্শ ছিল, এখনও আমাদের উচ্চশিক্ষার ধরন-ধারণ সেই পর্যায়ের। তার উপর বিদেশী কনভেন্ট বা ইংরেজী-মাধ্যম স্কুল-কলেজে পড়াশুনো হলে তো আর কথাই নেই, আলাপ-আলোচনায়, চাল-চলনে তখন তারা এতো কৃত্রিমতা অর্জন করে যে, উনবিংশ শতাব্দীর প্রবলতম ইংরেজীয়ানার যুগেও এজাতীয় অনুকরণ-প্রবৃত্তি নিঃসন্দেহে লজ্জিত হতো। এদিক থেকে স্বামীজী স্পেন্সারের গ্রন্থের অনুবাদকালে মেয়েদের খেলাধূলা ও ব্যায়ামের অংশটি সযত্নে তুলে ধরেছেন এবং পরবর্তীকালে স্ত্রী-শিক্ষার আদর্শে জাতীয় ঐতিহ্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে আধুনিক নারীসমাজকে অবহিত করেছেন।

"আমাদের এক প্রকার বিশ্বাস আছে যে, যথেষ্ট শারীরিক বল ভদ্রবংশীয়া স্ত্রীলোকের লজ্জার বিষয়। অনেকে বলেন যে, ঐ প্রকার পুরুষদিগের ন্যায় লাফালাফি করিলে স্ত্রীলোক পুরুষের ন্যায় কঠোরপ্রকৃতি হইবে। যদি বালক ঐ প্রকার করিয়া শিষ্ট-শান্ত ভদ্রলোক হয়, তাহা হইলে বালিকা ঐ প্রকার করিয়া কেন শান্ত ভদ্র স্ত্রীলোক হইবে না?"[৬]

নারীশিক্ষার আদর্শে এই দেহ-মনের সামঞ্জস্যমূলক অনুশীলনের কথা বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাসে 'প্রফুল্লের' শিক্ষা-প্রসঙ্গেও দেখিয়েছেন। বস্তুতঃ স্ত্রীশিক্ষার নানা দিক দিয়ে উনবিংশ শতাব্দীর মনীষীরা আলোচনা করেছেন। কিন্তু আমাদের অভ্যস্ত সংস্কারে মেয়েদের স্বাস্থ্যচর্চার দিকটি এখনও পূর্ণ মর্যাদা পায়নি।

প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় অতিরিক্ত মস্তিষ্ক-চালনা সম্বন্ধে স্পেন্সারের আপত্তি ছেলেদের

৫ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা : ৭ম খণ্ড : পৃঃ-২৮৭

৬ শিক্ষা : স্বামী বিবেকানন্দ : বসুমতী সংস্করণ : পৃঃ-৯৪

শিক্ষার চেয়ে মেয়েদের শিক্ষার ক্ষেত্রেই বেশী। এ সম্বন্ধে স্পেন্সার যে বাস্তব দৃষ্টি নিয়ে সমস্যাটিকে দেখেছেন, স্বামীজীর ভাষায় তার অনুবাদ—"সাধারণতঃ বালকেরা যে প্রকার শারীরিক পরিশ্রমের দ্বারা অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রমের ভার শমিত করে, বালিকারা তাহা পারে না। এই জন্য সহস্রের মধ্যে দশটির শরীরও সুদৃঢ় নহে। মানসিক সৌন্দর্যের হানি করা কোনমতেই উচিত নহে। কোন্ স্ত্রীলোক বিদ্যাপ্রভাবে স্বামীর একান্ত প্রেম-অধিকারে সমর্থ হইয়াছে? অনেকে হয়ত পুরুষজাতির সৌন্দর্যের দোষ দিবেন; কিন্তু ভগবানের এই সুন্দর নিয়ম কখনও নিরর্থক হয় নাই। যদ্যপি সৌন্দর্যলিপ্সা না থাকিত, তাহা হইলে ঐ প্রকার অসম্পূর্ণ শরীর পুরুষানুক্রমে চলিয়া আসিত এবং অল্পদিনেই মনুজবংশ লোপ পাইত। শরীর থাকিলে তবে বিদ্যা; শরীর যদি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, তবে বিদ্যা লইয়া কি হইবে?"[৭]

শরীরচর্চার ক্ষেত্রে উপযুক্ত আহার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমাদের শাস্ত্রীয় সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক খাদ্যরুচির কথা মনে রেখেই বলা যায় যে, কর্মজীবনের বৈশিষ্ট্যের উপরেই আহারের নির্বাচন অনেক পরিমাণে নির্ভরশীল। স্পেন্সার আহার সম্বন্ধে বিজ্ঞানসম্মত আলোচনায় দেখিয়েছেন তৃণভোজী জীবজন্তুর চেয়ে মাংসাশী জীবজন্তুরা কত বেশী সতেজ, সবল ও সতর্ক। মানুষের ক্ষেত্রেও এ নিয়ম যে অনেক পরিমাণেই খাটে তার উদাহরণ দিতে গিয়ে স্পেন্সার লিখেছেন—"Count up the wild races who are well-grown, strong and active, as the Kaffirs, North American Indians and Pantagonians, and you find them large consumers of flesh. The ill-fed Hindoo goes down before the Englishman fed on more nutritive food; to whom he is as inferior in mental as in physical energy. And generally, we think, the history of the world shows that the well-fed races have been the energetic and dominant races."[৮]

আলোচ্য বিষয়টি আর একটু বিস্তৃতভাবে স্বামীজীর ভাষায় উদ্ধৃত করা যাক—"শরীর হৃষ্টপুষ্ট হইলেই যে শক্তি থাকে, তাহা নহে। আবার আয়তন ছাড়িয়া যদি তেজের তুলনা করি, দেখিতে পাই নিরামিষাশী অপেক্ষা মাংসাশী শিশু কি শারীরিক কি মানসিক সকল বিষয়েই উন্নত। পশুদিগের মধ্যে গোমেষাদি এবং সিংহ-ব্যাঘ্রাদির তুলনা করিলে দেখিতে পাই যে, নিরামিষাশী অপেক্ষা মাংসাশী কতদূর শক্তিসম্পন্ন। মানুষদিগের মধ্যে বুস্‌ম্যান, অস্ট্রেলিয়ান প্রভৃতি নিরামিষাশী অসভ্যেরা দুর্বল এবং খর্বাকৃতি, অন্যদিকে প্যাণ্টাগোনিয়ান, কাফ্রি প্রভৃতি মাংসাশী অসভ্যেরা কেমন সুগঠিত, কেমন দীর্ঘাকার এবং বলিষ্ঠ। অপেক্ষাকৃত পুষ্টিকরখাদ্যসেবী হিন্দু অপেক্ষা মাংসাশী ইংরাজ মানসিক এবং শারীরিক বলে বলীয়ান এবং আবহমান কালই পুষ্টিকরখাদ্য-প্রতিপালিত জাতিরাই যে চিরকাল তেজস্বী এবং প্রধান হইয়া আসিতেছে, সে বিষয়ে জগতের ইতিহাসই সাক্ষ্য দিতেছে।"[৯]

আমিষ-আহার-সম্বন্ধে স্পেন্সারের এই মতামত সবটাই যে স্বামীজী সমর্থন করতেন, তা মনে করবার কারণ নেই। পরবর্তীকালে

৭ তদেব পৃঃ ৯৭-৯৮

৮ Education: Herbert Spencer: 1st edn: p 158

৯ শিক্ষা: স্বামী বিবেকানন্দ: বসুমতী সং: পৃঃ ৯১

পরিণত অভিজ্ঞতায় স্বামীজী এ সম্বন্ধে যে-সব মন্তব্য প্রকাশ করেছেন, তার আলোকে এ পর্যন্ত বলা যায় যে, অধ্যাত্মজগতের উচ্চ অধিকারীর ক্ষেত্রে নিরামিষ-ভোজনই প্রশস্ত মনে করলেও কঠোর জীবনসংগ্রামের ক্ষেত্রে আমিষ-আহারই যে বিধেয়, এ বিষয়ে স্বামীজীর দৃঢ়মত। স্পেন্সার মাংসভোজী ইংরেজকে শারীরিক ও মানসিক বলে নিরামিষাশী হিন্দুর চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করলেও মানসিক বলের মাপকাঠি যে কি, এ বিষয়ে স্পষ্ট করে কিছুই বলেননি। যদি অধ্যাত্মরাজ্যের উচ্চ অধিকারীদের কথা ভাবা যায়, তাহলে নিরামিষভোজনের মহত্ত্বের কথা স্বাভাবিক-ভাবেই স্বীকার্য।

উনবিংশ শতাব্দীর অগ্রগামী চিন্তানায়ক বৈজ্ঞানিক অক্ষয়কুমার দত্ত কিন্তু বিদেশী গ্রন্থকারদেরই প্রেরণায় নিরামিষভোজনের পক্ষপাতী হয়েছিলেন। অবশ্য শেষজীবনে নিদারুণ মস্তিষ্করোগে তাঁকেও আমিষের আশ্রয় নিতে হয়েছিল। তবু নিরামিষ-ভোজনকেই একমাত্র ধর্ম মনে না করেও, নিরামিষের নিজস্ব গুণ মানতে হয়।

'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' গ্রন্থে এই আমিষ-নিরামিষ-প্রসঙ্গে স্বামীজী যে মন্তব্য করেছেন, একটু লঘু চালে হলেও তার চিন্তার গুরুত্ব লক্ষণীয়—"...প্রাচীন কাল হ'তে আধুনিক কাল পর্যন্ত এক মহা বিবাদ—আমিষ আর নিরামিষ। মাংসভোজন উপকারক কি অপকারক ?...আধুনিক বৈষ্ণব পড়েছেন কিছু ফাঁপরে. তাঁদের ঠাকুর রাম বা কৃষ্ণ মদ-মাংস দিব্যি ওড়াচ্ছেন, রামায়ণ-মহাভারতে রয়েছে। সীতাদেবী গঙ্গাকে মাংস, ভাত আর হাজার কলসী মদ মানছেন। বর্তমানকালে শাস্ত্রও শুনবে না, মহাপুরুষ বলেছেন বললেও শোনে না। পাশ্চাত্যদেশে এরা লড়ছে যে, মাংস খেলে রোগ হয়, নিরামিষাশী নীরোগ হয় ইত্যাদি। এক পক্ষ বলছেন যে, মাংসাহারীর যত রোগ; অপর পক্ষ বলছেন, ও গল্পকথা, তা হলে হিঁদুরা নীরোগ হ'ত, আর ইংরেজ আমেরিকান প্রভৃতি প্রধান প্রধান মাংসাহারী জাত লোপাট হয়ে যেত এতদিনে। এক পক্ষ বলছেন যে, ছাগল খেলে ছাগুলে বুদ্ধি হয়, শূয়োর খেলে শূয়োরের বুদ্ধি হয়, মাছ খেলে মেছো বুদ্ধি হবে। অপর পক্ষ বলছেন যে, কপি খেলে কোপো বুদ্ধি, আলু খেলে আলুয়ো বুদ্ধি এবং ভাত খেলে ভেতো বুদ্ধি। জড়বুদ্ধি হওয়ার চেয়ে চৈতন্যবুদ্ধি হওয়া ভাল। এক পক্ষ বলছেন যে, ভাত-ডালে যা আছে, মাংসেও তাই; অপর পক্ষ বলছেন যে, হাওয়াতেও তাই, তবে তুমি হাওয়া খেয়ে থাক। এক পক্ষ বলছেন যে, নিরামিষ খেয়েও লোকে কত পরিশ্রম করতে পারে; অপর পক্ষ বলছেন, তা হলে নিরামিষাশী জাতিই প্রধান হ'ত; চিরকাল মাংসাশী জাতিই বলবান্ ও প্রধান। মাংসাহারী বলছে, হিঁদু চীনে দেখ, খেতে পায় না, ভাত খেয়ে শাক-পাতড়া খেয়ে মরে, ওদের দুর্দশা দেখ—আর জাপানীরাও ঐ ছিল; মাংসাহার আরম্ভ ক'রে অবধি ওদের ভোল ফিরে গেছে। ভারতবর্ষে দেড় লাখ হিন্দুস্থানী সেপাই, এদের মধ্যে কয়জন নিরামিষ খায় দেখ! উত্তম সেপাই গোরখা বা শিখ কে কবে নিরামিষাশী দেখ। এক পক্ষ বলছেন যে, মাংসাহারে বদহজম, আর একপক্ষ বলছেন—সব ভুল, নিরামিষাশীগুলোরই যত পেটের রোগ। এক পক্ষ বলছেন, তোমার কোষ্ঠ-শুদ্ধিরোগ শাক-পাতড়া খেয়ে জোলাপবৎ ভাল হয়ে যায়, তা ব'লে কি দুনিয়াসুদ্ধকে তাই করতে চাও? ফলকথা, চিরকালই মাংসাশী

জাতিরাই যুদ্ধবীর, চিন্তাশীল ইত্যাদি। মাংসাশী জাতেরা বলছেন যে, যখন যজ্ঞের ধূম দেশময় উঠত, তখনই হিঁদুর মধ্যে ভাল ভাল মাথা বেরিয়েছে। এ বাবাজীডৌল হয়ে পর্যন্ত একটাও মানুষ জন্মাল না। এ বিধায় মাংসাশীরা ভয়ে মাংসাহার ছাড়তে চায় না।···

সকল পক্ষ দেখে শুনে আমার তো বিশ্বাস দাঁড়াচ্ছে যে, হিঁদুরাই ঠিক, অর্থাৎ হিঁদুদের ঐ যে ব্যবস্থা যে জন্ম-কর্ম-ভেদে আহারাদি সমস্তই পৃথক, এইটিই সিদ্ধান্ত। মাংস খাওয়া অবশ্য অসভ্যতা, নিরামিষ-ভোজনই পবিত্রতর। যাঁর উদ্দেশ্য কেবলমাত্র ধর্মজীবন, তাঁর পক্ষে নিরামিষ, আর যাকে খেটেখুটে এই সংসারে দিবারাত্রি প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্য দিয়ে জীবনতরী চালাতে হবে, তাকে মাংস খেতে হবে বইকি।"[১০]

বেলুড় মঠে শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী একদা স্বামীজীকে প্রশ্ন করেছিলেন—স্বামীজী, খাদ্যাখাদ্যের সহিত ধর্মাচরণের কিছু সম্বন্ধ আছে কি?

স্বামীজী। অল্পবিস্তর আছে বইকি।

শিষ্য। মাছ-মাংস খাওয়া উচিত এবং আবশ্যক কি?

স্বামীজী। খুব খাবি, বাবা! তাতে যা পাপ হবে, তা আমার। তোদের দেশের লোকগুলোর দিকে একবার চেয়ে দেখ্ দেখি—মুখে মলিনতার ছায়া, বুকে সাহস-ও উদ্যম-শূন্যতা, পেটটি বড, হাতে পায়ে বল নেই, ভীরু কাপুরুষ।···

'অহিংসা পরমো ধর্মঃ'—বৌদ্ধধর্মের এই মত খুব ভাল, তবে অধিকারী বিচার না ক'রে বলপূর্বক রাজ-শাসনের দ্বারা ঐ মত জনসাধারণ সকলের উপর চালাতে গিয়ে বৌদ্ধধর্ম দেশের মাথাটি একেবারে খেয়ে দিয়ে গেছে। ফলে হয়েছে এই যে, লোকে পিঁপড়েকে চিনি দিচ্ছে, আর টাকার জন্য ভায়ের সর্বনাশ করছে। ···অন্যপক্ষে দেখ্—বৈদিক ও মনূক্ত ধর্মে মৎস্য-মাংস খাবার বিধান রয়েছে, আবার অহিংসার কথাও আছে। অধিকারিবিশেষে হিংসা ও অধিকারিবিশেষে অহিংসা-ধর্মপালনের ব্যবস্থা আছে।'

প্রসঙ্গতঃ বলিদানের কথা আমাদের মনে জাগতে পারে। আধুনিক কালে শাক্তধর্মের কোনো কোনো সমালোচক বলিদানপ্রথার তীব্র বিরোধিতা করে থাকেন। তাঁদের মতে মাংস খাওয়ার সঙ্গে দেবতার উদ্দেশে বলিদানের কোনো সম্পর্ক না রাখাই ভালো। বলিদানের নিষ্ঠুরতার কথাই তাঁরা স্বাভাবিকভাবে চিন্তা করে থাকেন। কিন্তু পৃথিবীর সব প্রাচীন ধর্মেই ঈশ্বর বা দেবতার উদ্দেশে যে-সব প্রিয় বস্তু নিবেদন করা হয়, তার মধ্যে মাংস অন্যতম। এ বিষয়ে ইহুদী, খৃষ্টান, মুসলমান—এঁরা সকলেই দেবতার উদ্দেশে নিবেদিত মাংস গ্রহণের পক্ষপাতী। যে সমাজে মাংসাহার প্রচলিত, সে সমাজে এজাতীয় নিবেদন কিছুমাত্র আশ্চর্য নয়।

বেলুড় মঠে দুর্গাপূজায় স্বামীজীর বলিদানের ইচ্ছা যে ছিল, সেকথা তাঁর জীবনীকারেরা উল্লেখ করে গেছেন।[১১] অবশ্য সঙ্ঘজননী সারদাদেবীর নিষেধে শেষ অবধি আর বলিদান হয়নি। তবু দেবীপূজায় বলিদানে স্বামীজীর যে নিজের কোন আপত্তি ছিল না, এও লক্ষণীয়। দুর্বল স্নায়ুর জন্য যারা সামান্য রক্তপাতেই কম্পমান তাদের উদ্দেশ্যেই বোধ হয় 'নাচুক তাহাতে শ্যামা' কবিতায় স্বামীজীর এই ধিক্কার—

রে উন্মাদ, আপনা ভুলাও, ফিরে নাহি চাও,
পাছে দেখ ভয়ঙ্করা।
দুখ চাও সুখ হবে ব'লে, ভক্তিপূজাছলে
স্বার্থসিদ্ধি মনে ভরা॥
ছাগকণ্ঠরুধিরের ধার, ভয়ের সঞ্চার,
দেখে তোর হিয়া কাঁপে।
কাপুরুষ! দয়ার আধার! ধন্য ব্যবহার!
মর্মকথা বলি কাকে?

(ক্রমশঃ)

১০ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য : বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : ১ম সং : পৃঃ ১৭৪-৭৫

১১ "যদি পারি তো এবার মা'র পুজো ক'রব। রঘুনন্দন বলেছেন, 'নবম্যাং পূজয়েৎ দেবীং কৃত্বা রুধিরকর্দমম্'। —মার ইচ্ছে হয় তো তাও ক'রব।" বাণী ও রচনা : ৯ম খণ্ড : স্বামি-শিষ্য-সংবাদ : পৃঃ ২২৬

# আচার্য শঙ্কর ও স্বামী বিবেকানন্দ

**শ্রীপ্রভাকর মিত্র**

আচার্যগণের পথ চেয়ে ভারত প্রতীক্ষা করে, যথাসময়ে তাঁরা আসেন। এভাবেই এসেছেন আচার্য শঙ্কর ও স্বামী বিবেকানন্দ।

সমাধি হতে ব্যুত্থিত হয়ে গুরু গোবিন্দপাদ শঙ্করকে বললেন, "বৎস, গুরু গৌড়পাদের নিকট শুনেছিলাম তুমি আসবে। তাই সহস্র বৎসর অবস্থান করে আছি সমাধিতে।" এই ঘটনার এগার শত বৎসর পরে পরমহংসদেবও নরেন্দ্রনাথকে প্রথম দেখে অনুরূপভাবে পরম স্নেহে বললেন, "এতদিন পরে আসতে হয়? আমি তোমার জন্য কিরূপ প্রতীক্ষা করে আছি—তা ভাবতে নাই?…"

আচার্য শঙ্কর এলেন অষ্টম শতকে। ভারতে তখন সনাতন হিন্দুধর্মের ঘোর অমানিশা। বৌদ্ধযুগের শেষের দিকের বিকৃত প্রভাব, প্রকোপ ও সংঘাতের ফলে হিন্দুধর্ম তখন বিপর্যস্ত, ক্ষীণবল ও শতধা বিভক্ত। সেই যুগসন্ধিক্ষণে আবির্ভূত হলেন আচার্য শঙ্কর। তখন সকল সম্প্রদায়ের লোকেরাই নিজ নিজ ধর্মমতকে শ্রেষ্ঠ, সত্য ও মোক্ষফলপ্রদ বলে বিশ্বাস করতেন, স্পর্ধাও করতেন। অপর ধর্মমতে তারা যে ছিলেন শুধু আস্থাহীন তা নয়, ছিলেন বিরোধী ও বিদ্বেষী। হিন্দুধর্ম যে বেদমূলক তার সম্বন্ধে কারো পুরো ধারণা ছিল না। বেদের কর্মকাণ্ড পর্যন্ত কোন রকমে মানুষের প্রতীতি জন্মালেও বেদান্তের অঙ্গ নিত্য শাশ্বত আত্মোপলব্ধির ভূমিতে আরোহণ করার বার্তা তখনও তেমন সব মানুষের কানে এসে পৌঁছায়নি। কিন্তু গুরু গোবিন্দপাদ জানতেন—এই সেই শিবাবতার শঙ্কর, যিনি বেদব্যাস-রচিত ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য রচনা করে জগতে অদ্বৈত ব্রহ্মবিজ্ঞান প্রচারের জন্য দেহধারণ করেছেন। পরমহংসদেবও জানতেন, যে-নরঋষি মানবকল্যাণের জন্য পূর্বে বহু বার নারায়ণের সঙ্গে মানবদেহ ধারণ করেছেন, নরেন্দ্রনাথ সেই নরঋষি। এই হল দু'জনের আবির্ভাবের পূর্বাভাষ!

কাজেই বৈরাগ্যে রঞ্জিত গৈরিক বস্ত্রই এঁদের হল পরিধেয়। উভয়েই যোগী, নিত্য-সন্ন্যাসী। সপ্তমবর্ষে গুরুগৃহ হতে সর্বশাস্ত্রে পারঙ্গম হয়ে সমাবর্তন করেন শঙ্কর। তাঁর ছিল অলৌকিক প্রতিভা; তিনি ছিলেন শ্রুতিধর। একদিন মাতা বিশিষ্টাদেবীর সহিত নদীতে স্নান করতে গিয়ে তিনি কুমীর দ্বারা আক্রান্ত হন। তখন মায়ের অনুমতি নিয়ে তিনি মনে মনে আতুর সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। পরে গৃহে ফিরে মায়ের অনুমতি ও আশীর্বাদ লাভ করে তাঁর অন্তিমকালে প্রত্যাবর্তন ও তাঁকে ইষ্টদর্শন করানোর প্রতিশ্রুতি দিয়ে বালক শঙ্কর গৃহত্যাগ করেন।

"নরেন্দ্র ধ্যানসিদ্ধ মহাপুরুষ"—একথা বলতেন পরমহংসদেব। নরেন্দ্রনাথেরও স্মৃতিশক্তি ও প্রতিভা ছিল অনন্যসাধারণ। পিতৃবিয়োগের পর সংসারের নির্মম সংঘাত ও হৃদয়হীনতায় জর্জরিত অবস্থায় এক অতীন্দ্রিয় অনুভূতির পর নির্বেদাপন্ন নরেন্দ্রনাথ পিতামহের মত সংসারত্যাগের মনস্থ করেন। কিন্তু পরমহংসদেবের নির্দেশ অনুসারে তখন তিনি বিরত হন। পরমহংসদেব বলেন,

"জানি আমি, তুমি মায়ের কাজের জন্য আসিয়াছ, সংসারে কখনই থাকিতে পারিবে না। কিন্তু আমি যতদিন আছি, আমার জন্য থাক।" পরে ২৪ বৎসর বয়সে শাস্ত্রবিধান-মত তিনি বাহ্যসন্ন্যাস গ্রহণ করেন। নাম হল স্বামী বিবেকানন্দ।

উভয়েরই ঘটেছিল ইষ্টগুরুলাভ। বিদ্যা-গুরুর নিকট শঙ্কর শুনেছিলেন যে, পতঞ্জলিদেব গোবিন্দপাদ নামে দেহধারণ করে নর্মদাতীরে ধ্যানস্থ আছেন। তাঁকেই তিনি মনে মনে গুরুপদে বরণ করেন। তাঁরই সন্ধানে তিনি মহর্ষি নারদের ন্যায় গৃহত্যাগ করে একাকী অজানা পথে বহির্গত হন। কত জনপদ, নদ-নদী, কত বিপদসঙ্কুল অঞ্চল অতিক্রম করে অবশেষে নর্মদাতীরে বালক শঙ্কর গুরু-গোবিন্দপাদের দর্শনলাভ করেন এবং তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। নরেন্দ্রনাথের ন্যায় অকপট তীক্ষ্ণধী সত্যান্বেষী শিষ্যও "যিনি ভগবান প্রত্যক্ষ করিয়াছেন ও তাহাকেও প্রত্যক্ষ করাইতে পারেন" এইরূপ সত্যদ্রষ্টা যোগ্য গুরু সন্ধান ক'রে লাভ করেন।

উভয়েরই ব্রহ্মজ্ঞান হয়েছিল। তবে সমাধিস্থ হয়ে ভূমানন্দ সম্ভোগ করার জন্য এঁদের জন্ম হয়নি। যদিও প্রথমে দু'জনেই তাই চেয়েছিলেন। যোগশিক্ষা সমাপ্ত করে শঙ্কর চাইলেন গুরুর নিকট চিরনির্বাণ লাভ করার অনুমতি। তেমনি চেয়েছিলেন বিবেকানন্দও। কিন্তু গুরু গোবিন্দপাদ শঙ্করকে বললেন, "তুমি বৈদিকধর্ম স্থাপনের জন্য দেবাদিদেব মহাদেবের অংশে জন্মগ্রহণ করেছ। তোমাকে অদ্বৈত ব্রহ্মবিজ্ঞান উপদেশ করার জন্য গুরু-দেবের আদেশে অপেক্ষা করেছি সহস্র বৎসর। তুমি এক্ষণে কাশীধামে যাও। সেখানে ভবানীপতি যা নির্দেশ করবেন তাই করবে।" বীরেশ্বরের প্রসাদে বিবেকানন্দেরও জন্ম। পরমহংসদেবও নরেন্দ্রনাথ নির্বিকল্প সমাধি হতে ব্যুত্থিত হবার পরেই বললেন, "মা তো তোমাকে সব দেখাইয়া দিলেন। এসব তালা বন্ধ রহিল; চাবি রহিল আমার হাতে! এখন কাজ আছে। কাজ শেষ হইলে আবার উহা ফিরিয়া পাইবে।"

উভয়েরই গুরুদেবের তিরোধানের পর আরম্ভ হয় কর্মসাধনা। গুরু গোবিন্দপাদ শঙ্করের শিক্ষা সমাপন হলে শঙ্করকে কাশী-ধামে গিয়ে ভবানীপতির নির্দেশমত কার্য করার উপদেশ দিয়ে বললেন—"এখন আমার কার্য শেষ হয়েছে। আমি সমাধিযোগে স্ব-স্বরূপে লীন হব।" তিনি তখন শিষ্যদের আশীর্বাদ করে দেহত্যাগ করেন। পরমহংসদেবও দেহত্যাগের দু-চার দিন পূর্বে নিজ শক্তি নরেন্দ্রনাথের মধ্যে সঞ্চারিত করে বললেন—"আজ তোমায় আমার সর্বস্ব দিয়ে ফকির হয়ে গেলাম। এই শক্তি দিয়ে তুমি জগতের অশেষ কল্যাণসাধন করবে। এ কাজ শেষ হবার আগে তোমার ফিরে যাওয়া হবে না।"

উভয়েই কর্মপথে পেয়েছেন দৈব নির্দেশ। বেদান্তের একনিষ্ঠ সেবক আচার্য শঙ্করও সাধকরূপে ভারত পরিভ্রমণ করতে করতে ব্যাসাশ্রমে এসে বেদান্তসূত্রের ভাষ্য রচনা করেন। কথিত আছে, ভাষ্যরচনায় পরিতৃপ্ত হয়ে বেদব্যাস তাঁকে দর্শন দিয়ে বলেন—"বৎস, যে দেবকার্যসাধনের জন্য তোমার দেহধারণ, তার পরিসমাপ্তির জন্য তোমার আরো ষোল বৎসর আয়ু বৃদ্ধি হল। তুমি বত্রিশ বৎসর এই দেহে বাস করবে। কুমারিল ভট্টকে পরাস্ত করা তোমার প্রথম কাজ। তারপর ভারত পরিভ্রমণ করে বেদান্তের মহিমা ঘোষণা করে তোমাকে অদ্বৈত ব্রহ্মবিজ্ঞান প্রতিষ্ঠা করতে

হবে। এই সব কার্য শেষ হলে তখন তুমি স্ব-স্বরূপে লীন হবে।" এতে ভগবদিচ্ছা যে কতখানি অনুকূল তা চিন্তা করলে বিস্মিত হতে হয়। সঙ্গে সঙ্গে স্মৃতিপটে জেগে ওঠে স্বামী বিবেকানন্দেরও অনুরূপ গুরুদেবের নির্দেশলাভ। তিনি সমগ্র ভারত পরিক্রমা করে কন্যাকুমারীর শেষ প্রস্তরখণ্ডের উপর বসে ধ্যানে মগ্ন হয়ে ফিরে আসার পর একদিন অর্ধজাগ্রত অবস্থায় দেখলেন ভারতের উপকূল হতে নেমে পরমহংসদেব যেন সমুদ্রের উপর দিয়ে পায়ে হেঁটে চলেছেন এবং তাঁকে যাবার জন্য হাতছানি দিয়ে ডাকছেন। কি গভীর অর্থবহ এ দেবসঙ্কেত! বিবেকানন্দ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের নিকট হতে আমেরিকা যাবার নির্দেশ পেলেন।

কালের কিন্তু ভিন্ন গতি। প্রয়াগে এসে আচার্যদেব দেখলেন ভট্টপাদ তখন তুষানলে দেহত্যাগ করার মানসে তুষের স্তূপে আরোহণ করেছেন। তিনি আচার্যদেবকে দেখে বললেন, —"হে যতিবর, স্বদোষের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ আমি তুষানলে প্রবেশ করেছি। আমার দ্বারা আপনার কোন কার্য সিদ্ধ হবে না। তবে আমার শিষ্য মণ্ডন মিশ্রকে বিচারে জয় করলে আপনার সমস্ত জগৎ জয় করা হবে। তার পরাজয় আর আমার পরাজয় সমান।" মণ্ডন মিশ্রের সহিত কয়েকদিবসব্যাপী কূটতর্ক-যুদ্ধের পর তাঁর স্ত্রী সভানেত্রী উভয়ভারতী আচার্যদেবের অলৌকিক শক্তি দেখে বিস্মিত হলে মিশ্র পরাভব স্বীকার করেন এবং আচার্যদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তৎকালে মণ্ডনের ন্যায় দুর্ধর্ষ মীমাংসক দার্শনিকের সহিত বিচার-যুদ্ধে জয়লাভ উত্তরকালে চিকাগো ধর্ম-মহাসভায় স্বামীজীর বেদান্ত-বক্তৃতার পর পাশ্চাত্য জগৎ জয় করার, 'জড়বিজ্ঞান-কৌরব-রণে' জয়লাভ করারই মত। ঈদৃশ জয়লাভে উভয় ক্ষেত্রে অজ্ঞাতকুলশীল সন্ন্যাসী পাইলেন সর্বজনসমাদৃতি। আচার্যদেবের বিজয়-ডিণ্ডিম তখন ধ্বনিত হল দিকে দিকে। শিষ্যদের বিশেষ আগ্রহে তিনি বহির্গত হলেন দিগ্বিজয়ে। শঙ্করের দিগ্বিজয়যাত্রা এক অপরূপ দৃশ্য। বিরাট দিগ্বিজয়বাহিনী-পরিবৃত হয়ে (সহস্রাধিক শিষ্য, ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিত-প্রবরেরা এমনকি রাজারাও তাঁর অনুগামী, হতেন) মুণ্ডিতমস্তক, গৈরিকবসন-পরিহিত, দণ্ডকমণ্ডলুধারী, সৌম্যদর্শন, তরুণ যতিরাজ শঙ্কর চলেছেন শান্ত ধীর পদক্ষেপে—পথের দুই পার্শ্বে দাঁড়িয়ে জনতা পুষ্পমাল্য, পূজোপ-করণ নিয়ে নিবেদন করছে তাদের হৃদয়ের ভক্তি, অন্তরের শ্রদ্ধা। এ দৃশ্যের অনির্বচনীয় মাধুর্যে পরিপ্লুত হয়ে মন কালের তিমির ভেদ করে বিদ্যুৎগতিতে ফিরে আসে অনুরূপ এক দৃশ্যে—যেখানে স্বামীজী পূর্বোক্ত পাশ্চাত্য জগৎ জয় করে ফিরছেন। দেশে দেশে কী উদ্দাম উদ্দীপনা! কলম্বো হতে আলমোড়া সর্বত্রই কী বিপুল সংবর্ধনা! রামনাদের রাজা ও তাঁর অনুচরবৃন্দ গাড়ীর অশ্ব খুলে দিয়ে টেনে নিয়ে চললেন স্বামীজীর গাড়ী। স্বামীজী "যে আদর অভ্যর্থনা ও সম্মান শ্রদ্ধা পেয়েছিলেন, ভারতের ইতিহাসে তার তুলনা নেই।...... যথার্থই ভারতবর্ষ জানে কেমন করে একজন আধ্যাত্মগুরুকে সম্মান দিতে হয়।" যে পথে একদিন তাঁরা অজ্ঞাত সন্ন্যাসী ভিখারীর বেশে চলেছিলেন, সেই পথেই ফিরেছেন তাঁরা বীর বিজয়ীর বেশে শতসহস্র লোকের পুরোধা হয়ে! "ভারতের তৎকালীন সর্বমতাবলম্বী যোগী, যতি ও পণ্ডিতগণ তাঁর (আচার্য শঙ্করের) গভীর জ্ঞানবত্তা ও মহামহিম জীবনের কাছে মস্তক অবনত করেছিলেন।" তেমনি ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ "কি ভারত-

বর্ষে, কি আমেরিকায় কোথাও এমন কেহ তাঁহার পাশে আসে নাই, যিনি তাঁহার নিকট নতশির না হইয়াছেন।.... "

কিন্তু এঁদের এ দিগ্বিজয় বড সুখের ছিল না। পথে দু'জনেরই অনেক ক্ষেত্রে জীবন হয়েছে বিপন্ন। পবহিতে মস্তক দান করতে গিয়ে কাপালিকের খড়্গ হতে নৃসিংহদেব রক্ষা করেন আচার্য শঙ্করের শির। অভিনব গুপ্তের গুপ্ত প্রক্রিয়ার ফল থেকে তাঁকে রক্ষা করেন তাঁর শিষ্য পদ্মপাদ। স্বামীজীও পরিব্রাজকরূপে ভারত-পরিভ্রমণকালে অনাহারে এবং কাপালিকের কবলে মৃত্যুরও সম্মুখীন হয়েছিলেন; তৎপব বিদেশে, এমনকি ডেট্রয়েটে বিষমিশ্রিত কফি হতে তাঁকে রক্ষা করেন পরম গুরু পরমহংসদেব।

জীবনের ব্রত উভয়েই উদ্‌যাপন করেন। ব্রহ্মনিষ্ঠ বীর সন্ন্যাসী দু'জনেই পথে বেরিয়েছিলেন বেদান্তের পতাকা বহন করে—একক, একমাত্র ভগবানের উপর নির্ভর করে—সম্বল অপরাজেয় আত্মশক্তি। তবে যুগের প্রয়োজনে তাঁরা আসেন; লোকসংগ্রহে তাঁদের জীবনের সাধনাও বিকাশ লাভ করে বিভিন্ন রূপে। আচার্য শঙ্কর শিবাবতাররূপে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন দেবমানব। শৈশব কাল হতেই ধীর ও শান্তপ্রকৃতি। চিত্তের বিক্ষোভ তাঁর কোন সময়ে কোন অবস্থাতেই লক্ষিত হয়নি। তিনি থাকতেন নির্বিকার পদ্মপত্রে জলের মত। তাঁর জীবনই ছিল তাঁর বেদান্তভাষ্য। তাঁর যুগে ভারতে বর্ণাশ্রম প্রচলিত। জীবন ছিল সরল, জীবিকাও ছিল সহজ। লোকের দুঃখকষ্ট থাকলেও তা সমাজে বিকটরূপে প্রকটিত হয়নি। ভারত তখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত। তীর্থগুলি ছিল বিভিন্ন ধর্মমতের প্রাণকেন্দ্রস্বরূপ। সমগ্র ভারত পদব্রজে পর্যটন করে আচার্য শঙ্কর এই সকল প্রাণকেন্দ্রে ব্রহ্মজ্ঞান সঞ্চার করে অদ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি বিভিন্ন ধর্মমতগুলিকে এক বৈদিক ধর্মসূত্রে গ্রথিত করে অখণ্ড ভারতে আনলেন ধর্মের এক মহান ঐক্য। ধর্মই যে অখণ্ড ভারতের প্রাণস্বরূপ তা উত্তরকালে স্বামীজীও দিব্য আলোকে দর্শনলাভ করেন। তখনকার দিনে কূটতর্কে, বাগ্‌বিতণ্ডায় বা অলৌকিক যৌগিক শক্তির দ্বারা যিনি অপর পক্ষকে পরাভূত করতে পারগ হতেন, তিনিই হতেন জয়ী। এইরূপ ভাবেই বৌদ্ধ, জৈন, শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, সূর্যোপাসক, চার্বাক, কাপালিক প্রভৃতি বহুবিধ ধর্মসম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আচার্য শঙ্কর বিচারে প্রবৃত্ত হন, সকল ধর্মমতকেই বিচারে পরাস্ত করেন। স্বামীজীও শঙ্করের জ্ঞান নিয়ে জন্মেছিলেন। তাঁরও বক্তৃতা বা রচনাবলীর প্রতিটি বাক্য "যুক্তিনিষ্ঠা, বিচারশীলতা ও আধ্যাত্মিক গভীরতা"র প্রকৃষ্ট পরিচয় দেয়। আচার্য শঙ্কর বিভিন্ন ধর্মমতের সংস্কার সাধন করে তাদের করেন বেদানুযায়ী। অদ্বৈতবাদী হলেও তাঁর মধ্যে সংকীর্ণতার লেশমাত্র ছিল না। তিনি ছিলেন উদারপন্থী, দূরদর্শী ও ক্রমসমুচ্চয়বাদী; অধিকারিভেদে তিনি জ্ঞান, কর্ম ও দেবদেবীর উপাসনা প্রভৃতির অবিরোধী। গয়ার বৌদ্ধ মন্দিরে তিনি বুদ্ধদেবকে বিষ্ণুর অবতারজ্ঞানে অর্চনা করেন। ফলে, বৌদ্ধধর্মের প্রভাব হ্রাস হয় এবং কালের প্রভাবে বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্মের মধ্যে ঘটে এক অভূতপূর্ব সংমিশ্রণ। যে মধুর সুললিত ছন্দে তিনি স্তব রচনা করে দেবদেবীর বন্দনা করতেন তাহা অনবদ্য, অপূর্ব। তাঁর রচনাভঙ্গী, রসানুভূতি ও অনুপম কবিত্বমাধুর্য সর্বকালেই হৃদয়গ্রাহী। তেমনি অতুলনীয় যুগোপযোগী সাহিত্য ও কবিতা সৃষ্টি করেন স্বামীজীও। তাঁর চিন্তায়

অনন্যা সৃজনীশক্তি, ভাষায় "অফুরন্ত প্রাণ-চাঞ্চল্য।" ভারতীয় শিল্প-জাগরণেও স্বামীজীর অবদান সামান্য নয়। তিনি ছিলেন একজন বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞও বটে। পরমহংসদেব বলতেন —"নরেন্দ্র গাইতে বাজাতে সব তাতেই ভাল।" স্বামীজী ধর্মমহাসভায় বললেন—"যে-ধর্ম পরধর্মের প্রতি ঔদার্য ও সর্ববিধ ধর্ম-মতকে স্বীকৃতি দান করিতে শিখাইয়াছে, আমি সেই ধর্মভুক্ত বলিয়া নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করি।"

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রেরণায় স্বামীজী এযুগে সর্বধর্মসমন্বয়ে আত্মপ্রকাশ করেন। পরম-হংসদেবই দেখাইলেন "যত মত তত পথ"। সুদৃঢ় আধ্যাত্মিক ভিত্তির উপর আচার্য শঙ্কর অখণ্ড ভারতে যে বৈদিক ধর্মরাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন, তার যথারীতি সংরক্ষণার্থে কুশলী সেনা-নায়কের ন্যায় তিনি ভারতভূমিকে চার ভাগে বিভক্ত করে চার বেদের অনুশাসনে চারদিকে চারটি দুর্গতোরণস্বরূপ বৈদিক মঠ সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। এই হল আচার্য শঙ্করের দেবাদিষ্ট কর্মসাধনা। জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির ত্রিবেণীই ছিল তাঁর জীবনের প্রতিভাস।

এর এগার শত বৎসর পরে এল স্বামীজীর যুগ। তখন জাতীয়তা-উচ্ছল বিরাট পৃথিবী জেগেছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ-মহাদেশের পরস্পর সম্বন্ধ স্থাপিত হয়ে গেছে। শিল্পবিপ্লব ঘটে গেছে জগতে। শিল্পাশ্লিষ্ট জটিলতা-সমস্যার জট পাকিয়েছে সমাজে। মানুষের মন অধিকার করেছে বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানসুলভ দ্বিধা ও যুক্তি। বিপুল পরিবর্তন এসে গেছে মানুষের জীবনে। ভারতে বর্ণাশ্রম অতীত। ভারতে তখন আর এক রকমের ঘোর দুর্দিন। সে তখন পরাধীন। পাশ্চাত্যের ধাঁচে সমাজের গোড়াপত্তন হতে চলেছে। ধর্ম তখন প্রাণহীন আচার-অনুষ্ঠানে পর্যবসিত। দাসত্বের অন্ধকারায় ভারত আত্মবিস্মৃত। তার চোখে ধাঁধা লাগিয়েছে পাশ্চাত্য সভ্যতা —সে তখন মোহাচ্ছন্ন। ভারতের এই রাজ-নৈতিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক অন্ধকারের যুগে এলেন স্বামী বিবেকানন্দ। এই সাধক সন্ন্যাসীর অনন্যসাধারণ স্বদেশ-চেতনায় তীব্র কশাঘাত করলে ভারতবাসীর অশিক্ষা ও তার আজন্ম দারিদ্র্য। তিনি ছিলেন ভারতের মূর্ত বিগ্রহ। বলা যায়, "তাঁকে জানলেই ভারতকে জানা যায়।" "তিনি যখন পরমহংসদেবের নিকট যান তাঁকে দেখেই পরমহংসদেব বুঝলেন —সমস্ত ভারত তাহার নিকট আসিতেছে। তাই ভবিষ্যৎ ভারতের প্রতিনিধিকে অতি যত্নে গঠিত করিয়াছিলেন।" স্বামীজী দেখলেন বিশালকায় "অজগর" নিদ্রিত। তাকে জাগাতে হলে চাই বিশাল শক্তি। পরমহংসদেব ছিলেন বিরাট শক্তির আধার। স্বামীজী বলেছেন,—"কয়েক শতাব্দী যাবৎ ভারতে এইরূপ মহাশক্তির বিকাশ আর কখনও হয় নাই।" আরো বলেছেন, "ভারতের পুনরুত্থানের জন্য এই শক্তির বিকাশ যথা-সময়েই হইয়াছে।" এই মহাশক্তির সঙ্কেতেই স্বামীজী পাশ্চাত্যে গমন করেন। তথাকার বস্তুতান্ত্রিক ভোগবাদী সভ্যতার বুকে যে দ্বিধা-সংশয়ের ধোঁয়া বাসা বেঁধেছিল তা তিনি বিজ্ঞানসম্মত যুক্তির সহিত সামঞ্জস্য রেখে বেদান্তের আলোকসম্পাতে অপসারিত করে ভারতের জন্য লাভ করলেন উচ্চ আসন। স্বদেশে ফিরে এসে এই সৈনিক সন্ন্যাসী ঝঞ্ঝার মত বেগবান ব্যক্তিত্ব নিয়ে দেশের অবলুপ্ত চেতনার মূলে করলেন অভীঃমন্ত্রের অগ্নি-সংযোগ। দিকে দিকে সেই অগ্নি ঊর্ধ্ব শিখায়

জলে উঠল। তাঁর বেদান্তের বাণী উত্তপ্ত মদিরার মত জাতির শিরা-উপশিরায় সঞ্চারিত করলে জীবন-চেতনা।" "তিনিই হলেন ভারতের জাতীয় জীবনের গঠনকর্তা, তিনিই ইহার প্রধান নেতা।" "বিরাট"রূপে পূজা করলেন দেশমাতৃকার। বললেন, "আগামী পঞ্চাশ বৎসর যেন ভারতমাতা হন আমাদের উপাস্য দেবতা।" একথা তিনি বলেছিলেন ১৮৯৭ খৃঃ অব্দে। তার ঠিক পঞ্চাশ বৎসর পরেই ১৯৪৭ খৃঃ অব্দে ভারতমাতার ললাট হতে অপসৃত হল দাসত্ব-কালিমা। স্বামীজীই "ভারতের মুক্তির জনক—কি রাজনৈতিক, কি সাংস্কৃতিক, কি আধ্যাত্মিক।"

তবে জ্ঞানের আলোর চেয়ে হৃদয়ের আলোই যেন স্বামীজীর জীবনে বিকীর্ণ করেছে বৈদ্যুতিক দ্যুতি। বজ্রের মত কঠোর হলেও কুসুমের মত কোমল ছিল তাঁর হৃদয়। শঙ্করের জ্ঞানের সঙ্গে "বুদ্ধের হৃদয়"-ও ছিল তাঁর। তিনি বললেন, "হৃদয়, শুধু হৃদয়ই জয়ী হইয়া থাকে, মস্তিষ্ক নহে।" আরো বললেন, "যতদিন পর্যন্ত না তোমার হৃদয় খুলিতেছে, যতদিন পর্যন্ত না ভগবানকে উপলব্ধি করিতেছ, ততদিন সব বৃথা···।" "···হৃদয়ের ভাষা তৃণগুচ্ছ হইতে আরম্ভ করিয়া ভগবান পর্যন্ত বুঝিতে পারে।" অখণ্ড ভারতের তীর্থে তীর্থে, মন্দিরে মন্দিরে ফিরেছিলেন আচার্য শঙ্কর মহাজ্ঞানী ধর্মসংস্কাররূপে। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ জ্ঞানের সঙ্গে হৃদয়ের ভাষা বহন করে ফিরেছিলেন রাজার রাজপ্রাসাদ হতে দীনের পর্ণকুটিরে। তাঁর হৃদয়রসে অভিষিক্ত হয়ে "নব" বেদান্ত দূর দিগন্তে পরিব্যাপ্ত হল সর্বজনীন মানবতায়। তিনি বললেন, "বেদান্তের এই সকল মহান্ তত্ত্ব কেবল অরণ্যে বা গিরিগুহায় আবদ্ধ থাকবে না; বিচারালয়ে, ভজনালয়ে, দরিদ্রের কুটিরে, মৎস্যজীবীর গৃহে, ছাত্রের অধ্যয়নাগারে সর্বত্র এই সকল তত্ত্ব আলোচিত ও কার্যে পরিণত হইবে।" আসন্ন শূদ্রযুগের পদধ্বনি তাঁর কর্ণে আসছিল। তিনি সমাজ-সমীক্ষার সুতীক্ষ্ণ আলোকে দেখলেন—শ্রেণীসংঘাত ও শোষণ। বিচলিত হৃদয়ে তিনি দান করলেন "মন-প্রাণ-শরীর" সমাজসেবাব্রতে। তাঁর উপাস্য দেবতা হলেন "পাপী-নারায়ণ", "তাপী-নারায়ণ" ও "সর্বজাতির দরিদ্রনারায়ণ"। ধর্মসংস্কারক ও ধর্মসংস্থাপকরূপে ভগবান্ শঙ্কর ভারতে করেন বৈদিকধর্মের পুনর্জীবনদান, তাকে যুগযুগান্তের স্থিতিশীলতায় করেন পুনঃপ্রতিষ্ঠা। যুগাচার্য বিবেকানন্দ স্বদেশপ্রেমে মানবতাবাদী মহামানবরূপে আবির্ভূত হন। সমগ্র মানবজাতির হাতে তিনি দিলেন আত্মজ্ঞান-প্রতিষ্ঠার জন্য বিবেক-বিজ্ঞান। জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে ঈশ্বরজ্ঞানে মানবসেবার আদর্শ স্থাপনের জন্য রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন তিনি প্রতিষ্ঠিত করেন। তখন ভারত ভিন্ন আমেরিকা ইংলণ্ড প্রভৃতি বিভিন্ন দেশেও ইহার শাখাসমূহ প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি ছিলেন "সহস্রদল পদ্ম"। বেদান্তই ছিল তাঁর জ্ঞান ও কর্মের উৎসমূল।

জননী ছিলেন উভয়েরই জীবনে পরম-আরাধ্যা। মাতৃসেবা ছিল শঙ্করের অন্তরের জিনিস। প্রবাদ আছে বাল্যকালে মাতার নদীস্নানে দুঃখ দেখে অন্তরের কাতর প্রার্থনায় তিনি নদীর গতিবেগ গৃহের পাশ দিয়ে পরিবর্তন করে জননীর স্নানের ক্লেশ লাঘব করেন। কিন্তু হৃদয়ের আকুল বৈরাগ্য-আকাঙ্ক্ষা তাঁকে জননীর পাশে আবদ্ধ রাখতে পারেনি। তিনি গৃহত্যাগের সময় জননীকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে গিয়েছিলেন, সেই প্রতিশ্রুতিমত তাঁর অন্তিম

শয্যা-পার্শ্বে এসে তিনি দাঁড়ান এবং তাঁকে ইষ্ট দর্শন করান। তেমনি একান্ত মাতৃভক্ত ছিলেন স্বামীজীও। ১৮৯৪ খৃঃ অব্দে ২৯শে জানুআরি তিনি চিকাগো থেকে লিখলেন, "এ বিপুল সংসারে আমার ভালবাসার পাত্র যদি কেহ থাকেন তবে তিনি আমার মা। তথাপি এ দৃঢ় বিশ্বাস আমি পোষণ করিয়া আসিতেছি এবং এখনও করি যে, যদি আমি সংসারত্যাগ না করিতাম তবে আমার মহান গুরু পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণদেব যে বিরাট সত্য প্রচার করিতে জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তাহা প্রকাশিত হইতে পারিত না।" জগতের বৃহত্তর কল্যাণে উভয়েই মাতৃসেবা অসমাপ্ত রেখে গৃহত্যাগ করেন।

উভয়েই ছিলেন সত্যদ্রষ্টা ঋষি। দেহবাস-বর্জন বিষয়ে উভয়েই ছিলেন সচেতন। কাল পূর্ণ হলে আচার্য শঙ্কর হলেন অন্তর্মুখী। অধিকাংশ সময়েই ধ্যানমগ্ন হয়ে থাকতেন। একদিন অপরাহ্ণে শিষ্যদের বললেন, "বৎসগণ, এ দেহের কার্য সমাপ্ত হয়েছে। এখন স্ব-স্বরূপে লীন হবার সময় আগত। যে ব্রহ্মাত্ম-বিজ্ঞান তোমাদের উপদেশ করেছি তা গুরু-পরম্পরাপ্রাপ্ত। তোমরা ব্রহ্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হও।" এইরূপ আশীর্বাদ করে তিনি ধ্যানস্থ হয়ে স্ব-স্বরূপে লীন হলেন। তাঁর বয়স তখন ৩২ বৎসর। মতান্তরে দেহত্যাগের সময় তাঁর বয়স ৩৪, ৩৬। পরমহংসদেবও বিবেকানন্দ সম্বন্ধে বলেছিলেন: ওর কাজ শেষ হলে যখন দিব্যভাব-বিষয়ে সচেতন হবে তখনই ও ছেড়ে যাবে ওর দেহকে। তাঁর এই ভবিষ্যদ্বাণী প্রতি অক্ষরে ফলেছিল। স্বামীজী ১৮৯৭ জুলাই মাসে আলমোড়া হতে লিখলেন, "আমি বুঝতে পারছি আমার কাজ শেষ হয়েছে…।" তখন থেকে তিনিও অন্তর্মুখী। বলতেন, "আহা, আবার তাঁর মধুর বাণী শুনতে পাচ্ছি—সেই চিরপরিচিত কণ্ঠস্বর—যাতে আমার প্রাণের ভিতরটা পর্যন্ত কণ্টকিত করে তুলছে—যাই, প্রভু, যাই।" ১৯০২ খৃষ্টাব্দে ২রা জুলাই বুধবার স্বামীজী বলেন, "আমি এখন মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হচ্ছি।" আর ৪ঠা জুলাই শুক্রবার সন্ধ্যায় তিনি গভীরতম ধ্যানে মগ্ন হন। রাত্রি ৯টায় তিনি ধ্যানযোগে দেহত্যাগ করেন। বয়স তখন সবেমাত্র ঊনচল্লিশ।

এই দুই পুণ্যশ্লোক মহাত্মা দিব্যলোক হতে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়ে জগদ্ধিতায় যে মহৎ কর্ম সম্পাদন করে ফিরে গেলেন, তার গভীরতা বা পরিধি পরিমাপ করা সাধারণের পক্ষে সম্ভবপর নয়। তাঁরা নিজেরাই এ সম্বন্ধে যা ইঙ্গিত রেখে গেছেন তা থেকে লৌকিক জ্ঞানের কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যেতে পারে। আচার্য শঙ্কর ছিলেন জাগ্রত চৈতন্যরূপে শিবাবতার। সমগ্র ভারতে বৈদিক ধর্মের পুন প্রতিষ্ঠার জন্যই যেন তাঁর দেহধারণ। স্বরচিত অনুশাসনে আচার্য শঙ্কর বলেছেন, "কৃতে বিশ্বগুরুর্ব্রহ্মা ত্রেতায়াং ঋষিসত্তমঃ। দ্বাপরে ব্যাস এব স্যাৎ কলাবত্র ভবাম্যহম্।" সত্যযুগে ব্রহ্মা বিশ্বগুরু, ত্রেতা-যুগে মহর্ষি বশিষ্ঠ, দ্বাপরে ব্যাস এবং কলিযুগে আমি বিশ্বগুরু।" স্বামীজীও ছিলেন "মূর্তিমান বেদান্ত।" শেষের দিকে একদিন বলেছিলেন, "যা দিয়ে গেলাম দেড় হাজার বৎসর চলবে।" অন্যত্র বললেন, "বিবেকানন্দ কী করেছে, আর একটা বিবেকানন্দ থাকলে বুঝতে পারত।" শ্রীঅরবিন্দ বলেন, "দেখ! মাতৃভূমির জাগ্রত আত্মায় বিবেকানন্দ এখনও জীবন্ত!…যে মহৎ কার্য দক্ষিণেশ্বরে আরব্ধ হয়েছে, তা সমাপ্ত হওয়া তো দূরের কথা তাহা এখনও দেশ ভাল-ভাবে বোঝে নাই। বিবেকানন্দ যা পেয়েছিলেন

এবং রূপায়িত করতে চেষ্টা করেছিলেন তাহা এখনও সম্পূর্ণভাবে কার্যে পরিণত হয় নাই।"

আজ বিংশ শতাব্দীর আণবিক যুগে বিশ্ব-বিলোপের নিত্য-আশঙ্কার ভিতরেও যে ধর্মা-ধর্মাতীত সংস্কারবর্জিত উদার মানবতা বিশ্ব-রক্ষায় অন্তরে অন্তরে কার্য করে চলেছে, সেই পরিব্যাপ্ত সর্বগত মানবতাবাদের বিশ্ব ধর্মের দিকে অগ্রগতি। এই বিশ্বধর্মগঠনে ভারতের সুপ্রাচীন প্রাণবাণীই প্রাণ সঞ্চার করবে—তপোবনে ঋষিকণ্ঠে উপনিষদাকারে একদা যা উচ্চারিত হয়েছিল, ধ্বনিত হয়েছিল আচার্য শঙ্করের কণ্ঠে, বিশ্বময় আবার যা ঘোষিত হয়েছে স্বামী বিবেকানন্দের কণ্ঠ-নিঃসৃত হয়ে—"আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্। ন বিভেতি কুতশ্চন॥" "চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্।"

"বুদ্ধ ও কপিল কেবল বলেন—জগতে দুঃখ দুঃখ, পালাও পালাও। সুখ কি একেবারে নাই? যেমন ব্রাহ্মরা বলেন, সব সুখ—এ-ও সেই প্রকার কথা। দুঃখ, তা কি করিব? কেহ যদি বলে যে, সহিতে সহিতে অভ্যাস হইলে দুঃখকেই সুখ বোধ হইবে? শঙ্কর এদিক দিয়া যান না—তিনি বলেন, 'সন্নাপি অসন্নাপি, ভিন্নাপি অভিন্নাপি'—আছে অথচ নাই, ভিন্ন অথচ অভিন্ন এই যে জগৎ, এর তথ্য আমি জানিব, জানিতে গেলে যে অনন্ত দুঃখ তা তো প্রাণভরে গ্রহণ করিতেছি; আমি কি পশু যে ইন্দ্রিয়জনিত সুখদুঃখ-জরামরণ-ভয় দেখাও? আমি জানিব, জানিবার জন্য জান দিব।···তাহাতে দুঃখ আসে বা সুখ আসে আমি গ্রাহ্য করি না। কি উচ্চভাব! কি মহান্ ভাব! উপনিষদের উপর বুদ্ধের ধর্ম উঠেছে, তার উপর শঙ্করবাদ। কেবল শঙ্কর বুদ্ধের আশ্চর্য heart অণুমাত্র পান নাই।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

# অতীত ভারত-ইতিহাসের একপৃষ্ঠা—ভবিষ্যতের পথনির্দেশ

শ্রীসতীশচন্দ্র রায়চৌধুরী

মানুষ স্মৃতির সাহায্যের জন্য অনন্ত অসীম কালকে বিভাগ করে এক একজন স্মরণীয় পুরুষের জন্ম বা মৃত্যু ধরিয়া। এই জন্মমৃত্যু-ঘটনাই কালকে ছেদ করিয়া অসীমকে সীমার মধ্যে আনিয়া ফেলে উপলব্ধির সাহায্যের জন্য। পাশ্চাত্যে আজকাল যিশুখৃষ্টের জন্মমৃত্যু ধরিয়াই কালনির্ণয় হইতেছে; যথা, খৃঃ পূর্ব অথবা খৃঃ পর। আমরাও তাহা গ্রহণ করিতে বাধ্য হইতেছি; এখন আর শালিবাহন রাজার দোহাই দিয়া বা উজ্জয়িনীরাজের দোহাই দিয়া পাঁজি না খুলিয়া কাল নির্ণয় করা যায় না। আমরা অনেকটা বুদ্ধ-পূর্ব বা বুদ্ধ-পর ধরিয়াই ইতিহাসের তথ্যকে সময়ের দিক দিয়া উপলব্ধি কবিতে পারি। এই হিসাবে খৃষ্ট এবং বুদ্ধের জন্ম আমাদের জ্ঞানবিভাগের সাহায্য করে। এর পূর্বেকার যা কিছু সব প্রাগৈতিহাসিক যুগে গিয়া পড়ে। হয়ত কেহ কেহ বলিবেন আমাদের ঋগ্বেদের যুগ তো আছে? সত্য বটে ঋগ্বেদ পৃথিবীর প্রাচীনতম রচনা—তাহার ভাষাই তাহার প্রমাণ। সে-ভাষা যেন প্রথম মানুষের বাক্-এর আরাধনা। ধাতুগত ভাবে তাহা অনেকাংশে মধ্যপ্রাচ্যের ও গ্রীসের প্রাচীন ভাষার সহিত জ্ঞাতিত্ব রক্ষা করিতেছে। কিন্তু তাহার উৎপত্তি এবং বিকাশের কালনির্ণয় অসম্ভব। কেহ কেহ বলেন খৃঃ পূঃ ৪,০০০ বৎসর। স্বামী বিবেকানন্দের মতে তাহা পাঁচ হইতে দশ হাজার বৎসর হইতে পারে। ইহার সঠিক কাল-নির্ণয় আজ পর্যন্ত হইয়া উঠে নাই। অধ্যাপক ম্যাক্স্‌মূলার-এর মতে এর মন্ত্র ইত্যাদি মুখে মুখে সুদীর্ঘ কাল চলিতে থাকে, লিখন আবিষ্কারের পর তাহা লেখনীমুখে প্রকাশ পায়। কাজেই এর উৎপত্তিকাল কুয়াশা-আবৃত থাকিয়াই যাইবে। লেখনী আবিষ্কারের কাল মধ্যপ্রাচ্যের সভ্য জাতির ইতিহাস হইতে কতকটা নির্ণীত হইয়াছে—যেমন এসাই-রিয়ান, সুমেরিয়ান, বেবিলোনিয়ান প্রভৃতি জাতির আধুনিক প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার দ্বারা। সেটাও জন্ম নিয়াছিল symbol বা প্রতিমূর্তির আকারে। বর্তমান-আকারে অক্ষর-সৃষ্টি তাহার বহু পরে। মানুষের প্রকৃতিতে ইহাই আছে যে, সে শুধু জানিয়াই সন্তুষ্ট নহে, সে আত্মপ্রকাশের জন্য উদ্‌গ্রীব। যাহা মানুষকে অন্য জীবকুল হইতে পৃথক স্থান দিয়াছে এবং মানুষের জ্ঞান নিয়তই ভাগাভাগি হইয়া জগৎ জুড়িয়া ছড়াইয়া পড়িতেছে ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে।

এই সকল এসাইরিয়ান, বেবিলোনিয়ান, সুমেরিয়ান, বেকট্রীয়ান জাতির সভ্যতা পাঁচ হাজার বৎসরের কাছাকাছি বৈজ্ঞানিক ভাবেই নিরূপিত হইয়াছে।

ভারতীয় প্রাচীন কাল নির্ণয়ের মহা অসুবিধা এই যে, মহাভারতাদি যাহা কিছু ইতিহাস ভারতের আছে তাহা ঐতিহাসিক সত্য অপেক্ষা পারমার্থিক সত্য প্রকাশেই সমধিক মনোযোগী থাকায় তাহা mythology বা পুরাণের সহিত এভাবে মিশ্রিত হইয়া আছে যে, তাহা আমাদিগকে কালের সত্যনির্ণয়ে

মোটেই সাহায্য করে না। বহু রাজা-রাজড়ার জন্ম-উল্লেখ তাহাতে দেখা যায় কিন্তু তাহাদের কালনির্ণয়েরও কোন গবেষণা এদেশে আজ পর্যন্ত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। যাহা হইয়াছে তাহাও সংশয় বৃদ্ধি করে মাত্র। আবার কতকগুলি নাম এমন অর্থব্যঞ্জক, সেগুলি শুনিলেই সন্দেহ হয় যে, তাহা ইতিহাসের পূর্বের নহে, ইতিহাসকে অর্থযুক্ত করার জন্য তাহা পরে কল্পিত হইয়াছে। অবশ্য তাহাতে নীতি বা ধর্ম-সংক্রান্ত উপদেশের কোন খর্বতা হয় না—খর্বতা হয় ইতিহাস-উপলব্ধির, যাহা ভারতীয়দের কখনই মূল লক্ষ্য ছিল না। এ বিষয়ে আমাদের সঙ্গে পার্থক্য দেখি প্রথমতঃ গ্রীক জাতির ও পরে মুসলমান জাতির। ইঁহারা ইতিহাস-লিখনকে জ্ঞানের একটা অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গ বলিয়া ধরিয়া নিয়াছেন, যেমন গ্রীসে হিরোডোটাস এবং মুসলমাদের অলবেরুনী প্রভৃতি।

এই ইতিহাস-রচনা বা ঐতিহাসিক সত্য-উপলব্ধি বিষয়ে বুদ্ধদেবের জন্ম আমাদিগকে খুবই সাহায্য করিতেছে; তাহাও খৃস্টজন্মের সঙ্গে যোগ করিয়া। বুদ্ধের জন্মকর্ম নিয়া অনেক সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছে, ভবিষ্যতে আরও হইবে। খৃঃ পূঃ ৬২০ হইতে ৫৪৩ পর্যন্ত বুদ্ধদেবের স্থিতিকাল। একজন ঐতিহাসিক আবার গবেষণামূলে বলেন ৫৬৩ হইতে ৪৮৩ খৃঃ পূঃ। তবেই দেখুন, আধুনিক কালেও এই বিভ্রান্তি! তবে একমাত্র স্বীকৃত সত্য হইল গৌতম বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এই ভারতের অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলেই। কিন্তু খৃষ্টের জন্ম নিয়াও অনেক গবেষক সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন।

এ প্রবন্ধে আমার আলোচ্য বিষয় হইবে বৌদ্ধদের প্রচারিত ও প্রসারিত ধর্মের সহিত হিন্দুধর্মের কতখানি সাদৃশ্য তাহাই দেখানো এবং উভয় ধর্মের আলোকে ভবিষ্যতের পথ-নির্দেশ। বেদ-উপনিষদই আমাদের হিন্দু-ধর্মের প্রধান মূলগ্রন্থ—তাহা যতদিনে যে ভাবেই বর্তমান আকার প্রাপ্ত হইয়া থাকুক। শাক্যসিংহ গৌতম বেদবেদাঙ্গপারদর্শী ছিলেন, সুতরাং হিন্দুধর্মের সহিত তিনি সুপরিচিত। অশ্বঘোষ তাঁহার প্রথম জীবনচরিত-লেখক। সেটা অবশ্য তাঁহার তিরোধানের অনেক পরে হইলেও তাহা প্রসিদ্ধ এবং নির্ভরযোগ্য। তাহাতে পাই দেবল ঋষি তাঁহার জন্মকালে লক্ষণাদি দৃষ্টে তাঁহার সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন। এই সব ঋষি-পরিবেষ্টিত পিতৃসন্নিধানে তাঁহার বাল্যজীবন অতিবাহিত হওয়ায় তাঁহার হিন্দুশাস্ত্রে জ্ঞানলাভ খুবই স্বাভাবিক; বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের সহিত আলোচনারও প্রমাণ আছে। এতদ্ব্যতীত সঙ্গীত প্রভৃতি কলাবিদ্যাও তাঁহার অধিগত হইয়াছিল। এ অবস্থায় তিনি সন্ন্যাসী হইয়া মানুষের সর্ববিধ দুঃখ-নিরাকরণের সন্ধানে বাহির হন, যাহা শাস্ত্রজ্ঞান তাঁহাকে দিতে পারে নাই। সুদীর্ঘ তপস্যার পর তিনি যে সন্ধান লাভ করিলেন তাহাতে ছিল না কোন কল্পনা বা কৃত্রিমতার স্থান, তাহা ছিল নীতিজ্ঞানমূলক; সত্যকথন, সত্য-আচরণ ইত্যাদি আটটি পন্থা যাহা সমস্ত ধর্মেরই স্বীকৃত মূলভিত্তি। ইহার যে-কোনটি বাদ দিলেই যে-কোন ধর্মের ভিত্তি ভাঙ্গিয়া পড়ে। দেবদেবী বা ঈশ্বর তাঁহার প্রচারিত ধর্মের আওতায় আসে না। তাঁহাদের সম্বন্ধে তিনি নীরব। যাহা সাধারণের বুদ্ধির বিষয়ীভূত নয়, তাহা তিনি কখনও প্রচার করিতেন না। অবশ্য দেবদেবীর উপাসনায় যাঁহারা অভ্যস্ত, তাঁহাদিগকে তিনি বাধাও দেন নাই; কাজেই

বুদ্ধসংঘের পার্শ্বে আমরা পাই হিন্দু ব্রাহ্মণ প্রভৃতিও। ব্রাহ্মণপণ্ডিতের সহিত শাস্ত্র-বিচারেও তিনি পশ্চাৎপদ হন নাই। কাজেই তিনি কোন সম্প্রদায়েরই শ্রদ্ধা হারান নাই।

লক্ষ্য তাঁহার ছিল ত্রিবিধ দুঃখকষ্টের অতীত হইয়া সমগ্র মানুষের শান্তির পথ করা। হিন্দু-ধর্ম তথা বেদান্তধর্মেরও মূল লক্ষ্য তাহা। এই শান্তিলাভের প্রধান উপায় তিনি আবিষ্কার করিয়াছিলেন—সর্বদুঃখের মূলে যে বাসনা, তাহার ত্যাগ। ধম্মপদের তহ্নাবগ্‌গো অধ্যায় দ্রষ্টব্য। ইহার সহিত আমরা গীতার পঞ্চদশ অধ্যায় তুলনা করিতে পারি। লক্ষ্য ও উপায় যখন একই তখন ভগবৎকৃপা ইত্যাদি বিষয়কে তিনি জড়াইয়া পুরুষকারকে পঙ্গু করিতে চান নাই। তাই তহ্নাবগ্‌গোর ২০।২১ শ্লোকে "আপনিই আপনাকে উদ্ধার কর।"—তাঁহার এই পৌরুষ-উক্তি লক্ষ্য করি। গীতায় দেখি "উদ্ধরেদাত্মনাত্মানম্‌" ইত্যাদি (৬ষ্ঠ অধ্যায়)। কাজেই সর্বশাস্ত্রময়ী গীতাকে পাশা-পাশি রাখিয়া ধম্মপদ দেখিলে দেখা যাইবে, লক্ষ্য ও উপায়ে কোন বিরোধিতা নাই।

মানুষকে বুদ্ধদেব মনুষ্যত্বের উপরই দাঁড় করাইতে চাহিয়াছিলেন। হিন্দুধর্মের বড় কথা জন্মান্তরবাদ ও কর্মবাদ, তাহাও বুদ্ধদেব মানিয়া লইয়াছিলেন। তবে মৃত্যুর পর কি থাকে, কি যায়, কোথায় কি ভাবে থাকে, এ সব দার্শনিক তত্ত্বে তাঁহার চেলাদের মতভেদ দেখা যায়, কিন্তু তাহাতে চলার পথে কোন বাধা জন্মায় না। Eschatology বা মৃত্যুর পরবর্তী অবস্থা সম্বন্ধে ধর্মে ধর্মে এবং একই ধর্মের বিভিন্ন শাখায় মতভেদের চূড়ান্ত; সুতরাং এগুলি নিয়াও সংঘাতের সৃষ্টি হইতে পারে না। কিন্তু বৌদ্ধধর্মের দার্শনিক তত্ত্ব সম্বন্ধে বড় কথাই হইল, সব কিছুই পরিবর্তনশীল; এমন কি জীবাত্মা বা soul বলিতে আমরা যাহা বুঝি তাহাও। বস্তুতঃ তাহারই পূর্ণ পরিণতি বুদ্ধমতে।

এই সব দার্শনিক মতভেদ লইয়াও বুদ্ধদেব হিন্দুর দশ অবতারের এক। বুদ্ধদেব পূর্ণপ্রজ্ঞ স্বীকৃত না হইলে তিনি এই অবতার-শ্রেণীভুক্ত হইতে পারিতেন না। জ্ঞানের চরম সীমায় মানুষের কোন ভেদাভেদদৃষ্টি থাকিতে পারে না। তখন সবই যা আছে তাই। ঋগ্বেদের নাসদীয় সূক্ত আর কি?

এখন চিন্তনীয় বিষয় এই যে, এমন সোজা সরল প্রাণবন্ত জ্ঞানমূলক সর্বলোকচিত্তজয়ী ধর্ম ভারত হইতে লুপ্ত বা বিতাড়িত হইল কেন? উত্তরে বলা যায় মানবচিত্তের দুর্বলতা। সাধারণ মানুষ চায় একজন সাকার উদ্ধারকর্তা, যাঁহাকে অবলম্বন করিয়া সে মনোরাজ্যের উর্ধ্বতম অনুভূতিস্তরে উঠিতে পারে। এ যুগে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব তাহা দেখাইয়া গিয়াছেন। নিজেই তিনি শ্রেষ্ঠ অবতারপুরুষ। এই কারণেই পরবর্তী কালে বৌদ্ধসংঘ বুদ্ধদেব-কেই সাকার ঈশ্বরের স্থানে বসাইতে চেষ্টা করিয়া দ্বিধাবিভক্ত হইয়া গেল। একদল হীনযান, তাঁহারা আদিম বৌদ্ধ দর্শন নীতি ও ও সদাচার ইত্যাদি সম্বন্ধে বুদ্ধবাণী অনুসরণ করিয়া চলিতেন। ইঁহাদের প্রাধান্য থাকিল দক্ষিণদিকে সিংহল প্রভৃতি জুড়িয়া আর একদল যোগ করিলেন বুদ্ধের পূজার সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য বোধিসত্ত্ব এবং দেবদেবীর মূর্তিপূজার ব্যবস্থা; ইঁহাদের নাম হল মহাযান। হীন-যানীদের উদ্দেশ্য হইল ধ্যান ধারণা ইত্যাদি উপায়ে নিজ নির্বাণ বা মুক্তিসাধন অর্থাৎ সংসারচক্রে ঘোরাফেরা বন্ধ করা। ইহা ব্যক্তির

মুক্তি। আর মহাযানীদের লক্ষ্য হইল ব্যষ্টির উদ্ধার বোধিসত্ত্বদের আনুকূল্যে ও সাহায্যে। ক্রমে আসিয়া পড়িল তান্ত্রিক সাধনার যত স্থূল সূক্ষ্ম উপায়। খৃষ্টীয় ৫ম শতকে অসঙ্গ যোগ করিলেন তাহাতে যোগশাস্ত্র, এবং তাহার এক শতাব্দী পরেই হিন্দুর যত তান্ত্রিক মত শক্তি-উপাসনা ইত্যাদি এবং তদানুষঙ্গিক যত আচার অনাচাব সবই ঢুকিয়া গেল সেই নির্মল স্রোতস্বতীরূপ বৌদ্ধধর্মে। বৌদ্ধদের তন্ত্র হিন্দুতন্ত্রের সৃষ্টির বহু পরে, ইহা স্বীকার্য। হিন্দুর তন্ত্রসাধনা বেদের প্রায় সমকালীন। তন্ত্রের পূর্ণ আলোচনা পাই কলিকাতা হাইকোর্টের পূর্বতন বিচারপতি স্যর জন উড্রফ সাহেবের প্রকাশিত গ্রন্থমালায়। বঙ্গদেশে প্রসিদ্ধ দেবদেবীর পূজা-আরাধনাদি অধিকাংশই তন্ত্র-মতে। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব তন্ত্রসাধনায় সিদ্ধ হন। নবদ্বীপধামে বৈষ্ণব সাধনার পাশা-পাশিই তান্ত্রিক সাধনা চলিতেছিল। প্রতি-যোগিতার রেশারেশিও ছিল ঢের।

বাংলার তন্ত্রসাহিত্যে কৃষ্ণানন্দ আগম-বাগীশের নাম চিরস্মরণীয়। আধুনিক কালেও অনেক সাধক তন্ত্রসাধনায় সিদ্ধ হইয়া বহু শিষ্য-মণ্ডলী রাখিয়া গিয়াছেন। আর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-দেব তো প্রথম অবস্থায় তন্ত্রসাধনারই উজ্জ্বলতম মণি। নদী যেমন সমুদ্রেই বিলীন হয় তেমনি তিনি শেষধাপে ব্রহ্মজ্ঞানে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া জগতে নূতন ভাবে নূতন শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কথা স্বতন্ত্র।

এই সুপ্রাচীন প্রত্যক্ষফলপ্রদ তন্ত্রসাধনা সম্ভবতঃ বুদ্ধদেবের নির্বাণের বহু পরে মহাযান বৌদ্ধেরা গ্রহণ করিল ব্যভিচারদুষ্ট বিকৃত রূপে। স্বামী বিবেকানন্দের মতে বৌদ্ধ-ধর্মের শেষ অবস্থায় এই-জাতীয় তন্ত্রাচার বৌদ্ধধর্মকে কলুষিত করার ফলেই ভারত হইতে কুমারিল ভট্ট ও শ্রীশঙ্করাচার্য বৌদ্ধ-ধর্মকে নির্বাসিত করিতে সহজে সক্ষম হইয়া-ছিলেন। ('স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা' ৬ষ্ঠ খণ্ড, পত্রসংখ্যা ৩৪)। স্বামীজীর ইতিহাস-পর্যালোচনা ও ইতিহাস-চেতনা অপূর্ব বৈজ্ঞানিক যুক্তিসম্মত। কেবল একদেশদর্শী সমালোচকেরাই বলেন ভারতে শ্রীশঙ্কর প্রভৃতি বৌদ্ধধর্মকে চাপিয়া মারিয়াছেন। শঙ্কর সম্বন্ধে এ অভিযোগ যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না এজন্য যে, তিনি নিজে মায়াবাদের আশ্রয় নিয়া বুদ্ধের শূন্যবাদকেই প্রকারান্তরে গ্রহণ করিয়াছেন; যাহার জন্য তাঁহার খ্যাতি হইয়াছিল পণ্ডিতমহলে—প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ। আর স্বামীজী তাঁহার অপূর্ব বেদান্তজ্ঞান ও ব্রহ্মৈক্য-বুদ্ধি সত্ত্বেও বলিয়াছেন যে বুদ্ধের "ঈশ্বরবাদ নাই বটে, কিন্তু তিনি নিজে ঈশ্বর, আমি খুব বিশ্বাস করি" (ঐ পত্রসংখ্যা)। কী উদারতা! তিনি ভাবরাজ্যে কত ঊর্ধ্বে উঠিয়া গিয়াছেন।

ভারতে বৌদ্ধধর্মের বিলুপ্তি যে কারণেই হউক, তান্ত্রিকতা-সুপরিপুষ্ট মহাযান বৌদ্ধ-ধর্ম খৃঃ ৭ম শতকে (খৃঃ ৬৪৩) তিব্বতে প্রবেশ লাভ করে, তিব্বতের রাজা সমসেন লাম্পার দুই স্ত্রীর সাহায্যে। তাহার মধ্যে একজন ছিলেন চীনদেশীয়া। তাঁহারা অনেক দেব-দেবীমূর্তি এবং হস্তলিপি (manuscript) প্রভৃতি ভারত হইতে তিব্বতে নিয়া যান। অনেক শিক্ষাবিদ্‌ও ভারত হইতে তথায় যান। তিব্বতী অক্ষরমালা (alphabets) তাঁহাদেরই সৃষ্টি। পরে ৭৪৭ খৃঃ অব্দে পদ্মসম্ভব নামক একজন বড় তন্ত্রাচার্যকে ভারত হইতে তিব্বতে লওয়া হয়। তাঁহার অসামান্য প্রতিভাবলে তিব্বতে তিব্বতীয়দের প্রাচীন পোঁ-ধর্ম ও

ভারতীয় তন্ত্রধর্মের সংযোগে বিশ্ববিশ্রুত লামা-ধর্মের সৃষ্টি হয়। এই লামা-ধর্ম অত্যন্ত mystic বা রহস্যপূর্ণ। লামা-ধর্মে দীক্ষালাভ হয় শৈশবে, ৫।৭ বৎসর হইতেই গৃহত্যাগী ব্রহ্মচারিরূপে।

প্রথমতঃ কোন মঠে (monastery) ঢুকিয়া চাকরের কাজে নিযুক্ত হইয়া ক্রমে ধাপে ধাপে উপরে উঠিয়া শেষে লামাপদ-প্রাপ্তি হয়। লামা মানে শ্রেষ্ঠ পুরোহিত। সর্বোপরি দালাই লামা, তিনি তুর্কীর খলিফার মতো আধ্যাত্মিক এবং পার্থিব শক্তির কেন্দ্র (both spiritual and temporal lord)। এই-যে মঠের দীক্ষা এবং শিক্ষা তাহা এত কঠিন নিয়মের ভিতর দিয়া সাধিত হয় যে, এর বিধান-কর্তাকে প্রশংসা না করিয়া পারা যায় না। আমাদের প্রাচীন গুরুগৃহবাসের ব্রহ্মচর্যের কাঠিন্য ইহার সহিত কতকটা তুলনীয়। ভারতেই প্রায় শতাধিক বৌদ্ধ তন্ত্রগ্রন্থ ছিল। তিব্বতে গিয়া তাহা সংখ্যাতীত হইয়া দাঁড়াইল। কেবল সংখ্যাগুরুত্বে নয়, বিষয়-গুরুত্বেও তাহা প্রবল হইয়া উঠে। তন্ত্র-সাধনায় একজন অতি সিদ্ধ ভারতীয় সন্ন্যাসী, যাঁহার নাম সিদ্ধনাগার্জুন, তিনি অলৌকিক শক্তির অধিকারী হন। তাঁহার জীবনের প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ অভিজ্ঞতাপূর্ণ একখানি তন্ত্রগ্রন্থ তিনি রচনা করেন। তাহার নাম "সিদ্ধ-নাগার্জুন কক্ষপুট"। এই গ্রন্থখানি তন্ত্রশাস্ত্রের অত্যাশ্চর্যমহিমামণ্ডিত। এই গ্রন্থখানি (manuscript) ভারতে নাই, তিব্বতের কোন বৌদ্ধ মঠে তাহা সংরক্ষিত বলিয়া অনেকেই অনুমান ও বিশ্বাস করেন, অন্ততঃ চীনের আক্রমণের পূর্ব পর্যন্ত ছিল বলিয়া।

তিব্বতে গিয়া তন্ত্রের অলৌকিক শক্তির বিকাশ ও প্রকাশ সম্বন্ধে আমরা আভাস পাই একজন তিব্বতীয় ডাক্তার লবশং রাম্পার প্রসিদ্ধ পুস্তক (লণ্ডন হইতে প্রকাশিত) 'লাসার ডাক্তার' (Doctor From Lhasa) নামক গ্রন্থে। তিনি ডাক্তার অথচ একজন তিব্বতীয় যোগী। তাঁহার আর এক পুস্তক 'তৃতীয় চক্ষু' (Third Eye)। যাঁহারা যোগশাস্ত্রে এবং তন্ত্রশাস্ত্রে বিশ্বাসী, তাঁহারা এই গ্রন্থগুলিতে একটা লুপ্ত বিজ্ঞানের সন্ধান পাইবেন। তিনি অনেক সময়ই সঙ্কটাপন্ন অবস্থা হইতে যোগবলে উদ্ধার লাভ করিয়াছেন। তন্ত্র একটা গুপ্ত-বিদ্যা, কিন্তু তাই বলিয়া ইহা অবৈজ্ঞানিক হইবে এমন কোন কথা নাই। লামাদের প্রধান মঠে ভূমির বহু নিম্নদেশে কত যে গুপ্ত গুহা ও তাহার বিস্তৃত শাখাপ্রশাখা! সেগুলির এখন চিহ্ন আছে কিনা জানা নাই। রাম্পার পুস্তকদ্বয় ইউরোপের বৈজ্ঞানিক মহলে এক আন্দোলন সৃষ্টি করে, কারণ রাম্পাও একজন বৈজ্ঞানিক। মানুষের দস্যুবৃত্তির (vandalism) ফলে অনেক জ্ঞানই ধরাপৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে, আজও হইতেছে—ইহা ঐতিহাসিক সত্য। কাজেই বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কোন কথা আসে না। জার্মানীর মহাকবি গেটের মতে বলিতে হয়: যাহা প্রত্যক্ষ করি নাই তাহাকে শ্রদ্ধার সহিত (reverentially) এক দিকে রাখিয়া দিয়া আলোকের অপেক্ষা করিব।

তন্ত্রসাধনা যে তিব্বতে গিয়া বহু বিস্তার লাভ করিয়াছিল তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ সেখানকার মঠে মঠে অগণিত দেবদেবীর মূর্তি (iconography)। তাহার রূপ এবং প্রকারভেদই বা কত! আমাদের তন্ত্র-উপাসনার যত মূর্তি তাহা অনেকই এবং তাহা ছাড়া আরো বহু মূর্তি মন্দিরের গাত্রে গাত্রে নানা উজ্জ্বল বর্ণরাগে অঙ্কিত এবং কোন কোন স্থলে চমৎকার ভাবপ্রকাশক। প্রস্তর-

মূর্তিও বহু দৃষ্ট হয়। বুদ্ধমূর্তিই বা কত! অবলোকিতেশ্বর, অমিতাভ ইত্যাদি, এবং প্রত্যেক ভাবের প্রকাশক ভিন্ন ভিন্ন মূর্তি। তাঁহারা জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী। দালাইলামা অবলোকিতেশ্বর বুদ্ধের অবতার ( incarnation ), তেসিলামা অমিতাভ বুদ্ধের অবতার বা incarnation। দালাইলামাকে লক্ষণদৃষ্টে তিব্বতের শিশুমহল হইতে বাছিয়া বাহির করিতে হইত, তাঁহার দেহে পূর্বজন্মের মহৎ চিহ্নাদি দৃষ্টে। সেজন্য তিব্বত এবং নিকটবর্তী চীনপ্রদেশে হইত তাঁহাদের বিশেষজ্ঞদের এক বিরাট অভিযান নির্বাচনের পূর্বে। মন্দির-গাত্রে বুদ্ধমূর্তির চারিদিক বেষ্টন করিয়া স্ত্রী-পুরুষ বোধিসত্ত্বদের সঙ্গে অসংখ্য দেবদেবীর মূর্তি। তাহাতে বাদ যান নাই আমাদের গণেশ, সরস্বতী প্রভৃতি, এমন কি হয়গ্রাব পর্যন্ত। দেবতাদের এক একটা সভার ( assembly ) মধ্যদেশে প্রায়ই বুদ্ধদেবের এক এক প্রকার মূর্তি। বোধিসত্ত্বের সংখ্যা অগণিত। সেখানে প্রায়ই symbol বা প্রতীকের সাহায্যে হয় ভাবের উন্মেষ ও প্রকাশ। এককালে মধ্যপ্রাচ্যে যথা বেবিলন, এসাইরিয়াতেও প্রতীকই ছিল ভাষা। এই symbolism বা প্রতীক অবলম্বন আধুনিক কালেও তিব্বতীয়দের বড় প্রচেষ্টা। প্রাচীন গ্রীস ও মিশরেও ছিল তাহাই।

আমাদের যোগসাধনার মুদ্রা ও আসন ইত্যাদিও সেখানে বহুত্বে পরিণত হইয়াছে। হস্তমুদ্রা অনেকগুলিই ফুটন্ত পুষ্পসদৃশ, কারুকার্যের চূড়ান্ত। কোনটা আশীর্বাদ, কোনটা অভয়দান, কোনটা ভীতি প্রদর্শন করে। চক্র ঘণ্টা মালা এগুলি তাহাদের উপাসনার উপচারের মধ্যে। ধূপ ধুনা ঘৃতের প্রদীপমালা আমাদের পূজাগৃহ স্মরণ করাইয়া দেয়। নানাভাব-প্রকাশক দেবীমূর্তিগুলি শক্তি-আরাধনার অপূর্ব নিদর্শন। মঞ্জুশ্রী প্রভৃতি দেবীগুলি সৌন্দর্য ও কারুকার্যের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করে। অবলোকিতেশ্বরের যেমন বহু আকৃতি, মঞ্জুশ্রীরও তাহাই। ধ্যানী বোধিসত্ত্বদের প্রকারও বিভিন্ন। তাঁহাদের ধর্মচক্রটি ( wheel of life ) একটি অর্থপূর্ণ প্রতীক। ভাব এবং কবিত্ব দুই-ই ইহার মূলে। চীন ও জাপানের বহু মন্দিরে দেবীমূর্তির বাহুল্য, তিব্বতেরই অনুকরণ হবে। ধ্যানী বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বর দয়ার অবতার, তিব্বতের এক প্রধান সন্ত ( patron-saint of wisdom )। আদি বুদ্ধকে স্বয়ম্ভু বলা হয়। বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তা তিনি। চরাচর সকলই তাঁহার প্রকাশ (manifestation); দেবতারা অধিকাংশই ধ্যানী বোধিসত্ত্বের প্রকাশ বা manifestation। ঈশ্বরবাদ বাকী রহিল কই?

উপর্যুক্ত সংক্ষিপ্ত চিত্র ( sketch ) হইতে তিব্বতের লামা-ধর্ম, তাহাদের আদি পোঁ-ধর্মের সহিত ভারতীয় মহাযান বৌদ্ধধর্ম এবং তৎসহকারী ভারতীয় তন্ত্রশাস্ত্রের যোগে এক বিস্তৃত শাখা-প্রশাখাযুক্ত ধর্মবৃক্ষের সৃষ্টি হইয়াছে। প্রত্যেক দেবদেবীর মূর্তিই ইহাদের কোন না কোনটির প্রভাব প্রদর্শন করিতেছে। সকল ধর্মশাস্ত্রের বিকাশই এইপ্রকার সংমিশ্রণের ফল মনে করি। আর্যপূর্ব সভ্যতা, যাহা হারাপ্পা ও মহেঞ্জদারোর সভ্যতা নামে খ্যাত তাহার অন্তর্গত ভূমিতেও মাটি খুঁড়িয়া ( archeology ) এমন সব দেব-দেবীর মূর্তি পাওয়া গিয়াছে যাহা পরবর্তী আর্যসভ্যতার কালে পূজা পাইয়া আসিতেছে। অন্য প্রাচীন দেশ অপেক্ষা ভারতীয় সভ্যতার একটা বৈশিষ্ট্য হইল এই যে, তাহা বর্জনের নীতি অপেক্ষা গ্রহণ ও নিজ দেহের অন্তর্ভুক্ত করাকেই ঐক্যের

ও সমন্বয়ের মন্ত্র হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিল। আধ্যাত্মিক পথে অগ্রসর হইবার ও সকল শ্রেণীর লোককে অগ্রসর করাইবার পন্থাই অধিকারভেদ স্বীকার করিয়া লওয়া। মুসলমান ও খ্রীশ্চানরা প্রতিমাপূজার নামেই শিহরিয়া উঠেন এবং যে-কোন উপায়ে তাহাকে ধ্বংস করাই তাহাদের ধর্মের অঙ্গ বলিয়া গণ্য। অথচ দেখা যায় তাহারা একটিকে বিসর্জন করিতে গিয়া আর একটিকে—প্রতীককে ঈশ্বরভাবে আরাধনা করিয়াছেন ও করিতেছেন। ব্রাহ্ম খ্রীশ্চান প্রভৃতির সংঘাতে এবিষয়ে আমাদের যে-সব সন্দেহের উদ্রেক হইয়াছিল, স্বামী বিবেকানন্দ গুরুর দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া এই প্রতিমাপূজা যে একশ্রেণীর লোকের উন্নতির পথে অপরিহার্য ধাপ—তাহা মনোবিজ্ঞানের সাহায্যে এমনভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, তাহাতে সকলেরই চোখ খুলিয়া গিয়াছে। তাঁহার বক্তৃতা রচনা এবং কবিতা ইত্যাদি সেই সোজা সরল রাজপথেরই সন্ধান দিয়া আমাদের লুপ্ত প্রতিমাপূজার মধ্যে নূতন প্রাণ সঞ্চার করিয়াছেন। গীতায় আছে "ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্মসঙ্গিনাম্।" পাশ্চাত্য দেশের দার্শনিকদের মনেও আজ এই প্রশ্ন উদিত হইয়াছে যে, বিজ্ঞান মানুষের চিত্তে পরমার্থ সম্বন্ধে যে শূন্যতা সৃষ্টি করিয়াছে তাহা সমাজকে ধ্বংসের পথে নিয়া যাইতেছে। অবিচার ব্যভিচার নির্মমতার বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার শক্তি মানুষ হারাইয়া ফেলিতেছে। এর প্রতিকার তাঁহারা খুঁজিয়া পাইতেছেন না। আমাদের দেশের স্বামীজী প্রভৃতি চিন্তানায়কগণ সমগ্রদৃষ্টিতে অর্থাৎ কার্যকারণের বাহিরে গিয়া এই বিশ্ব এবং বিশ্বস্রষ্টাকে দেখিয়া প্রকৃত সমন্বয় ও সত্যের পথ নির্দেশ করিয়াছেন। ইহাতে ঝগড়ার কোন স্থান নাই। লক্ষ্য যে এক, তাহা স্বীকৃত। যে যাহার ভাবের সাহায্যে অগ্রসর হইয়া পরম ঐক্যে পঁহুছান, ইহাই হইল এদেশে যুগাবতারের নির্দেশ। নানা পথ। বিজ্ঞান বলে, প্রত্যেক অণু পরমাণু, যা কিছু এই চরাচরের উপাদান, সব পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। আমাদের মনোরাজ্যও বহিঃপ্রকৃতিরই অনুরূপ। কাজেই সেখানেও বর্জন অপেক্ষা গ্রহণের এবং সামঞ্জস্যকরণেরই প্রয়োজন বেশি। স্বামীজীর এই সামগ্রিক দৃষ্টি যেদিন সমস্ত জগৎ গ্রহণ করিবে, কার্যতঃ সেদিন দেশে-দেশে ধর্মে-ধর্মে মানুষে-মানুষে সকল বিভেদ ঘুচিয়া গিয়া প্রকৃত ধর্মরাজ্যের সৃষ্টি হইবে। ফলে সকল মানুষের সকল চেষ্টা, শারীরিক মানসিক ও আধ্যাত্মিক সকল ক্ষেত্রে বাধাহীনভাবে প্রসারিত হইয়া কল্পনার অতীত এক উন্নত ভূমিতে মানুষকে স্থাপন করিবে, যেখানে দারিদ্র্য ও দুঃখদৈন্যের থাকিবে না অস্তিত্ব। দেবতারাই তখন পূর্ণ করিবেন মনুষ্যলোক। শুধু প্রতীক্ষা নহে, সেদিনকে আগাইয়া আনিবার চেষ্টা হইতে বড় চেষ্টা মানুষের আর কি হইতে পারে? ধরার এই মরুভূমে তখন প্রেমপদ্ম প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিবে। তখন "ইয়ং পৃথিবী সর্বেষাং ভূতানাং মধু" হইয়া উঠিবে।

স্বামী বিবেকানন্দের বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে মতবাদের সহিত ঐক্য আজ আমরা সকলেই সম্পূর্ণ অনুভব করিতেছি। পরন্তু আমি মনে করি সমস্ত ধর্ম-উপধর্মগুলি যেন এক বৃহৎ ধর্ম-পিরামিডের এক একটি স্তম্ভ বা খিলান। সেই পিরামিডের সর্বোচ্চ চূড়া হইল স্বামীজী-প্রচারিত অদ্বৈতবেদান্তধর্ম, যাহা কোন দেশে কালে বা জাতিতে আবদ্ধ নয় এবং যাহা সর্ব

সভ্যজাতির দার্শনিক-চিন্তানায়কগণ প্রত্যক্ষতঃ বা পরোক্ষতঃ গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদের নিজ নিজ প্রচলিত ধর্মকে পরিত্যাগ না করিয়াও। সেই বেদান্তমতের ভিত্তিতেই সুদূর ভবিষ্যতে গড়িয়া উঠিবে এক বিশ্বব্যাপী ঐক্য ও মানবতা। এই বিরাট ধর্মসৌধ বা পিরামিডকে বিধৃত করিয়া রাখিবে নিষ্ঠা ( faith ) এবং প্রেম ( love ), যাহার গীতি স্বামীজী গাহিয়াছেন বহু কবিতায় ভাষণে ও রচনায়। তাহাই হইল "সূত্রে মণিগণা ইব।" সে-ই বেদান্তধর্মমূলক মানবতা অর্থাৎ সর্বজীবে এক অদ্বয় আত্মা, 'জীব শিব'; সকলই একই ব্রহ্মের বিভিন্ন প্রকাশ অর্থাৎ মূলতঃ এক, এই বিশ্বাস হইতে মৈত্রী এবং জীবসেবার প্রেরণা-লাভ। স্বামীজী-প্রচারিত এই বৈদান্তিক মানবতাই মাত্র বিশ্বমানবকে দ্বন্দ্বাতীত ঐক্যভূমিতে স্থাপন করিতে পারে। "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়", যতই জোর গলায় আমরা ঐক্য ঐক্য বলিয়া চিৎকার করি না কেন। ধর্মভিত্তিশূন্য মানবতার ঐক্যধ্বনি শূন্যগর্ভ কোলাহল মাত্র। বুদ্ধদেবই জগতে প্রথম মানবতার ভাবুক ও প্রচারক। আজ তাহার মূলে দাঁড়াইবার একটা দৃঢ়ভূমি অর্থাৎ ব্যাপক অর্থে ধর্মভাব না থাকায় তাহাতে কোন ফলোদয় হইতেছে না, মারণাস্ত্রের নিত্য নূতন আবিষ্কারে ধ্বংস নিশ্চয় জানিয়াও। আমাদের দেশে ধর্মকেই সর্বপ্রথমে স্থান দেওয়া হইয়াছে। তাই সত্যদ্রষ্টা এবং ত্রিকালজ্ঞ স্বামীজী প্রচার করিলেন—প্রথমেই অধ্যাত্মবিদ্যা তারপর অন্যান্য জ্ঞানলাভ ইত্যাদি: শারীরিক মানসিক আধ্যাত্মিক ত্রিবিধ চেষ্টা সমান্তরালে না চলিলে মানবজাতির ধ্বংস অনিবার্য, ইহাই স্বামীজীর শিক্ষার মূলে। কোন কোন সমালোচক বলেন, স্বামীজী নূতন কোন পন্থা নির্দেশ করেন নাই, সবই শাস্ত্রে আছে। ইহা এক ভ্রান্ত ধারণা। সূর্য চিরকালই এক কিন্তু সূর্যকিরণের ব্যবহারের নিত্য নূতন উদ্ভাবনা হইয়া জগতে জ্ঞানের বিকাশ হইতেছে কত! সত্য চিরকালই এক, দৃষ্টিকোণের বৈচিত্র্য কত! কি সামাজিক, কি রাজনৈতিক, কি আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে স্বামীজী যাহা ভাবেন নাই, যাহা বলেন নাই এমন একটি দৃষ্টান্ত স্বামীজীর পরবর্তী সমাজ- ও দেশ-নায়কদের মধ্যে কেহ দেখাইতে পারিবেন কি? আমি বলি মানুষকে মানুষ-ভাবে কিংবা আরও উন্নত জীব-ভাবে বাঁচিতে হইলে বর্তমান কালে একমাত্র পথনির্দেশক স্বামীজীই। যত দিন যাইবে, মানুষের সমস্যা যত জটিল হইবে, জীবনসংগ্রাম যত কঠিন হইতে কঠিনতর হইবে ততই আমরা তাকাইব স্বামীজীর দিকে আলোকের জন্য সাগ্রহ দৃষ্টিতে। এই জন্যই তো এইসব পুরুষসিংহের জন্ম হয় এই মরুর দেশে, যাহা গীতার ভাষায় "দুঃখালয়মশাশ্বতম্।" স্বামীজীর নিজের ভাষায় বলিব—স্বামীজীর জন্ম ধর্মস্থাপনার্থে, যাহা তিনি গুরুর প্রতি প্রয়োগ করিয়াছেন। ইহার অর্থ—সকলকেই নিজ নিজ অভ্যস্ত ধর্মে দৃঢ় করা এবং সেই ধর্মকেই বেদান্তমতে জ্ঞানে কর্মে মোক্ষলাভে সার্থক করিয়া তোলা। হিন্দু, খৃষ্টান, মুসলমান, তথাকথিত পৌত্তলিক সকলকেই এক আসনে বসাইয়া তিনি অর্ঘ্য দান করিয়াছেন। ইহাই তাহার বেদান্ত-ধর্ম, যাহা সর্বব্যাপী আকাশের ন্যায়। তাঁহার বেদান্ত-ধর্মের ব্যাখ্যা জীবনের প্রতি স্তরকে, প্রতি কর্মকে আলোকিত করে, অর্থ দান করে মহা মনীষী বেদান্তবিদ্ ম্যাকস্-মুলারের মনের আশঙ্কা সম্পূর্ণ বিদূরিত করিয়া। ধ্যানী বুদ্ধ যেমন আছেন, অভয়-

মুদ্রার বুদ্ধও পাশেই আছেন। স্বামীজীর মধ্যে যে বিপুল ঐশ্বর্য বিকশিত হইয়াছিল তাহাকে তিনি গোপনে রাখিয়াছিলেন এই জন্য যে, তিনি যেমন মানুষ, সকলেই ইচ্ছা করিলে সেরূপ হইতে পারে পুরুষকারের দ্বারা। ইহাই দেবত্ব ও মনুষ্যত্বের মিলনাত্মক তাঁহার 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত' বাণীর অর্থ। স্বামীজী তাই বুদ্ধদেবের সেই শেষ বাণী সকলকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। কেহ কেহ স্বামীজীর সেই অলৌকিক শক্তির পরিচয় পাইয়াছিলেন আকস্মিকভাবে। কিন্তু নিজ কুসংস্কারপূর্ণ দেশে তিনি ইচ্ছা করিয়াই তাহার পরিচয় দেন নাই শেষে তাহারা আরও কুসংস্কারাচ্ছন্ন না হইয়া পড়ে। স্বামীজী চাহিয়াছিলেন সকলেই তাঁহার নিজের মতো এমনকি তাঁহা হইতেও বড় হউক। এ অভিমানশূন্যতার আর একটি দৃষ্টান্ত আধুনিক যুগে মিলে কি? এক মহান সোঽহং ভাবের মূর্ত প্রতীক।

স্বামীজীর বাণী ও প্রচার হইতেও বড জিনিস হইল স্বামীজীর জীবন। অনেক সংস্কারক এবং নেতাদেরই হইল তাহার বিপরীত অর্থাৎ তাঁহাদের জীবনধারা তাঁহাদের বক্তৃতা ও প্রচারের বিপরীত। এ সম্বন্ধে একটা উল্লেখযোগ্য উক্তি পাই জার্মানীর দার্শনিক ঐতিহাসিক Oswald Spengler-এর 'Decline of The West' গ্রন্থে—It is personality that counts. It was not the Christian Gospel but the Christian martyr that conquered the world. অর্থাৎ বাইবেলের বাণী নয়, কিন্তু যিশুর আত্মত্যাগ যাহা পৃথিবীকে জয় করিয়াছে। গীতায় অর্জুনের সব সন্দেহের, সব প্রশ্নের মীমাংসাই পাই স্বামীজীর জীবনে। আজকার এই বিশ্বব্যাপী সংগ্রামক্ষেত্রে, এই মহাকুরুক্ষেত্রে ধ্বনিত হউক স্বামীজীর পাঞ্চজন্যশঙ্খ, ধ্বনিত হউক বিশ্ব জুড়িয়া শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী। ইহাই প্রত্যেক অভিমানশূন্য মানবহিতৈষীর কাম্য। ইহাই হউক দেবভূমি ভারতের মর্মবাণী। যদি আমরা নিজেরা সকল দুর্বলতা ও ভীরুতার উর্ধ্বে না উঠিতে পারি, নিজেরা "অন্তর্নিহিত দেবত্বের বিকাশ সাধন" না কবিতে পারি, তাহা হইলে কিন্তু আমাদের কথা কেহ শুনিবে না।

# দাক্ষিণাত্যে তীর্থভ্রমণ

স্বামী দীপ্ত্যানন্দ

তিরুমালাই তথা শেষাচল পর্বতমালাস্থিত ভগবান শ্রীভেঙ্কটেশ্বরের দর্শন লাভ করে, তাঁর প্রসাদ পেয়ে এবং পর্বতোপরি আকাশগঙ্গা, পাপবিনাশনম্ প্রভৃতি দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দর্শন করে শ্রীবিষ্ণুনাম স্মরণ করতে করতে দেবস্থানম্ কর্তৃপক্ষ-পরিচালিত বাসে আঁকা-বাঁকা বার মাইল পার্বত্য রাস্তা অতিক্রম করে পর্বতপাদদেশে অবস্থিত তিরুপতি শহরে পৌছান গেল। তথায় বিখ্যাত শ্রীগোবিন্দরাজা স্বামী মন্দির, শ্রীকোতন্দরামা স্বামী মন্দির, শ্রীকপিলতীর্থম্-কপিলেশ্বর স্বামী মন্দির প্রভৃতি দর্শন করে তিরুপতি শহর হ'তে দুই মাইল দূরে অবস্থিত তিরুচানূর নামক স্থানে শ্রীপদ্মাবতী আম্মাবরী মন্দির দর্শন করলাম।

সেখান থেকে ফিরে আসতে দ্বিপ্রহর অতিক্রান্ত করে গেল। তিরুপতি শহরে একটি হোটেলে মধ্যাহ্ন-আহারাদি সমাপন করে দেবস্থানম্-কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিচালিত একটি পান্থশালায় বিশ্রাম করলাম। পান্থশালাগুলি বাস স্টেশনের সংলগ্ন। পান্থশালায় এক একটি প্রশস্ত কক্ষ; বিনা ভাড়ায় যাত্রীদের প্রয়োজনানুসারে থাকতে দেওয়া হয়। বার ঘণ্টার মধ্যে পান্থশালার আশ্রয় ছেড়ে যেতে হবে। ওখানে স্নানাদির ব্যবস্থাও আছে। এই বিশ্রামস্থানগুলি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। দেখাশুনা করার জন্য দেবস্থানম্ কর্তৃপক্ষ অনেক লোক নিযুক্ত করেছেন। অপরাহ্ণ চারটা অবধি আরামে বিশ্রাম করে আবার বাসযাত্রার জন্য প্রস্তুত হলাম। এবার সরকারী বাস নয়, কিংবা দেবস্থানমের বাসও নয়, পাবলিক বাস সার্ভিসের প্রাইভেট বাস। গন্তব্য স্থল কালাহস্তী। স্থানটি তিরুপতি শহর হতে প্রায় পঁচিশ মাইল দূরে। সাউথ রেলওয়ের রেণুগুণ্টা স্টেশন হতে পনের মাইল। অপরাহ্ণ চারটায় যাত্রা করে দেড় ঘণ্টায় কালাহস্তী পৌঁছলাম। স্থানটি একটি অনুচ্চ পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত ছোট শহরতলী। তথায় শ্রীকালাহস্তীশ্বর শিবমন্দির বর্তমান। মন্দিরটি বেশ বড, অতি প্রাচীন ও প্রস্তরের উচ্চ প্রাচীর-পরিবেষ্টিত। মন্দিরসংলগ্ন দুইটি অতিথিশালা। একটি অন্ধ্র সরকার-কর্তৃক পরিচালিত, অন্যটি তিরুপতি তিরুমালাই দেবস্থানম্ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক। সরকারী পান্থশালাটি নূতন। ১৯৬৮ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুআরি মাসে এটির উদ্বোধন হয়। রাজামান্দ্রীর একজন পুলিশ অফিসার আমার সঙ্গে থাকায় ঐ অতিথিশালায় আমরা আশ্রয় পেলাম। আমাদের কক্ষটি প্রশস্ত—আসবাবে সজ্জিত। দুটি চৌকি। স্নানাগার ও শৌচাগারের ব্যবস্থা ভাল। একটু বিশ্রামের পর হাত-পা ধুয়ে আমরা মন্দিরদর্শনে যাত্রা করলাম। তখন সন্ধ্যা আগতপ্রায়। অন্ধ্ররাজ্যের সব মন্দিরে প্রবেশ করতে হ'লে টিকিট করে যেতে হয়। এখানেও সেই এক ব্যবস্থা। পুলিশ অফিসারটি আমাদের সকলের জন্যই টিকিট করলেন। প্রতি টিকিট চার আনা করে। পূজাদি দিতে গেলে আরও দক্ষিণা দিয়ে টিকিট করতে হয়। কোন্ পূজাতে কত দর্শনী দিতে হবে বাহিরে তার একটা লিস্ট বোর্ডে লাগানো থাকে।

প্রবাদ আছে, দক্ষিণ দেশে যে প্রধান প্রধান শিবমন্দিরগুলি আছে, সেগুলির শিব হলেন এক একটি মহত্তত্ত্বের প্রতীক। কাঞ্চীপুরের একাম্রেশ্বর শিব পৃথ্বী মহত্তত্ত্ব। অপ্ হলেন জম্বুকেশ্বর শিব—ত্রিচিনপল্লীতে। তিরুভান্নামালাইতে অরুণাচলম্ শিব হলেন তেজ। কালাহস্তীতে এই শ্রীকালাহস্তীশ্বর শিবলিঙ্গ হলেন মরুৎ। আকাশ হলেন চিদাম্বরমস্থিত শ্রীনটরাজ। এই কালাহস্তীশ্বর শিবমন্দিরটি স্বর্ণমুখী নদীর তীরে অবস্থিত। নদীটি অল্প প্রশস্ত। নদীতীরে কুঠিয়াতে কিছুসংখ্যক সাধু বাস করেন। এই শিব-লিঙ্গকে শ্রীকালাহস্তী বলা হয়। প্রবাদ আছে, 'শ্রী' অর্থাৎ মাকড়সা, 'কালা' অর্থাৎ সর্প এবং হস্তী অর্থাৎ হাতি, এই তিনটি প্রাণীই প্রথমতঃ এই স্থানে ভগবান শঙ্করকে আরাধনা দ্বারা সন্তুষ্ট করে। এই শিবলিঙ্গে ইহাদের তিনটিরই চিহ্ন এখনও বর্তমান।

তখন সন্ধ্যা হয়েছে, প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে ভগবানের সান্ধ্য আরাত্রিক হ'ল। আরাত্রিকের সাথে সাথে 'নাদস্বরম্' ও অন্যান্য বাদ্য-যন্ত্রাদি সুললিতছন্দে বাজছিল। একটু দূর

থেকেই আরাত্রিক দর্শন করলাম, আরাত্রিক-দর্শনার্থী যাত্রীর সংখ্যা ছিল অনেক। তারপর ক্রমশঃ সারিবদ্ধভাবে অগ্রসর হয়ে গর্ভমন্দিরের দ্বারে উপনীত হলাম। চার-পাঁচ ফুট উঁচু কাল পাথরের শিবলিঙ্গ দর্শন করে অন্তরের শ্রদ্ধা ভক্তি নিবেদন করলাম। রাজমান্দ্রীর পুলিশ অফিসারটি ফুল, ফলমূলাদি, নারিকেল ও কর্পূর দিয়ে ভগবানের পূজা দিলেন। ঐ কর্পূর দিয়ে সামান্য আরাত্রিক হ'ল। আরাত্রিকের পর প্রজ্বালিত ও নিবেদিত অগ্নি স্পর্শ করে একটু স্নানজল পান করলাম। তারপর গর্ভমন্দির হতে বেরিয়ে এসে মন্দির-অভ্যন্তরস্থ *'প্রকরম্'গুলি অর্থাৎ প্রদক্ষিণপথগুলি দেখতে* আরম্ভ করলাম। মন্দিরে তিনটি প্রদক্ষিণ-পথ। প্রথমটি ঠিক গর্ভমন্দিরের চতুর্দিকে। দ্বিতীয় প্রদক্ষিণপথটি একটু বাইরের দিকে। এই পথের একপাশে বিভিন্ন প্রকারের ও আকারের বহু শিবলিঙ্গ এবং আলোয়ারদের মূর্তি। ছাদ হতে আরম্ভ করে চতুর্দিকের সমগ্র করিডর প্রস্তরের সূক্ষ্মকারুকার্যপূর্ণ বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তি দ্বারা সুসজ্জিত। একপ্রান্তে দাঁড়িয়ে অপরপ্রান্ত পর্যন্ত দৃষ্টিপাত করলে চারদিকের করিডরগুলি খুবই সুন্দর দেখায়। তখন ডিসেম্বর মাস। উৎসবের সময়। মন্দিরের অভ্যন্তর বিভিন্ন রং-এর আলোকমালায় সুসজ্জিত এবং খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। মন্দিরের চারদিকে চারটি দ্বার এবং দ্বারগুলির উপর এক একটি উচ্চ গোপুরম্। ঘণ্টা খানেক ঘুরে ঘুরে মন্দির দর্শন করে বাইরে এলাম। মন্দিরের অতি নিকটে একটি "মণ্ডপম্" অর্থাৎ ছোট নাট-মন্দির-সদৃশ কক্ষ আছে। তার নাম "মণিকন্যাঘাটম্"। এখানে মণিকন্যা নাম্নী একটি ভক্তিমতী মহিলা বাস করত। কথিত আছে, এই মহিলার মৃত্যুসময়ে ভগবান শঙ্কর তার কর্ণে "তারকব্রহ্মমন্ত্র" উচ্চারণ করেছিলেন। এই বিশ্বাসের বলে আজও অনেক লোক এখানে এসে থাকেন এই আশায় যে, ভগবান শঙ্কর মৃত্যুকালে তাঁদের কর্ণেও "তারকব্রহ্মমন্ত্র" উচ্চারণ করবেন এবং তাঁদের মুক্তি হয়ে যাবে। ঠিক কাশীবাসের মতো। এই কালাহস্তী স্থান সম্বন্ধে আরও একটি প্রবাদ আছে যে, ইহার নিকটবর্তী পাহাড়ে একদা অর্জুন বহু কৃচ্ছ্র-সাধন করে ভগবান শঙ্করকে সন্তুষ্ট করেন এবং তাঁর নিকট হতে পাশুপত অস্ত্র লাভ করেন। *অর্জুন এই স্থানে একটি শিবলিঙ্গ স্থাপন করেন।* পরবর্তী কালে কান্নাপ্পার নামক একটি ভক্ত এই শিবলিঙ্গকে খুব আন্তরিকতা নিয়ে পূজা করত। কান্নাপ্পার তামিলদেশীয় ও জাতিতে ব্যাধ ছিল। জন্তু-জানোয়ার শিকার করে তারই মাংস এই ব্যাধ ভক্তটি ভগবান শঙ্করকে প্রতিদিন অতি শ্রদ্ধার সহিত নিবেদন করত। কথিত আছে একদা ভগবান শঙ্কর কান্নাপ্পার এই ভক্তির গভীরতা পরীক্ষা করতে উদ্যত হন। একদিন কান্নাপ্পার দেখল যে, ভগবান শঙ্করের একটি চক্ষু দিয়ে রক্ত নির্গত হচ্ছে। বহু চেষ্টা করা সত্ত্বেও সে এই রক্ত বন্ধ করতে পারল না। ব্যর্থ হয়ে এবং অনন্যোপায় হয়ে ভক্তির আতিশয্যে ভক্ত কান্নাপ্পার তার একটি চক্ষু উৎপাটন করে ভগবান শঙ্করের রোগগ্রস্ত সেই চক্ষে লাগিয়ে দিল। কিন্তু সে চক্ষুটি ভাল হলেও ভগবানের আর একটি চক্ষু হতে অনুরূপভাবে রক্ত নির্গত হতে আরম্ভ করল। ভক্ত কান্নাপ্পার একটুও ইতস্ততঃ না করে তার অন্য চক্ষুটি উৎপাটন করে ভগবান শঙ্করের চক্ষে স্থাপন করল। এভাবে দুটি চক্ষু দান করে অন্ধ হয়েও কান্নাপ্পার ভগবানের সেবা

করে। ভগবান শঙ্কর সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে দর্শন দান করেন, চক্ষু ফিরিয়ে দেন এবং আশীর্বাদ করেন। মহাশিবরাত্রিতে এই কালাহস্তীশ্বর মন্দিরে দশদিনব্যাপী উৎসবাদি হয়। তখন বহু দূরদেশ হতেও অনেক যাত্রীর সমাগম হয়ে থাকে। মকর সংক্রান্তির তিন দিন পরে এখানে আরও একটি উৎসব হয়ে থাকে। তখন ভগবান শ্রীকালাহস্তীশ্বরের উৎসব-মূর্তি নিয়ে একটি বড় শোভাযাত্রা বাহির হয়। শোভাযাত্রাটি কালাহস্তী শহর ও তৎসংলগ্ন পাহাড় পরিক্রমা করে।

এইভাবে শ্রীকালাহস্তীশ্বর শিবমন্দির দর্শন শেষ করে আমরা পান্থনিবাসে ফিরে গেলাম। রাত্রি তখন আটটা। সকলেই তখন পরিশ্রান্ত ও ক্ষুধার্ত। মন্দির হতে বাহিরে এসে কিছু প্রসাদ কিনে খাওয়া গেল। তারপর অতিথি-নিবাসে গিয়ে আমরা বিশ্রাম করতে লাগলাম। আমার সঙ্গীটি তখন নিকটবর্তী বাজারে কোন এক হোটেলে খেতে গেলেন এবং সঙ্গে একটি বড় টিফিন-কেরিয়ার নিয়ে গেলেন। যাওয়ার পর তিনি ঐ টিফিন-কেরিয়ার ভরতি করে আমাদের জন্য অনেক ভাত, তরকারী, দধি ইত্যাদি কিনে নিয়ে এলেন। পরদিন খুব ভোরে উঠে "সুপ্রভাতম্" দেখতে আবার মন্দিরে গেলাম। নাদস্বরম্ ও অন্যান্য বাদ্য-যন্ত্রের ঐকতান-ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে মঙ্গলারতি দর্শন করলাম। আরাত্রিকের প্রজ্বলিত অগ্নি স্পর্শ করে শেষবারের মত ভগবান শ্রীকালা-হস্তীশ্বরকে অন্তরের ভক্তি শ্রদ্ধা নিবেদন করে সেখান থেকে বিদায় নিলাম। তারপর কাল-বিলম্ব না করে স্থানীয় বাসস্টেশনে এসে কাঞ্চী-পুরগামী বাসে এসে উঠলাম। সেখান থেকে কাঞ্চীপুর পঞ্চাশ মাইল। নবোদিত সূর্যালোকে শ্রীকালাহস্তীশ্বর মন্দিরের উচ্চ গোপুরমগুলি দেখতে দেখতে শহরসীমা অতিক্রম করলাম। অল্পক্ষণের মধ্যেই গোপুরম্গুলি অদৃশ্য হয়ে গেল। বাস তখন নির্জন নিস্তব্ধ উন্মুক্ত প্রান্তরের মধ্য দিয়ে পূর্ণবেগে ছুটে চলেছে।

মধ্যে মধ্যে ভক্ত কান্নাপ্পার শ্রদ্ধা-ভক্তির কথা, ভগবানের সেবার জন্য স্বীয় চক্ষুদান, তাঁর অন্ধ হওয়া, ভগবান শঙ্করের আবির্ভাব ও আশীর্বাদপ্রদান প্রভৃতি কাহিনী স্মৃতিতে ভেসে উঠতে লাগল। ভগবান শ্রীশঙ্করাচার্য তদীয় 'শিবানন্দলহরীতে' ভক্তিবিষয়ক যে স্তবটি লিখেছেন তা মনে পড়ল :

'ভক্তিঃ কিং ন করোত্যহো বনচরো
ভক্তাবতংসায়তে ॥'

অর্থাৎ প্রকৃত ভক্তির দ্বারা কি না করা যায়? বনচারীও উৎকৃষ্ট ভক্তরূপে পরিণত হয়।

তিন ঘণ্টায় পঞ্চাশ মাইল অতিক্রম করে বেলা নয়টায় কাঞ্চীপুরম্ পৌঁছলাম। এই স্থানে আমাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটল। সঙ্গী অফিসারটি একটি ধর্মশালায় আশ্রয় নিলেন। আমি স্থানীয় শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে চলে গেলাম। ভদ্রলোক সারাদিন মন্দিরাদি দর্শন করে অপরাহ্নে পুনরায় কালাহস্তী যাবেন। আমি আশ্রমে গিয়ে স্নানাদি করে বিশ্রাম করতে লাগলাম। আশ্রমটি শহরের মধ্যস্থলে অবস্থিত, চতুর্দিকে দোকানপাট, আশ্রমের সীমানা ঘেঁসে বসতবাটী। নিবাসগৃহগুলি অতি পুরাতন ধরনের। তিনজন সাধু থাকেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবাপূজা, ভোগরাগাদি নিত্য হয়ে থাকে। একটি লাইব্রেরী, কয়েক সহস্র পুস্তক, বিভিন্ন প্রকার মাসিক পত্রিকা ও দুই-তিন খানি দৈনিক পত্রিকা আছে।

কাঞ্চী অথবা কাঞ্চীভেরাম্ মাদ্রাজ শহর হ'তে পয়তাল্লিশ মাইল দূরে চিংগুলপুট জিলায়

অবস্থিত। দক্ষিণ ভারতের অতি প্রাচীন স্থানগুলির মধ্যে ইহা অন্যতম। পূর্বে এই শহর পল্লব রাজাদের রাজধানী ছিল। উত্তর ভারতে কাশীর মত দক্ষিণ ভারতে কাঞ্চী অতি পবিত্র স্থান এবং বহুমন্দিরাদি-পরিপূর্ণ। "গয়া গঙ্গা প্রভাসাদি কাশী কাঞ্চী কেবা চায়" —সঙ্গীতেও এর মাহাত্ম্য প্রকট। ভারতের মধ্যে সাতটি স্থান বিশেষ পবিত্র বলে পরিগণিত হয়ে থাকে—অযোধ্যা, মথুরা, হরিদ্বার, কাশী, কাঞ্চী, উজ্জয়িনী ও দ্বারকা। এগুলির মধ্যে তিনটি শিবের, আর তিনটি বিষ্ণুর স্থান। কিন্তু সপ্তম স্থান এই কাঞ্চী—শিব ও বিষ্ণু উভয়েরই স্থান। শহরটি ছোট, দুই ভাগে বিভক্ত। একটি ভাগের নাম হল শিবকাঞ্চী অথবা বড কাঞ্চী। আর একটি ভাগ হল বিষ্ণুকাঞ্চী অথবা ছোট কাঞ্চী। পল্লব রাজাদের রাজধানী এই কাঞ্চীপুরম্ একদা শিক্ষার একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল এবং শৈব, বৈষ্ণব, জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের বহু মন্দিরে পূর্ণ ছিল। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ-মতে কাশী ও কাঞ্চী শিবের দুটি চক্ষুস্বরূপ। যদিও এই স্থান প্রধানতঃ বৈষ্ণবদের তীর্থ, শৈবদেরও এখানে সমান অধিকার আছে। বিখ্যাত বৌদ্ধ পর্যটক হুয়েন সাং তাঁর বিবরণীতে উল্লেখ করেছেন যে, ছয় মাইল পরিধিবিশিষ্ট এই শহরে বুদ্ধদেব ধর্ম প্রচার করতে এসেছিলেন, রাজা অশোক এখানে অনেকগুলি স্তূপ নির্মাণ করেছিলেন। বিবরণীতে ইহাও উল্লিখিত হয়েছে যে, এই কাঞ্চী শহর বিখ্যাত বৌদ্ধধর্ম-প্রচারক ধর্মপাল বোধিসত্ত্বের জন্মস্থান ছিল। পর্যটনকারী হুয়েন সাং আরও লিপিবদ্ধ করেছেন যে, সপ্তম শতাব্দীতে তিনি যখন পল্লব রাজাদের চৌণ্ডাইমণ্ডলম্ নামক শহর পরিভ্রমণ করেন তখন কাঞ্চীতে কয়েকশত সংঘারাম ও প্রায় দশসহস্র বৌদ্ধ পুরোহিত বাস করতেন। কিন্তু কালক্রমে দাক্ষিণাত্যে শৈব ও বৈষ্ণবদের প্রাধান্য-বৃদ্ধির ফলে বৌদ্ধ প্রাধান্য বিলুপ্ত হয়। ষষ্ঠ শতাব্দী হতে আরম্ভ করে বহু কাল শৈব ও বৈষ্ণব আলওয়ারগণ দাক্ষিণাত্যে খুব প্রাধান্য বিস্তার করেছিলেন। তাঁরা শিব ও বিষ্ণু সম্বন্ধে ধর্মভাবের উদ্দীপনা-মূলক বহু ভজনগান রচনা করেন এবং সর্বত্র মধুর কণ্ঠে এইসব ভগবদ্বিষয়ক ও ভক্তিমূলক গান গেয়ে গেয়ে বেড়াতেন। ভক্তিগদ্‌গদ কণ্ঠে গীত আলওয়ারদের গান জনসাধারণের মধ্যে এক অতুলনীয় প্রভাব বিস্তার করে এবং সমগ্র দক্ষিণদেশকে হিন্দুধর্মের ভাবধারায় প্লাবিত করে। এইভাবে ক্রমশঃ বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের প্রভাব সেইসব অঞ্চল হতে প্রায় বিলুপ্ত হয়। আজও কোন কোন মন্দিরে আলওয়ারদের রচিত ভক্তিমূলক গানগুলি সমবেতভাবে গীত হয়ে থাকে। শৈব আলওয়ার সম্বন্দর, আপ্পার, সুন্দরার, মাণিক্কা-ভাচাকার, তিরুমালার প্রভৃতির রচিত ভক্তিমূলক গানসমূহ তৎকালীন কোন নৃপতি একত্র সংগ্রহ করে এগারখানি গ্রন্থে তাহা প্রকাশিত করেন। বৈষ্ণব আলওয়ারদের রচিত ভক্তিমূলক গানগুলিও একত্র পুস্তকা-কারে প্রকাশিত হয়।

রাজা প্রথম মহেন্দ্র বর্মন পল্লববংশীয় নৃপতিদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধিশালী ও প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি ৬০০ খৃষ্টাব্দ হতে ৬৩০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। কথিত আছে তিনি প্রথমে জৈনধর্ম অবলম্বন করেন। তারপর শৈব আলোয়ার শ্রীআপ্পার-এর পাণ্ডিত্য ও ব্যক্তিত্বের প্রভাবে তিনি অনতি-বিলম্বে শৈব ধর্মে পুনরায় দীক্ষিত হন এবং এত উৎসাহী হন যে, এই শৈব ধর্মের উন্নতির

জন্য তিনি পুরাতন জৈন মন্দিরগুলি ভেঙ্গে তার জায়গায় বহু শিবমন্দির ও বিষ্ণুমন্দির নির্মাণ করেন। এই রাজা প্রথম মহেন্দ্র বর্মনের পুত্র প্রথম নরসিংহ বর্মন তাঁর রাজত্ব-কালে ( ৬৯৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ৭২২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ) কাঞ্চীতে কৈলাসনাথ নামক বিখ্যাত মন্দির নির্মাণ করেন। মাদ্রাজের নিকটবর্তী মহা-বলীপুরমেও তিনি সমুদ্র-উপকূলবর্তী বিষ্ণু-মন্দিরটি নির্মাণ করেন।

কালাহস্তী হতে পরিশ্রান্ত হয়ে এসে একদিন রামকৃষ্ণ আশ্রমে বিশ্রাম লাভ করার পর কাঞ্চীতে মন্দিরাদি দর্শন করতে বের হলাম। প্রথমেই গেলাম বিখ্যাত ও অতি প্রাচীন একাম্রনাথ মন্দিরে। সপ্তম শতাব্দীর প্রসিদ্ধ আলওয়ার 'জ্ঞানসম্বন্ধ'-রচিত ভক্তি-মূলক স্তব ও গান প্রভৃতিতে এই একাম্রনাথ সম্বন্ধে বিশেষ উল্লেখ আছে। দক্ষিণ ভারতের পাঁচটি প্রসিদ্ধ শিবলিঙ্গ পাঁচটি মহত্তত্ত্বের প্রতীক। পূর্বে এই পাঁচটি শিবলিঙ্গ সম্বন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে। এই একাম্রনাথ হ'ল পৃথ্বী মহত্তত্ত্ব। এই মন্দির সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কাহিনীটি কথিত আছে। একদা শিব ও গৌরীর মধ্যে এক ঘোরতর মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয়। মনোমালিন্য-জনিত উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে গৌরী শিবকে একটু অবহেলা দেখান। প্রতিবাদে শিব গৌরীকে অভিশাপ দিলেন যে, গৌরীর মুখমণ্ডল সৌন্দর্যহীন হয়ে কুশ্রী আকার ধারণ করবে। যতদিন পর্যন্ত না গৌরী কাঞ্চীতে একটি মাত্র আম্রবৃক্ষের নিম্নে কঠোর তপস্যা করে বিষ্ণুর অনুগ্রহে শিবকে সন্তুষ্ট না করতে পারেন ততদিন পর্যন্ত গৌরীর এই কুশ্রী মুখমণ্ডল পূর্ব সৌন্দর্য ফিরিয়ে পাবে না। তদনুযায়ী গৌরী কাঞ্চীতে একটি আম্র বৃক্ষের নীচে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করে কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনা দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ করেন এবং শীঘ্রই বিষ্ণুর অনুগ্রহ লাভ করেন। অনতি-বিলম্বে গৌরীর মুখমণ্ডলের পূর্ব রূপ ফিরে আসে। গৌরীর শ্রদ্ধাভক্তির গভীরতা পরীক্ষা করার জন্য শিব একদিন তাঁর জটা হতে প্রবল বেগে গঙ্গাকে প্রবাহিত করেন। যে স্থানে গৌরী শিবের আরাধনা করছিলেন সেই স্থান দিয়ে গঙ্গা প্রবল বেগে প্রবাহিত হতে লাগল। হঠাৎ তীব্রগতিবেগসম্পন্ন এই গঙ্গাপ্রবাহ দেখে গৌরী ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে আত্মরক্ষার্থ শিবলিঙ্গকে সজোরে জড়িয়ে ধরেন। ভগবান শিব সন্তুষ্ট হলেন। শিব ও গৌরীর পুনর্মিলন হ'ল। গৌরীর বিশেষ প্রার্থনায় শিব ঐ আম্রবৃক্ষের নিম্নে বিরাজ করতে রাজী হলেন। সেই অবধি শিব এখানে বর্তমান আছেন এবং একাম্রনাথ, একাম্রেশ্বর, একাম্বরনাথ বা একম্বান বলে কথিত হয়ে থাকেন।

স্থানীয় রামকৃষ্ণ আশ্রমের অধ্যক্ষকর্তৃক নিয়োজিত গাইডের সমভিব্যাহারে প্রথমে একাম্রনাথ শিবমন্দিরে উপনীত হলাম। গাইড হ'ল স্থানীয় একটি কলেজ ষ্টুডেন্ট,—নাম শ্রীরামানুজম্, আশ্রমের অতি নিকটেই বাড়ী, প্রত্যহ এখানে যাতায়াত করে। মন্দিরের প্রথম প্রবেশদ্বারেই বৃহৎ গোপুরম্। তারপর দ্বিতীয়, তৃতীয় দ্বার অতিক্রম করে গর্ভমন্দিরের সম্মুখে এসে উপনীত হলাম। ওখান হতেই ভগবানকে দর্শন করতে হয়। কিছু ফুল, ফল ও কর্পূর দিয়ে পূজা দেওয়া হ'ল। কর্পূর দিয়ে ভগবানের আরাত্রিক হ'ল। তারপর প্রজ্বালিত আরাত্রিক-অগ্নি স্পর্শ করে কিছু প্রসাদ নিয়ে মন্দির হতে বিদায় নিলাম। সমগ্র মন্দিরের সীমানাটি উচ্চ প্রস্তরের প্রাচীর দিয়ে পরিবেষ্টিত। মন্দিরের অভ্যন্তরে একটি পুষ্করিণী ও তন্মধ্যে একটি মণ্ডপম্ অর্থাৎ ছোট

একটি মণ্ডপ। মন্দিরের অভ্যন্তরে গর্ভমন্দিরের পিছনেই একটি আম্রবৃক্ষ আজও দেখতে পাওয়া যায়। একাম্রেশ্বর শিবমন্দিরের নিকটে কামাক্ষীদেবীর মন্দির। এই স্থানেই নাকি গৌরী তপস্যা করেছিলেন। দেবীর নাম কামাক্ষী। অষ্টম শতাব্দীর শ্রীআদিশঙ্করাচার্য এই কামকোটী-অম্বিকার একজন অত্যুৎসাহী পূজক ছিলেন। কথিত আছে, এই দেবী কামাক্ষী উগ্র কালীমূর্তিরূপ ধারণ করে মন্দির হতে বাইরে আসতেন। দেবীর ক্রোধাগ্নির কবলে পড়ে দেশবাসী নানাবিধ দৈব-দুর্ঘটনাদিতে পতিত হতে লাগল। শঙ্করাচার্য আরাধনা করে দেবীকে সন্তুষ্ট করেন। ভিতরে শঙ্করাচার্যের একটি মূর্তিও প্রতিষ্ঠিত আছে। উৎসবাদিব সময় দেবীর উৎসব-মূর্তি নিয়ে মন্দিরের বাইরে শোভাযাত্রা নগর প্রদক্ষিণ করে। এক সম্প্রদায়ের লোকের মতে শ্রীশঙ্করাচার্য এই কাঞ্চীতেই দেহত্যাগ করেন। অন্য সম্প্রদায়ের মতে তিনি হিমালয়স্থিত কেদারনাথে দেহত্যাগ করেন। একাম্রেশ্বর শিবের দর্শন ও পূজার পর আমরা দেবী কামাক্ষীর মন্দিরে উপনীত হলাম। এখানেও কিছু ফুল, ফল ও কর্পূর দ্বারা দেবীর পূজা দিলাম। তারপর মন্দির প্রদক্ষিণ করে, দেবীকে অন্তরের ভক্তিশ্রদ্ধা নিবেদন করে সেখান থেকে চলে এলাম এবং কাঞ্চীর আর একটি অতি প্রাচীন মন্দির শ্রীকৈলাসনাথ অথবা শ্রীরাজ-সিংহেশ্বর দর্শন করে বিষ্ণুকাঞ্চী অভিমুখে যাত্রা করলাম।

শিবকাঞ্চী হতে দুই মাইল দূরে বিষ্ণুকাঞ্চী অথবা ছোটকাঞ্চী অবস্থিত। এখানে বহু পুরাতন মন্দিরাদি বর্তমান। তন্মধ্যে শ্রীবরদা-রাজা স্বামী বিষ্ণুমন্দিরটি খুব বিখ্যাত। মন্দিরটি অনুচ্চ একটি পাহাড়ের উপর অবস্থিত। মন্দিরগাত্রে নানাবিধ প্রাচীন কাহিনী ও বিবরণী খোদিত আছে। মন্দিরের যাবতীয় খরচপত্রাদি, রক্ষণাবেক্ষণ প্রভৃতি পূর্বকালে বিজয়নগরের বৈষ্ণব রাজারাই বহন করতেন। তজ্জন্য রাজারা বহু সম্পদশালী গ্রাম, ধনরত্নাদি ও নানাবিধ মূল্যবান দ্রব্যসামগ্রী দান করেন। কথিত আছে, লর্ড ক্লাইভ্ মন্দিরস্থ দেবতাকে তৎকালীন আট হাজার ছয় শত টাকা মূল্যের একটি স্বর্ণহার প্রদান করেছিলেন। সঙ্গীকে নিয়ে আমি এই মন্দিরে প্রবেশ করলাম। এই মন্দিরটিও অন্যান্য মন্দিরের ন্যায় উচ্চ প্রস্তর-নির্মিত প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত। মন্দিরের সীমানা অতি প্রশস্ত। প্রথম দ্বার হতে অনেক ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন দ্বার অতিক্রম করে অবশেষে মূল গর্ভমন্দিরে উপনীত হলাম। শঙ্খচক্র-গদাপদ্মধারী চতুর্ভুজ কৃষ্ণপ্রস্তরের বিষ্ণু-মূর্তিটি নানা বেশভূষায় সজ্জিত। মুখমণ্ডল জ্যোতির্ময়। এখানেও পূর্ব পূর্ব মন্দিরের মত পূজাদি দিয়ে অন্তরের শ্রদ্ধা ভক্তি নিবেদন করে বিদায় নিলাম। এখানে আর একটি বিখ্যাত ও অতি প্রাচীন মন্দির আছে—নাম শ্রীবৈকুণ্ঠ পেরুমল মন্দির। এই মন্দিরের বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহার গাত্রে সূক্ষ্ম-কারুকার্যপূর্ণ বিভিন্ন প্রকার ও বিভিন্ন অবস্থার শ্রীবিষ্ণুর মূর্তি খোদিত আছে।

শিবকাঞ্চীতে শঙ্কর-সম্প্রদায় 'কামকোটী পীঠম্' নামে একটি পীঠ স্থাপন করে। প্রথমতঃ ইহা বিষ্ণুকাঞ্চীতে ছিল। পরবর্তী কালে রামানুজাচার্য-সম্প্রদায়ের প্রতিপত্তিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শঙ্করসম্প্রদায় ঐ পীঠকে শিবকাঞ্চীতে উঠিয়ে নেয়। এখনও শিবকাঞ্চীতে ঐ 'কামকোটী পীঠম্' বর্তমান। যিনি এর প্রধান তাঁকে কামকোটী পীঠের শঙ্করাচার্য বলা হয়। বর্তমানে যিনি শঙ্করাচার্য তিনি ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে

গদীতে বসেন। তাঁর পিতামাতা কর্ণাটকের উচ্চ ব্রাহ্মণবংশীয় এবং খুব ভক্তিমান। তিনি নিজে অগাধ পণ্ডিত এবং বহুভাষাবিদ্। তিনি নিত্য পূজাপাঠাদি নিয়ে খুব কঠোর জীবন যাপন করে থাকেন। তিনি ভারতের বহু স্থান পরিদর্শন করেছেন।

শিবকাঞ্চী ও বিষ্ণুকাঞ্চীতে প্রধান প্রধান মন্দিরগুলি দর্শন করে স্থানীয় শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে কয়েক দিন বিশ্রাম নিলাম। তারপর পুনরায় যাত্রার স্থান-কাল-নির্বাচনের জন্য কাঞ্চী ত্যাগ করে মাদ্রাজ অভিমুখে যাত্রা করলাম। পূর্ব উপকূলবর্তী দ্রষ্টব্য স্থানগুলি প্রথমতঃ নির্বাচিত হ'ল। মাদ্রাজ হতে চিদাম্বরমে বিখ্যাত ও অতি প্রাচীন শ্রীনটরাজ-মন্দির। চিদাম্বরম্ হতে কুম্ভকোণম্। তথায় শ্রীকুম্ভকেশ্বর শিবমন্দির। কুম্ভকোণম্ হতে তাঞ্জায়ুর। তথায় শ্রীবৃহদেশ্বর শিবমন্দির। তাঞ্জায়ুর হতে ত্রিচিনপল্লী। তথায় শ্রীরঙ্গমে শ্রীরঙ্গনাথের মন্দির অতি বিখ্যাত ও অতি প্রাচীন। ত্রিচিনপল্লী হতে মাদুরা। তথায় কারুকার্যপূর্ণ উচ্চগোপুরম্‌যুক্ত শ্রীমীনাক্ষী দেবীর মন্দির। মাদুরা হতে রামেশ্বরম্ দর্শন করে তিনেভেল্লী হয়ে তিরুচেন্দুর। তথায় সমুদ্রতীরে বিখ্যাত শ্রীবিষ্ণুর মন্দির। তিরুচেন্দুর হতে নাগেরকোয়েল হয়ে কন্যাকুমারী। তথায় শ্রীদেবী কুমারী মন্দির ও সমুদ্রমধ্যবর্তী বিবেকানন্দ শীলা। তথা হতে দশ মাইল দূরে সুচিন্দ্রমে সমুদ্রতীরে বিখ্যাত শিবমন্দির দর্শন।

তারপর পশ্চিমে উপকূলবর্তী দ্রষ্টব্য স্থানসমূহ। কন্যাকুমারী হতে ত্রিবান্দ্রম্ শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম। তথায় অনন্ত শয়নে শায়িত শ্রীবিষ্ণুর মন্দির। ত্রিবান্দ্রম্ হতে কেরালা রাজ্য আরম্ভ। তথা হতে তিরুভাল্লা শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম। তিরুভাল্লা হতে কালাডী—ভগবান শ্রীশঙ্করাচার্যের জন্মস্থান। কালাডী হতে এর্ণাকলাম্ ও কোচীন বন্দর। আবার কালাডী প্রত্যাবর্তন। এবার কালাডী হতে ত্রিচুর শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম। ত্রিচুর হতে গুরুবায়ুর মন্দির দর্শন ও ত্রিচুর প্রত্যাবর্তন। গুরুবায়ুর বিষ্ণুমন্দির বিখ্যাত। হরিজনদের মন্দিরে প্রবেশ-অধিকার নিয়ে মহাত্মা গান্ধী এখানে প্রায়োপবেশন করেছিলেন। ত্রিচুর হতে কালিকট শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম। কালিকট হতে কোয়েম্বাটুরের নিকটবর্তী শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যালয়ম্—পেরীয়ানাইকেন-পালায়াম্ নামক স্থানে অবস্থিত। তথা হতে উটী শ্রীরামকৃষ্ণ মঠম্। উটী হতে মহীশূর শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম। মহীশূর হতে কুর্গ জিলার পোনামপেট শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম। তথা হতে উডিপি শ্রীমধ্বাচার্যের জন্মস্থান। তথায় শ্রীকৃষ্ণমন্দিরে তিনি কঠোর তপস্যাদি করেন। মারকারা হয়ে মাঙ্গালোর। মাঙ্গালোর হতে উডিপি তথা হতে মাঙ্গালোর প্রত্যাবর্তন। এই পর্যন্ত পশ্চিম উপকূলবর্তী স্থানসমূহ শেষ হ'ল। এখন মাঙ্গালোর হতে সোমেশ্বর এবং তথা হতে জগ্ জলপ্রপাত দেখে সোমেশ্বর প্রত্যাবর্তন। সোমেশ্বর হতে আগম্বী হয়ে শৃঙ্গেরী। শৃঙ্গেরী হতে চিক্ মাঙ্গালোর হয়ে বেলুড় ও হালেবীরের মন্দির দর্শন। তথা হতে হাসান এবং হাসান হতে চিন্নারায়াপাটনা হয়ে শ্রাবণবেলা গোলাতে শ্রীগোমটেশ্বর মূর্তি দর্শন। সেখান হতে বাঙ্গালোর। বাঙ্গালোর হতে কোলার স্বর্ণখনি দর্শন। আবার বাঙ্গালোর প্রত্যাবর্তন। সেখান হতে সালেম শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম। সালেম হতে পালানী। তথায় পাহাড়ের উপরে বিখ্যাত বালসুব্রহ্মণ্যমের মন্দির। পালানী হতে সালেমে প্রত্যাবর্তন। তথা হতে নটরামপল্লী শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম। নটরামপল্লী হতে তিরুভান্নামালাই। সেখানে অরুণাচলম্ শিবমন্দির দর্শন। তথা হতে বাঙ্গালোর হয়ে হায়দ্রাবাদ। হায়দ্রাবাদ হতে শ্রীশৈলম্ পর্বতস্থিত শ্রীমল্লিকার্জুনম্ শিবমন্দির দর্শন। আবার হায়দ্রাবাদ প্রত্যাবর্তন। শ্রীমল্লিকার্জুন দর্শনের কথা পূর্বে বিস্তারিত বর্ণনা করেছি।

# সমালোচনা

**প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য** ( বিংশ সংস্করণ ): স্বামী বিবেকানন্দ। প্রকাশক: উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা ৩। পৃষ্ঠা ১৬০; মূল্য দুই টাকা।

'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় স্বামী সারদানন্দজী লিখিয়াছিলেন: 'ইহাতে শ্রীমৎ স্বামীজীর গভীর মনস্বিতা ও ভূয়োদর্শনের বিশিষ্ট পরিচয় রহিয়াছে। আমাদের সমাজে দুই শ্রেণীর লোক দেখিতে পাওয়া যায়; একদলের মতে পাশ্চাত্যের যাহা কিছু সবই নিখুঁত ও সর্বাঙ্গসুন্দর, দেশী জিনিসের মধ্যে আদৌ দেখিবার বা ভাবিবার বিষয় কিছুই নাই। অপর দল ইহার ঠিক বিপরীত মতাবলম্বী, হিন্দুদের এবং হিন্দুসমাজের যে কোনকিছু দোষের থাকিতে পারে, তাহা একেবারেই অসম্ভব বিবেচনা করেন; আর যে পাশ্চাত্য জাতি ও পাশ্চাত্য সভ্যতা আজ সমস্ত পৃথিবীময় আপনার রাজত্ব বিস্তার করিতে বসিয়াছে, তাহাদের নিকট হইতে আমাদের যে কিছু শিখিবার আছে, ইহা তাঁহারা কল্পনায়ও আনিতে পারেন না। এই প্রবল স্রোতের ঘাত-প্রতিঘাতে হিন্দুসমাজ আত্মহারা হইতে বসিয়াছে। স্বামীজীর এই প্রবন্ধ চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের চিন্তাস্রোত যথার্থ পথে প্রবাহিত করাইয়া দিবে…।'

বর্তমান সংস্করণে উল্লেখযোগ্য সংযোজন—পরিবর্ধিত তথ্যপঞ্জী এবং তথ্যপঞ্জীর সুলিখিত ভূমিকা। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' গ্রন্থের স্থান নির্ণয় করিয়া অধ্যাপক শ্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোষ 'উদ্বোধন', মাঘ, ১৩৭৬, সংখ্যায় যে সুচিন্তিত প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, পরিবর্ধিত আকারে তাহাই তথ্যপঞ্জীর ভূমিকারূপে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

বর্তমান সংস্করণটি সকল শ্রেণীর পাঠক-পাঠিকার, বিশেষ করিয়া বাংলা সাহিত্যের গবেষক ছাত্রছাত্রীগণের নিকট বিশেষভাবে সমাদৃত হইবে বলিয়া আমরা আশা করি।

**ভারতের সাধক চিত্রাবলী**—সম্পাদনা: শঙ্করনাথ রায়, হিমাদ্রি সংসদ। প্রকাশক: এইচ. চৌধুরী, প্রাচী পাবলিকেশনস্, ৩ এবং ৪ হেয়ার স্ট্রীট, কলিকাতা ১। পৃষ্ঠা ৪২; মূল্য দশ টাকা।

সুলেখক শঙ্করনাথ রায়ের সুপরিচিত 'ভারতের সাধক' গ্রন্থ রবীন্দ্র পুরস্কার লাভ করিয়াছে এবং এযাবৎ এই গ্রন্থের আট খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে।

আলোচ্য চিত্রপুস্তকে ২০ জন সাধক মহাপুরুষের চিত্রাবলী (ফটো) সংক্ষিপ্ত পরিচিতি সহ প্রদত্ত হইয়াছে। পুস্তকখানিতে কলাশিল্পের প্রয়োগ-নৈপুণ্য আকর্ষণীয়। প্রত্যেকটি চিত্রের নিম্নে মহাপুরুষের আবির্ভাব ও তিরোভাব খৃষ্টাব্দে নির্দেশিত। সুলিখিত ভূমিকার পর গ্রন্থারম্ভে আচার্য শঙ্কর এবং গ্রন্থশেষে শ্রীঅরবিন্দের চিত্র দেওয়া হইয়াছে। পূর্ণ এক পৃষ্ঠায় প্রদত্ত পরিচিতি—লেখনীমুখে প্রত্যেকটি মহাজীবনের ক্ষুদ্র দর্পণস্বরূপ। আশা করি অনেকেই এই সুদৃশ্য 'অ্যালবাম্' সংগ্রহে যত্নবান হইবেন।

# শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

## বেলুড় মঠে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাধারণ মহোৎসব

**বেলুড় মঠে** গত ২৫শে ফাল্গুন (৯.৩.৭০) শুভ শুক্লা দ্বিতীয়ায় ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পুণ্য জন্মতিথি উদ্‌যাপিত হয়। তদুপলক্ষে পরবর্তী রবিবার ১লা চৈত্র (১৫.৩.৭০) শ্রীশ্রীঠাকুরের সাধারণ মহোৎসব বিবিধ কর্মসূচীর মাধ্যমে সারাদিন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। মন্দিরের পূর্বদিকে নির্মিত মণ্ডপে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এক সুবৃহৎ প্রতিকৃতি ও তাঁহার ব্যবহৃত দ্রব্যাদি সজ্জিত ছিল। মধ্যাহ্নে প্রসাদ-বিতরণ আরম্ভ হয়। প্রায় ২০,০০০ ভক্ত হাতে হাতে খিচুড়িপ্রসাদ গ্রহণ করেন।

বেদপাঠ, ভজন, প্রদর্শনীমণ্ডপে শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্গীত, মঠপ্রাঙ্গণে কালীকীর্তন, আবৃত্তি প্রভৃতি উৎসবের প্রতিটি অঙ্গ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। স্বেচ্ছাসেবকগণের ব্যবস্থা ভাল ছিল। সন্ধ্যারতির পর আতসবাজি পোড়ানো হয়।

## শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্য

**উত্তরবঙ্গে বন্যার্তসেবা:** জলপাইগুড়ি মোহিতনগর কলোনীতে ৫৩টি গৃহ (thatched house) নির্মিত হইয়াছে। কলোনীটিকে দুই অংশে বিভক্ত করা হইয়াছে—এক অংশের নাম শ্রীরামকৃষ্ণ নগর এবং অপর অংশের নাম শ্রীসারদা পল্লী। বিদ্যালয়-ভবন-নির্মাণের কাজ ভালভাবেই চলিতেছে।

**গুজরাট বন্যার্তসেবা:** সমাজমন্দির, রাস্তা প্রভৃতি নির্মাণের কাজ এবং বৈদ্যুতীকরণ প্রায় শেষ করিয়া আনা হইয়াছে।

## কার্যবিবরণী

**বৃন্দাবন** রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের ৬২তম বর্ষের কার্যবিবরণী (এপ্রিল, ১৯৬৮—মার্চ, ১৯৬৯) প্রকাশিত হইয়াছে।

আর্তনারায়ণের সেবাকল্পে ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে প্রসিদ্ধ তীর্থ বৃন্দাবনে সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়; তদবধি সুদীর্ঘকাল ধরিয়া এই আশ্রম জাতি-ধর্মনির্বিশেষে জনসাধারণের সেবাকার্যে নিরত রহিয়াছে।

বর্তমানে সেবাশ্রমে মেডিক্যাল, সার্জিক্যাল, রেডিওলজি, এক্স-রে, ফিজিওথেরাপি প্রভৃতি সুপরিচালিত বিভাগে অ্যালোপ্যাথিক মতে আধুনিক সুচিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। বিভিন্ন বিভাগে অভিজ্ঞ চিকিৎকগণ চিকিৎসা পরিচালনা করেন।

ইনডোর হাসপাতাল: অন্তর্বিভাগে ১০৩টি শয্যা আছে; এই বিভাগে চক্ষুরোগী সহ আলোচ্য বর্ষে ২,৩৬৪ জন রোগী ভরতি হয়, চক্ষু-অস্ত্রোপচার সহ মোট ১,২৫২টি অস্ত্রোপচার করা হয়। গড়ে দৈনিক শতকরা ৭২টি শয্যায় রোগীরা চিকিৎসার জন্য ছিল।

আউটডোর ডিস্পেন্সারী: আলোচ্য বর্ষে বহির্বিভাগে ১,৪৪,৮৩০ জন রোগী (পুরাতন ১,২০,৬৯৩) চিকিৎসিত হয় এবং চক্ষুরোগী সহ মোট ১,১০৩ জনের অস্ত্রোপচার করা হয়। বহির্বিভাগে গড়ে দৈনিক চিকিৎসিতের সংখ্যা ৩৯৭।

আলোচ্য বর্ষে এক্স-রে বিভাগে ১,৩৫৫টি এক্স-রে করা হয় এবং ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরিতে

২৪,২০৩টি প্যাথলজিক্যাল পরীক্ষা করা হয়। ফিজিওথেরাপি বিভাগে ২৩৪ জন রোগী চিকিৎসা লাভ করে।

আলোচ্য বর্ষে হোমিওপ্যাথিক বিভাগে নূতন ও পুরাতন রোগীর সংখ্যা যথাক্রমে ৩,২১৩ ও ১৫,৬৫২।

বৃন্দাবন সেবাশ্রমের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য সুপরিচালিত চক্ষুবিভাগটিতে সহস্র সহস্র চক্ষু-রোগী সুচিকিৎসা লাভ করিয়া নিরাময় হইতেছে।

রোগীদের জন্য সেবাশ্রম কর্তৃক একটি গ্রন্থাগার ও পাঠাগার পরিচালিত হয়। এখানে উপযুক্ত পুস্তকাবলী ও পত্রপত্রিকা রাখা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত একটি স্বতন্ত্র ক্ষুদ্র মেডিক্যাল লাইব্রেরী আছে। রোগীদিগের আনন্দ বিধানের উদ্দেশ্যে ওয়ার্ডগুলিতে রেডিও শুনাইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

## দেওঘর শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠে নবনির্মিত প্রার্থনাগৃহের দ্বারোদ্ঘাটন ও শ্রীশ্রীঠাকুর-প্রতিষ্ঠা

গত ২৩শে মার্চ সোমবার সকাল ৭টায় দেওঘর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সভাপতি পূজ্যপাদ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ নবনির্মিত প্রার্থনা-গৃহের দ্বারোদ্ঘাটন ও শ্রীশ্রীঠাকুর-প্রতিষ্ঠা করেন। ১১টি গম্বুজবিশিষ্ট এই ভবনটির মোট উচ্চতা ৬৮′ ফুট। রামকৃষ্ণ মিশনের বিভিন্ন কেন্দ্র হইতে শতাধিক সন্ন্যাসী এবং সহস্রাধিক ভক্ত নরনারী ও ছাত্রবৃন্দ এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। সাধু ও ব্রাহ্মণদের বৈদিকমন্ত্রপাঠ এবং স্বামী পুণ্যানন্দজী-পরিচালিত সুমধুর কীর্তন এসময় একটি ভাবগম্ভীর পরিবেশ সৃষ্টি করে। এদিকে যজ্ঞশালায় কাশীর তিনজন পণ্ডিত সপ্তশতী হোম শুরু করেন।

পূর্বদিন, ২২শে মার্চ, স্বামী হিতানন্দ শ্রীশ্রীঠাকুরের অধিবাস সম্পন্ন করেন এবং সুসজ্জিত যজ্ঞশালায় রুদ্রযাগ ও বাস্তুযাগ অনুষ্ঠিত হয়। অপরাহ্নে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী গম্ভীরানন্দজী শিক্ষা-প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। সন্ধ্যায় শ্রীবিষ্ণুচরণ ঘোষের পার্টি ব্যায়াম-কৌশল প্রদর্শন করিয়া সমবেত সহস্র সহস্র দর্শকবৃন্দকে মোহিত করেন। ২২শে হইতে ২৮শে পর্যন্ত ৭ দিনব্যাপী উৎসবে প্রায় ৭০ হাজার লোক যোগদান করিয়াছেন।

২৪শে মধ্যাহ্নে সাধুসেবার আয়োজন ছিল। অপরাহ্নে পুরস্কারবিতরণী সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় পৌরোহিত্য করেন স্বামী গম্ভীরানন্দজী এবং প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী। বিদ্যাপীঠের অধ্যক্ষ স্বামী শুদ্ধসত্ত্বানন্দের স্বাগত সম্ভাষণ ও সংক্ষিপ্ত কার্যবিবরণী-পাঠের পর সভাপতি মহারাজ একটি সারগর্ভ ভাষণ প্রদান করেন। পরে সুপ্রসিদ্ধ শানাইবাদক আলি হুসেন খাঁন ও তাঁর সুযোগ্য পুত্র আলি আসগর খাঁন সুমধুর শানাই বাজাইয়া শ্রোতৃবৃন্দকে মুগ্ধ করেন। উৎসবের অন্যান্য অঙ্গ ছিল—দুইদিন যাত্রা, দুইদিন শ্রীরথীন ঘোষের কীর্তন, স্বামী পুণ্যানন্দজীর কথকতা, রসরঙ্গ সভ্যবৃন্দ কর্তৃক শ্রীশ্রীমায়ের লীলাকীর্তন, রহড়ার ছাত্রগণ কর্তৃক মুক্তিযজ্ঞ ও প্রহ্লাদ যাত্রাভিনয়, হাওড়া সমাজ কর্তৃক নদের নিমাই অভিনয়, ভারত-বিখ্যাত শিল্পিগণ কর্তৃক উচ্চাঙ্গের যন্ত্র- ও কণ্ঠসঙ্গীত এবং ভজন, বাজি-পোড়ানো প্রভৃতি। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে সমাগত ৯২ জন সাধু এবং প্রায় ৪০০ ভক্ত ও

অভিভাবক সকলেই এই সাতদিনের উৎসব-দর্শনে ও বিদ্যাপীঠের ছাত্র ও কর্মিগণের আদর-আপ্যায়নে বিশেষ পরিতৃপ্ত হইয়াছেন।

## উৎসব-সংবাদ

**চণ্ডীগড়** আশ্রমের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে আয়োজিত দুইটি সভায় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন পঞ্জাবের রাজ্যপাল ডক্টর ডি সি. পাভাতে এবং হরিয়ানার রাজ্যপাল শ্রী বি. এন. চক্রবর্তী।

**কাঁথি** শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে ৯ই মার্চ হইতে ৫ই মার্চ পর্যন্ত বিবিধ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের ১৩৫তম জন্মতিথি-উৎসব পালিত হইয়াছে। ১২ই মার্চ ছয় হাজার পথ-যাত্রীর একটি শোভাযাত্রা নগরপরিক্রমা করে। ১৩৫টি মঙ্গলঘট, ১৩৫টি শঙ্খের ধ্বনি এবং বিভিন্ন দলের নামগান শোভাযাত্রাটিকে আকর্ষণীয় করিয়াছিল। শোভাযাত্রাটি আশ্রম-প্রাঙ্গণে ফিরিয়া আসিবার পর ছাত্রদেব লইয়া একটি বৃহৎ সমাবেশ হয়; এই সভায় ছাত্রগণই সভাপতিত্ব ও বক্তৃতা করেন। ১৩ই মার্চ পূর্বাহ্ণে স্বামী আপ্তকামানন্দ 'কথামৃত' পাঠ ও আলোচনা করেন। অপরাহ্ণে লীলাগীতি পরিবেশনের পর শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষা বিষয়ে শ্রীবনবিহারী ভট্টাচার্যের সভাপতিত্বে একটি ধর্মসভার অধিবেশন হয়; অধ্যাপক শ্রীস্নেহাংশুকুমার সরকার ও স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ ভাষণ দেন। সন্ধ্যায় আশ্রমের ছাত্রগণ কর্তৃক নাটক অভিনীত হয়। ১৪ই মার্চ পূর্বাহ্ণে স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। বিকালে শ্রীরাখহরি চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় অধ্যাপিকা বন্দিতা ভট্টাচার্য ও স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ শ্রীশ্রীমায়ের জীবনালোচনা করেন। ১৫ই মার্চ সকালে স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ কঠোপনিষদ্ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। মধ্যাহ্নে প্রায় ৭,০০০ নরনারায়ণ পরিতৃপ্তি সহকারে প্রসাদ পান। পরে স্বামী হিরণ্ময়ানন্দের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় শ্রীরাখহরি চট্টোপাধ্যায় ও সভাপতি মহারাজ 'বিবেকানন্দ ও বর্তমান ভারত' সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

**কাটিহার** রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে গত ৯ই হইতে ১৫ই মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি-উৎসব বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালিত হয়।

৯ই মার্চ শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা-হোমাদি হয়; ঐদিন ৪,০০০ ভক্ত বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন। ১০ই মার্চ সন্ধ্যায় স্থানীয় ব্যায়ামাগারের সদস্যগণ কর্তৃক ব্যায়াম-প্রদর্শন, ১১ই মার্চ শ্রী বি এন. ঝা-এর সভাপতিত্বে আশ্রমের স্কুলের পুরস্কারবিতরণী সভা এবং ১২ই সন্ধ্যায় স্কুলের ছাত্রগণ কর্তৃক নাটকাভিনয় হয়।

১৩ই, ১৪ই ও ১৫ই মার্চ সন্ধ্যায় স্বামী পরশিবানন্দের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় যথাক্রমে স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রীশ্রীমা এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন ও বাণী আলোচিত হয়। প্রতিদিনই সভাপতি মহারাজ, স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ ও অধ্যাপক রবীন্দ্রকুমার দুবে বক্তৃতা করেন; ১৩ই তারিখ সভারম্ভে শ্রীসমর রায় চৌধুরী 'সভ্যতা ও সংস্কৃতি'-শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। তিনদিনই সভান্তে রামায়ণগান পরিবেশন করেন সঙ্গীতসুধাকর শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী।

**ফরিদপুর** রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে কার্য-নির্বাহক সমিতির ও স্থানীয় ভক্তগণের উদ্যোগে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শুভ জন্মতিথি গত ৯ই মার্চ উদ্‌যাপিত হইয়াছে।

ঐদিন ব্রাহ্মমুহূর্তে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিকৃতি

সহ আশ্রম-পরিচালিত মহাকালী পাঠশালা ও ছাত্রাবাসের ছাত্র-ছাত্রীগণ ভজনগান গাহিতে গাহিতে শহর পরিক্রমা করেন।

প্রভাতে ভজনাদির পর শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজাদি সুসম্পন্ন হয়। অপরাহ্ণে সর্বশ্রেণীর তিন হাজার নরনারী খিচুড়িপ্রসাদ গ্রহণ করেন। সন্ধ্যায় আরাত্রিকের পর শ্রীসুধীররঞ্জন চক্রবর্তী, শ্রীকরুণাময় অধিকারী, শ্রীযুক্তা গীতা ভৌমিক, কুমারী উমা ও বিমল কর্তৃক শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনদর্শন, অবলম্বনে রচিত জীবন-আলেখ্য পরিবেশিত হয়।

**ঢাকা** শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনে সম্প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব একসপ্তাহব্যাপী বিবিধ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মহা সমারোহে অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিদিনই পূর্বাহ্ণে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, গীতা, ভাগবত প্রভৃতি পাঠ ও ব্যাখ্যা করা হয়। ৯ই মার্চ বিশেষ পূজাদির পর মধ্যাহ্নে প্রায় পাঁচশতাধিক ভক্ত বসিয়া প্রসাদ পান। অপরাহ্ণে এডভোকেট শ্রীবীরেন্দ্রচন্দ্র পাণ্ডে, শ্রীজীবনচন্দ্র সাহা ও অধ্যাপক পরেশচন্দ্র মণ্ডল শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবন-দর্শন ও বাণী সম্পর্কে আলোচনা করেন। সন্ধ্যার পর টেলিভিশনশিল্পী শ্রীহরলাল রায়ের পরিচালনায় ভক্তিমূলক সঙ্গীত পরিবেশিত হয়।

১০ই ও ১১ই মার্চ দুইদিন শ্রীকালশশী চক্রবর্তী ও শ্রীতারিণী সরকার কবিগান গাহিয়া সকলকে আনন্দ দান করেন।

১২ই মার্চ ও পরদিন পদাবলী কীর্তন করেন শ্রীগোপাল মোহন্ত। সন্ধ্যায় অধ্যক্ষ শ্রীবারীন মজুমদারের পরিচালনায় স্থানীয় শিল্পিগণ উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

১৩ই মার্চ এবং আরও দুইদিন মধ্যাহ্নে নরসিংদির শ্রীখুকুমণি দাস রামায়ণগান গাহিয়া সকলকে আনন্দ দান করেন। অপরাহ্ণে ডক্টর কাজী মোতাহের হোসেনের সভাপতিত্বে একটি ছাত্রসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার প্রারম্ভে আশ্রমের বিদ্যালয় ও ছাত্রাবাসের বার্ষিক পুরস্কারবিতরণের পর অধ্যাপক সতীশচন্দ্র দাস, শ্রীলক্ষ্মীকান্ত রায়, ব্রহ্মচারী বিদেহচৈতন্য ও কুমিল্লা রামমালা ছাত্রাবাসের অধ্যক্ষ রাসমোহন চক্রবর্তী স্বামী বিবেকানন্দের মানবপ্রেম ও শিক্ষাদর্শ সম্পর্কে সারগর্ভ ভাষণ দান করেন।

১৪ই মার্চ অপরাহ্ণে ইসলামিক একাডেমীর ডিরেক্টর জনাব আবুল হাসিমের সভাপতিত্বে ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। অধ্যাপক সন্তোষকুমার ভট্টাচার্য, এডভোকেট বীরেন্দ্রচন্দ্র পাণ্ডে, এডভোকেট বিমলেন্দুবিকাশ রায়চৌধুরী, কাজী মোতাহের হোসেন, শ্রীসুখদারঞ্জন চৌধুরী, শ্রীরাসমোহন চক্রবর্তী প্রমুখ সুধীবৃন্দ উক্ত সভায় রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ও সর্বধর্মসমন্বয় সম্বন্ধে ভাষণ দেন। সন্ধ্যার পর কুমার মনোতোষ দেবের পরিচালনায় স্থানীয় শিল্পিগণ মাতৃসঙ্গীত পরিবেশন করেন।

১৫ই মার্চ মধ্যাহ্নে প্রায় দেড় হাজার নর-নারায়ণের সেবা করা হয়। অপরাহ্ণে শ্রীরাসমোহন চক্রবর্তীর সভাপতিত্বে সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় মিশনের সম্পাদক স্বামী কালিকাত্মানন্দ কার্যবিবরণী পাঠ করেন। অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী ভাষণ দান করেন স্থানীয় মিশনের সভাপতি ডক্টর কাজী মোতাহের হোসেন এবং প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন ঢাকা হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি জনাব এস. এম মুর্শেদ। সভায় ডক্টর সুকুমার চক্রবর্তী, শ্রীবিমলচন্দ্র বসু, ডক্টর হরিনাথ দে প্রমুখ সুধীবৃন্দ বিশ্বশান্তি-প্রতিষ্ঠায় রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের অবদান সম্পর্কে আলোচনা করেন। সভার পর ওস্তাদ

আলী ইমাম কিছুক্ষণ যন্ত্রসঙ্গীত পরিবেশন করেন। পরে পূর্ব-পাকিস্তান সরকারের সৌজন্যে ধর্মীয় চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়। এই আনন্দোৎসবে প্রতিদিনই শহরের শত শত নরনারী আশ্রমে উপস্থিত হন।

### স্বামী জয়দানন্দের দেহত্যাগ

আমরা গভীর দুঃখের সহিত জানাইতেছি, গত ৪ঠা মার্চ, ১৯৭০ বেলা সাড়ে নয়টার সময় স্বামী জয়দানন্দ ( যতীশ মহারাজ ) ৬৭ বৎসর বয়সে কলিকাতা রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি আন্ত্রিক গোলযোগ, জনডিস ও অন্যান্য উপসর্গে কিছুকাল যাবৎ অসুস্থ ছিলেন।

স্বামী জয়দানন্দ শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন, ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে সঙ্ঘে যোগদান করেন এবং ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের নিকট সন্ন্যাসদীক্ষা প্রাপ্ত হন। তিনি জীবনের অধিকাংশ কাল বাঁকুড়া আশ্রমে এবং পরে রামহরিপুর আশ্রমে ঠাকুর-স্বামীজীর কাজে ব্রতী ছিলেন। তিনি ছিলেন কঠোর পরিশ্রমী, সরলস্বভাব সন্ন্যাসী।

তাঁহার আত্মা শ্রীরামকৃষ্ণচরণে শাশ্বত শান্তি লাভ করিয়াছে।

## বিবিধ সংবাদ

### নিবেদিতা ব্রতী সঙ্ঘ

গত ১লা ফেব্রুআরি স্বামী বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে 'নিবেদিতা ব্রতী সঙ্ঘে'র উদ্যোগে সহস্রাধিক মহিলা সকাল নটায় রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার হইতে সিমলাস্থিত স্বামী বিবেকানন্দের পৈতৃক বাটীর উদ্দেশ্যে পদযাত্রা করেন। পত্রপুষ্পে সুসজ্জিত স্বামীজীর একটি সুবৃহৎ আলেখ্য সহ সুদীর্ঘ একমাইলব্যাপী বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রাটির পুরোভাগে ছিলেন রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ রমা চৌধুরী প্রমুখ বিশিষ্ট মহিলাবৃন্দ। সমগ্র পথটি সহস্র কণ্ঠে পবিত্র বেদমন্ত্রপাঠ এবং স্বামীজীর বন্দনাগীতিতে মুখরিত হইয়া উঠে।

ঐদিন বেলা সাড়ে দশটায় স্বামী বিবেকানন্দের পৈতৃক বাটীর অঙ্গনে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। পৌরোহিত্য করেন ডঃ রমা চৌধুরী এবং ভাষণ দেন প্রব্রাজিকা বিশুদ্ধপ্রাণা।

গত ২৪ হইতে ২৮শে নভেম্বর, ১৯৬৯ পাঁচদিনব্যাপী একটি আলোচনাচক্রের অধিবেশন হয় রামকৃষ্ণ মিশন ইন্‌স্টিট্যুট অব কালচারের সহযোগিতায়। ২৪শে তারিখে ইহার উদ্বোধন করেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেন। উদ্বোধনী ও সমাপ্তি অধিবেশনে পৌরোহিত্য করেন যথাক্রমে প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা ও শ্রীমৎ স্বামী গম্ভীরানন্দজী মহারাজ। স্বামীজীর চিন্তার বিভিন্ন দিকের আলোচনা-সভায় পৌরোহিত্য করেন যথাক্রমে শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক নির্মল ভট্টাচার্য, স্বামী বুধানন্দ,

অধ্যক্ষ অমিয়কুমার মজুমদার। আলোচনায় যোগদান করেন প্রায় চল্লিশজন সুধী, সমাজ-সেবী ও ছাত্রছাত্রী।

### উৎসব-সংবাদ

**হুগলী** জেলা শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসঙ্ঘ কর্তৃক হুগলীতে শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব মহানন্দে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

৭ই মার্চ শনিবার বৈকালে অখিল ভারত বিবেকানন্দ যুব-মহামণ্ডলের হুগলী-চুঁচুড়া শাখার শিক্ষাশিবিরের উদ্বোধন হয়। রাত্রে আরাত্রিক ভজনাদি ও প্রবন্ধপাঠ হইয়াছিল।

৮ই মার্চ রবিবার সকালে শোভাযাত্রা সহ নগরপরিক্রমা, বৈকালে 'লীলাপ্রসঙ্গ' পাঠ ও আলোচনা এবং রাত্রে নামসঙ্কীর্তন হয়। ৯ই মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি-দিবসে বিশেষ পূজার্চনা, প্রসাদবিতরণ, লীলাকথা, কালীকীর্তন প্রভৃতি হইয়াছিল। ১০ই মার্চ 'বীর সন্ন্যাসী' গীতি-আলেখ্য, ১১ই রামায়ণ-গান, ১২ই লীলাকীর্তন, ১৩ই 'বিবেকানন্দ' গীতি-আলেখ্য প্রভৃতি অনুষ্ঠান উল্লেখযোগ্য।

১৪ই মার্চ শনিবার আবৃত্তি ও বিতর্ক-প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতার পারিতোষিক বিতরণ করেন স্বামী নিরাময়ানন্দজী। সভায় শ্রীরামকৃষ্ণ ও সর্বধর্মসমন্বয় বিষয়ে ভাষণ দেন অধ্যক্ষ অমিয়কুমার মজুমদার; স্বামী নিরাময়ানন্দজী সময়োপযোগী হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা দেন।

১৫ই মার্চ রবিবার বিবেকানন্দ শিশু-শিক্ষা-মন্দিরের বিচিত্রানুষ্ঠানের পরে শ্রীবিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে পারিতোষিক বিতরণ করা হয়। বক্তৃতা, পাঠ ও আলোচনাদিতে বিভিন্ন দিনে অংশ গ্রহণ করেন স্বামী রুদ্রাত্মানন্দ, শ্রীনবনীহরণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, অধ্যাপক নলিনীভূষণ দাশ-গুপ্ত, অধ্যাপিকা বাসন্তী চৌধুরী প্রভৃতি।

**ব্রাহ্মণবাড়িয়া** শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি মহাসমারোহে পালিত হইয়াছে। ৯ই মার্চ বিশেষ পূজাদির পর প্রায় ৫ হাজার ভক্ত প্রসাদ গ্রহণ করেন। অপরাহ্ণে 'কথামৃত' পাঠ ও আলোচনা হয়। ১০ই ও ১১ই মার্চ সন্ধ্যায় ডক্টর শ্রীমন্মহানামব্রত ব্রহ্মচারী শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, ভগিনী নিবেদিতা সম্বন্ধে ভাষণ দেন।

**আরারিয়া** শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের শুভ জন্মোৎসব ১৬ই হইতে ১৯শে মার্চ পর্যন্ত রামায়ণগান, অষ্টযাম হরি-নামসংকীর্তন, নর-নারায়ণসেবা ও ধর্ম-সভাধিবেশন সহ উদ্‌যাপিত হয়। সভাপতি স্বামী মিত্রানন্দ মহারাজ সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীকে শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনী পর্যালোচনা করিয়া শুনান।

আশ্রমস্থ হোমিওপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালয় হইতে গত বৎসর ৩২,০১৩ জন রোগীকে ঔষধ বিতরণ করা হয়। আশ্রম কর্তৃক একটি ছাত্রাবাস ও একটি পুস্তকালয় পরিচালিত হইতেছে।

**ডিব্রুগড়** শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সমিতিতে গত ২০, ২১ ও ২২ মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্ম-মহোৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে। প্রতিদিন প্রাতে পূজা-পাঠাদি এবং প্রথম দুইদিন সন্ধ্যায় জনসভা ও তৃতীয় দিবসে লীলাকীর্তন ও প্রসাদ-বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়। ২০ মার্চের সভায় সভাপতিত্ব করেন অধ্যক্ষ শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য এবং ২১ মার্চের সভায় সভাপতিত্ব

করেন অধ্যক্ষ মথুরানাথ ভট্টাচার্য। এই দুই দিন সভায় যথাক্রমে শ্রীরামকৃষ্ণদেব এবং স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী ও বাণী আলোচনা করেন স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ ; তাছাড়া ২১শে ও ২২শে প্রাতে তিনি যথাক্রমে শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দপ্রসঙ্গ আলোচনা করেন।

২০শে মার্চ প্রাতে শ্রীরামকৃষ্ণপ্রসঙ্গ আলোচনা করেন স্বামী শমানন্দজী ; লীলা-কীর্তন পরিচালনা করেন শ্রীফণীন্দ্রচন্দ্র দাস। ২২শে মার্চ মহোৎসবে পাঁচ হাজারের অধিক নর-নারায়ণ বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন।

**দিনহাটা** শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের উদ্যোগে গত ২০, ২১ ও ২২শে মার্চ স্থানীয় কালী-বাড়ীতে শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ২১শে মার্চ বিশেষ পূজাপাঠাদি হয়, ২,০০০ ভক্ত বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন। সকালে শোভাযাত্রা শহর পরিক্রমা করে। উৎসবের তিনদিনই সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম দিনের আলোচ্য বিষয় ছিল শ্রীশ্রীমা সারদা-দেবী। সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক অলোক গঙ্গোপাধ্যায়। দ্বিতীয় দিনের সভায় শ্রীরাম-কৃষ্ণ সম্বন্ধে বক্তৃতা হইয়াছিল। সভাপতির আসন গ্রহণ করেন শ্রীশচীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। উৎসবের শেষদিন রবিবার অনুষ্ঠিত সভায় স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে আলোচনা হয় ; সভাপতিত্ব করেন শ্রীজগদিন্দ্রনারায়ণ লাহিড়ী। সভান্তে বিবেকানন্দ-লীলাগীতি অনুষ্ঠিত হয়। স্বামী প্রণবানন্দ প্রথম দিন ছায়াচিত্রযোগে শ্রীশ্রীমা সম্বন্ধে এবং দ্বিতীয় দিন শ্রীশ্রীঠাকুর সম্বন্ধে ভাষণ দেন। বিভিন্ন দিনে বিশিষ্ট বক্তাগণ বক্তৃতা করেন। তিনদিনব্যাপী রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ প্রদর্শনী খোলা ছিল।

**ডিব্রুগড়** সিস্টার নিবেদিতা কিণ্ডার-গার্ডেন স্কুলে গত ২২শে মার্চ পূর্বাহ্ণে আয়োজিত সভায় স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ শ্রীশ্রীমায়ের জীবন ও বাণী আলোচনা করেন। সভার পূর্বে উপনিষদের মন্ত্র এবং সভান্তে শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্গীত গীত হয়।

**ভদ্রেশ্বর** সারদা পল্লীতে গত ২৮শে ও ২৯শে মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পুণ্য জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ২৮শে মার্চ বিশেষ পূজা, 'কথামৃত'পাঠ, প্রসাদবিতরণ ও ভজনাদি হয়। বৈকালে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী নিবৃত্ত্যানন্দ। প্রধান অতিথিরূপে ভাষণ দেন অধ্যাপিকা সান্ত্বনা দাশগুপ্ত। ২৯শে মার্চ সকালে উষাকীর্তন, পল্লীপরিক্রমা প্রভৃতি হইয়াছিল। বৈকালে আয়োজিত সভায় সভা-পতির আসন গ্রহণ করেন স্বামী একান্তানন্দ। বক্তা ছিলেন অধ্যাপক হরিপদ ভারতী। সন্ধ্যায় ভজন ও রাত্রে লীলাগীতি উপভোগ্য হইয়াছিল।

**নিউ বনগাইগাঁও** রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে গত ৯ই মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব উদ্‌যাপিত হইয়াছে। ২৫শে মার্চ এই উপলক্ষে পূর্বাহ্ণে পূজাপাঠাদি ও মধ্যাহ্নে প্রায় ২,০০০ ভক্তকে অন্নপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। অপরাহ্ণে আয়োজিত সভায় শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী আলোচনা করেন স্বামী অক্ষজানন্দ।

# উদ্বোধন

## দিব্য বাণী

অবিদ্যায়ামন্তরে বর্তমানাঃ স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতং-মন্যমানাঃ।
দন্দ্রম্যমানাঃ পরিযন্তি মূঢ়া অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ॥ ১।২।৫

অজ্ঞানের মাঝে থাকি তবুও যাহারা
ধীর ও পণ্ডিত বলি ভাবে নিজেদেরে
দুখের কুটিল পথে জন্মে জন্মে ভ্রমে যে তাহারা—
এ যেন দেখায়ে পথ নিয়ে যায় এক অন্ধ অপর অন্ধেরে॥

ন নরেণাবরেণ প্রোক্ত এষ সুবিজ্ঞেয়ো বহুধা চিন্ত্যমানঃ।
অনন্য-প্রোক্তে গতিরত্র নাস্তি অনীয়ান্ হ্যতর্ক্যমণুপ্রমাণাৎ॥ ১।২।৮

—কঠোপনিষদ্

উপলব্ধি নাই যার সেরূপ প্রাকৃতজন আত্মতত্ত্ব কহিলে তাহাতে
সে-তত্ত্বের সুষ্ঠু জ্ঞান কখনো না হয়,—
'আত্মা আছে', 'আত্মা নাই' এইরূপ বহুবিধ বিভিন্ন চিন্তাতে
অনুভূতিহীন তর্ক, শুধু বুদ্ধি নিয়ে যায়; সত্যে কভু নয়।
আত্মা সনে আপনার অভেদত্ব উপলব্ধি হয়েছে যাঁহার
তাঁহারি কথায় শুধু বিতর্কের নাহি অবকাশ,
সেই সত্যদ্রষ্টা কাছে পাওয়া যায় যথাযথ সত্য-সমাচার;
তর্কের অতীত তিনি, তর্কে কভু আত্মতত্ত্ব হয় না প্রকাশ—
চরম সত্যেরে যদি অতি সূক্ষ্ম, অণুসম বলে কোন জন,
সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্মতম, কিংবা অন্য কিছু বলি অন্যজন করিবে খণ্ডন॥

# কথাপ্রসঙ্গে

## ধর্ম

### ধর্ম সম্বন্ধে বর্তমান বিভ্রান্তির কারণ

মানুষ তাহার জীবনের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য ক্রমোন্নতির পথে অনেক কিছু করিয়াছে, যাহাকে আমরা সভ্যতার অগ্রগতি, সভ্যতার অবদান বলিয়া থাকি। বিবিধ প্রকার রাষ্ট্র-ব্যবস্থার, সমাজব্যবস্থার উদ্ভব, বিজ্ঞান, শিল্প, সাহিত্য, চারুকলা, সঙ্গীত প্রভৃতির উদ্ভব ও উন্নতি হইয়াছে মানবজীবনের প্রয়োজনের তাগিদেই। ধর্মেরও উদ্ভব এই জন্যই।

মানবজীবনের প্রয়োজন বলিতে কেবল তাহার দেহেরই প্রয়োজন বুঝায় না, দেহ-মন-বুদ্ধি প্রভৃতি যাহা লইয়া মানুষ, তাহার সব কিছুর প্রয়োজনই বুঝায়। ইহার কোনটিকে বাদ দিয়া বা উপেক্ষা করিয়া যে রাষ্ট্র-বা সমাজপরিকল্পনা, তাহা কখনই মানুষের জীবনের প্রয়োজন মিটাইবার পক্ষে যথেষ্ট হইতে পারে না।

আধুনিক যুগে ধর্মকে মানবজীবনের পক্ষে অপ্রয়োজনীয় বলিয়া, ধর্ম ও ঈশ্বর অসত্য, স্বার্থ-সিদ্ধির প্রয়োজনে একশ্রেণীর মানুষের কল্পনা-প্রসূত বলিয়া ধর্মের ও ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিরুদ্ধে যে চিন্তাগুলির উদ্ভব হইয়াছে, তাহা সবই বিভিন্ন যুগের, বিভিন্ন দেশের লোকের জন্য প্রাত্যহিক জীবনে ধর্মের যে বিভিন্ন প্রয়োগবিধি, এবং স্বার্থান্ধ লোকের স্বার্থসিদ্ধির জন্য তাহার যে অপব্যবহার সেগুলিকেই ধর্ম বলিয়া ধরিয়া লইয়া তাহারই ভিত্তিতে উদ্ভূত; যে মূল সত্য অবলম্বনে সেইসব প্রয়োগবিধিগুলি সত্যদ্রষ্টাগণ কর্তৃক যুগোপযোগিরূপে প্রযুক্ত হয়, সেই মূল সত্যের ভিত্তিতে নহে। ধর্ম সম্বন্ধে আজ যা-কিছু বিভ্রান্তির সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার মূলে ইহাই। যে-সব মনীষী এই চিন্তার প্রবর্তক, তাঁহারা ধর্মের এই মূলগত সত্যের সন্ধান পান নাই বা সন্ধানলাভের চেষ্টা করেন নাই, কেবল তাহার বহিরঙ্গকেই বুদ্ধি দ্বারা বিচার করিয়াছেন বলিয়া এই বিভ্রান্তির উদ্ভব। এই সত্যকে জানিতে চান এরূপ বহু পাশ্চাত্য দার্শনিকও কেবল বুদ্ধিসহায়ে তাহা করিতে চাহিয়াছেন বলিয়াই মূল সত্যের সন্ধান তাঁহারাও পান নাই, মানবজাতির বৌদ্ধিক জ্ঞানভাণ্ডারের ক্রমবর্ধমানতার সহিত তাঁহাদের সিদ্ধান্তও পরিবর্তিত হইয়া চলিয়াছে।

### ধর্মের মূল সত্য

ধর্ম ও ভগবান কল্পনাপ্রসূত নহে, বিজ্ঞানের মতোই প্রত্যক্ষের উপর প্রতিষ্ঠিত। জগতের অচেতন বস্তুনিচয় ও আমাদের স্থূল-দেহ লইয়া যে জড়জগৎ, অথবা মন বুদ্ধি প্রভৃতি চেতন বলিয়া প্রতীত যে সূক্ষ্মজগৎ,—যে জগৎ-ই হউক, কতকগুলি সত্যের উপর তাহা প্রতিষ্ঠিত। সেগুলি বিভিন্ন স্তরের সত্য হইতে পারে, কিন্তু সত্য। যে স্তরেরই হউক, কোন সত্যকে জানার, প্রত্যক্ষ করার নামই জ্ঞান। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, "এই জ্ঞান কখনও উৎপন্ন করা যেতে পারে না, তাকে কেবল অনাবৃত বা আবিষ্কার করা যেতে পারে; যে-কোন ব্যক্তি কোন বড় আবিষ্কার করেন তাঁহাকেই উদ্বুদ্ধ বা অনুপ্রাণিত পুরুষ বলা হয়। কেবল যদি তিনি আধ্যাত্মিক সত্য আবিষ্কার করেন, আমরা তাঁকে 'ঋষি' বা

'অবতার' বলি ; আর যখন সেটা জড়জগতের কোন সত্য হয়, তখন তাঁকে 'বৈজ্ঞানিক' বলি।" আমরা জানি বা না-জানি, এই সত্যগুলি যতদিন জগৎ আছে ততদিনই রহিয়াছে, ভবিষ্যতে থাকিবেও। নিউটনের আবিষ্কারের পূর্বেও চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করিত, এ সত্য কোন দিন বিজ্ঞানীরা ভুলিয়া গেলে ভবিষ্যতেও করিবে। মানুষ ঈশ্বরকে ও আধ্যাত্মিক সত্যগুলিকে প্রত্যক্ষ করিবার পূর্বেও ঈশ্বর এবং অধ্যাত্ম সত্যগুলি ছিল, এখন আমরা না জানিতে চাহিলে বা অস্বীকার করিলেও চিরদিন উহা থাকিবে। আমাদের জানা বা বিশ্বাস করার উপর সত্যের অস্তিত্ব নির্ভর করে না। বিজ্ঞানীদের কথায় বিশ্বাস করিয়া চলিলে যেমন তাঁহাদের নির্দেশমত সেগুলির প্রয়োগ করিয়া আমরা জাগতিক সুখসুবিধার অধিকারী হই, তেমনি অধ্যাত্মবিজ্ঞানীদের কথায় বিশ্বাস করিয়া তাঁহাদের নির্দেশমত চলিলে জীবনকে, সমাজকে আরো উন্নত করিতে পারি। বিশ্বাস করা বা না করায় প্রভেদ শুধু এইটুকু।

আধ্যাত্মিক শব্দের অর্থ হইল আত্মসম্বন্ধে, নিজের সম্বন্ধে, দেহ-মন-বুদ্ধি প্রভৃতি যে-সবকে 'আমি' বলিয়া মনে হয় সেই সম্বন্ধে জ্ঞান ; আধ্যাত্মিক সত্য বলিতে এই সব বিষয়ক জ্ঞানকেই বুঝায়। কিভাবে দেহ-মন-বুদ্ধি-চেতনা-সমন্বিত এই 'আমি' চালিত হয়, ইহার মধ্যে আসল 'আমি'—চেতন সত্তা কোন্‌টি, কিভাবে তাহাকে দেহাদি হইতে পৃথক করিয়া দেখা যায়—ইত্যাদি বিষয়ক সত্যগুলিই আধ্যাত্মিক সত্য, যাহাকে সাধারণতঃ আমরা ধর্মজগতের সত্য বলিয়া থাকি, যে সত্যে বিশ্বাসকে ধর্মবিশ্বাস বলিয়া থাকি। ঋষিয়া এ সত্যগুলি প্রত্যক্ষ করিয়া তাহার কথা বলিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন, দেহ-মন-বুদ্ধি-চেতনা-সমন্বিত যে মানুষ, দেহটি তাহার সর্বস্ব নয়, আসল মানুষ হইল মন-বুদ্ধি-চেতনা-বিশিষ্ট মানুষটি, যে দেহের নাশের পরও থাকে ; তাহার ভিতরও আবার আসল মানুষ হইল ঐ চেতন অংশটিই, যা ঈশ্বর বা ভগবান। এই সত্য প্রত্যক্ষ করিয়াই তাঁহারা বলিয়াছেন, 'সব মানুষই স্বরূপতঃ ভগবান', 'মানুষের সেবাই ভগবানের সেবা'। এই সত্যের ভিত্তিতেই সব মানুষকে এক দেখা, যথার্থ সাম্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব, অপরের সেবায় সেচ্ছায় স্বার্থত্যাগ সম্ভব।

মানবজাতির ইতিহাস বা বিভিন্ন জ্ঞানের পুস্তক পড়িয়া বুদ্ধি দ্বারা অনুমান সহায়ে ঋষিরা এই সত্যের কথা ঘোষণা করেন নাই, বা অপর কোন ঋষিকর্তৃক প্রত্যক্ষ করা সত্যের উদ্ধৃতি-মাত্ররূপেও বলেন নাই ; উপনিষদের ঋষিগণ, রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, খৃষ্ট, মহম্মদ প্রভৃতি পরবর্তী-কালের সত্যদ্রষ্টা বা অবতারগণ প্রত্যেকেই নিজে এই সব সত্য উপলব্ধি করিয়া তবে সে-গুলির কথা ঘোষণা করিয়াছেন ; সব মানুষকে এই সত্য প্রত্যক্ষ করার পথে অগ্রসর করাইবার জন্য বিভিন্ন যুগে, বিভিন্ন ধারণাশক্তিবিশিষ্ট মানুষের কাছে যে ভাবে উহার কথা বলিলে তাহারা উহা বুঝিতে এবং জীবনের প্রয়োজন-সিদ্ধিতে উহা প্রয়োগ করিতে পারিবে, সেই ভাবে তাহা বলিয়াছেন ; কারণ, যতটুকুই হউক, কাজে না লাগাইতে পারিলে সে সত্য শুধু বুঝিয়া কোন লাভ নাই। সেই জন্যই, সকলেই চরম সত্যকে একইরূপে প্রত্যক্ষ করিলেও জীবনে উহাকে প্রয়োগের ব্যাপারে দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে বিভিন্ন প্রকার নির্দেশ দিয়াছেন। কিন্তু ভিন্ন হইলেও ঋষি-নির্দিষ্ট বলিয়া সর্বকালে

সেগুলি সত্যাভিমুখই থাকে। মূল সত্যের সন্ধান না রাখিয়া, কেবল যুগে যুগে দেশে দেশে এই প্রয়োগবিধির বিভিন্নতা দেখিয়া যদি ধর্ম ও ঈশ্বরকেই বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন দেশে বিভিন্নরূপ হওয়ার জন্য অসত্য বলা হয়, তাহা হইলে সে কথায় কোন যৌক্তিকতা থাকে কি? আর কতকগুলি স্বার্থপর লোক স্বার্থসিদ্ধির জন্য ধর্মের অপব্যবহার করে বলিয়া আধ্যাত্মিক সত্যগুলিকে মিথ্যা বলিবার পিছনে কোন যুক্তি আছে কি? একদল মানুষ পারমাণবিক শক্তিকে ধ্বংসের কাজে ব্যবহার করিয়াছে বা করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে বলিয়া পরমাণুর কেন্দ্রীণের অংশগুলির সংযোজন-ও বিভাজনজনিত বিপুল শক্তির উদ্ভব হয়, এই বৈজ্ঞানিক সত্যটিকে কি অসত্য বলিতে বা ঐ সত্যের আবিষ্কারক বিজ্ঞানীকে দোষ দিতে হইবে? না বলিতে হইবে ঐ শক্তি জগতের কোন কল্যাণকর্মে লাগে না?

## জীবনে ধর্মের প্রয়োজন আছে কি?

এই আধ্যাত্মিক সত্যগুলির সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞতা বা সেগুলির অপব্যবহারের জন্য মানুষকে স্থানবিশেষে, কালবিশেষে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইলেও এগুলির যথাযথ প্রয়োগ মানুষের সত্তাকে ঝিমাইয়া দেয় না, তাহার প্রগতির পথরোধও করে না; বরং মানুষকে সবলতর, উন্নততর করিবার, তাহাকে অধিকতর স্বার্থহীন, ভেদবুদ্ধিহীন, মানবপ্রেমিক, পরহিতৈষী ও সমাজের কল্যাণকামী করিবার ইহাই একমাত্র উপায়। জড়বাদীই হই বা ঈশ্বরবিশ্বাসী—নিজের অমর সত্তায় বিশ্বাসীই হই, ইহা তো আমরা সকলেই জানি ও মানি যে, চিন্তা ও মনের অনুভূতিই আমাদের জীবনের চালক। জীবনের চলার পথে বুদ্ধিও আমাদের চালিত করিতে পারে না, পথ দেখাইতে পারে মাত্র। আমরা হয়তো বুদ্ধিগত করিলাম, সকলকে বুঝাইলাম যে আমাদের সকলকে সমান অধিকার ভোগ করিতে হইবে, নিজের জন্য অপরের চেয়ে বেশী কিছু চাওয়া চলিবে না, আমরা সবাই সমান, সকল মানুষকে এক বলিয়া দেখিতে হইবে, ইত্যাদি। কিন্তু তাহাতেই যে মানুষ স্বার্থত্যাগী, সমদৃষ্টিপরায়ণ হয় না, ইহা তো আজ দেখাই যাইতেছে; এভাবে সমাজ-ব্যবস্থা করার জন্য সাম্যবাদী দেশগুলিতেও এখনও কড়া শাসন এবং বলপ্রয়োগ করিতে হইতেছে; সাম্যবাদী রাষ্ট্রগুলিও আজ পরস্পরকে 'এক' বলিয়া ভাবিতে পারিতেছে না, নিজ নিজ স্বার্থের জন্য পরস্পরের মধ্যে সংঘর্ষও বাধিতেছে। তরবারির দ্বারা, আইনের দ্বারা সুদীর্ঘকাল মানুষকে চালনা করা অতীতে কখনও সম্ভব হয় নাই, ভবিষ্যতেও হইবে না। হৃদয়ই উহার চালক, জনসাধারণের উন্নত হৃদয়ই সমাজের একমাত্র স্থায়ী নিরাপত্তা। আর একমাত্র ধর্মই মানুষের হৃদয়ের এই উন্নতি-ও বিস্তারসাধনে সক্ষম। একমাত্র ধর্মাচরণই মানুষের স্বার্থপরতার মূল দেহাত্মবুদ্ধি ক্ষীণ করিতে পারে, মানুষকে অন্তর্মুখ করিয়া সংযম-ও একাগ্রতাজনিত বিষয়-ভোগ নিরপেক্ষ আনন্দের সন্ধান দিতে পারে, যাহার আস্বাদ একটু না পাইলে, নিজের দেহাতীত সত্তার আভাষ একটু নিজে না পাইলে শুধু কথায় মানুষ অপরের জন্য কখনও স্বার্থত্যাগ করিবে না, কখনও সব মানুষকে সমান বলিয়া ভাবিতে পারিবে না।

মানুষ ভোগের, ব্যক্তিত্ববিকাশের সমান অধিকার আজ হউক কাল হউক সব দেশেই চাহিবে। তাহার ব্যবস্থাও স্বেচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক সব দেশকেই করিতে হইবে

সন্দেহ নাই ; কিন্তু উহা করার জন্য তাহার সব উচ্চভাব নষ্ট করিয়া মানুষকে প্রায়-পাশব স্তরে নামাইয়া আনিতে হইবে, ইহার কি প্রয়োজন আছে ?

## ভারতের ধর্ম ও সমাজ

ভারতের সমাজব্যবস্থা চিরদিন ধর্মভিত্তিক বা আধ্যাত্মিক ছিল বলিয়া হাজার হাজার বছর ধরিয়া বহু বিরোধী ভাবের ঝঞ্ঝা-প্লাবন সহিয়াও এখনো বাঁচিয়া আছে। আজ আমাদের বিশেষভাবে ভাবিয়া দেখা উচিত, আমরা বিদেশাগত জড়বাদভিত্তিক ধর্ম-ও ঈশ্বরবিশ্বাসহীন যে মতবাদ অবলম্বনে অকল্যাণকর কুসংস্কারগুলির সঙ্গে সুদীর্ঘকালের কল্যাণকর ভাবগুলির, শুভসংস্কারগুলির ধ্বংস করিয়া বিদেশের হুবহু অনুকরণে জনগণের কল্যাণসাধনে অগ্রসর হইতে চাহিতেছি, সে পথে চলিলে আমরা দেশকে একটি সুদৃঢ় অবলম্বন হইতে সরাইয়া কোন্ ভিত্তির উপর স্থাপন করিব এবং তাহাতে কল্যাণের নামে মহা অকল্যাণই টানিয়া আনিব কি না? বর্তমানে চারিদিকে যে উচ্ছৃঙ্খলতা, হৃদয়হীনতা ও অসংযমের পরিচয় প্রায় প্রতিদিনই পাওয়া যাইতেছে, এই আদর্শেই কি সারা দেশের মানুষকে গড়িতে চাই আমরা ? পাশ্চাত্যের মতো, স্বামীজীর ভাষায় উদ্গীরণ-উন্মুখ আগ্নেয়-গিরির উপর অবস্থিত দেশগুলির পাশে কি ভারতকেও বসাইতে চাই ?

## ভারতের ভবিষ্যৎ

অবশ্য ভারতকে সেরূপ করা কখনো সম্ভব হইবে না ; তবে এ প্রচেষ্টায় তাহাকে বহু দুর্ভোগের ভিতর দিয়া যাইতে হইবে। ঈশ্বর-বিশ্বাসের উপর দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত, বিভিন্ন বিষয়ে ডিমোক্রাসি ও সোস্যালিজমের শুভকারী দিকগুলি লইয়া গঠিত রাষ্ট্র ও সমাজনীতিই ভবিষ্যতে মানুষ গ্রহণ করিবে বলিয়াই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, এবং ভারতই তাহার আদর্শ দেখাইবে।

দেশের বর্তমান অবস্থার উন্নতির জন্য সর্বাগ্রে শিক্ষাব্যবস্থাকে ধর্মভিত্তিক করা একান্ত প্রয়োজন, যাহা আমরা রাজনৈতিক স্বাধীনতা পাইবার পর এতদিনেও করিতে পারি নাই বা করিবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি নাই।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আবির্ভাব ধর্ম-হীনতার প্রভাব হইতে ভারতকে তথা সমগ্র বিশ্বকে বাঁচাইবার জন্যই। আধুনিক জগতের দুইজন প্রখ্যাত মনীষীর একজন, ফ্রয়েড, মানুষের জীবনের সব প্রচেষ্টার মূল বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন কামকে ; অপর জন, কার্ল মার্কস, মানুষের রাষ্ট্র-ও সমাজ-ব্যবস্থা-প্রচেষ্টার মূল বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন কাঞ্চনকে। আমরা যেন ভুলিয়া না যাই মানুষের উন্নততর অবস্থা লাভের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণদেব এই কাম-কাঞ্চন-লালসা কমাইবার কথাই বার বার বলিয়াছেন। যেন ভুলিয়া না যাই, সংযম ও ত্যাগের মহিমায় ও শক্তিতে, নিবেদিতার ভাষায় বজ্রের শক্তিতে বিশ্বাসী, ধর্মনিষ্ঠ কয়েকজন প্রখ্যাত দেশ-প্রেমিকই আমাদের দেশকে পরাধীনতাশৃঙ্খলমুক্ত করিতে সর্বাধিক সহায়তা করিয়াছেন।

যদি কাহারো হৃদয়ে ধর্মাচরণ ছাড়াই সকল মানুষের উপর সমদৃষ্টি, সমান ভালবাসা থাকে, সব মানুষের কল্যাণসাধনের জন্য নিজের সর্ববিধ স্বার্থকে বলি দিবার প্রেরণা ও শক্তি আসে, তবে তাহা অপেক্ষা শুভকর আর কি হইতে পারে ? কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় এরূপ মানুষ কখনও কখনও আসে বটে, তবে সংখ্যায় অতি অল্প, প্রায় বিরল। সেই মুষ্টিমেয় কয়েকজন ছাড়া সকলেরই পক্ষে প্রয়োজন ধর্মাচরণ বা আধ্যাত্মিকতাভিত্তিক জীবন।

# স্বামী ব্রহ্মানন্দের অপ্রকাশিত পত্র

( ১ )

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

The Math, P. O. Belur, Howrah,
The 15th. April, 1905

My Dear Kumud,

তোমার ৫ ও ১১ তারিখের পত্র পাইয়াছি এবং টেলিগ্রামও পাইয়াছি। শুনিয়া খুব আনন্দবোধ করিতেছি যে, শশী মহারাজের ক্লাশ ও বক্তৃতা ও কাজকর্ম খুব সাফল্যলাভ করিয়াছে এবং তাহার ফলে ওখানে সত্বরই একটি স্থায়ী কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইবারও সম্ভাবনা রহিয়াছে; তদুদ্দেশ্যে স্থানীয় গণ্যমান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের নিকট হইতে সাহায্য পাইবারও প্রতিশ্রুতি পাইয়াছে।

মঠপ্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে সার্থক চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আমাকে সময়মত জানাইবে। ইহা খুবই ভাল লক্ষণ যে, তুমি বোম্বের অনেক বিশিষ্ট নাগরিককে আমাদের সৎকাজের জন্য প্রভাবান্বিত করিতে সমর্থ হইয়াছ। শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের অশেষ কৃপায় আমাদের ক্ষুদ্র বাঙ্গালী বন্ধুদলের উদ্যম, শ্রম ও স্বার্থত্যাগ পূর্ণমাত্রায় পুরস্কৃত হইয়াছে। আশা করি আমাদের এই মহৎ ধর্মীয় কার্যের সুযোগটির সদ্ব্যবহার করিতে পশ্চাৎপদ হইবে না।

আমরা এখানে সকলে ভাল আছি। আশা করি তোমাদের কুশল। ভালবাসা ও শুভেচ্ছাদি জানিবে।

Yours afftly
Brahmananda

( ২ )

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

Puri, Sasi Niketan,
July, 1907

My Dear Mohantaji,

তোমার মা শরতের সঙ্গে এখানে আসিয়াছেন ও দর্শনাদি করিতেছেন। বোধ হয় তোমার মায়ের হাতে এখন খরচ নাই। যদ্যপি শীঘ্র কিছু টাকা পাঠাইয়া দাও ভাল হয়। আর ার মাসিক যাহা তুমি দিয়া থাক তাহাও সামান্য মাত্র আছে। যদি হাতে কিছু থাকে তাহা হইলে শীঘ্র তীর্থ ইত্যাদির জন্য কিছু পাঠাইয়া দিলে ভাল হয়। তুমি কেমন আছ লিখিয়া সুখী করিবে, ইতি।

With love + নমস্কার

Afftly yours
Brahmananda

( ৩ )

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

The Math, Belur,
( Howrah )
28. 3. 08

My Dear Sasi Maharaj,

গতকল্য অভিরাম নামক পাচককে মান্দ্রাজ মেলে তোমার নিকট রওনা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। আশা করি সে নিরাপদে ওখানে পৌঁছিয়াছে। তাহার পৌঁছান সংবাদ জানাইয়া সুখী করিবে। ছেলেটী খুব ভাল। উহাকে মিষ্টবাক্য দ্বারা সন্তুষ্ট করিলে ও প্রাণপণে কার্য্য করিবে। তোমাকে লেখা বাহুল্য মাত্র যে উহাকে একটু যত্ন করিবে। এক-আধটী গেঞ্জী দিতে পারিলে ভাল হয়, আর কার্য্যের অবসর সময় রুদ্রচৈতন্যকে দিয়া একটু আধটু বাঙ্গলা পড়াইলে আরও ভাল হয়। তাহার রেলভাড়া বাবদ ১৬।৵. খরচ হইয়াছে। আশা করি তুমি ভাল আছ। কার্য্যাদিও বেশ চলিতেছে। রুদ্রচৈতন্য ও বৈরাগ্যানন্দও আশা করি বেশ আছে ও কাজকর্ম্মাদি ভাল করিয়া করিতেছে। আমি ভাল আছি। এখানকার সব একপ্রকার কুশল। আমার আশীর্বাদ জানিবে এবং রুদ্রচৈতন্য ও বৈরাগ্যানন্দকেও জানাইবে। এখানকার সকলে তোমায় এবং আর সকলকে যথাযোগ্য প্রণাম ভালবাসাদি জানাইতেছে। ইতি

Yours afftly
Brahmananda

P. S, I have a mind to see you and your hermitage with a band of good company

Yours lovingly + afftly
Brahmananda

( ৪ )

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

Ramakrishna Advaita Ashrama,
Luxa, Banaras City, 29. 11. 13.

প্রিয় শঙ্করানন্দ,

বাবুরামদার মুখে শুনিলাম বাগবাজারের নগেন উকীল বড়দিনের মধ্যেই মঠের পশ্চিম দিকের জমিটি permanent lease করিয়া দিবে এইরূপ প্রতিশ্রুত হইয়াছে। তুমি এখানে আসিবার আগে সত্বর তাহার সহিত দেখা করিয়া কিরূপ মনোভাব জানিয়া একটা বন্দোবস্ত করিয়া আসিতে পার ত ভাল হয়। যদি প্রকৃতই সে দেয় তাহা হইলে তুমি কথাবার্ত্তা কহিয়া মহিমানন্দকে মধ্যে মধ্যে তাহার নিকট পাঠাইয়া যাহাতে কার্য্য শীঘ্র সম্পন্ন হয় এমত চেষ্টা করিয়া আসিবে।

তোমার কোন্ তারিখ নাগাত এখানে আসা হইবে পত্রোত্তরে লিখিবে। বাবুরামদাদা বলিতেছে—আসিবার সময় মঠের কিছু বেগুন ও গাছের গুড় লইয়া আসিবে। ইতি

শুভানুধ্যায়ী

ব্রহ্মানন্দ

( ৫ )

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

Bhadrak

14. 7. 15.

প্রিয় কেদারবাবা,

মনে করিয়াছিলাম বুঝি তপস্যাদি করিয়া আমাদের সব ভুলিয়া গিয়াছ। এখন দেখিতেছি তাহা নয়। আমাদের একটু একটু মনে আছে। যাহা হউক তুমি তপস্যার জন্য ৺কাশী যাইতে চাহিতেছ? তা যাও। কিন্তু আমাকেও একটু আকর্ষণ করিও যাহাতে আমারও সেখানে যাওয়া হয়। আহা এমন স্থান! কাহার না সাধ হয় সেখানে গিয়া বাস করিতে? আমি যাহাকে দেখি তাহাকেই বলি যে, যাও ৺কাশী গিয়া তপস্যা কর। ৺কাশী সর্বশ্রেষ্ঠ তপস্যার স্থান। আমার যখনই ৺কাশীর কথা মনে পড়ে, ইচ্ছা হয় সেই মুহূর্তেই সব ছাড়িয়া ছুটিয়া তথায় চলিয়া যাই। কি আর বলিব? তোমার হাতেই সব। তুমি ইচ্ছা করিলেই সব হয়। ৺কাশী যাইয়া আমায় একটু আকর্ষণ করিও যাহাতে আমারও ৺কাশীবাস হয়। তুমি আকর্ষণ করিলেই হইবে। শেষ জীবনটা ৺কাশী বাস করিয়া কাটাইব, ইহাই আমার এখন ইচ্ছা। ৺কাশীর কথা মনে করিলে আর বাজে কোন কথাই ভাল লাগে না। বেশী আর কি বলিব? একান্তে স্থির হইয়া বসিয়া ভগবৎ-প্রেমে বিভোর হইয়া থাকাই ৺কাশীবাসের চরম ফল!

ভালবাসা ও শুভেচ্ছাদি জানিবে।

Yours affly

Brahmananda

# বিবেকানন্দের যুগবাণী সমন্বয়

## শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

পাশ্চাত্যের আধিপত্যের ছায়ায় প্রাচ্য শান্ত হয়ে আছে যেন সর্বংসহা বসুমতী। রোম-সাম্রাজ্যবাদের ছায়ায় গ্যালিলির প্রশান্তির কথা মনে জাগে। সে প্রায় দু'হাজার বছর আগের কথা। গ্যালিলির সঙ্গে ভারতবর্ষের তুলনা করা চলে। কেবল রোম শব্দটির জায়গায় বৃটিশ শব্দটি বসালে আর কোন গোল থাকে না। বাইরে থেকে ভারতকে কতই না শান্ত দেখায়! কিন্তু বাহিরের এই স্থৈর্যের নীচে জাতির মর্মের গভীরে শুরু হ'য়ে গেছে একটা প্রচণ্ড আলোড়ন। বসুমতীর বুকের পুঞ্জীভূত বেদনা কখন উৎক্ষিপ্ত হয়ে উঠবে আগ্নেয়গিরির অগ্নিস্রাবে। ভারতবর্ষের অন্তরে যে-বিপর্যয়ের ঝড়ের হাওয়া বইতে শুরু করেছে তার মুকুরে সারা এসিয়ার বিক্ষুব্ধ আত্মার প্রতিফলন।

এতকাল পরে ভারতবর্ষ সম্বিৎ ফিরে পেয়েছে। সে নিজেকে নূতন ক'রে যেন আবিষ্কার করেছে। ইতিহাসের নাট্যলীলায় তার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে, এই কথাটি অকস্মাৎ সে বুঝতে পেরেছে। এতদিন যা ঘটবার তাই ঘটেছে, যা হবার তাই হয়েছে। এখন থেকে পাশ্চাত্যের উদ্ধত সভ্যতার আনুগত্য স্বীকার করতে সে আর রাজী নয়। ভারতবর্ষ তার নিজস্ব আদর্শগুলিকে অকুণ্ঠ স্বীকৃতি দেবে, তার যুগযুগান্তের গরিমাময় ঐতিহ্যের জয়ধ্বজাকে সে সম্মুখ থেকে সম্মুখের পানে সগর্বে বহন করে চলবে। ঐ ঐতিহ্যের মধ্যে তার যে-স্বকীয়তা আছে সেই স্বকীয়তার এক বিন্দু-বিসর্গও ছাড়তে প্রস্তুত নয় সে। তার যে সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য আছে, সেই বৈশিষ্ট্য থেকে জগতের কি কিছুই শিখবার নেই? পাশ্চাত্যের পদ-প্রান্তে ব'সে প্রাচ্যের নিশ্চয়ই শিখবার অনেক-কিছুই আছে। বিজ্ঞানকে সহায় ক'রে পাশ্চাত্য বিদ্যা তো কম আহরণ করেনি। হোক সে বিদ্যা অপরা বিদ্যা, তাতেও কি আমাদের প্রয়োজন নেই? কিন্তু যেখানে ভারতবর্ষ আচার্যের ভূমিকা নেবার যোগ্যতা রাখে, সেখানে সুদৃঢ় আত্মবিশ্বাসের সঙ্গেই তাকে সেই ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে।* আর পাশ্চাত্য যেখানে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পৃথিবীর আচার্য হবার অধিকারী, সেখানে নম্রতার সঙ্গেই প্রাচ্য তার পদতলে শিষ্যের আসন গ্রহণ করবে।

কিন্তু যে-প্রসঙ্গে উপরের কথাগুলি এসে পড়লো এবার তাতেই আসা যাক। সমগ্র প্রাচ্যের একটা বিশাল মানব-পরিবারের ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ আত্মার গভীর আকুতি চাইছিলো নব নব রূপের মধ্যে নিজেকে মূর্ত ক'রে তুলতে। প্রায় দ্বিসহস্র বর্ষ পূর্বে রোমের আধিপত্যের ছায়ায় গ্যালিলির অন্তরলোকে যখন একটা আলোড়ন চলেছে সেই বিপর্যয়ের মুখে খ্রীষ্ট এলেন। নব-সৃষ্টির আন্দোলনের ধারা বইতে আরম্ভ করলো ধর্মের পথ ধ'রে। ভারতবর্ষেও বৃটিশ-শাসনের ছায়ায় জাতির ভিতরটায় যে ভূকম্পন শুরু হোলো—সেই আলোড়নও ধর্মকে করলো আশ্রয়।

ভারতবর্ষে এমন তো হবেই—কারণ এখানে ধর্মই তো জাতির প্রাণকেন্দ্র। বিবেকানন্দের ভাষায় ধর্মই তো জাতির মেরুদণ্ড, ধর্মই তো

সেই ভিত্তি যার ওপরে জাতীয় ইমারত উঠেছে গ'ড়ে। স্বামীজীর মাদ্রাজের বক্তৃতায় আছে: "Here in India, it is religion that forms the very core of the national heart. It is the backbone, the bed-rock, the foundation upon which the national edifice has been built." অর্থাৎ এখানে ভারতবর্ষে জাতির মর্মকোষ ধর্ম দিয়ে তৈরী। জাতীয় সৌধ গড়ে উঠেছে ধর্মকে ভিত্তি ক'রে।

এই ধর্ম কি ঈশ্বরের অস্তিত্বে একটা বিশ্বাসমাত্র? তার বেশী কিছু নয়? হিন্দুদের কাছে ধর্ম ঈশ্বরের সাক্ষাৎ উপলব্ধি। ঈশ্বর আছেন, এই আস্তিক্যবুদ্ধি ধর্মের শেষ কথা নয়। ঈশ্বর রয়েছেন সমস্ত কিছুকে পূর্ণ ক'রে—এই উপলব্ধির গভীরতার মধ্যেই নিহিত রয়েছে ধর্মের আসল তত্ত্ব। একদিন ভারতবর্ষের মানুষগুলি ভুলে গেল ধর্ম কাকে বলে। ধর্ম পর্যবসিত হোলো সূক্ষ্ম দার্শনিক তত্ত্বগুলির বিচার-বিশ্লেষণে যার সঙ্গে অধ্যাত্ম চেতনার যোগ ছিল অল্পই। কতকগুলি বাহ্য অনুষ্ঠানের পর্যায়ে ধর্মকে নামিয়ে এনে আমরা আধ্যাত্মিকতাকে একটা প্রহসনে পরিণত করবার উপক্রম করছিলাম। পাশ্চাত্যের পদপ্রান্তে আসীন একদল নব্যযুবক ভাবতে শুরু করেছিল গোমাংস-ভক্ষণ আর সুরাপানই সভ্যতার অপরিহার্য অঙ্গ। আর রামমোহন রায় এবং ব্রাহ্মসমাজ তো লক্ষ লক্ষ হিন্দু নরনারীর সাকার উপাসনায় বিশ্বাসকে একটা পৌত্তলিকতা ছাড়া আর কিছুই বলতে রাজী ছিলেন না।

ধর্মের এই গ্লানির মহা দুর্দিনে রামকৃষ্ণ এলেন নব্যভারতের চেতনায় একটা নূতন আধ্যাত্মিকতার প্রবাহ বইয়ে দেবার জন্য। তিনি বললেন, ধর্মের তত্ত্ব বুদ্ধি দিয়ে জানবার বিষয় নয়। ঠাকুর বললেন: "অনন্ত ঈশ্বরকে কি জানা যায়?" এর ভাষ্য ক'রে শ্রীঅরবিন্দ বললেন, "It is impossible for the limited human reason to judge the way or purpose of the Divine—which is the way of the Infinite dealing with the finite." অর্থাৎ সীমিত মানববুদ্ধির দ্বারা ঈশ্বরের গতিবিধি বা উদ্দেশ্যকে জানা অসম্ভব। ব্যাপারটা তো সান্তের সঙ্গে অনন্তের কারবার। ঠাকুর বললেন, ধর্ম জিনিসটা অতীন্দ্রিয় তত্ত্বের সাক্ষাৎ জীবন্ত দিব্য উপলব্ধি। উপনিষদের ঋষির কণ্ঠে ঘোষিত হয়েছে: "বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্। আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ॥"

—"আমি জেনেছি তাঁহারে
মহান্ত পুরুষ যিনি আঁধারের পারে
জ্যোতির্ময়।"

ঠাকুর জিজ্ঞাসু নরেন্দ্রকে বললেন. "আমি তাঁকে দেখেছি।" উপনিষদের ঋষির বাক্যেরই স্বীকৃতি রয়েছে এই উত্তরের মধ্যে। ধর্ম তো তর্কের ব্যাপার হ'তেই পারে না। উপলব্ধিতে যে পৌঁছালো সে কোন্ ভাষায় ব্রহ্মের বর্ণনা দেবে? আর সবই উচ্ছিষ্ট হ'তে পারে, শুধু ব্রহ্মই কোনোকালে উচ্ছিষ্ট হন না। কলসি জলে ভরে গেলে আর শব্দ নেই। ভোমরা মধুর আস্বাদন পেলে নিশ্চুপ হয়ে যায়।

ধর্ম জ্ঞান-বিচারে নয়, তর্কে নয়, বিশ্বাসেরও বিষয়বস্তু নয়; ধর্ম হচ্ছে ঈশ্বরের মধ্যে জীবের যে অনির্বচনীয় আনন্দ রয়েছে তারই সরাসরি আস্বাদন। প্রত্যক্ষ আস্বাদন যেখানে মূলকথা সেখানে বুদ্ধি দিয়ে অনন্তকে জানার চেষ্টা শুধু সীমিত মানববুদ্ধির পক্ষে

অসম্ভব নয়, এই চেষ্টার কোনো সার্থকতাও নেই। সুন্দর উপমা দিয়ে ঠাকুর এই সত্যটি বুঝিয়েছেন। "যদি আমার এক ঘটি জলে তৃষ্ণা যায়, পুকুরে কত জল আছে এ জানবার আমার কি দরকার?"

ঠাকুর রামকৃষ্ণকে আশ্রয় ক'রে ধর্মজগতে আর একটি বিপুল সত্য প্রতিষ্ঠিত হোলো এবং এই সত্যটি হোলো "যত মত তত পথ।" ঠাকুর বললেন শ্রীম-কে: "নানা রকম পূজা ঈশ্বরই আয়োজন করেছেন। যাঁর জগৎ তিনিই এই সব করছেন—অধিকারভেদে। যার যা পেটে সয়, মা সেইরূপ খাবার বন্দোবস্ত করেন।" এত যে ধর্মের আয়োজন করেছেন ভগবান—এর প্রত্যেকটিকে অনুসরণ ক'রে ঈশ্বরীয় উপলব্ধিতে আমরা পৌঁছাতে পারি। ঠাকুরের এই বাণীর পশ্চাতে ছিল অভিজ্ঞতাপ্রসূত প্রত্যয়ের দৃঢ়তা। মুসলমানধর্মের উপদেশগুলি শিরোধার্য ক'রে মুসলমানমতে তিনি রীতিমতো সাধনা করেছিলেন এবং সিদ্ধ হয়েছিলেন। খৃষ্টধর্মমতেও সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। ধর্মের বিচিত্র সাধনায় সিদ্ধিলাভ তিনি করেছিলেন। রামকৃষ্ণের পূর্বে যাঁরা এসেছিলেন ধর্মগুরুর ভূমিকা নিয়ে তাঁদের বাণীর মধ্যে বিচিত্র সুরের এই মহাঐক্যতানটি আমরা শুনিনি। একের সুর যেন অন্যের সুর থেকে স্বতন্ত্র ছিলো—সুরের সঙ্গে সুর মিলে যায়নি। রামকৃষ্ণের বাণীর মধ্যেই আমরা প্রথম শুনতে পেলাম ধ্বনির বৈচিত্র্যের মধ্যে সুরের একটি ঐক্য যাকে ইংরেজীতে বলে symphony. যুগের কর্ণে রামকৃষ্ণ যে মহামন্ত্রটি উচ্চারণ করলেন তা হচ্ছে একের মন্ত্র।

আর একটি যুগান্তকারী ভাবকে আধ্যাত্মিকতার দিব্যচ্ছটায় মহিমান্বিত ক'রে ঠাকুর রামকৃষ্ণ যুগের সম্মুখে রাখলেন। "শিবজ্ঞানে জীবসেবা।" ক্ষুধিত জাতির জন্য প্রথম ব্যবস্থা করা দরকার অন্নের। যার উদরে জ্বলছে ক্ষুধার আগুন তাকে ধর্মের কথা কি শোনাবে? ঠাকুর জীবসেবার কথা বললেন, কিন্তু শিবজ্ঞানে। অনেক তপস্যা ক'রে, অনেক অশ্রু-গঙ্গা পার হ'য়ে রামকৃষ্ণ মৃণ্ময়ীতে চিন্ময়ীকে দর্শন করেছিলেন। জগন্মাতার জ্যোতিঃসমুদ্রের তীরে ঠাকুর রামকৃষ্ণ যখন পৌঁছালেন, দেখলেন মা-ই সব হয়েছেন। সর্বত্র তাঁকেই দেখতে লাগলেন। হাজরাকে বললেন, "কারুকে নিন্দা কোরো না। নারায়ণই এই সব রূপ ধ'রে রয়েছেন। দুষ্ট খারাপ লোককেও পূজা করা যায়।" বললেন, "দেখ, দুষ্ট লোককে পর্যন্ত বাদ দিবার জো নাই! তুলসী শুকনো হোক, ছোট হোক—ঠাকুর-সেবায় লাগবে।" রামকৃষ্ণ যখন শিশুর মতো মাকে বাহুবন্ধনে জড়িয়ে ধরলেন মায়ের সঙ্গে সমস্ত জগৎকেও আলিঙ্গন করলেন। ঠাকুর বলছেন; "রামলালের মাকে বকতে গিয়ে বকতে পারলাম না। দেখলাম তাঁরই একটি রূপ।"

এবার গুরু থেকে শিষ্যের প্রসঙ্গে আমরা নামতে পারি। বিবেকানন্দের প্রথম এবং শেষ পরিচয়: তিনি রামকৃষ্ণের দাসানুদাস, তাঁর শিষ্য, তাঁর সৃষ্টি, তাঁর কাজ করবার জন্য ঠাকুর তাঁকে নিজের হাতে তৈরি ক'রেছিলেন, শিল্পী যেমন ক'রে ধাতব উপাদানে মূর্তি তৈরি করে। বিবেকানন্দের জীবনব্রত ছিল রামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক ভাবসম্পদকে পৃথিবীর দিগ্‌দিগন্তে বিকীর্ণ ক'রে দেওয়া। রামকৃষ্ণকে বুঝতে পারলে বিবেকানন্দকে বুঝতে পারা একটুও কঠিন হবে না। রামকৃষ্ণের পরম অবদান একটি শব্দের মাধ্যমে প্রকাশ করতে গেলে বলতে হয়—ঐক্যতান,

symphony. বিচিত্র ধ্বনির একটি মিলিত সুর স্বর্গীয় সুষমায় ব্যক্ত হয়েছে তাঁর যুগবাণী 'যত মত তত পথ'-এর মধ্যে। সমস্ত সুরকে একটি মহান ঐক্য-তানের মধ্যে মিলিয়ে সেই সমন্বয়ের সোনার কংক্রিটের উপরে বিবেকানন্দ গড়তে চেয়েছিলেন তাঁর মহামানবের মিলন-স্বর্গ। রোমাঁ-রলাঁ বিবেকানন্দের জীবনীতে লিখেছেন: "In the two words—equilibrium and synthesis Vivekananda's constructive genius may be summed up." অর্থাৎ বিবেকানন্দের সৃজনী প্রতিভাকে দুটো শব্দে প্রকাশ করা যেতে পারে। একটি ভারসাম্য, অপরটি সমন্বয়। বিবেকানন্দ বিশ্বাস করতেন, যুগান্তরের নাট্যলীলায় জাগ্রত ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক একটি ভূমিকা আছে এবং সেই ভূমিকাটি হচ্ছে আধ্যাত্মিকতার অমৃতধারায় পৃথিবীর শুষ্ক অধরকে সে সিক্ত করবে। জগৎকে সে নতুন ক'রে শোনাবে তার তপোবনের বাণী।—বেদান্তের মৃত্যুহীন বাণী। স্বামীজী দেখেছিলেন সমস্ত পাশ্চাত্য জগৎ একটা আগ্নেয়গিরির শিখরে বসে আছে। সেই জগৎ অচিরে চূর্ণ-বিচূর্ণ হ'য়ে যেতে পারে। কোন আলো, কোনো আশা, কোনো আশ্রয় বিবেকানন্দ পাশ্চাত্য সভ্যতার মধ্যে খুঁজে পাননি। মাদ্রাজের যুবকদের সম্বোধন ক'রে স্বামীজী তাই বললেন, "We must go out, we must conquer the world through our spirituality and philosophy." অর্থাৎ আমরা আমাদের আধ্যাত্মিকতা এবং দর্শন দিয়ে জগৎ জয় করবো, বাহির বিশ্বে বেরিয়ে পড়বার ডাক এসেছে আমাদের কাছে। "জাতীয় জীবনে জাগরণ আসতে পারে, প্রাণের জোয়ার আসতে পারে একটিমাত্র সর্তে—আমরা যদি ভারতীয় চিন্তাধারা দিয়ে জগৎকে জয় করতে পারি।" স্বামীজীর চেতনায় এই বিশ্বজয়ের স্বপ্ন দেদীপ্যমান ছিল অম্লান দীপশিখার মতোই। কিন্তু বিবেকানন্দের জিগীষু আধ্যাত্মিকতার মধ্যে রোমাঁ রলাঁ যাকে বলেছেন "Spiritual imperialism" বা "আধ্যাত্মিক সাম্রাজ্যবাদ", তার নামগন্ধও ছিল না। ভারতের বেদান্তের বাণী যাঁরা দেশদেশান্তরে বহন ক'রে নিয়ে যাবেন তাঁরা প্রত্যেকের স্বাভাবিক ধর্মবিশ্বাসকে শ্রদ্ধা করবেন। বিবেকানন্দের আধ্যাত্মিকতার অভিযানে কোন জাতিকেই বলা হয়নি তার নিজস্ব পথগুলিকে পরিহার করতে। বিবেকানন্দ চেয়েছিলেন মানুষের মধ্যে যে-আত্মা ঘুমিয়ে আছে তাকে আবার জাগিয়ে দিতে।

বিবেকানন্দকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে তাঁর যে পরিচয়গুলি আমাদের কাছে পরিস্ফুট হয়ে উঠবে কোনটাই তাঁর সামগ্রিক রূপ নয়। আপাতবিরোধী সুরগুলিকে একের সূত্রে গেঁথে আপন জীবনকে তিনি একটি মহাসঙ্গীতে, এক আশ্চর্য symphonyতে সার্থক ক'রে তুলেছিলেন। তিনি ভক্ত ছিলেন ঠিকই। আমেরিকার সহস্রদ্বীপোদ্যানে যে-বিবেকানন্দ শিষ্যদের নারদীয় ভক্তিসূত্র পড়াতেন তাঁকে চিনতে আমরা নিশ্চয়ই ভুল করবো না। পতঞ্জলির যোগদর্শনের ভাষ্যকার বিবেকানন্দ স্বভাবত: জ্ঞানী ছিলেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকতে পারে? আর বিবেকানন্দের পক্ষে কর্মযোগী হওয়া ছাড়া কোনো উপায়ই ছিল না। রোমাঁ রলাঁ ঠিকই বলেছেন, He had to deal with a nation of "dyspeptics," drunk with their own sentimentality. ভাবের ফেনিল ক্রোড়ে নিলীন পেট-রোগা একটা

জাত নিয়ে তাঁকে কারবার করতে হয়েছিল। একটা অলস ভাবালু মৃতকল্প জাতির কর্ণ-কুহরে কর্মের বাণী ছাড়া কোন্ বাণী তিনি শোনাতে পারতেন? বিবেকানন্দের জীবনীর গোড়াতেই রোমাঁ রলাঁ তাই লিখেছেন, "He was energy personified, and action was his message to men."

বিবেকানন্দ কবিও ছিলেন। একটি কবিতায় আছে: "পূজা তাঁর সংগ্রাম অপার, সদা পরাজয়, তাহা না ডরাক তোমা।" বিবেকানন্দের নিজের জীবনও তো অন্তহীন একটা সংগ্রামেরই নাট্যলীলা। রোমাঁ রলাঁ ঠিকই লিখেছেন, "Battle and life for him were synonymous." বিবেকানন্দের ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ আত্মা যেন একটা রণভূমি। আধ্যাত্মিক জীবন এবং কর্মজীবন, বৈরাগ্য এবং মানব-সেবা—কোন্‌টাকে তিনি প্রাধান্য দেবেন? বিবেকানন্দকে খুব কাছে থেকে দেখতো যারা তারা প্রায়ই শুনতে পেতো একটা ক্লান্তির দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসছে তাঁর মর্মের গভীর থেকে। কর্মজীবনের সমস্ত ঝামেলা এবং কলরবকে পশ্চাতে রেখে তিনি যদি নিরাসক্ত নিঃসঙ্গ পরিব্রাজকের বন্ধনহীন জীবন যাপন করতে পারতেন। কিন্তু তা তো কোনক্রমেই সম্ভব ছিল না! রলাঁ লিখেছেন, "প্রত্যেক ব্রতের মধ্যেই এমন কিছু আছে যাকে বলা যেতে পারে নাটকীয়, dramatic. ব্রত যিনি গ্রহণ করেন তাঁকে বলি দিতে হয় স্বভাবের একটি অংশকে, বলি দিতে হয় তাঁর স্বাস্থ্যকে, তাঁর বিশ্বাসকে, তাঁর মর্মের গভীরতম আশা-আকাঙ্ক্ষাগুলিকে।"

বিবেকানন্দের জীবন-তরীর হাল তাঁর নিজের হাতে থাকলে সেই তরী সর্বদা নির্বিকল্প সমাধির আনন্দ-সাগরের দিকেই চলতো। কিন্তু রলাঁ ঠিকই লিখেছেন: "But he had not chosen his way of life. His mission had chosen him." গুরুর চিন্তা-ধারাকে কার্যে পরিণত করাই ছিল শিষ্যের জীবনব্রত! সেই কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তো বিবেকানন্দের বিশ্রাম বলে কিছু থাকতে পারে না! শিবজ্ঞানে জীবসেবার বিরাট কাজ রয়েছে তাঁর সম্মুখে! অজ্ঞতা, দুঃখ, দারিদ্র্য দিক থেকে দিগন্তরে বিস্তীর্ণ! জন-সাধারণের ম্লান মুখচ্ছবি চেতনার ক্ষেত্র থেকে বেমালুম সরিয়ে রেখে তিনি ভক্তির অমৃত-সিন্ধুতে ডুবে থাকবেন কেমন ক'রে? জীবনের একপ্রান্তে অদ্বৈত, আর একপ্রান্তে আর্ত-মানবতা। বিবেকানন্দ অদ্ভুত নৈপুণ্যের সঙ্গে দুয়ের মধ্যে ভারসাম্য রেখে চলেছেন! যখন ভারসাম্য রাখা সম্ভব হয়নি এবং বিবেকা-নন্দকে একটা পথ বেছে নিতে হয়েছে, বিবেকানন্দ ঝুঁকেছেন দুঃখতপ্ত প্রাণীদের আর্তিনাশের দিকে, করুণার কাছে তিনি সব-কিছুই বলি দিয়েছেন। আর এইজন্যই হয়তো বিবেকানন্দের ব্যক্তিত্বের এত বড়ো একটা আবেদন রয়েছে আমাদের কাছে।

বিবেকানন্দ মানে সমন্বয়, synthesis; বিবেকানন্দ মানে ভার-সাম্য, equilibrium; কর্মকে ধর্মের সঙ্গে মিলিয়ে দিলেন তিনি। তাঁর গুরুদেব কি বলেননি, 'নারায়ণই এইসব রূপ ধরে রয়েছেন?' দরিদ্রনারায়ণের সেবা, মূর্খদেবতার পূজা—ভগবানের উপাসনার এমন মহিমময় রূপ পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় আছে?

# পুণ্যস্মৃতি

## স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অষ্টম অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ স্বামী বিশুদ্ধানন্দ মহারাজের পুণ্য-স্মৃতিতে দুই বৎসর যাবৎ তাঁহার জন্মস্থান ২৪ পরগনার গুড়াপ গ্রামে ভক্তসম্মিলন ও আনন্দোৎসব হইতেছে, ইহা বড়ই সুখের বিষয়। যাঁহারা জীবিতকালে তাঁহাদের জ্ঞানভক্তিময় মহনীয় চরিত্রের প্রভাবে আমাদিগকে অনুপ্রাণিত ও মুগ্ধ করেন, মৃত্যুর পরও তাঁহারা আমাদের নিকট ফুরাইয়া যান না। আমাদের স্মৃতির মধ্যে তাঁহারা একটি জীবন্ত শক্তি হইয়া বাস করেন। তাঁহাদিগের কথা মনে করিয়া আমরা বিগত কালের আনন্দ ও উদ্দীপনা ফিরিয়া পাই, তাঁহাদের স্বভাবসিদ্ধ বৈরাগ্য, ধ্যানশীলতা, প্রেম ও তত্ত্বদৃষ্টির স্পর্শ অনুভব করি।

স্বামী বিশুদ্ধানন্দ মহারাজ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনে জিতেন মহারাজ বলিয়া পরিচিত ছিলেন। সঙ্ঘের অধ্যক্ষ হইবার বহু বৎসর পূর্ব হইতে তিনি তাঁহার উচ্চ আধ্যাত্মিক জীবনের জন্য শত শত সাধু ও ভক্তের আন্তরিক শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতেন। তিনি যৌবনের প্রারম্ভে শ্রীমা সারদাদেবীর যে কৃপা লাভ করিয়াছিলেন উহা তাঁহার সারা জীবনে নানা ভাবে বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছিল। স্বকীয় আধ্যাত্মিক লক্ষ্যে পৌঁছিবার সার্থকতা নিজে তিনি লাভ করিয়াছিলেন, আবার শত শত লোকের আধ্যাত্মিক জিজ্ঞাসা ও চেষ্টা তাঁহার সংস্পর্শে সার্থক হইয়াছিল।

পূজনীয় জিতেন মহারাজের প্রথম সাক্ষাৎ-লাভ করিয়াছিলাম ১৯২৭ সালে, ভুবনেশ্বর শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে। আমি তখন কলিকাতায় কলেজে পড়ি। কয়েক দিনের জন্য পুরীতে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। একদিন সকালে ট্রেনে পুরী হইতে ভুবনেশ্বর আসিলাম এবং স্টেশন হইতে সোজা শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে উপস্থিত হইলাম। পূজনীয় জিতেন মহারাজ তখন ঐ মঠের প্রধান। তিনি সস্নেহে থাকিতে ও প্রসাদ পাইতে বলিলেন। একদিন মাত্র থাকিয়া পুনরায় পুরীতে ফিরিয়া যাইব শুনিয়া তিনি একটি প্লান করিয়া দিলেন যাহাতে একদিনের মধ্যে ভুবনেশ্বরের যতটা পারা যায় দেখিয়া লইতে পারি। তদনুযায়ী ভুবনেশ্বরের মন্দিরাদি তো আমার দেখা হইলই, উপরন্তু খণ্ডগিরি উদয়গিরিও দেখা হইয়া গেল। বলিলেন, 'ঐ জঙ্গলের পাশে মাঠের মধ্য দিয়ে সোজা রাস্তা তোমায় বাতলে দিচ্ছি—ঐ মাঠ পার হয়ে চলে গেলেই খণ্ডগিরি উদয়গিরি পৌঁছে যাবে। জঙ্গল ও নিরিবিলি মাঠে ভয় পেয়ো না। তুমি ঠাকুরের ভক্ত, ভয় কি?'

শীতকাল। রাত্রে হলঘরে যেখানে আমার শয্যা ঠিক হইয়াছিল নিজে আসিয়া সেখানে দেখিয়া গেলেন যথেষ্ট কম্বলাদি দেওয়া হইয়াছে কিনা। পরের দিন অতি ভোরে বাহির হইয়া আমাকে ট্রেন ধরিতে হইবে। পূজনীয় জিতেন মহারাজ একটি লণ্ঠন হাতে লইয়া ঠিক আমাকে বিদায় দিতে আসিয়াছেন। আমার ন্যায় একজন কলেজের ছোকরার প্রতি এই পরিণতবয়স্ক সাধুর এমন অমায়িক স্নেহ ও যত্ন দেখিয়া হৃদয় অভিভূত হইয়াছিল।

১৯৩০ সালে মঠে যোগ দিয়া একটানা

চার বৎসর বেলুড় মঠে থাকিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। পূজনীয় বিশুদ্ধানন্দজী মঠে আসিলে পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজ তাঁহাকে বিশেষ স্নেহ যত্ন করিতেন দেখিয়াছিলাম। একবার ৺দুর্গাপূজায় প্রতিমা-বিসর্জনের পর মহাপুরুষজী মঠবাড়ীর দোতলার বারান্দায় চেয়ারে বসিয়াছেন। সাধু-ভক্তেরা একে একে ৺বিজয়ার প্রণাম করিয়া যাইতেছেন। মহাপুরুষজী চোখ বুঁজিয়া মায়ের নাম করিতেছেন এবং সকলকে আশীর্বাদ করিতেছেন। মাতোয়ারা ভাব। পূজনীয় জিতেন মহারাজ প্রণাম করিয়া দাঁড়াইলে মহাপুরুষজী বলিলেন:

"ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥

দেখ, সব সেই পূর্ণ ব্রহ্ম। সেই পূর্ণ ছাড়া আর কিছু নেই।" জিতেন মহারাজ হাত-জোড় করিয়া বলিলেন, "মহারাজ, আশীর্বাদ করুন আমাদেরও যেন সেই পূর্ণের উপলব্ধি হয়।"

মহাপুরুষজী। নিশ্চয়, নিশ্চয়ই হবে।

১৯৩০ সালে ৺পূজার কিছুদিন আগেকার একটি ঘটনা মনে পড়ে। সকালে পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজের ঘরে সাধু-ব্রহ্মচারীরা প্রণাম করিতে আসিতেছেন। পূজনীয় জিতেন মহারাজ ঘরে ঢুকিলেন। মহাপুরুষজী সাদরে তাঁহাকে 'এস এস' বলিয়া অভ্যর্থনা করিলেন। জিতেন মহারাজ মহাপুরুষজীর শরীরের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। মহাপুরুষ মহারাজ বলিলেন, "এসব আছেই—জরা ব্যাধি ইত্যাদি, আগমাপায়ী। আগম (উৎপত্তি) আছে, অপায় (বিনাশ) আছে। তা হোক্। জ্ঞান ভক্তি ঠিক থাক্। আর কেন? এ শরীরের দ্বারা যা হবার তা হয়েছে।"

বিশুদ্ধানন্দজী। মহারাজ, যতদিন আপনাদের শরীর থাকে ততদিনই আমাদের কল্যাণ। একটু কাছে এলে কত শান্তি হয়। আপনারা যেমন ঠাকুরকে যাতে তাঁর শরীর থাকে এই প্রার্থনা জানিয়েছিলেন, আমরাও আপনার কাছে তা করতে পারি না কি?

মহাপুরুষজী। তোমরা বেঁচে থাকো। এ শরীরে আর কেন? তোমাদের দ্বারা ঠাকুরের কত কাজ হবে।

পূজনীয় বিশুদ্ধানন্দ মহারাজ রাঁচি মোরাবাদীতে আশ্রম স্থাপন করিলে ঐ আশ্রমে কিভাবে তিনি ধ্যানজপে তদ্‌গত হইয়া থাকিতেন তাহার বর্ণনা অনেক সাধু-ব্রহ্মচারীর মুখে শুনিয়াছি। তরুণ সাধু-ব্রহ্মচারীদের তিনি জপধ্যানে খুব উৎসাহ দিতেন। তাঁহার পুণ্যসঙ্গলাভের জন্য প্রাচীন সাধুরাও কখনো কখনো রাঁচিতে কিছু সময় কাটাইয়া আসিতেন। সাধুরা কেহ গেলে তিনি অত্যন্ত আদরযত্ন করিতেন। যদিও তখনও তিনি কাহাকেও মন্ত্রদীক্ষা দেন নাই, কিন্তু রাঁচি শহরের বহু সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক ও মহিলা তাঁহাকে গুরুর ন্যায় ভক্তিশ্রদ্ধা করিতেন। তাঁহার অমায়িক সপ্রেম ব্যবহার ও উদ্দীপনাময় সৎপ্রসঙ্গ ধর্ম-পিপাসুদের হৃদয় জয় করিত।

১৯৪১ সালের ফেব্রুআরি মাসে মঠ ও মিশনের তদানীন্তন অধ্যক্ষ স্বামী বিরজানন্দ মহারাজের সহিত মানভূমের তুলিন নামক স্থানে আমাকে যাইতে হইয়াছিল। মহারাজজী দু'সপ্তাহের জন্য ওখানে একান্তে বিশ্রাম লইতে গিয়াছিলেন। যেদিন আমরা বেলুড় মঠে ফিরিব সেই দিন বিকালে পূজনীয় জিতেন মহারাজ একটি ভক্তের গাড়িতে হঠাৎ রাঁচি হইতে তুলিনে আসিয়া উপস্থিত। বিরজানন্দ মহারাজ একান্তে বিশ্রাম লইতে আসিবেন বলিয়া তাঁহার এখানে আসিবার

কথা গোপন রাখা হইয়াছিল। যাহা হউক, পূজনীয় জিতেন মহারাজ কোনওক্রমে সংবাদ পাইয়া মঠাধ্যক্ষ মহারাজকে প্রণাম নিবেদন করিতে রাঁচি হইতে বরাবর এখানে চলিয়া আসিয়াছেন। উভয়েই শ্রীশ্রীমায়ের প্রথম দিককার প্রাচীন মন্ত্রশিষ্য। এই অপ্রত্যাশিত মিলনে উভয়ের কী আনন্দ! বিরজানন্দ মহারাজ বিশুদ্ধানন্দ মহারাজকে কিভাবে সংবর্ধনা ও আপ্যায়ন করিবেন খুঁজিয়া পান না। বিশুদ্ধানন্দ মহারাজও হৃদয়ের আনন্দ ও শ্রদ্ধা কত প্রকারে প্রকাশ করিবেন বুঝিতে পারেন না। সে দৃশ্য কখনো ভুলিব না। পাশাপাশি বসিয়া দুজনের কত গভীর অন্তরঙ্গ প্রসঙ্গ চলিল!

একবার কাশীতে পূজনীয় জিতেন মহারাজের পুণ্যসঙ্গ কয়েক দিন লাভ হইয়াছিল। একদিন সন্ধ্যায় ৺বিশ্বনাথ-মন্দিরে গিয়া ভিড়ের মধ্যে দাঁড়াইয়া আরতি দর্শন করিয়া আসিলেন। পরে বলিয়াছিলেন, "শরীর বুড়ো এবং অপটু হয়েছে, তবুও অতক্ষণ দাঁড়িয়ে আরতি দেখে এসে কিছুমাত্র কষ্টবোধ করছি না। হৃদয় আনন্দে ভরে গেছে। ৺বিশ্বনাথের জীবন্ত সান্নিধ্য যেন অনুভব করলাম।"

কাশী সেবাশ্রমে পূজনীয় কেদার বাবা (স্বামী অচলানন্দজী) ও বিশুদ্ধানন্দজীর পারস্পরিক মিলন এবং কথাপ্রসঙ্গও বড় আনন্দপ্রদ ছিল। কয়েকদিন উহা উপভোগ করিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল।

স্বামী বিরজানন্দ মহারাজ অধ্যক্ষ থাকা কালে প্রতিবৎসর শীতকালে মঠে আসিতেন এবং গরম পড়িলে হিমালয়ে চলিয়া যাইতেন। পূজনীয় জিতেন মহারাজও এই সময়ে রাঁচি হইতে কয়েক মাসের জন্য মঠে আসিয়া থাকিতেন। সেই সময়ে তাঁহার দীর্ঘসময়ব্যাপী জপধ্যানের রুটিন দেখিয়া অবাক হইতাম। মঠবাড়ির দোতলায় স্বামীজীর ঘরের উত্তরের ছোট ঘরটিতে থাকিতেন। খাওয়া-দাওয়া অতি সরল—ঠিক যোগীর আহার। ধ্যানতন্ময়তা এবং ভগবদালোচনা—এই দুটিতেই তাঁহার সারা প্রাণ যেন কেন্দ্রীভূত মনে হইত। কখনো কখনো কলিকাতা হইতে আগত কোনও কোনও ভক্তের সহিত দোতলার বারান্দায় বসিয়া বহুক্ষণ ধরিয়া প্রাণমাতানো ভগবৎপ্রসঙ্গ করিতেন। বিবেক, বৈরাগ্য, ভক্তি, বিশ্বাস, নির্ভরতা প্রভৃতি সাধনগুলি তাঁহার কথার মধ্যে জীবন্ত হইয়া উঠিত।

তিনি মঠ ও মিশনের সহাধ্যক্ষ হইয়া ভারতের নানা স্থানে যখন যাইতেছেন এবং আমাদের আশ্রমসমূহে থাকিয়া শত শত ভক্তকে অধ্যাত্ম জীবনের পথ প্রদর্শন করিতেছেন, তখন শ্রীশ্রীঠাকুরের লোকতারণ শক্তি তাঁহার ভিতর অভিব্যক্ত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। যাহারা ঐ শক্তির সংস্পর্শে আসিতেছে তাহারা ধর্মজীবনে একটি নূতন প্রেরণা লাভ করিতেছে। সেই সময়ে 'উদ্বোধন' পত্রিকার সম্পাদকের ভার আমার উপর ছিল। নানা স্থানে ভক্তমণ্ডলীর নিকট কথিত তাঁহার ধর্মালোচনাগুলি কেহ কেহ লিপিবদ্ধ করিয়া উদ্বোধনে প্রকাশ করিতে পাঠাইতেন। আমাকে পূজনীয় বিশুদ্ধানন্দ মহারাজ বলিয়াছিলেন, "এই প্রসঙ্গগুলি তুমি উদ্বোধনে ছাপতে চাইলে ছাপতে পার। তবে ভাল করে এডিটিং করে দিও।"

তিনি মঠ ও মিশনের সর্বাধ্যক্ষ হইবার আগেই আমাকে আমেরিকায় চলিয়া আসিতে হয়। বেলুড় মঠে তাঁহার নিকট যখন শেষ বিদায় লইতে গিয়াছিলাম তখন তাঁহার

উৎসাহপূর্ণ বাণী, শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ আমাকে বিশেষ শক্তি দিয়াছিল। আমেরিকা হইতে তাঁহাকে মাঝে মাঝে পত্র দিতাম। তাঁহার বিপুল কার্যধারার মধ্যে সময় করিয়া তিনি নিজ হাতে আমাকে প্রত্যুত্তর লিখিতেন। কত উৎসাহ, অভয় এবং ভালবাসা ঐ সব চিঠির মধ্যে অভিব্যঞ্জিত হইত! ঐ পত্রগুলি আমার মূল্যবান সঞ্চয়।

পূজনীয় বিশুদ্ধানন্দ মহারাজ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ইতিহাসে একটি গৌরবময় স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। বাল্য, যৌবন, প্রৌঢ়কাল এবং বার্ধক্য—প্রতিটি অবস্থায় তাঁহার আধ্যাত্মিক জীবন কিভাবে বিকশিত ও সমৃদ্ধ হইয়াছিল তাহা অনুসরণ করিলে হৃদয় আনন্দে ভরিয়া যায়। যাঁহারা তাঁহাকে দেখিয়াছেন, তাঁহার সঙ্গলাভ করিয়াছেন এবং তাঁহার নিকট আধ্যাত্মিক সাধনার নির্দেশ পাইয়াছেন, তাঁহারা ধন্য।

# দুই বিহঙ্গ

শ্রীজগন্নাথ প্রামাণিক

দুই বিহঙ্গ একই কুলায়ে রয়,
প্রথম সে চাহে নীড়ের নিরালা কোণ,
পক্ষ ছড়ায়ে শক্তি করে না ক্ষয়,
আর আপনারে রাখে সে সংগোপন।

দ্বিতীয় সে খগ বিশ্ব-ক্ষুধিত ঠোঁটে
চক্ষে নিয়ত সুদূরের নেশা নিয়ে
বক্ষে বাসনা উদ্দাম নিয়ে ছোটে,
মত্ত গগন-মহুয়ার মধু পিয়ে।

লঙ্ঘে সে গিরি, কত খাদ কত গড়,
কোথাও শ্যামল নিবিড় সে বনমালা,
কোথাও তুহিন চিরতুষারের ঝড়
কোথাও সে মরু দীপ্ত অগ্নিঢালা।

আঁখি তার পিয়ে নীলের সুষমা যত
ক্লান্তিতে পাখা যত তার ভ'রে ওঠে,
তিয়াসা তাহার তত বাড়ে অবিরত,
ক্লান্ত পাখায় উন্মাদ হয়ে ছোটে।

হেথায় কুলায়-মাঝারে আছে যে পাখী
কী অসীম পাওয়া তাহার চরণে লোটে,
পরমানন্দ-বিলীন মুদিত আঁখি—
উধাও বিহগ এরই সন্ধানে ছোটে।

# যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ

## স্বামী বীতশোকানন্দ

১৩৪ বছর পূর্বে ফাল্গুনের শুক্লা দ্বিতীয়াতে হুগলী জেলার কামারপুকুর গ্রামে পিতা ক্ষুদিরামের ধর্মসদনে যে-শিশুর উদয় হয়েছিল উষার শুভলগ্নে, তাঁরই পুণ্য কীর্তির সৌরভে আজ পৃথিবী উদ্ভাসিত। তাঁকে যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ ব'লে জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে সকলে এখন শ্রদ্ধাপ্লুতচিত্তে স্মরণ করে। তাঁর অলৌকিক ত্যাগ, সুতীব্র দীর্ঘ তপস্যা, দেব-দুর্লভ পবিত্রতা, অপরিসীম ভূতদয়া, সর্বপ্রসারী সহানুভূতি, বর্ণাঢ্য ও বৈচিত্র্যময় আধ্যাত্মিক অনুভূতি তাঁর জীবনকে অনন্যতায় চিরভাস্বর করে রেখেছে।

সাধারণ মানুষ আমরা বহির্জীবনের ঘটনার প্রাচুর্যের দ্বারা মানবকে মহামানবের আসনে বসাই। এই মাপকাঠিতে যখন শ্রীরামকৃষ্ণকে পরিমাপ করতে যাই তখন আমাদের প্রয়াস অসফল হয়। ধনের আভিজাত্য, বংশের কৌলীন্য অথবা তথাকথিত শব্দঝরী বিদ্যার বৈখর্য শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনে অনুপস্থিত ছিল। কিন্তু আন্তর সম্পদের মহান্ বিভূতিমণ্ডিত তাঁর জীবন আকৃষ্ট করেছিল ধনী জ্ঞানী বৃদ্ধ যুবা সকলকে। তাদের মন-মধুকর এক নৈসর্গিক আকর্ষণে শ্রীরামকৃষ্ণের কথাসুধা-পানের জন্য সর্বদা লালায়িত থাকত। বাক্য তখনই মহাবাক্যে পরিণত হয়—যখন বাচকের পশ্চাতে থাকে তাঁর অনিন্দিত জীবন। শ্রীরামকৃষ্ণের সত্যসন্ধ জীবনের মূল সুরটির উন্মেষ হয় শৈশবেই। গ্রামের মুক্ত প্রাঙ্গণ, প্রকৃতির অবাধ সৌন্দর্য ও সংস্কৃতি তার মনপ্রাণকে অসীমের অনুসন্ধানে ব্যাকুল করে তুলত। নিবিড় ঘন-কৃষ্ণ মেঘপৃষ্ঠের উপর উড্ডীয়মান শ্বেত বলাকারাজি-দর্শনে তাঁর কবিমন শিশুবয়সেই পরম কবির সত্তার সঙ্গে একীভূত হওয়ায় তাঁর বাহ্য চৈতন্য লোপ পেয়েছিল। অধ্যয়নে অনাসক্তি তাঁর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অভিভাবকদের উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠল। পার্থিব জীবনে নিরাসক্তির নিরসনের জন্য তাঁর অগ্রজ তাঁকে কলকাতায় নিয়ে এলেন। কিন্তু সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হোল। তখন শ্রীরামকৃষ্ণ যৌবনে উপনীত। তাঁর মন জগৎকারণ জগদীশ্বরের অপাবৃত দর্শনের জন্য সতত ব্যাকুল। অদৃশ্যে তাঁর ভাগ্যবিধাতা তাঁর আধ্যাত্মিকতার পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য ক্ষেত্র নির্মাণ করলেন রানী রাসমণি-প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণেশ্বরের দেবায়তনে। এক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে তিনি ধর্মজগতের সত্যগুলির পরীক্ষা নিজের অনুভূতির কষ্টিপাথরে যাচাই করতে লাগলেন। প্রথমে তিনি কালীমন্দিরের পূজারী নিযুক্ত হলেন। তাঁর প্রশ্ন হোল, যে মূর্তির পূজা তিনি করছেন, যে-সব মন্ত্র উচ্চারণ করছেন দেবীর উদ্দেশ্যে, সেগুলি কি প্রাণহীন অর্থহীন অনুষ্ঠানমাত্র, না অতি বাস্তব প্রত্যক্ষ সত্যে প্রতিষ্ঠিত? দেবী চিন্ময়ী, না মৃন্ময়ী? তিনি যদি জাগ্রতা হন, তবে তাঁর প্রার্থনা, মন্ত্রোচ্চারণ মা কেন শুনবেন না? কেন তাঁর পূজার উপাচার দেবী স্বহস্তে গ্রহণ করবেন না? এই প্রশ্নের উত্তর তাঁকে পেতেই হবে। মাতৃদর্শনের জন্য নিজের জীবনপণ-কল্পে তিনি সাধন-সমরে অবতীর্ণ হলেন। তাঁর গন্ধর্ববিনিন্দিত কণ্ঠে ধ্বনিত হোল,

"আয় মা সাধন-সমরে, দেখি মা হারে, কি পুত্র হারে।" জনজল্পকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে হৃদয়-মন্থনকারী অবিরল ক্রন্দনধারা নিঃসৃত হ'তে লাগল, "মা, দেখা দে।" সন্তানের সেই আকুল আহ্বানে জগজ্জননী ধরা দিতে বাধ্য হলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম মাতৃদর্শন হয় সূর্যমণ্ডলের মধ্যে। কিন্তু সে-দর্শনে তো সাধকের মন স্বস্তি পায় না; ইষ্ট যে অনেক দূরে! উপনিষদের ঋষি প্রার্থনা জানিয়েছিলেন—"হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্। তত্ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে।" আদিত্যমণ্ডলস্থ ব্রহ্মের মুখ আচ্ছাদিত, হে পূষন্, আমি সত্যাশ্রয়ী, ব্রহ্মের সম্যক্ উপলব্ধির জন্য তুমি তোমার আচ্ছাদন অপসারণ কর। দেবীর কল্যাণতম শোভনতম রূপানুভব সম্ভব হয় না যতক্ষণ না তিনি অন্তিকে আসেন। অতৃপ্ত বাসনা নিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের দিন কাটতে লাগল। অন্তরতমকে নিবিড়ভাবে ঘনিষ্ঠরূপে পাবার জন্য তাঁর বিপুল প্রচেষ্টা অবশেষে সার্থক হোল। মন্দিরের পাষাণীকে তিনি প্রত্যক্ষ করলেন সাক্ষাৎ চিন্ময়ীরূপে, মায়ের ভুবন-ভরা রূপ তাঁর মনপ্রাণকে সম্পূর্ণ অধিকার করল। কিন্তু এখনও তাঁর আধ্যাত্মিক যাত্রার শেষ হোল না। মাকে তিনি বললেন, "মা, আমাকে একঘেয়ে করিসনি।" অপরূপাকে শতরূপে দেখার জন্য তাঁর নিরন্তর সাধন চলতে লাগল। বিবিধ সাকাররূপে দেখলেনও তাঁকে। আর অদ্বৈত সাধনায় প্রত্যক্ষ করলেন, যে-মাকে সূর্যমণ্ডলে দেখেছিলেন, যাঁকে চিন্ময়ীরূপে অতি নিকটে দেখেছেন, সেই মায়ের সঙ্গে তিনি অভিন্ন—"যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি।"—মা-ই ব্রহ্ম। সাধনা শুধু হিন্দুধর্মেই সীমিত রইল না। খ্রীষ্টান ও ইসলাম ধর্মেও তিনি তাঁর সাধনা দিগন্ত-বিস্তৃত করলেন। দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর তপস্যার অন্তে তাঁর সাধনার শেষ কথা তিনি ঘোষণা করলেন, "যত মত, তত পথ"। "একো নানেয়তে তদ্বদ্ ভগবান্ শাস্ত্রবর্ত্মভিঃ।" ভগবান এক, কিন্তু তিনি নানাভাবে বিরাজমান হন।

যুগপ্রয়োজনে শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব। সেই আবির্ভাবের ঐতিহাসিক তাৎপর্য-ব্যাখ্যান-প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনবেদের মূর্তিমান ভাষ্যকার স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, "এখন এমন এক ব্যক্তির আবির্ভাবের সময় হইয়াছিল, যিনি একাধারে শঙ্করের উজ্জ্বল মেধা ও চৈতন্যের অত্যাশ্চর্য সততবিস্তারী অনন্ত হৃদয়ের অধিকারী হইবেন, যিনি দেখিবেন সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে এক সত্তা, এক ভগবান ক্রিয়াশীল. দেখিবেন প্রত্যেক প্রাণীতে সেই ঈশ্বর-ই বিদ্যমান, যাঁহার হৃদয় ভারতে বা ভারতের বাহিরে দরিদ্র দুর্বল পতিত নিপীড়িত সকলের জন্য কাঁদিবে অথচ যাঁহার অত্যুত্তম অসামান্য প্রতিভা এমন মহৎ তত্ত্বসকল উদ্ভাবন করিবে, যেগুলি ভারতে বা ভারতের বাহিরে বিরোধী সম্প্রদায়সমূহের সমন্বয় সাধন করিবে, এবং এইরূপ বিস্ময়কর সমন্বয়সাধনের দ্বারা হৃদয় ও মস্তিষ্কের সামঞ্জস্যপূর্ণ এক সার্বভৌম ধর্ম প্রকাশ করিবে। এইরূপ ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং আমি কয়েক বৎসর যাঁহার চরণতলে বসিয়া শিক্ষা পাইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম।"

উপসংহারে রবীন্দ্রনাথের শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রশস্তি স্মরণ করি:

"বহু সাধকের বহু সাধনার ধারা
ধেয়ানে তোমার মিলিত হয়েছে তারা।
তোমার জীবনে অসীমের লীলাপথে।
নূতন তীর্থ রূপ নিল এ জগতে।
দেশ বিদেশের প্রণাম আনিল টানি।
সেথায় আমার প্রণতি দিলাম আনি।"*

* আকাশবাণীর সৌজন্যে

# 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'-মাধুরী

শ্রীনির্মলচন্দ্র বড়ুয়া

মহাভক্ত মহাসাধক শ্রীম।

তাঁহারই অনুধ্যানলব্ধ, শ্রীমুখকথিত ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্যজীবনকাহিনী-সংবলিত ও দিব্যবাণীমণ্ডিত "শ্রবণমঙ্গল" ভাগবতী কথা: "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত"। তৃষিত আত্মার শান্তির জন্য, সাধক অনুরাগী সন্তানের ধারণার নিমিত্ত, লোকশিক্ষার জন্য উর্ধ্বলোক হইতে প্রেরিত দিব্য প্রেরণার বাণী। শ্রীশ্রীমা ঠিকই বলিয়াছেন, "একসময় তিনিই তোমার নিকট এসকল কথা রাখিয়াছিলেন। একদিন তোমার মুখে শুনিয়া আমার বোধ হইল তিনিই ঐ সমস্ত কথা বলিতেছেন।"

সৃষ্টি-সাগরের অপর প্রান্ত হইতে ভূলোকের তটপ্রান্তে ভাসমান অমৃতলোকের দিব্যসঙ্গীত মহাজীবনকাব্য: সুরে সুরে অপরূপ মূর্ছনা, ছন্দে ছন্দে দিব্যপুরুষের অপার্থিব আভাস আর ছত্রে ছত্রে অনন্ত সুন্দরের শান্ত অমৃত স্পর্শ। এইসব দিব্য মনোহর রূপ ধ্যান করিয়া ভক্ত তৃপ্ত। এই সাগরসঙ্গীত-শ্রবণে অশান্ত হৃদয় শান্তি-স্নাত তৃপ্ত ও পবিত্র। এক একটি চিত্র দেখিতে দেখিতে মনপ্রাণ বিভোর হইয়া যায়। অতীত চক্ষের সমক্ষে প্রতিভাত হয়। ভাসিয়া উঠে এক একটি নয়নানন্দকর সুখপ্রদ শান্তিপ্রদ পট।

"চিন্তয় মম মানস হরি চিদ্ঘন নিরঞ্জন
দেখ শান্ত মনে সে প্রেমনয়নে অপরূপ
প্রিয়দরশন।
...পুলকে শিহরে জীবন।"

নরেন্দ্রনাথের সঙ্গীত শ্রবণ করিতে করিতে ঠাকুর সমাধিস্থ।

পৃথিবী স্বর্গ হইয়া উঠিয়াছে।

অপার্থিব জ্যোতিতে পৃথিবী প্লবমান। প্রকৃতি অপ্রাকৃত রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। মধুরের স্পর্শে সবই মধুময়। ধূলি পর্যন্ত মধুময়; ধরা আনন্দে মগন।

সেই-আনন্দ নিকেতন কালীবাড়ী দক্ষিণেশ্বরের প্রান্ত বাহিয়া ভাগীরথী বহু দূর পর্যন্ত পবিত্রদর্শন। আবার সৌরভাকুল সুন্দর নানাবর্ণরঞ্জিত কুসুমবিশিষ্ট মনোহর পুষ্পোদ্যান। তাহাতে আবার একজন চেতন মানুষ—অহর্নিশ ঈশ্বরপ্রেমে মাতোয়ারা হইয়া আছেন।

মাষ্টার (শ্রীম) বরাহনগরে বড় দিদির বাড়ীতে আসিয়াছিলেন। সিধুর সঙ্গে ২৬শে ফেব্রুআরি রবিবার অবসর থাকায় প্রসন্ন বাড়ুয্যের বাগানে বেড়াইতেছিলেন। সিধু বলিয়াছিলেন, "গঙ্গার ধারে একটি চমৎকার বাগান আছে—সেখানে একজন পরমহংস আছেন।"

সন্ধ্যা হয় হয়। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে মাষ্টার আসিয়া উপস্থিত। এই প্রথম দর্শন। ঠাকুর তক্তাপোষে বসিয়া পূর্বাস্য হইয়া সহাস্য বদনে হরিকথা কহিতেছেন, ভক্তেরা মেঝেতে বসিয়া আছেন—একঘর লোক। সকলেই নিস্তব্ধ।

মাষ্টার অবাক হইয়া দেখিতেছেন।

তাঁহার বোধ হইল যেন সাক্ষাৎ শুকদেব ভগবৎ-কথা কহিতেছেন আর সর্ব তীর্থের সমাগম হইয়াছে।

দেখিতেছেন আর ভাবিতেছেন—আহা! কি সুন্দর স্থান! কি সুন্দর মানুষ! কি সুন্দর কথা!

* * *

ঘরের বাহিরে আসিতে না আসিতে আরতির মধুর শব্দ হইতে লাগিল। কাঁসর, ঘণ্টা, খোল, করতালের সহিত নহবতের মধুর শব্দ আসিতে লাগিল। সেই শব্দ ভাগীরথী-বক্ষে ভ্রমণ করিতে করিতে অতি দূরে গিয়া কোথায় মিশিয়া যাইতে লাগিল! মন্দ মন্দ কুসুমগন্ধবাহী বসন্তানিল। সবে জ্যোৎস্না উঠিতেছে।

মাষ্টারের প্রথম দর্শন। দেখিয়া তিনি বিমুগ্ধ হইয়াছেন। বসন্তকালে সন্ধ্যাসমাগমে ভাগীরথীতীরে বন্ধু সমভিব্যাহারে উদ্যান-ভ্রমণে আসিয়া তিনি কি দেখিলেন—আশ্চর্য মনোহর স্থান। আশ্চর্য সুন্দর কথামৃত-শ্রবণান্তে ফিরিবার কালে আত্মভোলা মনো-মুগ্ধকর অভিনব আকর্ষণ। মাষ্টার ভাবিতে লাগিলেন—

"এ সৌম্য কে?—যাঁহার কাছে ফিরিয়া যাইতে ইচ্ছা করিতেছে? বই না পড়িলে কি মহৎ হয়? কি আশ্চর্য! আবার আসিতে ইচ্ছা হইতেছে। ইনিও বলিয়াছেন—"আবার এসো!"

পূজনীয় কথক—তথা গ্রন্থকার উপ-ক্রমণিকায় বলিয়াছেন, ঠাকুর ঈশ্বরাবেশে কখনও একাকী, কখনও বা ভক্তসঙ্গে নানাভাবে থাকিতেন। সেই সকল অবস্থা ও ভাবের কয়েকখানি মাত্র চিত্র সন্নিবেশিত হইয়াছে।

চিত্র দেখিয়া থাকি—নানা বর্ণে, নানা ভঙ্গিমায় ছবি শিল্পীমনের রূপ পরিগ্রহ করিয়া দর্শকের সম্মুখে উপস্থিত হয়, "শুধু পটে লেখা"।

"কথামৃত" সেই ধরনের চিত্রমালা নহে। অনন্তকালের পরিসরে জ্যোতির্ময় ভাবচ্ছবি ভাবনয়নে "অপরূপ প্রিয়দর্শন" স্বর্গীয় দীপ্তি বিচ্ছুরণ করিতে থাকে। হৃদয় মন পরিপূর্ণ করিয়া যাঁহারা এই চিত্র অনুধ্যান করিবেন তাঁহাদের জনম জীবন সার্থক হইবে।

অপম্রিয়মাণ অতীতের অমর আলেখ্য কালের ব্যবধান লঙ্ঘন করিয়া অম্লান ভাস্বর রূপে প্রতিভাসিত হইয়া উঠে। নয়নে আনন্দের ধারা নিঃসৃত হয়। প্রাণলোকের শান্তি-সায়র বিস্ফারিত হইয়া ক্ষুদ্র প্রাণকে দ্রবীভূত করিয়া দেয়। সুনিভৃত হৃদয়-কানন হইতে স্নিগ্ধ পুষ্পসৌরভ আসিয়া ভুলাইয়া দেয় মায়াময় জগতের তুচ্ছ প্রলোভন অথবা জগতের সত্যকে জাগ্রত করিয়া চৈতন্যের সঞ্চার করে। প্রতি তৃণকণিকা, প্রতিটি ধূলিকণা, প্রতি তরুপল্লব সজীব হইয়া উৎকর্ণ হইয়া সেই প্রেমাবতারের মধুর কণ্ঠধ্বনি নম্রনেত্রে নীরবে আকণ্ঠ পান করিতে থাকে। পাঠ করিতে করিতে সেই বাণী প্রতিধ্বনিত হয়, কত শত বৎসর আগে ক্লিষ্ট মানবের ক্লেশনিরসনার্থে বিগলিত প্রাণের তটভূমিতে, তাঁহারই সেই ভাগবত ভক্ত-হৃদয়ে যে সাড়া প্রথম আসিয়াছিল···

ঠাকুরবাড়ীতে এককালে তিন মন্দিরে—কালীমন্দিরে, বিষ্ণুমন্দিরে ও শিবমন্দিরে আরতি হইতেছে···তৎসঙ্গে ঠাকুরবাড়ার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ হইতে রসুনচৌকির সুমধুর নিনাদ শ্রুত হইতেছে।

সন্ধ্যাকালীন রাগরাগিণী বাজিতেছে। আনন্দময়ীর নিত্য উৎসব। যেন জীবকে

স্মরণ করাইয়া দিতেছে—

"কেহ নিরানন্দ হইও না। ঐহিকের সুখ দুঃখ আছেই; থাকে থাকুক—জগদম্বা আছেন। আমাদের মা আছেন; আনন্দ কর। দাসীপুত্র ভাল খেতে পায় না, ভাল পরতে পায় না—বাড়ী নাই, ঘর নাই—তবু বুকে যে জোর আছে, তার যে মা আছেন। মার কোলে নির্ভর। পাতানো মা নয়, সত্যকার মা। আমি কে, কোথা থেকে এলাম—আমার কি হবে, আমি কোথায় যাব—সব মা জানেন। কে অত ভাবে? আমার মা জানেন—আমার মা, যিনি দেহ মন প্রাণ আত্মা দিয়ে আমায় গড়েছেন। আমি জানতেও চাই না। যদি জানবার দরকার হয়, তিনি জানিয়ে দিবেন। অত কে ভাবে? মায়ের ছেলেরা আনন্দ কর।"

"সেবক-হৃদয়ে" অন্তর সিংহাসনে নিত্য-পূজিত প্রাণের ঠাকুরের শ্রীচরণে আপনাকে সম্পূর্ণরূপে বিকাইয়া দিয়া ভক্ত নিঃস্ব হইয়াছেন। আপনহারা আত্মভোলা (শ্রীম) "মণির" মনে ভাবের ফুট উঠিয়াছে:

"ভক্তিসূত্রে সাকারবাদী নিরাকারবাদী এক হয়।

হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, চারি বর্ণ এক হয়।

ভক্তিরই জয়!

ধন্য শ্রীরামকৃষ্ণ, তোমারই জয়! তুমি সনাতন ধর্মের বিশ্বজনীন ভাব আবার মূর্ত করিলে। তাই বুঝি তোমার এত আকর্ষণ! সকলধর্মাবলম্বীদের তুমি পরমাত্মীয়বোধে আলিঙ্গন করিতেছ। তোমার এক কষ্টিপাথর—ভক্তি। মুসলমানের যদি আল্লার উপর ভক্তি থাকে, সেও তোমার পরমাত্মীয়। তুমি বল যে, সব নদীই ভিন্ন দিক দেশ হইতে এক সমুদ্র-মধ্যে পড়িতেছে। সকলেরই উদ্দেশ্য এক—সমুদ্র।"

...

"শুনিলাম মহাপুরুষেরা সমাধিস্থ হয়ে সেই নিত্য পরমপুরুষকে দর্শন করেছেন, নিত্য লীলাময় হরিকে সাক্ষাৎকার করেছেন। তবে এ চর্মচক্ষে নহে—বোধহয় দিব্যচক্ষু যাহাকে বলে তাহার দ্বারা। সে চক্ষু কিসে হয়?

"ঠাকুরের মুখে শুনিলাম—ব্যাকুলতার দ্বারা হয়।"

এখন সে ব্যাকুলতা হয় কেমন করে?

"দিন কতক নির্জনে থাকা দরকার: তা এক বছর হোক, ছয় মাস হোক—তিন মাস হোক, এক মাস হোক। সেই নির্জনে ঈশ্বর চিন্তা করতে হয়, সর্বদা তাঁকে ব্যাকুল হয়ে ভক্তির জন্য প্রার্থনা করতে হয় আর মনে মনে বলতে হয়:

"আমার সংসারে কেউ নাই।

যাদের আপনার বলি তারা দুদিনের জন্য।

ভগবান আমার একমাত্র আপনার লোক।

তিনিই আমার সর্বস্ব। হায় কেমন করে তাঁকে পাব?"

...

ক্রমে সন্ধ্যা হইল। এই সূর্য চরাচর বিশ্বকে আলোকিত করিতেছিলেন। কোথায় গেলেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ মধুর নাম করিতেছেন। সকলে উদ্‌গ্রীব ও উৎকর্ণ হইয়া শুনিতেছেন। এমন মিষ্ট নাম তাঁরা কখনও শুনেন নাই—যেন সুধাবর্ষণ হইতেছে। এমন প্রেমমাখা বালকের মা মা বলে ডাকা তাঁরা কখন শুনেন নাই, দেখেন নাই। সকলের অশান্ত মন কিসে শান্তি লাভ করিল? নিরানন্দ ধরা কিসে আনন্দেভাসিল? এই প্রেমিক সন্ন্যাসী কি সুন্দর-

রূপধারী অনন্ত ঈশ্বর ? এইখানেই কি তৃষ্ণপানে পিপাসুর পিপাসার শান্তি হইবে ?

"অবতার হউন আর না হউন—ইঁহার চরণ-প্রান্তে মন বিকাইয়াছে। আর যাইবার জো নাই। ইঁহাকেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা। নামগুণকীর্তনান্তে ঠাকুর প্রার্থনা করিতেছেন। যেন সাক্ষাৎ ভগবান প্রেমের দেহ ধারণ করিয়া জীবশিক্ষা দিতেছেন কিরূপে প্রার্থনা করিতে হয়। বলিলেন, 'মা, আমি তোমার শরণাগত। দেহসুখ চাহি না; কেবল এই কোরো যেন তোমার শ্রীপাদপদ্মে শুদ্ধা ভক্তি হয়—নিষ্কাম অমলা অহৈতুকী ভক্তি। আর যেন মা তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ না হই। তোমার মায়ার সংসারের কামিনী-কাঞ্চনের উপর ভালবাসা যেন কখন না হয়। মা, তোমা বই আমার আর কেউ নাই। আমি ভজনহীন, সাধনহীন, জ্ঞানহীন, ভক্তিহীন; কৃপা করে শ্রীপাদপদ্মে আমায় ভক্তি দাও।' তিনিই শিখিয়েছেন—'বিশ্বাস, বিশ্বাস, বিশ্বাস—গুরুবাক্যে বিশ্বাস।' হে ভগবান, আমায় ঐ বিশ্বাস দাও। আর মিছামিছি ঘুরাইও না। যা হবার নয় তা খুঁজতে যাওয়াইও না। আর যা শিখিয়েছেন যেন তোমার পাদপদ্মে শুদ্ধাভক্তি হয়। আর যেন তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ না হই। কৃপা করে এই আশীর্বাদ কর।"

গিরিশের কি বিশ্বাস—! দুদিন দর্শনের পরই বলেছিলেন :

"প্রভু! তুমিই ঈশ্বর, মানুষদেহ ধারণ করে এসেছ আমার পরিত্রাণের জন্য।" গিরিশ ঠিক তো বলেছেন—ঈশ্বর মনুষ্যদেহ ধারণ না করিলে ঘরের লোকের মতো কে শিক্ষা দিবে? কে জানিয়ে দিবে, ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু? কে ধরায় পতিত দুর্বল সন্তানকে হাত ধরে তুলবে? কে কামিনী-কাঞ্চনে আসক্ত, পাশবস্বভাবপ্রাপ্ত মানুষকে আবার অমৃতের অধিকারী করবে? আর তিনি মানুষরূপে সঙ্গে সঙ্গে না বেড়ালে যারা তাঁকেই অন্তরাত্মা বলে জানে, যাদের ঈশ্বর বই আর কিছু ভাল লাগে না—তারা কি করে দিন কাটাবেন?

তাই—

"পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥"

শ্রীরামকৃষ্ণের অদৃষ্টপূর্ব প্রেমের কথা ভাবিতে ভাবিতে মণি (শ্রীম) সেই তমসাচ্ছন্ন রাত্রিমধ্যে রাজপথ দিয়া বাড়ী ফিরিয়া যাইতেছেন ও ভাবিতেছেন—"কি ভালবাসা গিরিশকে!" এমনও বলছেন না যে "আমার জন্য গৃহ, পরিজন, বিষয়, কর্ম সব ত্যাগ করে সন্ন্যাস অবলম্বন কর।" এর মানে এই—"সময় না হলে হয় না। তীব্র বৈরাগ্য না হলে ছাড়লে কষ্ট হবে।" ঠাকুর যেমন নিজে বলেন—ঘায়ের মামড়ী, ঘা শুকুতে না শুকুতে ছিঁড়লে রক্ত পড়ে কষ্ট হয়। কিন্তু ঘা শুকিয়ে গেলে মামড়ী আপনি খসে যায়। যাদের অন্তর্দৃষ্টি নাই তারা বলে এখনি সংসার ত্যাগ কর।

"ইনি সদ্‌গুরু, অহেতুক কৃপাসিন্ধু, প্রেমের সমুদ্র, জীবের কিসে মঙ্গল হয়, এই চেষ্টা নিশিদিন করিতেছেন।"

# শিক্ষাপ্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ

শ্রীদেবব্রত মজুমদার

শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য কি? এক কথায় এর উত্তর দেওয়া অসম্ভব, কারণ ব্যক্তি বিশেষে এবং রাষ্ট্র হিসাবেও শিক্ষা সম্বন্ধে ধারণার বিশেষ পার্থক্য রয়েছে। তবে মোটামুটি ভাবে বলা যায়— শিক্ষা মানুষের দেহ ও মনকে এমনভাবে বিকশিত করবে, যা নিজের কল্যাণের সহিত দেশ ও জাতির কল্যাণে লাগে।

আজকের শিক্ষাব্যবস্থার দিকে তাকালে আমরা দেখি—এই শিক্ষাই যেন আমাদের দেহ ও মনকে সবদিক দিয়ে চেপে ধরেছে। অর্থনৈতিক চাপ শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্যকে কুয়াশাচ্ছন্ন করে ফেলেছে। শিক্ষার সঙ্গে অবশ্যই অর্থ ও সম্পদের সম্পর্ক থাকবে, তবে শিক্ষা বলতে কেবলমাত্র অর্থ-উপার্জনের যোগ্যতা-অর্জন মাত্র নয়, আরও কিছু। যেদিন থেকে আমাদের শিক্ষার উদ্দেশ্য কেবলমাত্র অর্থ-উপার্জনে এসে দাঁড়াল, সেই দিন থেকেই শিক্ষা তার আসল পথ থেকে বিচ্যুত হল। আমরা তখন কোনরকমে কতকগুলি তথ্য মাথায় ঠেসে পুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের তকমা আদায়ের জন্য উঠে-পড়ে লাগলাম। ঠাকুর রামকৃষ্ণ অনেক দুঃখেই বলেছিলেন 'চালকলা-বাঁধা বিদ্যে শিখে কি হবে?' এ যেন ধূপধুনার প্রচণ্ড ধোঁয়ায় দেবতাকে আর দেখা গেল না। মানসিক উৎকর্ষ-সাধন, শরীরগঠন—এসব কথা চাপা পড়ে রইল।

তাছাড়া শিক্ষার উপায়েও রয়ে গেল একটা প্রচণ্ড ভুল। শিক্ষা অর্থে স্বামীজীর মতে, 'মানবের মধ্যে পূর্ব হইতেই যে দেবত্ব রহিয়াছে তাহাই প্রকাশ করা।'[১] কিন্তু শিশুকাল হতে যৌবন অবধি বই মুখস্থ করার সময় একটি-বারও মনে হল না আমাদের একটা মস্তিষ্ক আছে যার সাহায্যে পুঁথির বাইরেরও কোন বিষয় চিন্তা ভাবনা করতে পারি। অর্থাৎ পুঁথিগত বিদ্যা আয়ত্ত করতে গিয়ে স্বকীয়তা জলাঞ্জলি দিলাম। তাই স্বামীজী বলেছেন, 'শিশুদের শিক্ষা দিতে হইলে তাহাদের প্রতি অগাধবিশ্বাসসম্পন্ন হইতে হইবে, বিশ্বাস করিতে হইবে যে, প্রত্যেক শিশুই ঈশ্বরীয় শক্তির আধারস্বরূপ আর আমাদিগকে তাহার মধ্যে অবস্থিত নিদ্রিত ব্রহ্মকে জাগ্রত করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। শিশুদের শিক্ষা দিবার সময়ে আরও একটি বিষয় আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যাহাতে তাহারাও চিন্তা করিতে শিখে—সেই বিষয়ে তাহাদিগকে উৎসাহ দিতে হইবে।'[২] কিন্তু বাস্তবে আমরা ধরে নিই ছাত্রদের মাথাটি একটি শূন্যপাত্র—আমাদের কাজ ঠেসে ঠেসে তাতে বিদ্যে পোরা—মাথার মধ্যে ছাত্রের নিজস্ব যেন কিছু না থাকে। এইভাবে যুব-শক্তির অপচয় করে আমরা বহু অর্থব্যয়ে বহু পরিশ্রমে কতকগুলি তোতাপাখী তৈরি করে গেছি। যারা দেশের সম্পদে পরিণত হতে পারত তারা আজ হয়েছে দেশের সমস্যা।

স্বামীজী বার বার বলেছিলেন, 'আমাদের দেশে সেই শিক্ষা চাই—যে-শিক্ষায় থাকবে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সঙ্গে বেদান্ত, মূলমন্ত্র ব্রহ্মচর্য শ্রদ্ধা আর আত্মপ্রত্যয়।'[৩] অর্থাৎ ভারতের আধ্যাত্মিকতা, ধর্ম ও পাশ্চাত্যের জড়

১, ২ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৩৫২
৩ ঐ ৯ম খণ্ড পৃ ৪০১

বিজ্ঞান উভয়কেই সমান গুরুত্ব দিতে হবে।

দেশের নিদারুণ দারিদ্র্য তাঁকে অহরহ পীড়া দিত। তাই দেশের দারিদ্র্য দূর করার জন্য বিজ্ঞানের প্রয়োগের, শিল্পের প্রসারের ওপর তিনি বিশেষভাবে জোর দিয়েছিলেন, তিনি একবার কথাপ্রসঙ্গে বলেছিলেন, 'যদি কতকগুলি অবিবাহিত graduate পাই তো জাপানে পাঠাই। সেখানে গিয়ে কারিগরী শিক্ষা পেয়ে আসে।'[8] শিক্ষা জনসাধারণকে আত্মনির্ভরশীল করুক—এই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। তিনি বলতেন, 'Head, hand and heart—তিনটিরই উন্নতি করিতে হইবে।'

মন ও বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেহকেও সমান তালে উন্নীত করতে হবে। নিজের শক্ত সমর্থ বলিষ্ঠ দেহটির প্রতি কোন দিনই তিনি অকৃতজ্ঞ হননি। প্রায়ই তাঁকে উপনিষদের উদ্ধৃতি তুলে বলতে শোনা যেত, 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ'। আমাদের কর্মমুখর জীবনে জ্ঞান ও বুদ্ধির চেয়ে সবল সুস্থ দেহের প্রয়োজন কোন অংশে কম নয়—এটা সকলেই স্বীকার করবেন। পুরুষদের শিক্ষার মত স্ত্রীশিক্ষার উপরেও স্বামীজী সমধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। স্ত্রীজাতির অবহেলায় জাতিকে তিনি একপক্ষ-বিশিষ্ট পক্ষীর সঙ্গে তুলনা করেছেন। পাখিকে উড়তে গেলে তাকে দুটো ডানারই সাহায্য নিতে হয়, তেমনি জাতির অগ্রগতিতে স্ত্রীপুরুষ উভয়েরই প্রয়োজনীয়তা আছে। তাই যে-যুগে মেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর ব্যাপারে প্রচণ্ড বাধা ছিল, সে-যুগে স্বামীজী সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছেন, "ভারতের কল্যাণ স্ত্রীজাতির অভ্যুদয় না হলে সম্ভব হবে না।" "সাধারণের মধ্যে আর মেয়েদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার না হলে কিছুই হবার জো নেই।" তবে বলেছেন, তার জন্য ভারতীয় আদর্শকে যেন কোন অবস্থাতেই ত্যাগ করা না হয়। "যাদের মা শিক্ষিতা ও নীতিপরায়ণা হন, তাদের ঘরেই মহৎ লোক জন্মায়।" আবার ভারতের নারীজাতির সমস্যাবলীর সমাধানকল্পে তিনি এক মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছেন। তিনি কোন নারীসমস্যা সমাধানের জন্য পুরুষের সর্দারি বরদাস্ত করতেন না। তিনি বলতেন, "নারী-জাতিকে শিক্ষিত করে তোল, ব্যস—তাহলেই তারা নিজেরাই নিজেদের সমস্যার সমাধান করতে পারবে।" তাদের মৌলিকত্ব, আত্ম-বিশ্বাসকে স্বামীজী খর্ব করতে চাননি।

স্বামীজীর শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল প্রকৃত মানুষ গড়ে তোলা—যে-মানুষ সত্য বলতে, সত্যকে জানতে ভয় করবে না, যে-মানুষ আত্মপ্রত্যয়ে হবে দৃঢ় আবার তেমনি বিনয়ীও। পাশ্চাত্যের প্রবল কর্মপ্রেরণা ও বিজ্ঞানবাদী মনের সঙ্গে থাকবে প্রাচ্যের শ্রদ্ধা, ভক্তি, ব্রহ্মচর্য ও সহমর্মিতা। আজ আমরা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভব করি, কিন্তু কেবলমাত্র স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠা করে শিক্ষাখাতে মোটা টাকা ব্যয় করলেই দায় খালাস হবে না। শিক্ষার প্রকৃতি নিয়েও চিন্তা করতে হবে।

মনে রাখতে হবে, কাউকে ইঞ্জিনিয়ার ডাক্তার শিক্ষক তৈরি করার আগে তাকে 'মানুষ' করে তুলতে হবে।

৪ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৯ম খণ্ড, ৩০৬ পৃঃ

# অন্নং বহু কুর্বীত

শ্রীঅমরনাথ কুণ্ডু

বাঁকুড়ার বঙ্গবিদ্যালয়-প্রাঙ্গণ থেকে বর্ধমানের বড়শুল পর্যন্ত ঘুরে এলাম কয়েক মাস পূর্বে। আমরা চাই শান্তি, পরস্পর পরস্পরের প্রীতির ডোরে দৃঢ়ভাবে আটকে থাকতে আর দুবেলা পেটভরে দুটো খেতে। আমরা চাই জীবনের ব্যর্থতার হাত থেকে নিষ্কৃতি। চাই এমন খাদ্য যাতে জনজীবনের স্বাস্থ্য হয় উন্নত, অজ্ঞানের স্থানে জ্ঞানের বসতি, আলস্যের পরিবর্তে কর্মকুশলতা, রোগের বিনিময়ে আরোগ্য আর ভগবানের দেওয়া চোখদুটোতে সত্য দেখার জন্য কর্তব্যজ্ঞান।

এই জোরালো ঘোরালো দুর্দিনে 'অন্নং বহু কুর্বীত' অর্থাৎ অন্ন বর্ধন কর, ইহাই যেন হয় আমাদের মূলমন্ত্র। বিশাল ভারতবর্ষে লোক-সংখ্যাবৃদ্ধি পৃথিবীতে দ্বিতীয়; চিন্তাবিদ্‌দের মতে প্রতি তিন সেকেণ্ডে ভারতে একটি ক'রে শিশু জন্মলাভ করে, কিন্তু তার তুলনায় মৃত্যুহার খুবই কম। কাজেকাজেই এটা খুব পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে যে, মৃত্যুর তুলনায় নবজাতকের সংখ্যা যদি অধিক হয়, তাহলে খাদ্যাভাব দেখা দেবেই, অবশ্য আনুপাতিক হিসাবে খাদ্যবৃদ্ধি না পেলে। তাহলে উপায়? উপায় একমাত্র অন্নবর্ধন করা: বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে পুষ্টিকর খাদ্যোৎপাদন। আমাদের ছাড়তে হবে বাবুয়ানা, বাহ্যিক আড়ম্বর ঝেড়ে ফেলতে হবে আর তা না হলে আমাদের বিপদ রাখার জায়গা পর্যন্ত পাওয়া যাবে না। এক ইঞ্চি পরিমিত জমিও যেন পড়ে না থাকে—তার জন্য আমাদের প্রত্যেককেই সচেষ্ট থাকতে হবে আর সোনা ফলিয়ে নিতে হবে। স্বামীজীর মতে মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হবে, কঠোর পরিশ্রমী হতে হবে, কর্মের মধ্যেই আনতে হবে জীবনের পরিপূর্ণতা। খাল কেটে দূরদূরান্ত থেকে জল এনে, ঊষর জমি উর্বর করে, পুষ্ট বীজ রোপণ করে অন্ন বর্ধন করতে হবে—নিরলস কর্ম-প্রচেষ্টায় এটা একমাত্র সম্ভব। আমরা কাজে না নামার পূর্বে ফলটার বেশী চিন্তা করি—যার পরিণাম এত অধোগতি। কর্মক্ষেত্রে নেমে পড়াটায় সবচেয়ে বড় সাহসিকতার পরিচয়, ফল আমরা যাই পাই না কেন, আগে কাজে নামতে হবে।

আজ আমাদের দেশের ছোটখাটো মধ্যবিত্ত চাষীদের সবচেয়ে বড় অভাব—মনোবল ও অর্থবল। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চাষ করাব পদ্ধতি শেখাতে হবে গ্রামে গ্রামে কৃষিশিক্ষণ-কেন্দ্র খুলে। দীর্ঘমেয়াদী ও বিনাসুদে অর্থ সাহায্য দিয়ে তাদের নৈরাশ্যভাবাপন্ন মনের ভেতর আশার আলো জ্বালাতে হবে, অনুপ্রেরণা যোগাতে হবে। অর্থের ও জলের অভাবে ছোটখাটো ও মধ্যবিত্ত চাষীরা অত্যন্ত দুর্বল ও ভীত। তাই পুরানো পুকুর সংস্কার করে বা নূতন জলাধার তৈরি করে বা নদীনালা বেঁধে জলসেচের উপযোগী করে দিতে হবে। অনুন্নত ও অনুর্বর মাঠকে ট্রাক্টর দিয়ে তৈরি করে দিতে হবে, গাঁইতি ও কোদাল দিয়ে কতটুকু জমিই বা তৈরি করতে পারা যায়। যন্ত্রদানবের যুগে উপরিউক্ত যন্ত্রের সাহায্য যেন তারা শীঘ্রই পায় জমি তৈরি করার জন্য। যে হারে জন-সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে তা খুবই ভয়াবহ। শুধুমাত্র হাতে কলমে কৃষি শিক্ষা দিতে হবে এবং

উৎপাদনের সহায়ক হিসাবে যন্ত্রোৎপাদন করতে হবে।

সরকার জনগণের সৃষ্টি, কিন্তু জনগণ সরকারের সৃষ্টি নয়। তাই জনগণকে নিশ্চয়ই সচেষ্ট থাকতে হবে যাতে তারা সরকারের নিকট তাদের ন্যায্য দাবী আদায় করে নিতে পারে; কিন্তু সরকারের ঘাড়ে সবকিছু চাপিয়ে দেওয়া ঠিক নয়, কারণ জনগণেরও কিছু করার আছে। "সমবায় এব সাধুঃ।" জনগণকে লক্ষ্য রাখতে হবে জমির সীমানা নিয়ে যেন ঝগড়া না বাধে, পরস্পরের প্রীতি ও সৌহার্দ্য যেন নষ্ট না হয়। ধনীদের এমনকি সৎ-শিক্ষিতেরও লক্ষ্য রাখা উচিত যাতে এই নিরক্ষর ছোটখাটো ও মধ্যবিত্ত চাষীরা ফসল উৎপাদনে পিছপা না হয়, যে-কোন উপায়ে (সৎ) তাদের অনুপ্রেরণা যোগাতে হবে, সাহস দিতে হবে।

সব দেশের শিক্ষকদের এখানে সবচেয়ে বড় দায়িত্ব আছে। তাঁরা মানুষ গড়েন, জাতিগঠন ও দেশগঠনের কাজ মূলতঃ তাঁদেরই হাতে। জাতীয় স্বাস্থ্য ও জাতীয় সম্পদ উন্নত করা তাঁদের পক্ষে অতীব সহজ বলে মনে করি যদি তাঁরা দেশ-ও জাতি-গঠনের জন্য অন্ততঃ কিছুটা স্বার্থ ত্যাগ করতে পারেন। দেশগঠনের সবচেয়ে বড় হাতিয়ারটাই শিক্ষকসমাজের কাছে। আপনারা বর্তমানের নৈরাশ্যজনক রাজনীতি-ক্ষেত্র থেকে ছেলেদের নিয়ে যান সেই শান্তির রাজ্যে যেখানে হিংসা নেই, দ্বন্দ্ব নেই, খাদ্যাভাব নেই, অরাজকতা নেই, নিয়ে যান সেখানে যেখানে আছে ছেলেমেয়েদের নিরলস কর্মপ্রচেষ্টা, আছে সুখ-শান্তি, প্রেম-মৈত্রী ও ভালোবাসা।

স্বামীজীর মতে সাম্য অর্থে সমান অবস্থিতি নয়, সমান অধিকার। মানুষে মানুষে প্রভেদ আছে—এটা প্রকৃতির নিয়ম। কাজেকাজেই সকল মানুষ একই রকম হবে—এটা প্রলাপ ছাড়া আর কিছু নয়, কারণ একজন ঝাড়ুদার একটা কলেজের অধ্যক্ষের সমপর্যায়ভুক্ত নয়, কিন্তু রাষ্ট্র কর্তৃক আইনসিদ্ধ সমস্ত অধিকার দু'জনেরই সমান সমান, এখানে সাম্য থাকা চাই।

একজনকে দরিদ্র করে অপর জনকে বড় করার পিছনে কোন যৌক্তিকতা থাকতে পারে না। শ্রেণী-সংঘর্ষের পিছনে মঙ্গলময় চিন্তা থাকলেও তার দ্বারা সাম্য বজায় থাকে না। বিদ্যাবুদ্ধির দ্বারা অনুন্নত শ্রেণীকে উন্নত করা মানুষের পরিচয়। হিংসাকে দূরে রেখে সকল কাজ হাসিল করে নিতে হবে, আমাদের হতে হবে সত্যাচারী বিপ্লবী। প্রত্যেকের সহিত প্রত্যেকের চিন্তার সমন্বয় করার জন্য সচেষ্ট থাকতে হবে; লক্ষ্য রাখতে হবে মতানৈক্য দ্বারা যেন সংঘর্ষের সৃষ্টি না হয়, জাতীয় সম্পদের ক্ষতি না হয়, প্রীতির ডোরে যেন ছেদ না পড়ে। পঞ্চাশ বছরেরও পূর্বে মহামতি গোপালকৃষ্ণ গোখলে বাঙালীর ধীশক্তি ও চিন্তাশীলতার প্রশংসা করে বলে-ছিলেন, "What Bengal thinks today, India thinks to-morrow." সত্যই সেকালে চিন্তার রাজ্যে একচ্ছত্র অধিপতি ছিল বাঙালী, কিন্তু আজ তার এই উক্তি হাস্যাস্পদ বলে মনে হয়। অন্যান্য প্রদেশবাসীদের কায়িক শ্রমের তুলনায় আমরা অনেক পিছনে আছি। অলসতার জন্য আমাদের চিন্তারাজ্যে ভাঁটা পড়েছে।

আমরা এখন এক অদ্ভুত চিন্তারাজ্যে বিচরণ করছি; আমাদের অবস্থাটা যেন তামসিকতায় ডুবে থেকে বলছি, 'বেশ আছি'।

হয়তো বলবো, যেহেতু আমাদের দেশে

মহাপুরুষেরা আসেন ধর্মকে রক্ষা করার জন্য, পাপীকে পাপ থেকে মুক্ত করার জন্য, এমনকি স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ যখন বলে গেছেন "সম্ভবামি যুগে যুগে", কাজে-কাজেই আমরা আর কি করবো ধর্মের জন্য, দেশের জন্য, দশের জন্য, তিনি তো ঠিক সময়ে আসবেনই! সত্যিই এ-ই যদি আমাদের মনোভাব হয় তাহলে এর চেয়ে দুর্ভাগ্য আর নেই। এক্ষেত্রে আমরা ভগবান কৃষ্ণকে মেনে নিলাম, মহাপুরুষদের মেনে নিলাম। তবুও আমরা কেন ভুলে যাই তাঁদের কথামত চলতে? কেন ভুলে যাই ভগবান কৃষ্ণের সেই মহতী বাণী—"ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্তোত্তিষ্ঠ পরন্তপ"? কেন ভুলে যাই স্বামীজীর মহতী বাণী—"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত"? এর প্রধান কারণ আমাদের অলসতা ও জড়তা; *হাজার বছরের পরাধীনতা এর একমাত্র* কারণ। তাই ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে স্বামীজী ইংলণ্ড থেকে তাঁর গুরুভাই স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে একখানি পত্রে লিখেছিলেন—"মহা রজোগুণের কাজ, আমাদের দেশময় খালি তমস্, আমাদের দেশে রজস্ চাই, তারপর সত্ত্ব—সে ঢের দূরের কথা।" আমাদের এই তামসিকতার ভাব এখনো কেটে যায়নি। তাই আজ এই দুর্দিনে আমাদের সমস্বরে চিৎকার করে বলতে হবে—"উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত" ওঠ, জাগ—"কাজ কর, কাজ কর"। পর-মুখাপেক্ষী হয়ে নিজের মাথাটা অপরের কাছে বিকিয়ে দেওয়া উঁচুদরের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় নয়। কোমর বেঁধে মাঠে নেমে পড় কোদাল হাতে, ফসল ফলাও, সোনা ফলাও, অন্ন বর্ধন কর, খাদ্যাভাব দূর কর, নিজের পায়ে দাঁড়াও। শব্দের প্রতিটি কম্পনে শুধু নয়, জীবন দিয়ে আমরা যদি এই সুর ধ্বনিত করে তুলতে পারি তাহলে হয়তো বা তার প্রতিধ্বনি কিছুটা কাজে আসতে পারে।

আজ স্বাধীনতা পাওয়ার তেইশ বছর পরও আমরা খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতে পারিনি; অথচ রাশিয়ার দিকে চেয়ে দেখুন তার সংঘশক্তি, বিদ্যানুশীলন, বৈজ্ঞানিক উৎকর্ষ। আরও চেয়ে দেখুন নূতন ইহুদী রাষ্ট্র ইস্রায়েলের দিকে। যে ইস্রায়েল দেশকে তার প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলি চেয়েছিল আঁতুড়ঘরে সম্পূর্ণ নষ্ট করতে, কিন্তু সে-প্রচেষ্টা তাদের সফল হয়নি। বীরপদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে তারা দেশের গঠনমূলক কাজে তাদের কর্মকুশলতা ও নির্ভীকতার সহায়ে। আত্ম-বিশ্বাসী ও কঠোর পরিশ্রমী বলে আজ এরা স্ব-নির্ভরশীল। অথচ তারা স্বাধীনতা পায় ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই মে তারিখে; সাথে *সাথে যেন আমাদেরও স্মরণ থাকে যে, আমরা* স্বাধীনতা পেয়েছি এরও পূর্বে অর্থাৎ ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই আগস্ট তারিখে।

সত্যিই আমরা দেখেও শিখতে পারিনি—না আমরা দেখতে শিখিনি—না আমাদের চোখ নেই? বুদ্ধের কথা মনে পড়ে? তিনি কি করে শিখেছিলেন?—দেখে, প্রত্যক্ষ জ্ঞানসহায়ে। আর আমরা আলস্যভারে বদ্ধ অন্ধ কোণে কূপ-মণ্ডুক হয়ে হাতপা গুটিয়ে বসে থাকি মহাপুরুষদের আশায়। তাই স্বামীজী এই তামসিকতাকে উপলব্ধি করে আলাসিঙ্গা মহাশয়কে একখানি পত্রে লিখেছিলেন "হে ভ্রাতঃ! এই দাসভাবাপন্ন জাতের নিকট কিছু আশা করা উচিত নয়। ব্যাপারটা স্পষ্টভাবে দেখলে কোন আশার কারণ থাকে না বটে, তথাপি তোমাদের সকলের সামনে খুলেই বলছি—তোমরা কি এই মৃত জড়-পিণ্ডটার ভেতর, যাদের ভেতর ভাল হবার

আকাঙ্ক্ষাটা পর্যন্ত নষ্ট হয়ে গেছে, যাদের ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্য একদম চেষ্টা নাই, যারা তাদের হিতৈষীদের উপরই আক্রমণ করতে সদা প্রস্তুত, এরূপ মড়ার ভেতর প্রাণসঞ্চার করতে পারো ? তোমরা কি এমন চিকিৎসকের আসন গ্রহণ করতে পারো, যিনি একটা ছেলের গলায় ঔষধ ঢেলে দেবার চেষ্টা করছেন,—এদিকে ছেলেটা ক্রমাগত পা ছুড়ে লাথি মারছে এবং ঔষধ খাব না বলে চিৎকার করছে ?"

পরিশেষে এটাই বলি,—"এস, আমরা মানুষ হই।" এস, আমরা কাজ করি। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে প্রচণ্ড কর্মে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে, অনাবাদী মাঠকে চাষের উপযোগী করে সোনা ফলিয়ে নিতে হবে—অন্ন বর্ধন করতেই হবে ; কারো আশায় পথ চেয়ে বসে থাকা চলবে না, নিজেই নিজেকে চালিয়ে নিয়ে যেতে হবে কর্মের রাজ্যে সত্যকে খুঁজে বের করার জন্য।

# রিক্ততায়

**ডঃ মতিলাল দাশ**

সবার কাছে চেয়েছি যশ, ভেবেছি মোরে জ্ঞানী,
আমি যে হায় কত যে দীন, নিয়েছি প্রভু জানি
তোমার দেওয়া দুখের অভিঘাতে।
তোমার দুখ সোনা হয়ে এল জীবনতটে,
আপন বলি তারে আমি বরণ করি বটে
বরণ করি কাতর অশ্রুপাতে।
সবার কাছে চেয়েছি মান, ভেবেছি মোরে মানী
বালুর 'পরে গড়েছি ভিত, কভু না ইহা জানি
ভাঙ্গবে ইহা স্রোতের অভিঘাতে।
ভুল করেছি ; আজকে হেরি শূন্য গেহে মম
রিক্ত আমি সবার চেয়ে ভিক্ষু নিরুপম
ক্লিন্ন যেন কঠোর হিমবাতে।
সবার কাছে চেয়েছি দান চেয়েছি ভালবাসা
বুঝিনি হায় শূন্য হবে প্রাণের যত আশা
অমারাতির অন্ধকারের মত।
আশার পরে আশার রাশি শৈলচূড়ার সম
দিনের পরে দিনে কেবল বেড়েই গেছে মম
ভাবিনি হায় এমনি হবে নত।
এবার এলেম সকল ছাড়ি তোমার কাছে রাজা
দাও আমারে আপন হাতে যা কিছু দেবে সাজা
লও আমারে তোমার কোলে তুলি।
শুধু তোমায়, আর কিছু নয়, রাখবো আমার চিতে।
সর্বহারা আঁধার পথে তোমায় বরি' নিতে
তোমায় ডাকি সকল ব্যথা ভুলি।

# স্বামী বিবেকানন্দের অনুবাদ-গ্রন্থ : 'শিক্ষা'

[ পূর্বানুবৃত্তি ]

শ্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোষ

'অহিংসা' শব্দটির তাৎপর্য সম্বন্ধে আমাদের ধারণা যে অনেক সময় কতো অস্পষ্ট হয়ে পড়ে, সে-প্রসঙ্গে স্বামীজীর একটি কৌতুক-কণিকা স্মরণীয়—"এক 'অহিংসা পরমো ধর্মে'র বাড়ীতে ঢুকেছে—চোর। কর্তার ছেলেরা তাকে পাকড়া ক'রে বেদম পিটুছে। তখন কর্তা দোতলার বারাণ্ডায় এসে, গোলমাল দেখে, খবর নিয়ে চেঁচাতে লাগলেন, 'ওরে মারিস-নি ; অহিংসা পরমো ধর্মঃ।' বাচ্চা অহিংসারা মার থামিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, 'তবে চোরকে কি করা যায় ?' কর্তা আদেশ করলেন, 'ওকে থলিতে পুরে জলে ফেলে দাও।' চোর জোড়হাত করে আপ্যায়িত হয়ে বললে, 'আহা, কর্তার কি দয়া।'"[১]

আহারাদির বিষয়ে যাঁরা কেবল 'অহিংসার দিক থেকে নিরামিষ আহারের পক্ষপাতী তাঁদের পক্ষে তরি-তরকারীজাতীয় জিনিস খাওয়া কতটা সমীচীন তাও ভেবে দেখা প্রয়োজন। কারণ সাধারণ প্রাণিবধের চেয়ে মূক উদ্ভিদ-সংহারে তো আরো বেশী অপরাধের সম্ভাবনা।

সেদিক থেকে স্পেন্সার হিংসা-অহিংসার তত্ত্ব নিয়ে মাথা ঘামাননি। শারীরিক পুষ্টির দিক থেকেই তিনি মাংসাহার প্রশস্ত মনে করেছেন। এমন কি, তিন বছর বয়স থেকেই শিশুকে মাংসাহারে অভ্যস্ত করানো যেতে পারে বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয়, স্পেন্সার নিজে একবার মাস ছয়েক নিরামিষ-আহারের পরীক্ষা করে এ বিষয়ে নিশ্চিত হয়েছিলেন যে, আমিষ-আহারই শরীরের পক্ষে যথার্থ পুষ্টিকর। তবু, নিরামিষ-আহারের দ্বারাও যে সুগঠিত দেহ হতে পারে, তার প্রমাণ বিভিন্ন প্রাণী ও নানা দেশের মানুষের মধ্যে যথেষ্টই মেলে। স্পেন্সারের মাংস-বা আমিষপ্রীতির উপকারিতা সাধারণ-ভাবেই প্রযোজ্য।

"একটি ঘোড়া ঘাস খাইলে হৃষ্টপুষ্ট হয় বটে, কিন্তু পুষ্টিকর-খাদ্যপালিত ঘোটকের ন্যায় কার্যক্ষম হইতে পারে না। মাংসাশী ইংরাজ শ্রমজীবীরা অন্যান্য দেশের শ্রমজীবী অপেক্ষা অধিক ক্লেশসহিষ্ণু এবং কার্যক্ষম। আর অপর-দেশীয়দিগকে মাংসভক্ষণ করাইলে তাঁহারা ইংরাজের ন্যায় কার্যক্ষম হয়। অতএব ইহাদের প্রভেদ জাতিগত নহে—খাদ্যগত। আমরা ছয়মাস কাল নিরামিষ ভক্ষণ করিয়া দেখিয়াছি যে, ইহার দ্বারা মানসিক এবং শারীরিক শক্তি কমিয়া যায়।"[২]

একটি শিশুর পক্ষে কতটা আহার প্রয়োজন, এ বিষয়ে স্পেন্সারের চিন্তাধারার মৌলিকতা লক্ষণীয়। অতিভোজন ও অল্পভোজন—এ দুয়ের মধ্যবর্তী পন্থা গ্রহণ করে স্পেন্সার শিশুদের ইচ্ছানুযায়ী আহার দেওয়ারই পক্ষপাতী। তাঁর মতে, "যদি ক্ষুধার অনুসরণ করা প্রাকৃতিক নিয়ম হয়, যদি সমস্ত ইতর-প্রাণী এবং অধিকাংশ অসভ্য জাতির পক্ষে সুস্থ ক্ষুধাই একমাত্র আহার বিষয়ে নেতা হয়, তাহা হইলে মানবেরও তাহাই হইবে।"[৩] শিশুর ক্রমবর্ধমান শরীরের সঙ্গে

১ বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পরিব্রাজক : পৃ : ৮৯

২৩, স্বামী বিবেকানন্দ-অনুদিত হার্বার্ট স্পেন্সারের 'এডুকেশন' বা 'শিক্ষা' : বসুমতী সংস্করণ ; পৃ : ৯১ ৯২ ; ৮৭

ক্ষুধার যে-সম্পর্ক, একজন পরিণতবয়স্ক ব্যক্তির পক্ষে তা নয়।

অনেক সময় আমরা শিশুদের অতিরিক্ত খাওয়ার লোভ দমন করার অজুহাতে যতটা প্রয়োজন, ততটা খাদ্যও দিই না। আহারে স্বাধীনতার অভাবের ফলেই হাতে সামান্য পয়সা পেলেই শিশুরা বাজারের যে-কোনো লোভনীয় বস্তুর দিকে আকৃষ্ট হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শৈশবের অতিরিক্ত বাধা-নিষেধ, পরিণত বয়সের যথেচ্ছাচারের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

সাধারণভাবে শিশুদের মিষ্টির প্রতি অনুরাগ সম্বন্ধে স্পেন্সার সেকালে যে-কথা বলেছিলেন, তা একালের বৈজ্ঞানিক মনের কাছেও স্বীকার্য —"অনেকে মনে করিবেন যে, কেবল আস্বাদ-সুখের জন্যই তাহারা মিষ্টান্ন ভালবাসে, কিন্তু বৈজ্ঞানিক প্রাকৃতিক নিয়মের অক্ষত উপযোগিতা এবং কারুণিকতা দেখিয়া অনুসন্ধানের দ্বারা জ্ঞাত হন যে, শিশুরা দেহের তাপ রক্ষা করিবার জন্যই ঐ প্রকার মিষ্টান্ন ভোজন করে।"[৪] সেই সঙ্গে আহারের তালিকায় ফলের উপযোগিতা সম্বন্ধেও স্পেন্সারের বিশেষ উচ্চ ধারণা।*

অধিকাংশ গৃহস্থবাড়ীতে এবং বিশেষভাবে আবাসিক বিদ্যালয়গুলিতে খাদ্যতালিকার একঘেয়েমি যে শারীরিক ও মানসিক অস্বস্তির একটি বড়ো কারণ সে-সম্বন্ধে আমরা ততটা অবহিত নই। সাধারণতঃ আহারাদি সম্বন্ধে চিন্তা না করাটাই আমাদের কাছে 'সভ্য' হবার লক্ষণ। কিন্তু স্পেন্সারের মতো বিজ্ঞানবাদী দার্শনিকের কাছে আহার জীবনগঠনের একটি মৌল সত্য। তাই প্রতিদিনের আহার্যতালিকার একঘেয়েমি সম্বন্ধেও তিনি পাঠকদের সচেতন করেছেন। তাঁর মতে—"খাদ্যনির্বাচনের আর একটি অঙ্গ আছে,—খাদ্যদ্রব্য পরিবর্তন করিয়া দেওয়া উচিত। খাদ্যদ্রব্য বিভিন্ন প্রকারের হইলে হৃৎপিণ্ডের এবং স্নায়বীয় কার্য বর্ধিত করে এবং তদ্দ্বারা শীঘ্র পরিপাক হয়।"[৫] এ শুধু মানুষের নয়, পশুদের ক্ষেত্রেও সমান সত্য।

স্বামীজীর জীবনের প্রথম পর্বে এই অনুবাদ-গ্রন্থটির আহারাদি-সম্বন্ধে অভিমতের সঙ্গে পরবর্তীকালে তাঁর 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' গ্রন্থে আহারাদি-সম্বন্ধে অভিমত একটু তুলনামূলকভাবে পাশাপাশি রাখা যাক।

"এখন সর্ববাদিসম্মত মত হচ্ছে যে, পুষ্টিকর অথচ শীঘ্র হজম হয়, এমন খাওয়া খাওয়া। অল্প আয়তনে অনেকটা পুষ্টি অথচ শীঘ্র পাক হয়, এমন খাওয়া চাই। যে-খাওয়ায় পুষ্টি কম, তা কাজেই এক বস্তা খেতে হয়, কাজেই সারাদিন লাগে তাকে হজম করতে; যদি হজমেই সমস্ত শক্তিটুকু গেল, বাকি আর কি কাজ করবার শক্তি রইল?"[৬]

"যার দু'পয়সা আছে আমাদের দেশে, সে ছেলেপেলেগুলোকে নিত্য কচুরি, মণ্ডা মেঠাই খাওয়াবে!! ভাত রুটি খাওয়া অপমান!! এতে ছেলেপিলেগুলো নড়ে-ভোলা পেটমোটা আসল জানোয়ার হবে না তো কি?"[৭]...

৪, ৫ তদেব : পৃ : ৮৮, ৯২

* তুলনীয় : "এক পক্ষ বলছেন, শূল্য মাংস আর যথেষ্ট ফল এবং দুগ্ধ এইমাত্র ভোজনই দীর্ঘ জীবনের উপযোগী। বিশেষ ফল, ফলাহারী অনেকদিন পর্যন্ত যুবা থাকবে, কারণ ফলের খাট্টা হাড়-গোড়ে রং ধরতে দেয় না।"—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃ : ১৭৬

"নানান দেশ দেখছি, নানান রকমের খাওয়াও দেখছি। তবে আমাদের ভাত-ডাল ঝোল-চচ্চড়ি শুক্তো মোচার ঘণ্টের জন্য পুনর্জ্জন্ম নেওয়াও বড বেশী কথা মনে হয় না। দাঁত থাকতে তোমরা যে দাঁতের মর্যাদা বুঝছ না, *এই আপসোস। খাবার নকল কি ইংরেজের* করতে হবে—সে টাকা কোথায়? এখন আমাদের দেশের উপযোগী যথার্থ বাঙালী খাওয়া, উপাদেয় পুষ্টিকর ও সস্তা খাওয়া পূর্ব বাঙলায়, ওদের নকল কর যত পারো।৮...

"দুধ পেটে অম্লাধিক্য হলে একেবারে দুষ্পাচ্য, এমনকি একদমে এক গ্লাস দুধ খেয়ে কখন কখন সদ্য মৃত্যু ঘটেছে। দুধ—যেমন শিশুতে মাতৃস্তন্য পান করে, তেমনি ঢোকে ঢোকে খেলে তবে শীঘ্র হজম হয়, নতুবা অনেক দেরী লাগে।...মূর্খ মাতা কচি ছেলেকে জোর করে ঢক ঢক করে দুধ খাওয়ায় আর দু-ছ মাসের মধ্যে মাথায় হাত দিয়ে কাঁদে!!৯"

শিশুদের আহার বিষয়ে স্পেন্সার যতো বিশদ আলোচনা করেছেন, স্বামীজী ততটা বিস্তৃতভাবে সে-বিষয়ে আলোচনা না করলেও পুষ্টিকর আহারের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তিনি স্পেন্সারের মতো সদা সজাগ ছিলেন। তবে শীতপ্রধান দেশের মনীষী স্পেন্সার মাংসাহারের উপর জোর দিয়েছেন, স্বামীজী সাধারণভাবে সে ক্ষেত্রে আমিষের কথাই বলেছেন। "ঢাকা বিক্রমপুরও ট্যাঁইমাছ, কচ্ছপাদি জলে ছেড়ে দিয়ে 'সইভ্য' হচ্ছে"—বলে স্বামীজী যে আক্ষেপ করেছেন তার মূলে তেলে-বা ঘিয়ে-ভাজা ( আধুনিককালে তো এ দুয়ের বদলে ডালডাই প্রধান ) খাদ্যের প্রতি শহুরে বাঙালীর আসক্তির প্রতিবাদ।

আহার ও পরিবেশের দ্বারা দৈহিক পুষ্টির কাজ অনেক পরিমাণে সাধিত হলেও আধুনিক সভ্যতার সঙ্গে মানুষের জটিল সম্বন্ধও যে এ ক্ষেত্রে ক্রিয়াশীল, সেকথাও স্পেন্সার বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন—"*On old* and young, the pressure of modern life puts a still increasing strain. In all business and professions, intenser competition taxes the energies and abilities of every adult; and to fit the young to hold their places under this intenser competition taxes the energies and abilities of every adult; and to fit the young to hold their places under this intenser competition, subject to severer discipline than heretofore. The damage is thus doubled. Fathers, who find themselves run hard by their multiplying competition, and while labouring under this disadvantage, have to maintain a more expensive style of living, are all the year round obliged to work early and late, taking little exercise and getting but short holidays. The constitutions shaken by this continued overapplication, they bequeath to their children, predisposed to breakdown, ever under ordinary strains on these energies, are required to go through a curriculum much move extended than prescribed for the unfeebled children of past generations."১০

৬, ৭, ৮, ৯ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য: বাণী ও রচনা: ৬ষ্ঠ খণ্ড: পৃ: ১৭৬, ১৭৮, ১৭৯, ১৮৪

১০ Education: Spencer: Ist. Edn: p. 174

"আধুনিক কালে কি বালক, কি বৃদ্ধ, সকলের উপর পূর্বাপেক্ষা সমাজের ভার—সংসারের ভার—অনেক অধিক হইতেছে। সকল ব্যবসায়ে অনেক প্রতিযোগী হওয়াতে পূর্বাপেক্ষা অনেক অধিক উদ্‌যোগ এবং শক্তি ব্যয় হইয়া যায় এবং এই শক্তি সংগ্রামের উপযুক্ত করিবার জন্য সন্তানের উপর পূর্বাপেক্ষা কঠোরতর শিক্ষার আবশ্যকতা হইয়াছে। আবার পিতা ঐ প্রকার ক্রমাগত পরিশ্রম করিয়া আপনার শরীর এবং মন দুর্বল করিয়া ফেলিয়াছেন, পুত্র সেই শরীর প্রাপ্ত হইয়া এই প্রকার ক্ষীণতা সত্ত্বেও পূর্বোক্ত কঠোর পরিশ্রম করে, কাজেই অকালে তাহার শরীর ভগ্ন হইয়া পড়ে।"[১১]

সভ্যতার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানসিক উৎকর্ষের দিকে আমাদের দৃষ্টি শারীরিক প্রয়োজনকে অতিক্রম করে যায়। স্পেন্সারের সমসাময়িক য়ুরোপের তরুণ-সমাজের অপেক্ষাকৃত শারীরিক দুর্বলতা আমাদের এ যুগের এ দেশের তরুণদের চেয়ে নিশ্চয় বেশী ছিল না। তবু স্পেন্সার তাতেই চিন্তিত হয়েছিলেন। জীবনের জটিলতা যে শারীরিক সুস্থতাকে উপেক্ষা করে মানুষকে অর্থোপার্জনের যন্ত্রস্বরূপ করে ফেলে এবং তার ফলে পুরুষানুক্রমে স্বাস্থ্যগত অবক্ষয় দেখা দেয়, তা'র প্রমাণ একালের অনেক তরুণের অকালে দৃষ্টিশক্তির ক্ষীণতা, শারীরিক অপটুতা, অকালে দাঁত পড়া ও টাকের বাহুল্যে প্রমাণিত। এক্ষেত্রে স্পেন্সার শারীরিক উদ্যমের প্রয়োজনে মানসিক উন্নতির আপেক্ষিক বিলম্বেও রাজী, কারণ দুর্বল দেহের দ্বারা জীবনযাপনই অনেক পরিমাণে অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়।

স্বাস্থ্যরক্ষার ক্ষেত্রে স্পেন্সার ব্যায়ামের চেয়ে খেলাধূলার বেশী পক্ষপাতী। তাঁর মতে, "ক্রীড়াই মনুষ্যের স্বাভাবিক ব্যায়াম, এই জন্যই ইহা কৃত্রিম ব্যায়ামাদির অপেক্ষা অনেক ভাল। তবে কিছু না হওয়ার অপেক্ষা কৃত্রিম ব্যায়ামও (gymnastics) উত্তম।"[১২]

স্বামীজীর জীবনে ব্যায়াম ও খেলাধূলার একটি বিশেষ ভূমিকা ছিল। সেদিক থেকে স্পেন্সারের মতের তিনি সম্পূর্ণ পরিপোষক ছিলেন, সন্দেহ নেই। তবে 'ফুটবল' স্পেন্সার মোটে পছন্দ করতেন না, অপর পক্ষে স্বামীজীর অন্যতম প্রিয় খেলা ছিল 'ফুটবল'।

ব্যায়ামের চর্চা যে জাতীয় জীবনের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়, সেকথা আজ বিশদভাবে বলাই বাহুল্য। কিন্তু অনেক ব্যায়ামবীরেরা যতটা সুদেহী হওয়ার দিকে জোর দেন, ততটা জীবন-সংগ্রামের ক্ষেত্রে অগ্রসর হ'ন না, সে-কথাও ঠিক। তাছাড়া যাঁরা প্রধানতঃ শরীর চর্চা নিয়ে ব্যস্ত, তাঁদের ক্ষেত্রে মননচর্চায় উপেক্ষার সম্ভাবনাও প্রবল। এ দুয়ের মধ্যে যথাযথ সামঞ্জস্যস্থাপনই স্বামীজীর আদর্শ।

এদেশে অজীর্ণতাজনিত নানা রোগের প্রাদুর্ভাব সম্বন্ধে স্বামীজীর একটি দাওয়াই (prescription) বিশেষভাবে প্রণিধেয়—"ঐ যে এত প্রস্রাবের রোগের ধুম দেশে, ওর অধিকাংশই অজীর্ণ; দুচার জনের মাথা ঘামিয়ে, বাকি সব বদহজম। পেট পূরলেই কি খাওয়া হ'ল? যেটুকু হজম হবে, সেইটুকুই খাওয়া। ...পায়ের মাংস লোহার মত শক্ত হওয়া চাই। প্রস্রাবে চিনি বা আলবুমেন দেখা দিয়েছে বলেই হাঁ করে বসো না। ও-সব আমাদের দেশের কিছুই নয়। ও গ্রাহ্যের মধ্যেই

১১, ১২ 'শিক্ষা' : স্বামী বিবেকানন্দ : বসুমতী সংস্করণ : পৃঃ ৯৫, ৯৯

এনো না। খাওয়ার দিকে খুব নজর দাও, অজীর্ণ হতে না পায়। ফাঁকা হাওয়ায় যতক্ষণ সম্ভব থাকবে। খুব হাঁটো আর পরিশ্রম কর। যেমন করে পারো ছুটি নাও আর বদরিকাশ্রম তীর্থযাত্রা কর। হরিদ্বার থেকে পায়ে হেঁটে ১০০ ক্রোশ ঠেলে পাহাড় চড়াই করে বদরিকাশ্রম যাওয়া-আসা একবার হলেই ও-প্রস্রাবের ব্যারাম-ফ্যারাম ভূত ভাগবে।…পারতপক্ষে ওষুধ খেও না। রোগে যদি এক আনা মরে, ওষুধে মরে পনের আনা! পারো যদি প্রতিবৎসর পূজার বন্ধের সময় হেঁটে দেশে যাও।…যে একদমে দশক্রোশ হাঁটতে পারে না, সেটা মানুষ, না কেঁচো?[১৩]

(ক্রমশঃ)

১৩ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য: বাণী ও রচনা: ষষ্ঠ খণ্ড: পৃঃ ১৭৭

"মাংসাশী প্রাণী—যেমন সিংহ—এক আঘাত করেই ক্লান্ত হয়ে পড়ে, কিন্তু সহিষ্ণু বলদ সারাদিন চলছে, চলতে চলতেই সে খেয়ে ও ঘুমিয়ে নিচ্ছে। চঞ্চল, সদাক্রিয়াশীল 'ইয়াঙ্কি' (মার্কিন) ভাতখেকো চীনা কুলির সঙ্গে পেরে ওঠে না। যতদিন ক্ষাত্রশক্তির প্রাধান্য থাকবে, ততদিন মাংসভোজন প্রচলিত থাকবে। কিন্তু বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহ কমে যাবে, তখন নিরামিষাশীর দল প্রবল হবে।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

"আমাদের প্রাণশক্তির শতকরা ৯০ ভাগ খরচ হয় আমরা যা নই, অন্যের কাছে নিজেদের সেভাবে তুলে ধরার চেষ্টায়। আমরা যা হতে চাই, তাই হওয়ার চেষ্টায় ঐ শক্তির যোগ্য ব্যয় হওয়া উচিত।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

# সনাতন ধর্ম

**স্বামী অমৃতত্বানন্দ**

জগতের ধর্মগুলির মধ্যে হিন্দুধর্ম অন্যতম ও সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। পণ্ডিতগণ এই ধর্মের কাল-নিরূপণে অসমর্থ। কেহ বলেন খৃঃ পূর্ব ১০,০০০ বৎসর, কেহ বা ৩০০০ বৎসর প্রাচীন এই ধর্ম। বস্তুত:পক্ষে মানব-সভ্যতার উষাকাল থেকে এই ধর্ম অবস্থিত।

অবশ্যই 'হিন্দু' নামটি অনতিপ্রাচীন। ইরানীরা বা গ্রীকযবনেরা 'সিন্ধু' নদ উচ্চারণ করতে গিয়ে বলতো 'হিন্দু'। প্রাচীন আর্যগণ সিন্ধুনদের অববাহিকায় বাস করতেন। তা থেকে সিন্ধুতীরবাসিগণ হিন্দু নামে অভিহিত হন। প্রাচীন ভারতীয় ধর্মসাহিত্যে কোথায়ও হিন্দু শব্দের উল্লেখ নেই।

পৃথিবীর অপরাপর ধর্মের মতন ভারত-বাসীর ধর্মের কোন বিশেষত্বসূচক নাম ছিল না। তা 'ধর্ম'সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হত। খৃষ্ট, ইসলাম প্রভৃতি ধর্মের মত কোন ব্যক্তিকেন্দ্রিক নাম ভারতীয় ধর্মের নেই। ঐ ধর্মকে সনাতন ধর্ম অর্থাৎ শাশ্বতকালীন ধর্ম বলা হয়ে থাকে। কারণ এই ধর্মে কোন সম্প্রদায়বিশেষের নীতিকে না বুঝিয়ে জগৎ-জীবনের আন্তর সত্তাকে বুঝিয়ে থাকে। তা সর্বকালে সর্বদেশে সকল মানবের সকল ধর্মের তত্ত্বকে বোঝায়—এজন্যই এর নাম 'সনাতন ধর্ম'।

ইংরেজী religion অর্থে ঈশ্বর-সম্পর্কে যে-কোন ধারণা বা উপাসনাকে বোঝায়। শব্দটি লাতিন 'রেলিগ্রি' শব্দ থেকে উদ্ভূত। এর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হচ্ছে 'যা বাঁধে'। সে-জন্য পাশ্চাত্যে রিলিজিওন ওর অনুগামীদের কাছে চায় শুধু কোন সাম্প্রদায়িক মতবাদে আস্থা স্থাপন করাতে ও ওর বিহিত ক্রিয়াকর্মের অনুষ্ঠানে রত থাকাতে। কিন্তু ধর্ম শব্দটির অর্থ গভীর ও ব্যাপক। ধৃ ধাতুর অর্থ ধারণ করা। 'কোন বস্তুর অস্তিত্ব রক্ষা হয় যাহার প্রভাবে তাহাই উহার ধর্ম।' এই অর্থে বস্তুর বা প্রাণীর একটি বিশেষ ধর্ম আছে যা তার অস্তিত্বের পক্ষে অপরিহার্য—যেমন জলের তারল্য, শীতলতা ও নিম্নগামিতা। এ-ভাবে বিশ্বকে যে সূক্ষ্ম নিয়মাবলী ধারণ করে আছে তা 'বিশ্বধর্ম'—মানুষের ক্ষেত্রে তা মানব-ধর্ম। মহাভারতকার এর অপূর্ব সংজ্ঞা দিয়েছেন: "ধারণাদ্ধর্মমিত্যাহুঃ ধর্মো ধারয়তে প্রজা:" এই ধর্মের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ। এই তত্ত্ব হচ্ছে উদ্দেশ্য। একে লাভ করার উপায়কেই আমরা সাধারণতঃ ধর্ম বলে থাকি। সে-ধর্মও শাশ্বত। মনু বলেছেন: ইজ্যাধ্যানদানানি তপঃ সত্যং ধৃতিঃ ক্ষমা। অলোভ ইতি মার্গোঽয়ং ধর্ম-স্যাষ্টবিধঃ স্মৃতঃ॥ এই আটটি গুণ শাশ্বত ধর্ম।

ধর্ম বলতে এইজন্য হিন্দুগণ (১) জগৎ-জীবনের মূলতত্ত্বকে বুঝিয়ে থাকে। আবার (২) যে-সকল নিয়ম সুস্থ পবিত্র জীবনযাপনের জন্য কৃত তাও ধর্ম। এই অর্থে আচারমূলক ধর্ম। যেমন গার্হস্থ্য ধর্ম, সমাজধর্ম, পথধর্ম ইত্যাদি। ধর্মো হি দ্বিবিধঃ স্মৃতঃ সামাজিক আধ্যাত্মিক-শ্চেতি। সামাজিক ধর্ম যুগভেদে পরিবর্তিত হয়। আধ্যাত্মিক ধর্ম শাশ্বত সত্য, তা পরিবর্তিত হয় না। অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিকতার প্রকাশে আমরা মানব-আচরণে দেখতে পাই,

কেবল মানুষ নয়, সকল প্রাণীরই এই একটি স্বভাব দেখা যায় যে, সে স্বাধীনতা চায়, মুক্তি চায় বন্ধন থেকে। সে চায় তার অস্তিত্বকে বজায় রাখতে, চায় অবাধ অনন্ত আনন্দ। মানুষ চায় পাঁতি পাঁতি করে সবটুকু জানতে, সর্বজ্ঞ হ'তে। এই চাওয়াই তার সত্তা, চেতনা ও আনন্দের অভিব্যক্তি মাত্র। অনন্তের মধ্য দিয়েই সে নিজেকে শান্ত বলে জানে। তার অস্তিত্বের, চেতনা ও আনন্দ-সীমকে সে কেবলি বাড়াতে চায়, একেবারে অসীম করতে চায়। এই চাহিদার মধ্যে তার স্বরূপচেতনার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে। জগতের সকল বস্তুর যেমন বিশিষ্টতাজ্ঞাপক ধর্ম রয়েছে, তেমনি রয়েছে এক সামান্য ভূমি, সেখানে সে সকল প্রাণীর সঙ্গে, বস্তুর সঙ্গে এক। এই ঐক্য-চেতনাই মানুষকে প্রতিনিয়ত বন্ধন থেকে, বহু থেকে মুক্তির মধ্যে একতার দিকে পরিচালিত করছে। এই সচ্চিদানন্দই ঈশ্বর। "ঈশ্বর-ধারণাই মানুষের প্রকৃতির মূল উপাদান। বেদান্তের সচ্চিদানন্দই মানব-মনের ঈশ্বর-সম্বন্ধীয় সর্বোচ্চ ধারণা।" "বন্ধনের ধারণা যেমন মনের অচ্ছেদ্য ও মূল অংশ, ঈশ্বর-ধারণাও তদ্রূপ প্রকৃতিগত ও অচ্ছেদ্য।" "মুক্তি বা স্বাধীনতার মূর্ত বিগ্রহ—প্রকৃতির প্রভুকে আমরা 'ঈশ্বর' বলিয়া থাকি।" প্রকৃতি কেবলই আমাদের বাঁধতে চাচ্ছে, জীবন ও বস্তুর প্রতি প্রেমে, ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ে ও মনন-প্রচেষ্টায়। বহিঃপ্রকৃতি ও অন্তরপ্রকৃতির বন্ধন চেষ্টাকে অস্বীকার করে কেবলই আমরা বিদ্রোহ করছি—একেবারে মুক্ত হতে। "আমরা জন্ম হইতেই বিদ্রোহী এবং প্রকৃতির বিরুদ্ধে জীবনের প্রথম সত্য—জীবনীশক্তির চিহ্ন এই যে, আমরা বিদ্রোহ করি এবং বলিয়া উঠি—'কোনরূপ নিয়ম মানিয়া আমরা চলিব না।' 'মানুষ মুক্তি চায়।' "যেখানেই জীবন আছে, সেখানেই এই মুক্তির অনুসন্ধান এবং সেই মুক্তিই ঈশ্বর-স্বরূপ।" এই মুক্তি-প্রচেষ্টাই ধর্মের বিষয়।

সনাতন ধর্মের বৈশিষ্ট্য এই যে (১) তা কোন সম্প্রদায়গত মতবাদ নয়। এ-ধর্ম জগৎ-জীবনসত্তার স্বরূপতত্ত্ব উপদেশ করে; (২) যে-কোন লোক যে-কোন ধর্মপথে এর প্রচারিত তত্ত্ব লাভ করতে পারে; (৩) এ ধর্ম কোন একটি অনুভূতি বা একটি পথকেই একমাত্র সত্য অনুভূতি ও পথ বলে নির্দেশ করে না। এই ধর্ম জগতের সর্বকালে, সর্বদেশে যত প্রকার অধ্যাত্ম অনুভূতি মানবের হয়েছে বা হতে পারে সে-সবকে গ্রহণ করে এই মহান্ ধর্ম এবং 'যত মত তত পথ'রূপ মহান সত্যকে স্বীকার করে। (৪) অধিকারী বিশেষে সাধনবিশেষ এ-ধর্ম স্বীকার করে থাকে। (৫) এতে কর্মবাদ ও জন্মান্তরবাদ স্বীকৃত সত্য। (৬) এই ধর্ম বিশেষরূপে ঘোষণা করে থাকে যে, মানব-জীবনের উদ্দেশ্য নিজ স্বরূপকে জানা বা ঈশ্বরলাভ করা। (৭) তত্ত্বগতভাবে এই ধর্ম মানবকে চারি বর্ণে ও জীবনকে চারি আশ্রমে বা পর্যায়ে বিভক্ত করে থাকে।

আর্যদের ধর্ম হিসাবে একে আর্যধর্মও বলা হয়। তবে বর্তমান হিন্দুধর্ম কেবল আর্যভাব-ধারা নিয়েই নয়, অনেকানেক অনার্য ও অপরাপর ধর্ম-সত্যকেও আপন অঙ্গে গ্রহণ করে নিয়েছে। ব্রাহ্মণ অর্থে তত্ত্ববেত্তা ঈশ্বরদ্রষ্টা পুরুষ বোঝাত। এই ব্রাহ্মণত্বই মানবের আদর্শ বলে বা ব্রাহ্মণগণ-শাসিত ধর্ম হিসাবে একে ব্রাহ্মণ্য ধর্মও বলা হ'য়ে থাকে। বৈদিক ধর্মও বলা হয়, কারণ বেদই এই ধর্মের প্রামাণ্য গ্রন্থ।

আর্যদের ভারতে অনুপ্রবেশ সম্পর্কে তিনটি মতবাদ প্রচলিত : (১) কেহ কেহ বলেন আর্যদের আদি বাসস্থান ছিল মধ্য এশিয়ায় ; (২) কেউ বলেন—ভূমধ্যসাগরতীরে ; (৩) কেহ বা বলে থাকেন আর্যগণ মোটেই বাহির থেকে ভারতে আসেননি—তাঁদের আদি বাসস্থান ভারতবর্ষ—এখান থেকেই তাঁরা বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েন। সে যাই হোক, প্রথমে তাঁদের ধর্ম সাহিত্য প্রভৃতি সিন্ধুনদের অববাহিকাতে অনুশীলিত হতে দেখি।

আমাদের সভ্যতা ও ধর্মের বিশেষত্ব তাঁদের দান। এদেশের অন্য আদিবাসীদের সঙ্গে তাঁদের ক্রমাগত মিলমিশ হতে থাকে নানা যুদ্ধবিগ্রহ ঘাতপ্রতিঘাতের মাধ্যমে পরস্পর পরস্পরের ভাবধারার সংমিশ্রণে একীভূত হতে থাকে। এই একীকরণের মূলে রয়েছে আর্যদের বলিষ্ঠ ভাবপ্রকাশক্ষম ভাষা ও বর্ণ-বিভাগরূপ অপূর্ব সমাজবিভাগতত্ত্ব। এদের সম্মিলিত ধর্মচর্চার রূপই বর্তমানে হিন্দুধর্ম নামে বিকশিত বিরাট ঐতিহ্যমণ্ডিত সুমহান ধর্ম।

পরবর্তীকালেও শক হূন গুর্জর প্রভৃতি জাতি বিভিন্ন সভ্যতা ও ধর্ম নিয়ে এদেশে এসে মিলেমিশে গেছে। স্বাঙ্গীকরণের এক মহা-প্রচেষ্টা এখানেই সম্ভব হয়েছে এবং বিভিন্ন ভাবধারার সম্মিলনে এক অনবদ্য শোভন রূপ লাভ করেছে।

বর্তমানে হিন্দুধর্ম বহু সম্প্রদায়ে বিভক্ত। এখানে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য সকল সম্প্রদায়কে গ্রথিত করে হিন্দুধর্ম নামে লক্ষিত হচ্ছে। সম্প্রদায়গুলি অসংখ্য হ'লেও শৈব, গাণপত্য, সৌর, বৈষ্ণব ও শাক্তই প্রধান। শাস্ত্র, দেবতা, আদর্শ, বিশ্বাস ও আচার বিষয়ে সকল হিন্দুই একমত। এই পাঁচটি বিষয়ে মিল থাকাতে নানা সম্প্রদায় ও মতগত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও হিন্দু এক। (১) শাস্ত্র—হিন্দুর প্রামাণ্য শাস্ত্রগ্রন্থ বেদ। এ ছাড়া রামায়ণ ও মহাভারত, ভাগবতপুরাণ, বেদান্তসূত্র সকল হিন্দুর শাস্ত্র। সম্প্রদায়গত মতাদর্শ অনুসারে তাঁরা ঐ সকল শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করে থাকেন।

(২) দেবতা—"একং সৎ বিপ্রা বহুধা বদন্তি" : বেদের এই ঘোষণা সকল হিন্দুই মেনে থাকে। কোন বিশেষ দেবতা চরম সত্যের একটি আংশিক আদর্শমাত্র এবং সেই গুণময় দেবতাও স্বরূপতঃ চরম সত্তাই ; হিন্দুর এই পরম বিশ্বাস যুগ যুগ ধরে অটুট রয়েছে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এবং তাঁদের শক্তি—সরস্বতী, লক্ষ্মী ও সতী সকল হিন্দুরই পূজ্য। রাম ও কৃষ্ণকে সকল হিন্দুই অবতাররূপে পূজা করে থাকে। হিন্দু অবতারবাদে বিশ্বাসী। হিন্দু দেববাদকে ধর্মের চরম বিকাশ বলে না বা তাকে অপ্রয়োজনীয়বোধে ত্যাগও করে না।

(৩) আদর্শ—একই নৈতিক আদর্শ সকল হিন্দু সাধকের সাধ্য ; পবিত্রতা, সংযম, অনাসক্তি, সত্য ও অহিংসা সকলেই বরণ করে থাকে। তা কেবল সাধুর বরণীয় নয়, যে-কোন সৎ জীবনের পক্ষে আচরণীয় আদর্শ বলে হিন্দুর বিশ্বাস।

(৪) বিশ্বাস (ক) সৃষ্টিতত্ত্ব-সম্পর্কিত ধারণা সকল হিন্দুরই মূলতঃ এক। (খ) সমাজ-ক্ষেত্রে বর্ণবিভাগ, (গ) জীবনের ক্ষেত্রে চারি আশ্রমভাগ এবং (ঘ) মানব-জীবনের উদ্দেশ্য যে ঈশ্বরলাভ—এই বিশ্বাসে সকল হিন্দুই একমত। এ-ছাড়া (ঙ) কর্মবাদ ও জন্মান্তর-বাদে বিশ্বাস সম্প্রদায়গত বিভাগ সত্ত্বেও হিন্দুকে একসূত্রে বেঁধেছে।

(৫) আচার—কতকগুলি পূজা-অর্চার বিধান রয়েছে, যা সকল হিন্দুই পালন করে

থাকে। একাদশী, শিবরাত্রি, জন্মাষ্টমী ইত্যাদি সকল হিন্দুই পালন করে থাকে। ইষ্টদেব-সম্পর্কিত ধারণা, যোগচতুষ্টয় ও তীর্থ-সম্পর্কে ধারণা সকল হিন্দুরই এক। এইগুলিতে প্রায় একমত পোষণ সত্ত্বেও হিন্দুধর্মে সম্প্রদায়-সৃষ্টি ও লোপের সীমাসংখ্যা নাই। এমনকি অনীশ্বর বৌদ্ধ এবং জৈনধর্মও এ ধর্ম হতেই সৃষ্ট। অধুনিক কালের ব্রাহ্মধর্ম, আর্যসমাজ, প্রার্থনাসমাজ, সনাতন ধর্ম প্রভৃতি কত কত সম্প্রদায়ের সৃষ্টিই না হয়েছে। এ-সবকে বরণ করে হিন্দু এক।

"মানবজাতির ভাগ্যগঠনের জন্য যতগুলি শক্তি কার্য করিয়াছে এবং এখনও করিতেছে, ঐ সকলের মধ্যে ধর্মরূপে অভিব্যক্ত শক্তি অপেক্ষা কোন শক্তি নিশ্চয়ই অধিকতর প্রভাবশালী নয়।" ধর্ম মানবকে সভ্য ও মানব-মনীষাকে তৃপ্ত করেছে। সভ্য মানুষ আমরা তাকেই বলি, যে যত পরিমাণে অন্তঃপ্রকৃতিকে জয় করেছে। কেবল বাইরের উপকরণবাহুল্য সভ্যতা নয়। মানুষ কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্যের তাড়নায় অসভ্য আচরণে রত হয়; ঐ সকল রিপুকে সংযত ও সীমিত যে যত করতে পারে ততই সে সভ্য হয়, সুন্দর হয়—মানুষপদবাচ্য হয়। ধর্ম মানুষের এই অন্তঃপ্রকৃতিকে জয় করতে শেখায়।

মানুষের মনীষা, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, যুক্তি এমন একটি সীমায় পৌঁছে যার অপর পারে সে যেতে পারে না। অথচ "মানব-মন কোন কোন সময় শুধু ইন্দ্রিয়ের সীমাই অতিক্রম করে না, বিচারশক্তিও অতিক্রম করে।" এই অতীন্দ্রিয় অনুভূতি তার পরম পাওয়া, চরম আশ্বাস। নতুবা সীমিত, ব্যর্থ ও খণ্ডিত জ্ঞান মানুষকে ভগ্ন দান ও ইহসর্বস্ব জড় করত। "বিভিন্ন ধর্ম হইতে এই একটি সত্যই স্পষ্ট হইয়া উঠে যে, এক সূক্ষ্ম অখণ্ড সত্তা আছে, যাহাকে কখনও আমাদের নিকট ব্যক্তিবিশেষরূপে, অথবা নীতিবাদরূপে, অথবা নিরাকার সত্তারূপে অথবা সর্বানুস্যূত সারবস্তুরূপে উপস্থাপিত করা হয়।"

ঐ অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতাই নৈতিক নিয়মাবলীর জনক ও একমাত্র ব্যাখ্যা, কারণ হিতবাদিগণ যতই 'অধিক পরিমাণ সুখলাভ' তত্ত্ব প্রচার করুন তা দিয়ে নীতিবোধের ব্যাখ্যা চলে না। 'স্বার্থ নয়, পরার্থ' নীতির এই মূল মন্ত্রের হিতবাদীর মতানুসারে সার্থক ব্যাখ্যা হয় না! "অহঙ্কারের পূর্ণবিনাশই নীতিশাস্ত্রের আদর্শ।" মানুষ কালে অসীমকে সীমার মধ্য দিয়ে প্রকাশের চেষ্টা অসম্ভব অনুভব ক'রে সে চেষ্টা ত্যাগ করতে শেখে। এই ত্যাগই নীতি-শাস্ত্রের মূল। নীতিশাস্ত্রের প্রণেতাগণ সকলেই এই অতীন্দ্রিয় অনুভূতি লাভ করেছেন বলে দাবী করে থাকেন। বস্তুতঃপক্ষে— "অলৌকিক অনুমোদন অথবা অতিচেতন অনুভূতি ব্যতীত কোন নীতিশাস্ত্র গড়িয়া ওঠে না।" অনন্তের অভিমুখে অভিযান ব্যতীত কোন আদর্শই দাঁড়াইতে পারে না। অতএব হিতবাদীদের মত অযৌক্তিক ও সঙ্কীর্ণ।

যুগ যুগ ধরে ধর্মের বিরুদ্ধে নানা যুক্তির অবতারণা করা হয়েছে। বর্তমান শতকে ধর্মের বিরুদ্ধে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বসকলের প্রয়োগ করে ধর্মকে অজ্ঞ মানুষের প্রাচীন বন্ধন বা কুসংস্কাররূপে বর্ণনা করা হয়েছে। তথাপি ধর্মের লোপ হয়নি। বরঞ্চ প্রতি আক্রমণের পর ধর্ম আরো জোরালো যুক্তি সহায়ে আপন মহিমাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে চলেছে। ভ্রান্তি সুদীর্ঘকাল টিকে থাকে না, থাকতে পারে না। ধর্মের অভ্রান্ততার এও একটি বড় প্রমাণ।

বর্তমানে পদার্থবিদ্যার উচ্চ গবেষণার যুগেও ধর্মের প্রয়োজনীয়তা অবশ্য স্বীকার্য, মানব-কল্যাণে অপরিহার্য শক্তিরূপে প্রমাণিত হচ্ছে। পৃথিবীর সকল সভ্যজাতির হতিহাসেই দেখা যায় যে, ধর্মসহায়েই জাতি-বিশেষ উন্নত হয়েছে। ধর্মহীন কোন মানবগোষ্ঠি আজ পর্যন্ত দেখা যায়নি। ধর্ম তাই সভ্যতার অপরিহার্য শক্তি।

মানুষ জ্ঞান-অন্বেষী। সে সত্যকে চায়। অথচ সত্যকে নিয়ে ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে সে বড় হতে চায়! সমাজ গঠন করতে আমরা চাই, ব্যর্থতার জন্য বহু কারণ নির্দেশ করি—কিন্তু সত্যকে ছেড়ে, মিথ্যার আশ্রয়ে আপন স্বার্থকে বড় করে দেখার পাপেই যে আমরা ব্যর্থ তগ্ন, তা জেনেও বলি না। উকিল, ভিষক, বস্তুকারক, সমাজসেবী, রাজনীতিক সকলেই মিথ্যার আশ্রয়ে দেশকে উন্নত, জাতিকে প্রাগ্রসর দেখতে চায়। কিন্তু তা কি হয়? আমরা ব্যর্থ হই এবং দোষ অপরের স্কন্ধে চাপাই!! ধর্ম মানুষকে সত্যসেবী ও সরল হ'তে বলে—নির্লোভ ও প্রেমিক হতে বলে—আমরা ধর্মকে ছেড়ে কি করে দাঁড়াব? লোকধর্ম, সমাজধর্ম, দেশধর্ম সবকে আমাদের যথাযথভাবে বরণ করতে হবে। এখানেই ধর্মের অভ্রান্ত স্বাক্ষর বিদ্যমান যে, তা মানুষকে সুন্দর ও উদার, সভ্য ও সংযত করে। সচ্চিদানন্দই আমাদের চরম সত্তা। এই সত্তার বিকাশেই মানবীয় বিদ্যার বিভিন্নতা। সত্তাকে রক্ষা করতে আমাদের অর্থনীতি, রাজনীতি, ব্যবসায়নীতি, কৃষিবিজ্ঞান ইত্যাদি বিদ্যার প্রয়োজন। এগুলি সৎ-এর বিকাশ। চিৎজ্ঞানের প্রকাশে আমরা দর্শন, তর্কশাস্ত্র, বিজ্ঞান, জ্যোতিষবিদ্যার আলোচনা করি। আনন্দের রস সঞ্চার হয় সাহিত্যে, সঙ্গীতে, শিল্পে, নৃত্যে, ছন্দে। মানব ও জগৎ-সত্তার মর্মকথা দিয়েই আমরা বিদ্যাচর্চা করি অথচ বাদ দিতে চাই অন্তর্নিহিত সার বস্তুটিকে। ইহাই অজ্ঞান। ধর্ম তাই আমাদের স্বরূপের চেতনা এনে দেয়—ধর্ম-স্বরূপই আমাদের বিদ্যার মূল। ধর্ম সভ্য মানবের অপরিহার্য শক্তি। ধর্ম-বিকাশেই মানুষ মানুষ হতে পারে—সভ্যতায় আরূঢ় হ'তে পারে।

# নালান্দা

স্বামী সুব্রানন্দ

কেদার-বদ্রী, হরিদ্বার-হৃষীকেশ, পুরী-ভুবনেশ্বর, মথুরা-বৃন্দাবন এই এক এক জোড়া নাম অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। লোকে একডাকে বলে থাকে। একটি দেখতে গিয়ে অন্যটিও না দেখে বড কেহ ফেরেন না। একটির বিষয় জানতে গেলে অপরটিও জানা হয়ে যায়। এই সংযুক্ত স্থানগুলোর সংস্কৃতি ও সাধনা যেন একই বৃন্তে প্রস্ফুটিত দুটি কুসুমের মতো। ঠিক সেইরূপ রাজগৃহ ও নালান্দা। দেশ-বিদেশ থেকে যত জিজ্ঞাসু পরিব্রাজক ও ঐতিহাসিক এ দু'টির একটিতে যান, তাঁরা অপরটিতেও না গিয়ে ফেরেন না।

খ্রীষ্টপূর্বাব্দ হতেই বড়গাঁও ছিল একটি সমৃদ্ধিশালী গ্রাম। সম্পদশালী ব্যবসায়িগণ ব্যবসা-বাণিজ্য করে বেশ দু' পয়সা উপার্জন করে গ্রামের শ্রীবৃদ্ধি করেছিলেন। এই সৌন্দর্যমণ্ডিত গ্রামে মন্দির, বিহার, পাঠাগার সরোবর কিছুরই অভাব ছিল না। সরোবরে অজস্র কমল ফুটে শোভা বর্ধন করত। এক কথায় গ্রামের বেশ নামডাক। বৌদ্ধ ও জৈন শাস্ত্রাদিতে তার বিশেষ উল্লেখ পাওয়া যায়। গ্রামের অধিবাসীদের মধ্যে কারো কারো সামান্য অভাব থাকলেও অভিযোগ কিছু ছিল না। সকলে আনন্দে সৎপথে থেকে আদর্শ গৃহীর জীবন যাপন করত। সাধু-সন্ন্যাসী, অতিথি-অভ্যাগতের শুভাগমনে গ্রামটি সর্বদাই থাকত আনন্দমুখর হয়ে। এই জনপদের মধ্যবর্তী অপূর্ব মনোরম সরোবরের পদ্মবনে বাস করত একটি বিষধর নাগ। সেই সর্বজনবিদিত সর্পটির নাম ছিল নালান্দা। এই প্রচলিত নালান্দা নাম থেকে বড়গাঁও-এর নামও নালান্দায় পরিবর্তিত হয়। পরে আম্রকুঞ্জে প্রতিষ্ঠিত বিহারের নামও হয় নালান্দা।

আর একটি মত আছে- গ্রামে এত অধিক পদ্মবন ছিল যে, যার জন্যে এর নাম নালান্দা বলে বিখ্যাত হয়। পদ্মবন সেখানে অদ্যাপি দেখতে পাওয়া যায়। সূর্যতরাগের কমল উল্লেখযোগ্য। নাল— পদ্ম, ষণ্ড— সমূহ। নালষণ্ড নামের অপভ্রংশই হ'ল নালন্দা বা নালান্দা। অন্যমতে বোধিসত্ত্ব পূর্বজন্মে এখানে ছিলেন রাজা। সে রাজা অত্যন্ত দানশীল, যে যখন যেজন্যে তাঁর কাছে আসত, তিনি তখনই তাকে তার প্রার্থিত বস্তু দিয়ে তৃপ্ত করতেন। 'দেব না' একথা তিনি কখন বলেননি। 'ন-অলং-দা।' তাই সে রাজ্যের নাম হয়েছে নলন্দা বা নালান্দা।

ভগবান তথাগত রাজগৃহে যাতায়াতের সময় প্রায়ই এই শ্রীমন্ত ও তুষ্টিমন্ত গ্রামে আসতেন এবং কিছুকাল বিশ্রাম করতেন। স্থানটি ছিল তাঁর অতি প্রিয়। তাঁর অহেতুক করুণার পীযূষধারা এখানে অনেকের উপর বর্ষিত হয়েছে—তিনি বহু শিষ্য-সামন্ত করেন। সুবিখ্যাত শিষ্য সারিপুত্র ও মৌদ্গল্যায়ন এখানকারই উচ্চ-ব্রাহ্মণ-বংশ-সম্ভূত। ইঁহারা অতি মেধাবী ও চরিত্রবান লোক ছিলেন। এ দু'জন ছিলেন বৌদ্ধধর্মের দিক্‌পাল। জৈনধর্মের শেষ তীর্থংকর মহাবীরও এখানে যাতায়াত করতেন। সর্বত্যাগী হয়েও দেব-

দ্বিজে ভক্তিপরায়ণ এ হেন শান্ত সুষমামণ্ডিত লোকালয়ের কথা তিনি ভুলে থাকতে পারেননি। চৌদ্দটি চাতুর্মাস্য ব্রত তিনি এখানেই উদ্‌যাপন করেন। তাঁরও শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন অনেকে।

যাই হোক, এই গণ্ডগ্রাম নালান্দায় চৈত্য, স্তূপ, বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হয়ে এককালে এশিয়ার ধর্ম ও সংস্কৃতির একটি শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র হয়ে উঠে। প্রাচীন ভারতে তক্ষশিলা. নালান্দা, বিক্রমশিলা, বারাণসী, অজন্তা, জগদ্দল, উদ্দণ্ডপুর, বল্লভি প্রভৃতি স্থানে বিশ্ববিদ্যালয় ছিল; কিন্তু নালান্দার মতো আর একটিও ছিল না। তক্ষশিলার উল্লেখ রামায়ণ-মহাভারতেও পাওয়া যায়। অনুমান খ্রীঃ পূঃ সপ্তম শতাব্দীতে ইহা স্থাপিত হয়; গান্ধার রাজ্যের অধীনে ছিল, বর্তমান রাউল-পিণ্ডির সমীপবর্তী সরাইকোলা নামক স্থানে। ১২ বর্গমাইল জুড়ে ছিল তার সীমা। হুনদের আক্রমণে ইহা ধ্বংস হয়। নালান্দা একদিনে বিশ্বখ্যাত হয়ে উঠেনি; অনুমান খ্রীঃ পূঃ প্রথম শতাব্দী অথবা খ্রীঃ প্রথম শতাব্দীতে ইহার শুরু। খ্রীঃ দ্বিতীয় থেকে চতুর্থ শতকে ইহার আকার ও প্রকার অত বৃহৎ হয়নি, যদিও নাগার্জুন, আর্যদেব, অসঙ্গ, বসুবন্ধু, দিঙনাগ প্রভৃতি সুদক্ষ পণ্ডিতগণ অধ্যয়ন-অধ্যাপনা করেছেন। খ্রীঃ ৫ম শতকে কুমারগুপ্তের রাজত্বে এর বেশ সম্প্রসারণ হয়। পরবর্তী পালরাজগণের সময় নালান্দা সমৃদ্ধির চরম সীমায় পৌঁছে। তখন সত্যি ইহা বিশ্বের না হোক অন্ততঃ এশিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হ'য়ে নাম সার্থক করেছে। পৃথিবীর বহু দেশ-দেশান্তর থেকে ছাত্র ও অধ্যাপকের সমাগম হ'ত এ শিক্ষাকেন্দ্রে। সে সময় ভিক্ষু শীলভদ্র ছিলেন প্রধান আচার্য। বিদ্যোৎসাহী পালরাজ-গণ যদিও উদ্দণ্ডপুর (বিহার সরিফ), বিক্রমশিলা (ভাগলপুর), সোমপুর, পাহাড়পুর, জগদ্দলে মহাবিহার ও শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করেছিলেন, তবুও নালান্দার ব্যয়ভার বহন করতে এতটুকু কার্পণ্য করেননি, বরং ইন্দ্রশিলায় বৃহৎ দু'টি চৈত্য নির্মাণ করে ইহার গৌরববৃদ্ধি করেছেন। ১০ম শতাব্দী পর্যন্ত বাংলার পাল-রাজাদের অধিকারে ছিল নালান্দা।

৭ম শতকে প্রখ্যাত পরিব্রাজক ও ঐতিহাসিক হিউ-য়েন-সাঙ্‌ এদেশে আসেন। রাজসম্মানে তাঁকে নালান্দায় অভ্যর্থনা জানানো হয়। তিন বছর তিনি এখানে অবস্থান করেন এবং সমগ্র ভারতে ভ্রমণ করেন দীর্ঘ ১৪ বছর। নালান্দায় শিক্ষালাভ করেন প্রধান আচার্য ভিক্ষু শীল-ভদ্রের নিকট। পরে আসেন ইৎসিঙ্‌ অনুমান খ্রীঃ ৬৭৫-৬৮৫ শতাব্দীর মধ্যে। তিনি এখানে অধ্যয়ন করেন ১০ বছর। ফা-হিয়েনও এসেছিলেন এবং ১৫ বছর তিনি এদেশে অবস্থান করেছিলেন। অনেক ঐতিহাসিক ও পরিব্রাজক এই বিশ্ববিদ্যালয় ও বিহারের বিস্তৃত বিবরণ নিপুণ হস্তে লিপিবদ্ধ করে রেখে গিয়েছেন—বিশেষতঃ হিউ-য়েন-সাঙ্‌। এখানে আমরা তাঁদের বর্ণনা থেকে অতি সংক্ষেপে কিছুটা তুলে ধরছি।

নালান্দার সুবর্ণযুগে বিস্তার ছিল ১০ মাইল। ছয়তলা বাড়ীর সমান উঁচু গুম্ফাতে (বিহারে) ভগবান বুদ্ধদেবের ৮০ ফুট উঁচু তাম্রমূর্তি ছিল। ইহা মৌর্যরাজ পূর্ণবর্ম্মন-নির্মিত, ৬০০ খ্রীষ্টাব্দে। সম্রাট হর্ষবর্ধনও পিতলের পাত-মোড়া বিরাট বিহার নির্মাণ করেন। তা'ছাড়া এই নালান্দা চৈত্য, স্তূপ, মন্দির, বিশ্ববিদ্যালয়, পাঠাগার, সরোবর সব

মিলে অপূর্ব শোভাময়ী নগরীতে পরিণত হয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ে ১০ হাজার আবাসিক একসাথে অবস্থান ক'রে বিবিধ বিদ্যা অর্জন করতেন। অধ্যাপক ছিলেন দেড হাজার। এক একটি কোঠা বা কামরা ছিল এক একজন বিদ্যার্থীর জন্যে নির্দিষ্ট। ছাত্রগণ বিদ্যা বিনয়-ও সদাচারসম্পন্ন ছিলেন। পরিবেশ ছিল শান্ত ও সমাহিত। দৈনিক কার্যাবলী অতি সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত হ'ত। প্রতিটি কাজের সূচনা হ'ত ঘণ্টাধ্বনি ক'রে। সময়নির্ণয়ের জন্য জলঘড়ির ব্যবস্থা ছিল। ছাত্রগণ বিনাব্যয়ে অধ্যয়ন করতেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে উপযুক্ত বিদ্যার্থিগণই প্রবেশাধিকার লাভ করতেন। দ্বারপণ্ডিত পরীক্ষা গ্রহণ ক'রে প্রতি ১০ জনের মধ্যে মাত্র দু'জনকে গ্রহণ করতেন। শতকরা ২৫।৩০ জন শিক্ষার্থী ছিলেন বিদেশাগত। সাহিত্য ও দর্শনশাস্ত্রের সঙ্গে শারীরবিদ্যা, ধাতুবিদ্যা, স্থাপত্যবিদ্যা, রসায়ন, গ্রন্থ-সংরক্ষণ প্রভৃতি বিষয়ও পাঠ্যতালিকাভুক্ত ছিল। আম্রকুঞ্জে ৬টি চারতলা বৃহৎ অট্টালিকায় উদয়াস্ত বিভিন্ন সময়ে শতাধিক শ্রেণীতে অধ্যয়ন ও ধর্মচর্চা হ'ত। বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়নের জন্যে ছিল ভিন্ন ১০টি ঘর – ৩০ ফুট উঁচু। তার মধ্যে ৮টি হলঘর। হরসিংহ গুপ্ত (বালাদিত্য) স্বর্ণমণিমুক্তাখচিত অপূর্ব মনোরম একটি শ্বেত বিহার নির্মাণ করেন। সম্রাট হর্ষবর্ধন মুক্ত হস্তে নালান্দার জন্য অর্থ ব্যয় করতেন। এজন্য শতাধিক গ্রাম নিষ্কর ক'রে দান করেছিলেন; প্রজাগণ পালাক্রমে এখানে চাল, ডাল, দুধ, ঘি প্রভৃতি প্রদান করতেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের খাদ্য-তালিকায় ছিল প্রতিদিন জম্বীরফল, জামফল, খেজুর, ১ পোয়া চাল, তেল, কর্পূর, কিছু মাখন প্রভৃতি। যথা সময়ে অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করেন মনীষী ভববিবেক, ধর্মপাল, চন্দ্রপাল, গুণমতি, স্থিরমতি, প্রভমিত্র, জিনমিত্র, দিবাকরমিত্র, শীঘ্রবুদ্ধ পদ্মসংস্থ, বীরদেব, জিনপ্রভ. জ্ঞানচন্দ্র, শীলভদ্র, রাহুল মিশ্র, দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান প্রভৃতি আচার্যগণ। আচার্য পদ্মসম্ভব যখন অধ্যক্ষ, তখন তিব্বতে বিশেষ প্রচারের ব্যবস্থা হয়। তিনিই লামাধর্মের প্রবর্তক। সেখানে লেখাপড়ার প্রচলনও সেই সময়ে হয়। নালান্দায় লিখিত বৌদ্ধশাস্ত্র তিব্বতে যায়। তিব্বতে সঙ্ঘারাম ও গুম্ফা প্রভৃতি অবশ্য নির্মিত হয় বিক্রমশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকরণে। নালান্দায় যেখানে পুস্তকালয় ছিল, তাকে বলা হ'ত ধর্মগঞ্জ। ৩টি বড বড় প্রাসাদে ছিল পাঠাগার—রত্নোদধি. রত্নসাগর ও রত্নরঞ্জক। রত্নোদধি ছিল নয় তলা দালান। অনেকে বলেছেন—সুন্দর সুন্দর বিহার, মন্দির, স্তূপ. পাঠাগার, প্রস্ফুটিত কমল সহ সরোবর ভারতে সে সময় হয়তো অনেক ছিল কিন্তু এমন আর একটিও ছিল কিনা সন্দেহ। হর্ষবর্ধন যখন কান্যকুব্জে বৌদ্ধধর্ম-মহাসম্মেলন ডেকেছিলেন, তখন এখান থেকে এক হাজার ভিক্ষু সে-মহাসম্মেলনে যোগদান করেছিলেন।

এই বিশ্ববিদ্যালয় ও সম্পদসম্ভারে সমৃদ্ধ নগরী, যা এককালে মগধের রাজধানীও ছিল, বর্তমানে ধ্বংসস্তূপ বা ভূপ্রোথিত ভগ্নাবশেষ ছাড়া তার আর কিছুই নাই। মোগলদের আক্রমণে নালান্দা ও রাজগীর অবক্ষয়িত হ'তে থাকে ১১শ শতাব্দীর শেষ ভাগে। ইতিহাস বলে, বক্তিয়ার খিলিজী ও তাঁর পুত্র মহম্মদ নালান্দা, উদ্দণ্ডপুর, বিক্রমশিলা ও রাজগৃহ ধ্বংস করেন ১১৯৭—১২০৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে। বিহার স্তূপ ভেঙ্গে কবরখানা তৈরী হ'ল। মূল্যবান দ্রব্য-সমগ্রী. মূর্তি ও আসবাবপত্র সৈন্যগণ যথানিয়মে লুণ্ঠন করল—সমুদয় ভিক্ষু-সন্ন্যাসীকে হত্যা করল—নিঃশেষিত শ্মাশনপুরীতে

গ্রন্থাগারগুলিই পড়ে থেকে হাহাকার করল। খিলিজী সাহেবের ঔৎসুক্য—এত সব পুস্তকে এমন কি বিষয়-বস্তু থাকতে পারে? কিন্তু হায়, সে-সব বই পড়তে পারে এমন একটি লোকও আর জীবিত পেলেন না। তখন আর কি করেন—সংখ্যাতীত পুস্তক অমূল্য রত্ন অগ্নিতে নিক্ষেপ ক'রে ভস্মসাৎ করলেন।

কিউল জংশনের পরে বক্তিয়ারপুর কিংবা পাটনা স্টেশন থেকে যদি আমরা এগিয়ে যাই, তাহ'লে রাজগীরের ৭ মাইল পূর্বেই পাব নালান্দা। আর কিউলের পর নওদা অথবা গয়া থেকে যদি যাওয়া যায় তাহলে রাজগীরের ৭ মাইল পরে পাওয়া যাবে নালান্দা। বাস ও রেল স্টেশন থেকে ভগ্নাবশেষ ১ মাইল দূরে অবস্থিত। বাস, রিক্সা, ট্যাকসী, টাঙ্গা—যে-কোন যানবাহনে যাতায়াত করা যায়। বিরল-বৃক্ষ, জনপদহীন বিস্তৃতিতে ভূপ্রোথিত স্তূপগুলি মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। চারদিকে যেন লুপ্ত গৌরবের করুণ সুর ভেসে বেড়াচ্ছে। ধীর-পদক্ষেপে এগিয়ে গেলে পাওয়া যাবে একটি মহুয়া গাছের শীতল ছায়ায় ঘেরা বৃহৎ একটি চৌমাথা। চৌমাথার ডানদিকে পুরাতত্ত্ব বিভাগের একটি দর্শনীয় যাদুঘর। সুন্দর ফুলের বাগান ও লন সহ যাদুঘরটি নয়নানন্দকর। সুমুখে ফাঁকা ডাঙ্গায় চিকিৎসালয়, বিদ্যালয় ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত পুরানো লোকালয় এবং বাঁদিকে আমাদের দ্রষ্টব্য ভগ্নাবশেষের আবিষ্কৃত অংশ। আমরা যখন গেলাম, তখন সকাল বেলা মহুয়ার পাতায় ফুরফুরে বাতাস। ওদিকে একখানা ছোট লন। তারই পশ্চিমে আধুনিক বিরাট গেট। উৎকণ্ঠায় কিছু সময় বিশ্রাম নেবার পর বেলা ১০ টায় গেট খুলল। আমরা ভেতরে প্রবেশ করলাম। পুরানো প্রবেশদ্বারের এপাশে-ওপাশে বিস্তৃত চোরকুঠরি। এই চোরকুঠরিতে রাখা হ'ত দানে পাওয়া মূল্যবান দ্রব্য-সামগ্রী। ভেতরের প্রাঙ্গণটি বৃহৎ। শেষপ্রান্তে উচ্চ প্রতিমাবেদী এবং তারই পাশে অধ্যাপকের উপবেশনস্থল। বিদ্যার্থিগণ বসতেন প্রাঙ্গণে। চারদিকে বাসগৃহ—ভিক্ষুদের আবাস। এ সব নিপুণ হস্তে তৈরী। কোন কোন গৃহে ভেন্টিলেটর ও স্কাই-লাইটের ব্যবস্থা পর্যন্ত ছিল। তাছাড়া, দরজা-খিলান, নালা-নর্দমা, কূপ সবই বিজ্ঞান-সম্মত। সাধারণতঃ পূর্ব ও দক্ষিণে বিহার ও মন্দির। পশ্চিমদিকে চৈত্য এবং পশ্চিম-দক্ষিণ কোণে স্তূপ। প্রত্যেকটি বিহারে দু'তিনটি ক'রে স্তর; আবার প্রত্যেক স্তরে ২।৩টি ক'রে তলা আছে। ৯টি স্তর পাওয়া গেছে ১ম বিহারে। ২য়টি হ'ল প্রস্তরনির্মিত মন্দির। এখানে দেবদেবী, মানুষ, পশুপক্ষী প্রভৃতির মূর্তি উৎকীর্ণ। অনুমান, ইহা ৬ষ্ঠ কিংবা ৭ম শতাব্দীর নির্মিত। ৩য় স্তূপটিতে ৭টি স্তর আবিষ্কৃত হয়েছে; এবং স্তরগুলি ক্রমে ক্রমে বড় হয়েছে। হয়তো এক এক রাজার আমলে এক একটি নির্মিত। উত্তর দিকে ৩টি সিঁড়ি। যথাক্রমে ইহারা ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম স্তরে মিলিত হয়েছে। এই ৩য় স্তূপটির নির্মাণ-কৌশল ও রক্ষণাবেক্ষণ দেখে অনেকে অনুমান করেন যে, ইহা ভগবান তথাগতের অথবা সারিপুত্রের ধাতুস্তূপ। ৪র্থ ও ৫মটি প্রাচীন বিহার। ৬ষ্ঠ বিহারের উপর তলার প্রাঙ্গণে অনেক উনান। এখানে রসায়নবিষয়ক শিক্ষা দেওয়া হ'ত। তারপর ১১শ ১২শ পর্যন্ত চৈত্য। এ সব চৈত্যের চতুর্দিকে বহু অনাবিষ্কৃত ঢিবি এখনও ছড়িয়ে আছে। ১৩শ চৈত্যের উত্তরেও উনান আছে। এখানে ধাতু গলাবার বা কারি-গরী বিদ্যার ব্যবস্থা ছিল—মূর্তিনির্মাণ হ'ত। নালান্দার শিক্ষণীয় বিষয়গুলির মধ্যে ভাস্কর্য

একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিল। ১৪শটিও একটি চৈত্য। প্রতিমার নীচে অস্পষ্ট অথচ সুন্দর চিত্র অঙ্কিত আছে।

যাদুঘরের কথা পূর্বেই বলেছি। সেখানে বুদ্ধদেব বোধিসত্ত্বগণ ব্যতীত তান্ত্রিক ও বৌদ্ধতান্ত্রিক দেবদেবীর মূর্তি অসংখ্য। অপূর্ব কারুকার্যখচিত সব মূর্তি। নালান্দার মাটি ও প্রস্তরমূর্তির চেয়ে ব্রোঞ্জ, ধাতু-মূর্তির সংখ্যাই অধিক। প্রায় সবই গুপ্ত ও পাল যুগের তৈরী। পাল যুগের মূর্তি পাটনা, নেপাল, তিব্বত এমনকি পূর্ব দ্বীপপুঞ্জের বহু যাদুঘরে শ্রেষ্ঠ স্থান দখল ক'রে আছে। অবশ্য ইদানীং পাটনাতে 'রাজেন্দ্রপ্রসাদ হল'ই জাঁকজমকে চমকপ্রদ! শিল্পীরা বলেন গুপ্ত-যুগের ভাস্কর্যের বৈশিষ্ট্য হ'ল ভেতরের ভাব ফুটিয়ে তোলা আর পালযুগের শিল্পনৈপুণ্য হ'ল বাহ্য সৌকুমার্য। মিউজিয়মে অনেক শীলমোহর আছে। একটিতে লেখা—"শ্রীনালান্দা মহা-বিহারী আর্য ভিক্ষু সঙ্ঘস্য"। মন্ত্রখোদিত ইট এবং প্রাচীন বাসন-পত্রাদিও রক্ষিত আছে। আরো রয়েছে সে যুগের হস্তাক্ষর। এমনকি অ-ভগ্ন মাটির হাঁড়িতে চাল পর্যন্ত দেখতে পাওয়া যায়। যাদুঘরে প্রদর্শিত জিনিসপত্র সবই নালান্দায় প্রাপ্ত নয়—রাজগৃহেরও আছে।

নালান্দার আশেপাশে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য স্থান আছে, তার মধ্যে সারিচক ও দীপনগর বিখ্যাত। সারিচক বুদ্ধদেবের পরিকর সারিপুত্রের জন্মস্থান বলে কথিত। দীপনগর মহাস্থবির দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের সম্মানার্থে নামানুকরণ হয়েছে।

আর একটি বিষয়ের উল্লেখ না করলে নালান্দার কাহিনী অসম্পূর্ণ থেকে যায়। রেল স্টেশন হ'তে ভগ্নাবশেষে যাবার মধ্যপথে 'নব নালান্দা মহাবিহার' নামে একটি নিশানা দেখতে পাওয়া যায়। সেখান থেকে বাঁদিকে দু'ফার্লং দূরে একটি পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট পালি ইনস্টিটিউট আছে। মহাবিহারটি আধুনিক। সুরুচিসম্মত রাস্তা ঘাট, বাগান-বাড়ী ও গাছ-পালাতে সজ্জিত। দূর হ'তে ইহার সামগ্রিক ঝলমলে ছিমছিমে রূপটি পথিকের মন হরণ করে। সেখানে বিশ্রামগৃহ, সরাইখানা, ধর্মশালা কিছুরই অভাব নেই। পালি ও বৌদ্ধধর্মে স্নাতকোত্তর শিক্ষা দেওয়া হয়। রিসার্চের ব্যবস্থাও আছে। আজ পর্যন্ত শতাধিক বিদ্যানুরাগী ডক্টরেট উপাধি গ্রহণ করেছেন। ক্রমেই ইহার উৎকর্ষ বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু স্থানীয় ছাত্র প্রায় নেই বললেই হয়। শুনেছি বর্তমানে নাকি উপর্যুক্ত দু'টি ছাড়া আরো কয়েকটি বিষয়েও শিক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে।

# রবীন্দ্রনাথের 'পতিতা'

**শিবদাস**

ভারতের প্রাচীন তপোবন-তরুশিরে রাশি রাশি আনন্দের হাসি, অমৃত হিল্লোল ছড়ানো ছিল। আনন্দই মানুষ চায়, আর চায় মরণকে এড়িয়ে চলতে। মানুষ কেন, সব প্রাণীরই সর্ববিধ জীবনপ্রচেষ্টার প্রেরণাই হল আনন্দ লাভ করা, আর মরণকে এড়িয়ে চলা। কিন্তু কি করে তা করা যায়, সে-বিষয়ে পথ ভুল করি আমরা। আমরা চাই দেহ-মনের, ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বিষয়ের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে সেই আনন্দলাভ করতে। আর চাই দেহের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে রেখে, দেহকে আঁকড়ে ধরে দেহটিকেই অমর করতে। এর কোনটিই কিন্তু আমরা যা চাই তা দিতে পারে না।

তাহলে মানুষের কি চির আনন্দ লাভের, অমৃতত্বলাভের কোন পথই নেই? আছে বৈকি। মানুষকে সেই পথ সর্বাগ্রে দেখিয়েছে ভারত; প্রাচীন ভারতের তপোবন-গুলি, হিমালয়ের গুহাগুলি হাজার হাজার বছর আগেই পূর্ণ হয়েছিল এই আনন্দের হাসিতে, অমৃতের হিল্লোলে। আর তা ছড়িয়ে পড়েছিল ভারতের রাজসভায়, ধনীর গৃহে, দরিদ্রের কুটীরে, মন্দিরে, যজ্ঞশালায়, আবার গৃহস্থালীতে, ব্যাধের বিপণীতেও। শুধু ভারতেই সীমাবদ্ধ ছিল না তা, যুগে যুগে ছড়িয়ে গেছে সারা পৃথিবীতে। পথটি হল, দেহ থেকে তোমাকে সরে যেতে হবে; তুমি যে দেহ নও, দেহাতীত অমর আনন্দময় পুরুষ—এইটুকু শুধু জানতে হবে।

এই জানার এবং অপরকে জানানোর বহু উপায় আছে। যার একটি হল 'শ্রদ্ধা'। এই 'শ্রদ্ধা-'র উপর স্বামীজী খুব গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এর কোন প্রতিশব্দ পাওয়া মুস্কিল —মোটামুটিভাবে বলা যায় আত্মবিশ্বাস। কঠোপনিষদে নচিকেতার উপাখ্যানে এই শ্রদ্ধার কথা আছে। বড় প্রিয় ছিল স্বামীজীর এই উপনিষদ্‌টি। কিশোর নচিকেতাকে তার বাবা রেগে গিয়ে বলেছিলেন, 'তোকে যমের কাছে দিলাম।' শুনে নচিকেতার মনে শ্রদ্ধার উদয় হয়েছিল। এই শ্রদ্ধার ফলে, নিজের ওপর বিশ্বাসের ফলে সে ভাবল, 'আমি কি একেবারে অপদার্থ যে বাবা আমাকে যমের হাতে সঁপে দিতে চাইলেন।' ভেবে দেখলো, তা নয়; 'বাবার কাছে যারা পড়তে আসে, যাদের সঙ্গে পড়ি, তাদের ভেতর হয়তো সেরা ছেলে আমি নই; কিন্তু অনেকের তুলনায় আমি প্রথম, অনেকের তুলনায় মধ্যম। অধম তো নিশ্চয়ই নই।'

নিজের ওপর এই শ্রদ্ধার উদয়ে মানুষ যেমন ক্রমোন্নত হয়ে শেষে তার দেহাতীত আনন্দময় অমৃত-স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারে, অপরের প্রতি শ্রদ্ধা-প্রদর্শনেও তেমনি অপরকে উদ্বুদ্ধ করতে পারে এই স্বরূপ উপলব্ধির জন্য।

রবীন্দ্রনাথ এই শেষোক্ত সত্যটি অপরূপ ভাষায় ও ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর 'পতিতা' কবিতায়।

অঙ্গদেশের রাজা লোমপাদ একবার ব্রাহ্মণ ও পুরোহিতদের প্রতি অসদাচরণ করেছিলেন ব'লে রাজ্যে দীর্ঘকাল অনাবৃষ্টি হয়। প্রজাদের কষ্টের সীমা থাকে না। একজন মুনি তখন

লোমপাদকে পরামর্শ দেন, 'আপনি ব্রাহ্মণদের তুষ্ট করুন, নইলে বৃষ্টি হবে না। বিভাণ্ডক মুনির পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গকে রাজ্যে নিয়ে আসুন—তাহলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।' লোমপাদ তখন মন্ত্রীদের সঙ্গে পরামর্শ করতে বসলেন, কি করে মুনিকুমার ঋষ্যশৃঙ্গকে আনা যায়। মন্ত্রীরা স্থির করলেন, কয়েকটি রূপযৌবনবতী পতিতাকে পাঠিয়ে তাদের দিয়ে ঋষ্যশৃঙ্গকে মুগ্ধ করে এখানে নিয়ে আসা হোক। সেইভাবেই ঋষ্যশৃঙ্গকে আনাও হয়েছিল. ফলে আবার নিয়মিত বৃষ্টিপাতও শুরু হয়।

এই উপাখ্যানটি মহাভারতে আছে, রামায়ণেও আছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিপুল কল্পনা দিয়ে এতে কিছু সংযোজন করে তার ভেতর শ্রদ্ধার অবদান ফুটিয়ে তুলেছেন। হলেই বা পতিতা; ঋষির আশ্রমের পবিত্র পরিবেশে গিয়ে, ঋষিকুমারের সান্নিধ্যে এসেও তাদের ভেতর একজনেরও চৈতন্য হবে না, একজনও তুচ্ছ দেহসুখের মোহের উর্ধ্বে মনকে তুলতে পারবে না, এটা যেন তাঁর মনঃপূত হয়নি। নগরীর নাট্যশালায় তা হওয়া সম্ভব নয় ঠিকই, কিন্তু এ যে তপোবন।

"সে যে তপোবন, স্বচ্ছ পবন. অদূরে সুনীল
শৈলমালা।
কলগান করে পুণ্য তটিনী, সে কি নগরীর
নাট্যশালা?"

অতি পবিত্র, তপস্যার জ্যোতির্মণ্ডিত মুনিকুমারকে দেখেই পতিতাদের একজনের মনে পঙ্কিল জীবন থেকে উচ্চতর নবজীবনে উন্নত হবার স্পৃহা তখনি জাগলো—

"মনে হল মোর নব-জনমের উদয়শৈল উজল
করি
শিশির-ধৌত পরম প্রভাত উদিল নবীন
জীবন ভরি।"

এই জাগরণের পূর্ণতা ঘটল ঋষ্যশৃঙ্গের কথা শুনে। পিতা বিভাণ্ডক ছাড়া মুনিকুমার আর কোন মানুষের সংস্পর্শে আসেননি কখনো; স্ত্রীলোকের তো নয়ই। তবে গায়ত্রী-মন্ত্র পাঠ করেছেন সকাল-সন্ধ্যায়, তাই পতিতাদের দেখে গায়ত্রী দেবীর কথাই মনে জাগলো তাঁর, তাদের স্তব শুরু করলেন। কিন্তু তা অন্তর স্পর্শ করল শুধু একজনেরই, যার মনে হল :

"যে গাথা গাহিলা সে কখনো আর হয়নি
রচিত নারীর তরে।
সে শুধু শুনেছে নির্মল উষা নির্জন গিরি-
শিখর 'পরে
সে শুধু শুনেছে নীরব সন্ধ্যা নীল নির্বাক
সিন্ধুতলে—
শুনে গলে যায় আর্দ্র হৃদয় শিশির-শীতল
অশ্রুজলে।"

দেবী ভেবে তিনি বললেন তাকে :

"কোন্ দেব আজি আনিলে দিবা।
তোমার পরশ অমৃতসরস, তোমার নয়নে
দিব্য বিভা।"

"আনন্দময়ী মূরতি তুমি,
ফুটে আনন্দ বাহুতে তোমার,
ছুটে আনন্দ চরণ চুমি।"

বলা বাহুল্য, পতিতাদের এভাবে দেবীজ্ঞানে স্তব করতে দেখে আর সব পতিতারাই, "পিশাচীর দল উঠিল হেসে।" শুধু পূর্বোক্ত পতিতাটির মনে এই শ্রদ্ধানিবেদনের ফলে বিপুল শ্রদ্ধার সঞ্চার হল, দেবীজ্ঞানে স্তব করার ফলে তার অন্তরের দেবস্বরূপ জাগ্রত হল—নিজের দেহাতীত আনন্দময় অমৃতময় সত্তায় সে সজাগ হয়ে উঠল। মানুষমাত্রেই যে দেব-স্বরূপ, সেও তাই, একথা কেউ কোন দিন শোনায়নি তাকে। ভাবল, দেহের স্তুতিগান

'চাটুকথা' বহু শুনেছি কিন্তু কখনো "শুনিনি এমন সত্য বাণী।" কেউ কোন দিন তার অন্তরের দিকে, তার আসল সত্তার দিকে তাকায়নি, কেবল তার দেহের দিকেই তাকিয়েছে; ঋষিকুমারই প্রথম সে দেব-দেউলের দিকে তাকালেন। তার ফলে তারও দৃষ্টিফিরলো সেদিকে, তার অন্তরের দেবতা জাগ্রত হয়ে উঠলেন :

"সাধকবিহীন একক দেবতা ঘুমাতেছিলেন
সাগরকূলে,—
ঋষির বালক পুলকে তাঁহারে পূজিলা প্রথম
পূজার ফুলে।
আনন্দে মোর দেবতা জাগিল।"

পতিতাটি ফিরে এসে অতীত পঙ্কিল জীবনকে দুহাতে ছুঁড়ে ফেলে দিল—এই নবজাগ্রত শ্রদ্ধার পথ ধরে বাকী জীবন চলল দেবীত্বে সু-প্রতিষ্ঠিত হতে :

"তোমার পূজার গন্ধ আমার মনোমন্দির
ভরিয়া রবে—
সেথায় দুয়ার রুধিনু এবার যতদিন বেঁচে
রহিব ভবে।"

অপরের অন্তরস্থ দেবভাবকে জাগরিত করাইবার একটি রাজপথ হল তার প্রতি শ্রদ্ধা-নিবেদন। মানুষকে ঈশ্বরজ্ঞান করা, ঈশ্বর-জ্ঞানে তার পূজা করা তাই যেমন নিজের আনন্দামৃত স্বরূপ উপলব্ধির পথে সহায়তা করে, তেমনি সহায়তা করে অপরকে সেপথে চলার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে।

মানুষের সঙ্গে যখন আমরা ব্যবহার করি, যে বয়সের, যে স্তরের যে মানুষই হোক না, আমরা যেন তার প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা নিয়ে তা করতে পারি। কখনো কাউকে অবজ্ঞা করতে নেই, নিরুৎসাহ করতে নেই—সশ্রদ্ধভাবে করতে হয় তাকে আত্মবিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ। শিক্ষার ক্ষেত্রে, মানুষ গড়ার ক্ষেত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ দিক এটি—অবজ্ঞা নয়, শ্রদ্ধাপ্রদর্শন।

# সপ্তর্ষি আমার মন*

শ্রীরাজেন্দ্র শাহ

[ অনুবাদিকা—শ্রীমতী সুজাতা প্রিয়ংবদা ]

সপ্তর্ষি আমার মন
যা'
অহনিশ
প্রদক্ষিণ করছে তোমাকে
নিশ্চল!
হে সুদূর
হে ধ্রুবজ্যোতি তারকা!

আর,
শব্দরাশির উদ্গম
যা' হৃদয়ের ধ্বনি
তা'ই মন্ত্র—
গুঞ্জরণে ভরা এই নিখিল বিশ্ব
তুমি আমি
যেথা
শূন্য
ব্যাপক…

* কবির মূল গুজরাটী কবিতা হইতে অনূদিত।

# সমালোচনা

**বিদ্যাসাগর :** বাংলা গদ্যের সূচনা ও ভারতের নারীপ্রগতি ( কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত বিদ্যাসাগর বক্তৃতামালা ) : শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার, জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। ১১৯, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩ ; মূল্য : ছয় টাকা, পৃঃ ১৪৪

বর্তমান ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিকদের অন্যতম শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার তাঁর জীবন-সায়াহ্নে যে অনলস মননচর্চায় জ্ঞানসাধনার নব নব দিগন্ত উন্মোচন করে চলেছেন, সুধীসমাজে তেমন দৃষ্টান্ত বিরল। সাধারণতঃ পাণ্ডিত্যের শিখরচূড়ায় আরোহণ করে অনেক পণ্ডিতই অতীতকীর্তির প্রসাদজীবী হয়ে জীবনধারণ করেন। সে-তুলনায় শ্রদ্ধেয় আচার্য রমেশচন্দ্র নূতন তথ্যসংগ্রহে ও নূতনতর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে ভারত-ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান ও চিন্তার সমৃদ্ধি ঘটিয়ে প্রায় প্রতি বৎসরই রচনা ও বক্তৃতার দ্বারা দেশে-বিদেশে ভারত-ইতিহাসের প্রতি তাঁর একনিষ্ঠ আনুগত্যের পরিচয় দিয়েছেন। এ আমাদের জাতীয় সৌভাগ্য।

আলোচ্য গ্রন্থের পাঁচটি বক্তৃতায় আচার্য রমেশচন্দ্র প্রথমে বিদ্যাসাগর অবধি বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশ, দ্বিতীয় বক্তৃতা থেকে ঋগ্বেদ ও স্মৃতিশাস্ত্রের যুগে, এবং মধ্যযুগে ভারতের নারী ও উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার নারীসমাজের ক্রমিক ইতিহাস সংক্ষিপ্ত পরিসরে শ্রোতা বা পাঠকদের সামনে তুলে ধরেছেন। আলোচনাভঙ্গীর সরসতা ও বিষয়বস্তু-বিন্যাসের নিপুণতায় সমগ্র গ্রন্থটি এত সুখপাঠ্য ও কৌতূহলোদ্দীপক হয়ে, পাঠকচিত্তকে শেষ অবধি নিবিষ্ট করে রাখে। বিশেষতঃ ভারতীয় নারীসমাজের গৌরবময় যুগ থেকে পরবর্তী-কালের গ্লানিময় অবক্ষয়ের যুগ পর্যন্ত ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে বিদ্যাসাগরের আবির্ভাবের তাৎপর্য অনুসন্ধিৎসু পাঠকের কাছে আরো গভীর অর্থবহ হয়ে ওঠে।

প্রসঙ্গতঃ মনে হয়, ভারতীয় নারীসমাজের একখানি পূর্ণাঙ্গ ও বিস্তৃত ইতিহাস-রচনা আজ একান্ত প্রয়োজন। এ-বিষয়ে শ্রদ্ধেয় আচার্য রমেশচন্দ্রের নির্দেশে এ যুগের তরুণ-তরুণীরা কেউ যদি ব্রতী হ'ন, তাহলে ভারত-ইতিহাসের একটি দিক আলোকিত হয়ে উঠবে—এই আমাদের বিশ্বাস।

রাজা রামমোহন রায়, ডিরোজিওর শিষ্য-বৃন্দ, রাজা রাধাকান্তদেব ও তাঁর অনুগামিবৃন্দ থেকে আরম্ভ করে বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, অবধি বাংলার মনীষীদের বেশীর ভাগই নারীজাগরণের উদ্দেশে তাঁদের কর্ম ও সাধনার অনেকখানি নিয়োজিত করেছিলেন। এঁদের মধ্যে সহানুভূতি, সম্প্রীতি ও সর্বাত্মক আত্ম-নিবেদনে মধ্যমণিস্বরূপ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। বাংলার নারীসমাজের কল্যাণযজ্ঞে মাতৃভক্ত বিদ্যাসাগরের জীবনসাধনার পূর্ণাহুতি। বিদ্যা-সাগরের সার্ধশতাব্দীর জন্মজয়ন্তী প্রত্যাসন্ন। বাংলা তথা ভারতের পৌরুষ ও মমতার বিস্ময়কর সম্মেলনের উদাহরণ এই অনন্য চরিত্রের স্মৃতি আমাদের কর্তব্যসাধনের পথে উদ্বুদ্ধ করুক - এই প্রার্থনা। আদ্যন্ত সুমুদ্রিত এই গ্রন্থটির প্রকাশনায় যে শ্রদ্ধা ও যত্নের নিদর্শন মেলে, সেজন্য প্রকাশক আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদভাজন। — প্রণবরঞ্জন ঘোষ

**প্রবন্ধাবলী** ( দ্বিতীয় খণ্ড )—স্বামী ভূমানন্দ। প্রকাশক: স্বামী প্রকাশানন্দ, কালীপুর আশ্রম, কামাখ্যা, গৌহাটী ১০, আসাম। পৃষ্ঠা ২৩৮, মূল্য চার টাকা।

পুস্তকের নাম 'প্রবন্ধাবলী' সাধারণতঃ দেখা যায় না। তাহা হইলেও নামকরণের সার্থকতা আছে। বিভিন্ন বিষয় অবলম্বনে বিভিন্ন সময়ে লিখিত প্রবন্ধগুলিতে চিন্তাশীল লেখকের বিষয়বস্তুর গভীর মনন ও অনুধ্যানের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রবন্ধগুলির অধিকাংশই বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত। প্রবন্ধগুলির রচনাকাল উদ্ধৃত হওয়ায় ও ক্রমানুযায়ী বিন্যস্ত থাকায় গ্রন্থখানির মর্যাদা বৃদ্ধি পাইয়াছে। গ্রন্থে ৩১টি সুচিন্তিত প্রবন্ধ মুদ্রিত হইয়াছে, তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য: গুরুতত্ত্ব, শিবরাত্রি, গীতাবলী, মদালসা, রাষ্ট্র ও ধর্ম।

## শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের নবপ্রকাশিত-পুস্তক

**যুগনায়ক বিবেকানন্দ**—প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড ( দ্বিতীয় সংস্করণ ): স্বামী গম্ভীরানন্দ প্রণীত। প্রকাশক: উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা ৩; পৃষ্ঠা যথাক্রমে ৪৯৬, ৪৮৫ ও ৪৫৮; মূল্য প্রতিখণ্ড আট টাকা।

দুষ্প্রাপ্য, নূতন ও পুরাতন প্রামাণিক উপকরণ অবলম্বনে স্বামীজীর এই বিপুলায়তন জীবনচরিতখানি লিখিত। প্রতি খণ্ডে প্রাগ্‌বাণী ও নির্দেশিকা সংযোজিত হইয়াছে। উৎকৃষ্ট কাগজে শোভন মুদ্রণ ও উত্তম বাঁধাই। স্বামীজীর কয়েকখানি মনোরম চিত্র-সংবলিত।

গ্রন্থটির প্রথম খণ্ডে ( প্রস্তুতি ) শিশুকাল হইতে স্বামীজীর আমেরিকাযাত্রা পর্যন্ত, দ্বিতীয় খণ্ডে ( প্রচার ) স্বামীজীর পাশ্চাত্ত্যে প্রচার ও প্রথমবার ভারতে প্রত্যাবর্তন ( কলিকাতায় আগমন) পর্যন্ত এবং তৃতীয় খণ্ডে ( প্রবর্তন ) স্বামীজীর জীবনের বাকী অংশ বিবৃত।

স্বামীজীর এই প্রামাণিক ও পূর্ণাঙ্গ জীবনীর প্রথম সংস্করণ অল্প সময়ের মধ্যে নিঃশেষিত হইয়াছে।

**শ্রীশ্রীমায়ের পাঁচালী**—শ্রীঅক্রূরচন্দ্র ধর। প্রকাশক: শ্রীশ্রীমাতৃমন্দির, জয়রামবাটী, বাঁকুড়া। পৃষ্ঠা ৫০; মূল্য ০·৭৫।

শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী ভারতীয় নারীর আদর্শের পূর্ণ প্রতীক। সুকবি শ্রীঅক্রূরচন্দ্র ধর শ্রীশ্রীমায়ের পুণ্যময় অনবদ্য জীবন সহজ সরল ভাষায় পাঁচালি ছন্দে বর্তমান সমাজের কাছে উপস্থাপিত করিয়াছেন।

বহু দিন পরে 'শ্রীশ্রীমায়ের পাঁচালি'র সংশোধিত শোভন সংস্করণ প্রকাশিত হইল।

**পাঞ্চজন্য**—স্বামী চণ্ডিকানন্দ। প্রকাশক: উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা ৩; পৃষ্ঠা ৩০৮+৬; মূল্য ছয় টাকা।

সঙ্গীতরচনায় সিদ্ধহস্ত স্বামী চণ্ডিকানন্দের *'পাঞ্চজন্য' সঙ্গীত-গ্রন্থের* পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। প্রথম সংস্করণে ৬৪খানি গান স্থান পাইয়াছিল। ঐ গানগুলির অধিকাংশ বর্তমান সংস্করণে 'বিবেক-গীতি'-শীর্ষক প্রথম অধ্যায়ে স্থান পাইয়াছে, কিছু গান অন্যান্য অধ্যায়ে সন্নিবেশিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত বর্তমান সংস্করণে নয়টি নূতন অধ্যায় সংযোজিত হইয়াছে:

(১) মাতৃসঙ্গীত, (২) শিবসঙ্গীত, (৩) গুরুসঙ্গীত, (৪) মহামানবসঙ্গীত, (৫) লীলাগীতি, (৬) রামকৃষ্ণ-লীলাগীতি, (৭) সারদা-লীলাগীতি, (৮) বিবিধ সঙ্গীত, (৯) প্রতিধ্বনি ( বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত লেখকের কয়েকটি গান )। গানগুলির বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র সংযোজিত। বর্তমান সংস্করণের ভূমিকাটি শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী গম্ভীরানন্দজী কর্তৃক লিখিত।

# শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

## রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্য

**পূর্ব-পাকিস্তানের উদ্বাস্তুদের জন্য সেবাকার্য:** হাসনাবাদ ও বসিরহাটে ক্যাম্পে সমবেত উদ্বাস্তুগণের জন্য সেবাকার্য শুরু করা হইয়াছে। দৈনিক গড়ে ৫,০০০ দুঃস্থ ব্যক্তিকে চাল, ডাল, আলু, লবণ দেওয়া হইতেছে। ১৩ই হইতে ২৪শে এপ্রিল, ১৯৭০ পর্যন্ত রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক ১৩০'৫০ কুইন্ট্যাল চাল, ২১'৬৬ কুইন্ট্যাল ডাল, ১৬'৩২ কুইন্ট্যাল আলু এবং সাড়ে ছয় বস্তা লবণ বিতরণ করা হইয়াছে।

**গুজরাটে অন্নকষ্ট ও জলকষ্টের জন্য সেবাকার্য:** গত দুই বৎসর অনাবৃষ্টির ফলে কচ্ছে তীব্র অন্নাভাব ও জলাভাব দেখা দিয়াছে। রাজকোট আশ্রম কর্তৃক কচ্ছে সেবাকার্য আরম্ভ করা হইয়াছে।

**উত্তর-বঙ্গে বন্যার্তসেবা:** জলপাইগুড়ি শহরের সন্নিকট মোহিতনগরে বিদ্যালয়ভবন-নির্মাণের কার্য সম্পূর্ণ হইয়াছে।

**আসামে বন্যার্তসেবা:** শিলচর আশ্রম কর্তৃক ২৮ খানি বস্ত্র এবং ১০০ খানি কম্বল ৪টি গ্রামের ১০০ জনের মধ্যে বিতরিত হইয়াছে।

## কার্যবিবরণী

**কাঁথি** রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাশ্রমের ১৯৬৭-৬৮ ও ১৯৬৮-৬৯ খৃষ্টাব্দের কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। কাঁথি আশ্রম সুদীর্ঘকাল জনসাধারণের অকুণ্ঠ সেবায় রত থাকিয়া ভগবৎকৃপায় ৫৭তম বৎসরে উপনীত হইয়াছে। এই আশ্রম মঠ মিশনের প্রাচীন কেন্দ্রগুলির অন্যতম।

এখানে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিত্যপূজাদি অনুষ্ঠিত হয় এবং একটি ছাত্রাবাস, একটি দাতব্য চিকিৎসালয়, একটি গ্রন্থাগার ও পাঠাগার পরিচালিত হয়।

আলোচ্য বর্ষদ্বয়ের কার্যধারা নিম্নরূপ:

ছাত্রাবাস: ১৯৬৭-৬৮ খৃষ্টাব্দে ছাত্রাবাসে ৮টি ছাত্র রাখা হইয়াছিল, তন্মধ্যে ৭টি ছাত্র বিনা ব্যয়ে থাকিবার সুযোগ লাভ করে। ১৯৬৮-৬৯ খৃষ্টাব্দে ৮টি অবৈতনিক ছাত্রকে রাখা হয়। ছাত্রাবাসের পরীক্ষাফল আশানুরূপ।

গ্রন্থাগার ও পাঠাগার: বর্ষদ্বয়ে গ্রন্থাগারের পুস্তকসংখ্যা যথাক্রমে ৫,০০০ ও ৫,০১৬ এবং পঠনার্থে প্রদত্ত পুস্তকসংখ্যা ৪,৪৫৭ ও ৫,৪৮০।

পাঠাগারে নিয়মিত দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও মাসিক পত্রিকা লওয়া হয়, ১৯৬৮-৬৯ খৃষ্টাব্দে মোট ২৪ খানি পত্রিকা রাখা হইয়াছিল।

প্রাথমিক বিদ্যালয়: সেবাশ্রম কর্তৃক কাঁথি শহর হইতে প্রায় ৪ মাইল উত্তরে বেলদা গ্রামে ১৯২৮ খৃষ্টাব্দ হইতে একটি অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালিত হইতেছে। ১৯৬৮-৬৯ খৃষ্টাব্দে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ১৫০, তন্মধ্যে ছাত্রী ৬৫ জন।

দাতব্য চিকিৎসালয়: সেবাশ্রম-পরিচালিত দাতব্য হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসালয়ে ১৯৬৭-৬৮ খৃষ্টাব্দে ৯,৯৭১ জন এবং ১৯৬৮-৬৯ খৃষ্টাব্দে ১১,৮৯৪ জন রোগী চিকিৎসিত হইয়াছিল।

সেবাকার্য: আলোচ্য বর্ষদ্বয়ে কাঁথি সেবাশ্রম কর্তৃক উল্লেখযোগ্য বন্যার্তসেবা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ১৯৬৭-৬৮ খৃষ্টাব্দে ১২৭টি গ্রামের ১,২২,০০০ দুঃস্থ নরনারীকে খাদ্যদ্রব্যাদি দেওয়া হয়। ইহা ছাড়া বস্ত্র বিতরণ করা হইয়াছিল। ২ মাস ২০ দিন ধরিয়া এই সেবাকার্য চালানো হয়। মোট সাহায্যের পরিমাণ চাল ১,১৬২ কুইন্ট্যাল ৯০ কেজি, গম ৪৮৩ কুইন্ট্যাল ২৯ কেজি, ডাল ৩০ কেজি, ১,৩০২ খানি নূতন বস্ত্র, পুরাতন জামাপ্যান্ট ৩০০টি ও নগদ ৩,৫০৪ টাকা।

১৯৬৮-৬৯ খৃষ্টাব্দে বন্যার্তসেবাকার্যে ৩৭টি গ্রামের ২,৩০,৬৫০ জন দুঃস্থ নরনারীকে খাদ্য-দ্রব্যাদি দেওয়া হয়। ৪ মাস ৭ দিন ধরিয়া রিলিফ চলে। মোট প্রদত্ত সাহায্য: চাল ৭৫১ কুইন্ট্যাল ৫১ কেজি, গম ২,৯৪১ কুইন্ট্যাল ৬০ কেজি, আটা ১০২ কুইন্ট্যাল ৮৯ কেজি, বস্ত্র ১৭১৮ খানি ও নগদ ১৩ টাকা।

উৎসবাদি: শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব বর্ষদ্বয়ে সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। এই উপলক্ষে ৬।৭ হাজার নর-নারায়ণকে বসাইয়া প্রসাদ দেওয়া হয়। ১৯৬৮-৬৯ খৃষ্টাব্দে প্রতিমায় শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা ও শ্রীকালীপূজা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। আশ্রমে ও অন্যত্র শাস্ত্রপাঠ ও আলোচনা নিয়মিতভাবে করা হইয়া থাকে।

**কোয়েম্বাতুর** জেলা শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়ের ১৯৬৮-৬৯ খৃষ্টাব্দের কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। ১৯৭০-র ৩রা ফেব্রুআরি এই বিদ্যালয়ের ৪০ বৎসর পূর্ণ হইয়াছে। এই সময়ের মধ্যে বিশাল ভূখণ্ডের উপর নিম্নলিখিত শিক্ষায়তনগুলি গড়িয়া উঠিয়াছে এবং সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইতেছে:

(১) টিচার্স কলেজ—শিক্ষার্থীর সংখ্যা: ১২৩ জন বি. টি., ৮ জন এম. এড, ১ জন পি এইচ. ডি। পরীক্ষার ফল: এম. এড ১০০% এবং বি. টি. ৯৭% উত্তীর্ণ।

টিচার্স কলেজের গবেষণা এবং এক্সটেনশন সারভিস প্রভৃতি বিভাগের কার্য বিশেষ প্রশংসনীয়।

(২) আবাসিক বহুমুখী উচ্চবিদ্যালয়: ছাত্রসংখ্যা—১৯৬, তন্মধ্যে ৩১ জন ফ্রি স্কলার। পরীক্ষার ফল: ৯৬% উত্তীর্ণ।

(৩) বেসিক ট্রেনিং স্কুল: শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৩৯। পরীক্ষার ফল: ১০০% উত্তীর্ণ।

(৪) কলানিলয় (চতুষ্পার্শ্বস্থ গ্রামগুলির ছাত্রছাত্রীদের জন্য)—বেসিক ট্রেনিং স্কুলের আদর্শ বেসিক স্কুল: ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা—৫৭১, তন্মধ্যে ছাত্রী ২১৪ জন।

(৫) স্বামী শিবানন্দ হাই স্কুল (চতুষ্পার্শ্বস্থ গ্রামগুলির ছাত্রছাত্রীদের জন্য)—টিচার্স কলেজের আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়: ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ২২৫, তন্মধ্যে ছাত্রী ৪৬ জন। ফাইন্যাল পরীক্ষায় ৫৩ জনের মধ্যে ২৮ জন উত্তীর্ণ।

(৬) শারীর শিক্ষা কলেজ—১৩ বৎসর হইল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এই সময়ের মধ্যে ২০৫ জন শিক্ষক হায়ার গ্রেডে এবং ৮৪৯ জন শিক্ষক লোয়ার গ্রেডে শারীর শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

(৭) ইঞ্জিনীয়ারিং স্কুল: তিন বৎসরের কোর্সে মোট ছাত্রসংখ্যা ৮০। তন্মধ্যে প্রথম বর্ষে ২৩, দ্বিতীয় বর্ষে ২১ এবং তৃতীয় বর্ষে ৩৬। পরীক্ষার ফল সন্তোষজনক।

ইঞ্জিনীয়ারিং স্কুলের অটোমোবাইল সেকশনে এ পর্যন্ত ৬টি ব্যাচে ১৫৫ জন শিক্ষা লাভ করিয়াছে। ৭ম ব্যাচে ২৩ জন ছাত্র ট্রেনিং পাইতেছে।

(৮) কৃষিবিদ্যালয়: ছাত্রসংখ্যা ১৩৭। ৮৬ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৬৯ জন উত্তীর্ণ, তন্মধ্যে

৪ জন ফার্স্ট ক্লাস।

(৯) উচ্চতর গ্রামীণ শিক্ষা কলেজ : ছাত্রসংখ্যা ২৪৩, পরীক্ষার ফল সন্তোষজনক।

(১০) প্রাক্ বিশ্ববিদ্যালয় আর্টস কলেজ : ছাত্রসংখ্যা ৩৮১, পরীক্ষার ফল ৭৮% উত্তীর্ণ।

(১১) ইনডাস্ট্রিয়াল ইনস্টিট্যুট : ছাত্র-সংখ্যা ৭৫।

(১২) বিদ্যালয় প্রেস : এই প্রেসে প্রিন্টিং বিষয়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা আছে।

এখানে একটি বৃহৎ গ্রন্থাগার ( Central Library ) আছে ; পুস্তকসংখ্যা ৩৪,৩৭৮। শিক্ষক ও ছাত্রদিগকে পড়িবার জন্য ১৯,০৬০ খানি গ্রন্থ দেওয়া হইয়াছিল।

এতদ্ব্যতীত অধিকাংশ শিক্ষায়তনেই স্বতন্ত্র লাইব্রেরী আছে।

আলোচ্য বর্ষে ডিসপেন্সারীতে ২৩,৬৮৯ জন রোগী চিকিৎসিত হইয়াছে, তন্মধ্যে ১৭,২৮১ জন পুরুষ, ২,২৪৩ জন স্ত্রীলোক এবং ৪,১৬৫টি শিশু।

আলোচ্য বর্ষে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

১৯৬৮-৬৯ খৃষ্টাব্দে এই বিদ্যালয়ের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান—গান্ধী শত-বার্ষিকী এবং তামিল ভাষার সাধক-কবি তিরুভাল্লুবরের ২,০০০তম জন্মবার্ষিকী মনোজ্ঞ-ভাবে উদ্‌যাপন।

## উৎসব-সংবাদ

**তমলুক** শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে গত ৪ঠা এপ্রিল হইতে তিন দিন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৩৫ তম শুভ জন্মমহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন তমলুকের মহকুমাশাসক শ্রীঅশোক গুপ্ত এবং বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ শ্রীশ্রুতিনাথ চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী ও বাণী আলোচনা করেন বেলুড় মঠের স্বামী রুদ্রাত্মানন্দ এবং শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী ও বাণী আলোচনা করেন কলিকাতা লেডি ব্র্যাবোর্ন কলেজের অধ্যাপিকা ডঃ বন্দিতা ভট্টাচার্য। বেতারশিল্পী শ্রীসুকুমার দে ও সম্প্রদায় কর্তৃক রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-লীলাগীতি এবং গীতিসুধাকর শ্রীবিশ্বনাথ গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক রামায়ণগান পরিবেশিত হয়। অনুষ্ঠানের শেষ দিনে প্রায় ৫,০০০ ভক্ত বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন।

**মনসাদ্বীপ** রামকৃষ্ণ মিশনের উদ্যোগে গত ১ ই এপ্রিল হইতে ১৩ই এপ্রিল পর্যন্ত সাগরদ্বীপের বিভিন্ন স্থানে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৩৫তম জন্মোৎসব পালিত হয়।

১০ই এপ্রিল বিকালে স্বামী নিরাময়ানন্দ-জীর সভাপতিত্বে আশ্রম বিদ্যালয়গুলির (একটি বহুমুখী, একটি বালকদের নিম্ন বুনিয়াদী ও একটি বালিকাদের প্রাথমিক ) পারিতোষিক-বিতরণী সভা অনুষ্ঠিত হয়।

১১ই এপ্রিল সকালে পূজা-ভজনাদি হয় এবং বিকালে শোভাযাত্রা গ্রাম পরিক্রমা করে। পরে স্বামী অমৃতত্বানন্দের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ধর্মসভায় আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন স্বামী নিরাময়ানন্দ, স্বামী উমানন্দ ও শ্রীনবনী-হরণ মুখোপাধ্যায়। আশ্রম-অধ্যক্ষ স্বামী সিদ্ধিদানন্দ আশ্রমের বার্ষিক বিবরণী পাঠ করেন। সভার শেষে প্রায় আড়াই হাজার ভক্ত বসিয়া খিচুড়ি প্রসাদ গ্রহণ করেন। রাত্রে সরিষা রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের পরিচালনায় দুটি চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়।

১২ই এপ্রিল সকালে সুমতিনগর রামকৃষ্ণ প্রগতি সঙ্ঘে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা ও

বিকালে ধর্মসভা হয়। সভাপতিত্ব করেন স্বামী উমানন্দ এবং আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন স্বামী অমৃতত্বানন্দ এবং শ্রীনবনীহরণ মুখোপাধ্যায়। সভান্তে পুরস্কার-বিতরণের পর ছায়াচিত্র প্রদর্শিত হয়।

১৩ই এপ্রিল বিকালে মুড়িগঙ্গা প্রাথমিক বিদ্যালয়-প্রাঙ্গণে অয়োজিত ধর্মসভায় অংশ গ্রহণ করেন স্বামী উমানন্দ। সভান্তে ছায়াচিত্র প্রদর্শিত হয়।

প্রত্যেক স্থানেই সাগরদ্বীপের বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের প্রবন্ধ ও বক্তৃতা-প্রতিযোগিতায় পুরস্কার প্রদত্ত হইয়াছিল।

গত বৎসরের ন্যায় এ বৎসরেও জি প্লট, উত্তর সুরেন্দ্রগঞ্জে বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দিরে সেখানকার স্থানীয় লোকদের উদ্যোগে এবং মনসাদ্বীপ রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের সহযোগিতায় শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব-অনুষ্ঠানে ১৫ই এপ্রিল সকালে শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা ও বিকালে ধর্মসভার আয়োজন করা হয়। সভাপতিত্ব করেন স্বামী সিদ্ধিদানন্দজী। বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রেরা পাঠ ও আলোচনাদিতে অংশ গ্রহণ করেন। সভান্তে ছায়াচিত্র প্রদর্শিত হয়।

**বহরমপুর** আশ্রমে গত ৩রা এপ্রিল হইতে ৫ই এপ্রিল পর্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব মহানন্দে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। পূজা, পাঠ, ভজন, প্রসাদবিতরণ, জনসভা প্রভৃতি উৎসবের প্রতিটি অঙ্গ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। বিভিন্ন দিনে আয়োজিত সভায় স্বামী নিরাময়ানন্দ, স্বামী ধ্যানাত্মানন্দ ও অন্যান্য বিশিষ্ট বক্তা শ্রীশ্রীঠাকুর-স্বামীজীর পুণ্য জীবন ও বাণী অবলম্বনে সময়োপযোগী মনোজ্ঞ ভাষণ দেন।

**বাগেরহাট** (খুলনা) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ১৯শে চৈত্র হইতে ২৭শে চৈত্র পর্যন্ত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের শুভ জন্মোৎসব উদ্‌যাপিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে প্রতিদিন পূর্বাহ্নে বিশেষ পূজা, পাঠ ও ভজনাদির অনুষ্ঠান হয়। বিভিন্ন দিনে সভায় পৌরোহিত্য করেন শ্রীরাসমোহন চক্রবর্তী ও শ্রীবিমলচন্দ্র বসু এবং ভাষণ দেন মহম্মদ রিজাউল হক, শ্রীমৎ ধর্মরক্ষিত ভিক্ষু, প্রতিভারাণী বসু অধ্যাপক পরমানন্দ রায়, ডক্টর কাজী মোতাহের হোসেন, মিঃ মাইকেল, এস. অধিকারী, জনাব ইসমাইল হোসেন, অধ্যাপক লুৎফর রহমান ও ব্রহ্মচারী বিদেহচৈতন্য। রামায়ণগান পরিবেশন করেন শ্রীবিজয়কৃষ্ণ সরকার।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, এই আশ্রমের উৎসবান্তে ঢাকা কুমিল্লা ও চাঁদপুর হইতে আগত বিশিষ্ট বক্তাগণকে লইয়া ২৩শে চৈত্র সোমবার খুলনা সদরে এবং ২৪শে চৈত্র মঙ্গলবার দৌলতপুরে দুইটি আলোচনা-সভার অধিবেশন হয়। এই দুই স্থানের মহতী সভায় বক্তাগণ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জীবনাদর্শ ও ভাবধারা সম্বন্ধে মনোজ্ঞ ভাষণ দেন।

### ভিত্তিস্থাপন

**উদ্যানবাটী:** গত ২৪শে বৈশাখ, ১৩৭৭ (৮.৫.৭০) শুক্রবার পুণ্য অক্ষয় তৃতীয়া দিবসে সকাল ৭-৪৫ মিনিটের সময় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ কাশীপুর শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের স্থায়ী বসতবাটীর ভিত্তি স্থাপন করেন। এতদুপলক্ষে বৈদিক প্রার্থনা, পূজা ও ভজনাদি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। এই শুভ অনুষ্ঠানে বহু সন্ন্যাসী ও ভক্ত উপস্থিত ছিলেন।

## শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণাপূজা

**বেলঘরিয়া** রামকৃষ্ণ মিশন কলিকাতা বিদ্যার্থী আশ্রমে গত ৩১শে চৈত্র, ১৩৭৬ ( ১৪.৪.৭০ ) মঙ্গলবার আনন্দময় ভাবগম্ভীর পরিবেশে শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণাপূজা সুসম্পন্ন হইয়াছে। এই পুণ্য অনুষ্ঠানে বহু সাধু, ভক্ত ও প্রাক্তন ছাত্রের সমাগম হইয়াছিল। প্রায় তিন সহস্র ব্যক্তি বসিয়া অন্নপ্রসাদ গ্রহণ করেন। দেবী অন্নপূর্ণাকে নিবেদন করিয়া ১২০ খানি শাড়ী স্থানীয় অঞ্চলের দুঃস্থ মহিলাদিগকে বিতরণ করা হয়।

## স্বামী সিদ্ধান্তানন্দের দেহত্যাগ

আমরা অত্যন্ত দুঃখিত চিত্তে জানাইতেছি, গত ২১শে এপ্রিল, ১৯৭০ রাত্রি আটটার সময় স্বামী সিদ্ধান্তানন্দ ( মুখ্যপ্রাণ মহারাজ ) ৬৫ বৎসর বয়সে কলিকাতা রামকৃষ্ণ মিশন সেবা-প্রতিষ্ঠানে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি বি-কোলাই, রক্তাল্পতা, আন্ত্রিক গোলযোগ ও অন্যান্য উপসর্গে ভুগিতেছিলেন।

স্বামী সিদ্ধান্তানন্দ শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে তিনি সঙ্ঘে যোগদান করেন এবং ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের নিকট সন্ন্যাসদীক্ষা লাভ করেন।

তিনি প্রধানতঃ বারাণসী সেবাশ্রম, দেওঘর বিদ্যাপীঠ এবং রঁাচি স্যানাটোরিয়ামে শ্রীশ্রীঠাকুর-স্বামীজীর কাজে ব্রতী ছিলেন, প্রত্যেকটি আশ্রমে প্রায় ১২ বৎসর করিয়া তিনি ছিলেন ধ্যানপরায়ণ ও কঠোরী এবং সর্বজনপ্রিয়।

তাঁহার আত্মা শ্রীরামকৃষ্ণ-পাদপদ্মে শাশ্বত শান্তি লাভ করিয়াছে।

## স্বামী বিশ্বেশানন্দের দেহত্যাগ

অতি দুঃখের সহিত জানাইতেছি গত ২৯শে এপ্রিল, ১৯৭০ রাত্রি ২টা ৩৫ মিনিটের সময় স্বামী বিশ্বেশানন্দ ( শ্রীকণ্ঠ মহারাজ ) বেলুড় মঠে দেহত্যাগ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণচরণে চিরশান্তি লাভ করিয়াছেন। তাঁহার বয়স ৭০ বৎসর হইয়াছিল। হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া সহসা বিকল হওয়ায় তাঁহার দেহত্যাগ হয়। যদিও তিনি বহু বৎসর যাবৎ ডায়াবিটিস, ব্লাডপ্রেসার প্রভৃতিতে অসুস্থ ছিলেন, কিন্তু অপ্রত্যাশিত-ভাবে তাঁহার শান্তিপূর্ণ শেষ মুহূর্ত আসিয়াছিল।

স্বামী বিশ্বেশানন্দ শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। তিনি ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে সঙ্ঘে যোগদান করেন এবং ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজেরই নিকট হইতে সন্ন্যাস প্রাপ্ত হন। বেলুড় মঠ ডিসপেন্সারী ছাড়া তিনি কনখল ও বারাণসী সেবাশ্রমেও কয়েক বৎসর শ্রীশ্রীঠাকুর-স্বামীজীর কাজে নিরত থাকেন।

তিনি ছিলেন সরল, কঠোর পরিশ্রমী ও শান্তস্বভাব সন্ন্যাসী।

# বিবিধ সংবাদ

## উৎসব সংবাদ

**বৈকুণ্ঠপুর** (ফুলেশ্বর) শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা-তীর্থে গত ৯ই হইতে ১৫ই মার্চ পর্যন্ত পূজা, পাঠ, ধর্মসভা প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের জন্মতিথি-উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। বিভিন্ন দিনের সভায় ও ঘরোয়া আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ, স্বামী জয়ানন্দ, স্বামী জীবানন্দ, স্বামী নিরন্ত্যানন্দ, শ্রীনবনীহরণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত, শ্রীধীরেন্দ্রনাথ পাল, শ্রীঅতুলকৃষ্ণ মজুমদার প্রভৃতি। ১৪ই মার্চ জনসভায় আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী আত্মানন্দ কার্যবিবরণী পাঠ করেন। সন্ধ্যার পর ১২ই মার্চ ছায়াচিত্র-প্রদর্শন, ১৪ই মার্চ ও ১৫ই মার্চ যাত্রাভিনয় হয়। শেষ দিন প্রায় দশহাজার দর্শনার্থী উপস্থিত ছিলেন।

**নড়াইল** শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ১৬ই ও ১৮ই মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শুভ জন্মোৎসব প্রতিপালিত হয়। ১ম দিন শোভা-যাত্রা শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা, পাঠ ও কীর্তনের পর প্রায় ১০ সহস্র ভক্ত নরনারী বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন।

২য় দিন প্রসিদ্ধ কবি-গায়ক শ্রীবিজয়কৃষ্ণ সরকার রামায়ণ গান করেন।

৩য় দিন শ্রীনারায়ণচন্দ্র সাহা পদাবলী কীর্তন গান করিয়া সমবেত ভক্ত নরনারীকে আনন্দ দান করেন।

**যশোহর:** শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে গত ২৭শে মার্চ শ্রীশ্রীঠাকুরের শুভ জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সমাগত ৩ সহস্রাধিক ভক্ত নরনারী খিচুড়ি প্রসাদগ্রহণে পরিতৃপ্ত হন। বিকালে আলোচনা-সভায় অধ্যাপক পরমানন্দ রায় ও অন্যান্য বক্তা শ্রীশ্রীঠাকুরের পুণ্য জীবনী ও বাণী আলোচনা করেন। রাত্রে লালন শাহ ফকীরের ভক্ত সুফি কানাই ও তাঁহার সম্প্রদায় উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাবের গান করিয়া সমাগত ভক্তবৃন্দকে প্রচুর আনন্দ দান করেন।

**বনগাঁ** শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব গত ৪ঠা ও ৫ই এপ্রিল পূজা, পাঠ ও সভাদির মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

৪ঠা এপ্রিল অপরাহ্ণে স্বামী দেবানন্দজী কর্তৃক শ্রীশ্রীঠাকুরের 'কথামৃত' পাঠ ও ব্যাখ্যা, পরে স্থানীয় শিল্পিবৃন্দ কর্তৃক 'শিশু বিলে' নাটকের অভিনয় হয়।

৫ই এপ্রিল শোভাযাত্রাসহ নগর-পরিক্রমা ও শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজার পর প্রায় ৫,০০০ নরনারায়ণকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। অপরাহ্ণে জনসভায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন ও বাণী আলোচনা করেন স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। পরে অমৃত সঙ্গীত সমাজ সুরে শ্রীশ্রীকথামৃত গীতাভিনয় এবং শ্রীবিশ্বনাথ মৈত্র শ্রীশ্রীঠাকুরের লীলাপ্রসঙ্গ গীতাভিনয় করেন।

**খুলনা:** শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ কর্তৃক গত ৬ই এপ্রিল শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের শুভ ১৩৫তম জন্মোৎসব কয়লাঘাটা শ্রীশ্রীকালীবাড়িতে অনুষ্ঠিত হয়। পূজাদিতে যোগদান করেন নারায়ণগঞ্জ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের স্বামী যোগদানন্দ ও ঢাকা শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের

স্বামী দয়ানন্দ মহারাজ। বেলা ১০২টা হইতে ১২টা পর্যন্ত সমাগত তিন সহস্র ভক্ত নরনারী খিচুড়ি প্রসাদ গ্রহণ করেন। বৈকালে শ্রীশ্রীঠাকুরের ও শ্রীশ্রীমায়ের জীবন ও ধর্ম-সমন্বয়ের বাণী আলোচনা করেন শ্রীরাসমোহন চক্রবর্তী ( সভাপতি ), ডক্টর কাজী মোতাহার হোসেন ( প্রধান অতিথি ), স্বামী যোগদানন্দ, কুমিল্লা বৌদ্ধ মঠের শ্রীমৎ ধর্মরক্ষিত ভিক্ষু বিনয়সূত্রবিশারদ, অধ্যক্ষ প্রমথনাথ বিশ্বাস, শ্রীমতী প্রতিভা বসু, অধ্যাপক পরমানন্দ রায় এবং ব্রহ্মচারী বিদেহচৈতন্য।

**নব ব্যারাকপুর:** শ্রীরামকৃষ্ণ সংস্কৃতি পরিষদ কর্তৃক গত ১২ই ও ১৩ই এপ্রিল স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব-উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ১২ই এপ্রিল শোভাযাত্রা, পূজা, পাঠ, প্রসাদ-বিতরণ, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ গীতি-আলেখ্য হয়। সন্ধ্যায় জনসভায় স্বামীজীর ভাবধারার বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে ভাষণ দেন উপাধ্যক্ষ শ্রীতারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ( সভাপতি ), স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ ও স্বামী স্মরণানন্দ। রাত্রে পরিষদের পাঠচক্র বিভাগ কর্তৃক 'মূক দেবতা' নাটিকা অভিনীত হয়।

১৩ই সন্ধ্যায় এক জনসভায় ভাষণ দেন অখিল ভারত বিবেকানন্দ যুব মহামণ্ডলের সম্পাদক শ্রীনবনীহরণ মুখোপাধ্যায়, পৌরোহিত্য করেন পরিষদের সভাপতি ডঃ মহেন্দ্রচন্দ্র মালাকার। রাত্রে পশ্চিমবঙ্গ লোকরঞ্জন শাখা কর্তৃক 'তরজা' গান পরিবেশিত হয়।

**বারাসত** রামকৃষ্ণ-শিবানন্দ আশ্রম **:** গত ১০ই মে, ১৯৭০ শুভ শঙ্করপঞ্চমী দিবসে বারাসত রামকৃষ্ণ-শিবানন্দ আশ্রমে মন্দির-প্রতিষ্ঠার নবম বার্ষিকী উদ্‌যাপিত হইয়াছে। তদুপলক্ষে পূজা-হোম-পাঠাদি ও প্রসাদ-বিতরণ হইয়াছে। এই দিন নবপ্রকাশিত গ্রন্থ 'শিবানন্দ-স্মৃতি-সংগ্রহ'—৩য় খণ্ডের কিয়দংশ পাঠ করেন স্বামী নিরাময়ানন্দ মহারাজ এবং সন্ধ্যায় শঙ্করপঞ্চমী স্মরণে 'আচার্য শঙ্কর ও তাঁহার শিক্ষা' সম্বন্ধে ভাষণ দেন শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত।

## পরলোকে যদুনাথ মজুমদার

গত ১১ই ফেব্রুআরি, ১৯৭০ ভক্ত যদুনাথ মজুমদার মহাশয় ৭৮ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার নিবাস ছিল পূর্ববঙ্গের নোয়াখালির অন্তঃপাতী চণ্ডীপুর গ্রাম। এই গ্রামে তিনি নিজ বসতবাটীর সন্নিকট শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন এবং বহু ব্যক্তিকে ধর্মভাবে উদ্দীপিত করেন। তিনি শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের কৃপালাভ করিয়াছিলেন। গুরুগতপ্রাণ যদুনাথ বাবু প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ছিলেন এবং স্বোপার্জিত অর্থ অকাতরে অপরের সেবায় দান করিতেন। শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজের নির্দেশমত তিনি চিরকুমার থাকিয়া অনাসক্ত ও আদর্শ জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত আশ্রমেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁহার আত্মা চির শান্তি লাভ করুক, এই প্রার্থনা।

# উদ্বোধন


## দিব্য বাণী

সং গচ্ছধ্বং সং বদধ্বং সং বো মনাংসি জানতাম্।
দেবা ভাগং যথা পূর্বে সঞ্জানানা উপাসতে ॥ ২
সমানী ব আকূতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ।
সমানমস্তু বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি ॥ ৪

ঋগ্বেদ, ১০ম মণ্ডল, ১৯১ সূক্ত

একত্র হও, ( মিলে মিশে সবে
কাজ কর একমতে, )
একই বাক্য ঝঙ্কৃত হোক
সবার কণ্ঠ হতে,
একই অর্থ-বোধের দীপ্তি
জ্বলুক সবার চিত্তে।
পূর্বে যেমন দেবগণ নিল
এক হয়ে হবি যাগে,
( তোমরা তেমনি একমত হোয়ো
ধন-সম্পদ ভাগে ॥ )
একই লক্ষ্য অভিমুখী, একই
সংকল্পেতে থির,
এক-মন, এক হৃদি হও সবে,
( হও সংহত, ধীর )—
যাতে তোমাদের আসে এ একতা,
সুমহান সংহতি ;
( তাই হোক, সেই একতা-যজ্ঞে
পড়ুক পূর্ণাহুতি ॥ )

# কথাপ্রসঙ্গে

## ভারতের সংহতি

সম্প্রতি জনৈক নেতা 'ভারতের সংখ্যালঘু'-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "সংখ্যা লঘু" কারা? মুসলমানেরা নয়, খৃষ্টানরাও নয়, যারা নিজেদের 'ভারতীয়' ব'লে ভাবে, তারাই আজ সংখ্যালঘু। ভারতের অধিকাংশ লোকই আজ হয় তামিল, নয় তেলুগু, না হয় বাঙালী বা শিখ ইত্যাদি—ভারতীয় নয়।"

কথাটি খুবই মূল্যবান। স্বাধীনতালাভের পর হইতে প্রাদেশিকতা-বোধের গণ্ডীর, সংকীর্ণতায় আমরা যেন ক্রমশই জড়াইয়া পড়িতেছি, সংকীর্ণতর গণ্ডীতে আসিয়া প্রদেশগুলির মধ্যেও নিজেদের খণ্ড-বিখণ্ড করিয়া দেখিতেছি, সমগ্র ভারতের সঙ্গে নিজের একত্ববোধ জাগ্রত রাখিতে, নিজেকে ভারতবাসী বলিয়া ভাবিতে ক্রমশই ভুলিয়া যাইতেছি। এটি সর্বনাশা ভাব সন্দেহ নাই। ইহার মূল কারণ খুঁজিয়া যত শীঘ্র সম্ভব প্রতিকার করা প্রয়োজন, নতুবা ভারতের সংহতির বন্ধন শিথিলতর হইয়া ভারত খণ্ড-বিখণ্ড হইয়া যাইতে পারে।

নিজেকে ভারতবাসী বলিয়া ভাবার অর্থ এই নয় যে, নিজ প্রদেশের প্রতি, নিজ প্রদেশের ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগ ত্যাগ করিতে হইবে, নিজেকে বাঙালী বা মারাঠী ভাবা চলিবে না। ইহার অর্থ এই নয় যে, নিজ নিজ প্রাদেশিক ভাষা ও সংস্কৃতির বৈচিত্র্যকে ত্যাগ করিয়া একটি মাত্র ভাষা সারা ভারতে সকলকে শিখিতে হইবে, সংস্কৃতির খুঁটিনাটির ক্ষেত্রেও সকলকে একটি মাত্র ছককাটা পথ ধরিয়া চলিতে হইবে। ইহার অর্থ আমরা বাঙালী থাকিব, পাঞ্জাবী থাকিব, তেলুগু থাকিব, কিন্তু সর্বাগ্রে আমরা হইব ভারতবাসী। 'আমি ভারতবাসী' এই বোধকে অবলম্বন করিয়াই, ভারতকে কেন্দ্র করিয়াই আমাদের প্রাদেশিক শিক্ষা-সংস্কৃতির বোধ জাগিবে।

এই একত্ববোধ কোন বিশেষ আঞ্চলিক ভাষাতে নাই; এই বোধ কোন বিশেষ প্রদেশের সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান বা অন্যান্য খুঁটিনাটিতে নাই, অর্থনীতি বা কোন বিশেষ রাজনৈতিক মতবাদকে অবলম্বন করিয়াও নাই; আছে বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাব ও সংস্কৃতি যাহার বিভিন্ন প্রকাশমাত্র, সেই ভারতীয় ভাব বা ভারতীয় সংস্কৃতিতে, যাহা যুগ যুগ ধরিয়া বহু আঞ্চলিক বিভিন্নতা সত্ত্বেও, বহু অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, এমনকি ধর্মীয় খুঁটিনাটির পরিবর্তন সত্ত্বেও জাতীয় সংহতির সূত্রটিকে কখনো ছিন্ন হইতে দেয় নাই, বহির্বিষয়ে আপাত-বিচ্ছিন্ন জাতির প্রাণকে একই স্পন্দনে স্পন্দিত রাখিয়াছে।

ভারতপ্রেমিক স্বামী বিবেকানন্দ এই সংহত ভারতের কথাই বলিয়াছেন, এই ভারতকেই রাজরাজেশ্বরীরূপে দেখিতে চাহিয়াছেন। যখন আমরা অনেকে নিজেদের ভারতবাসী বলিয়া পরিচিত করিতেও লজ্জা-বোধ করিতাম, সে-সময় তিনিই কম্বুকণ্ঠে প্রথম বলিয়াছিলেন, "হে বীর, সাহস অবলম্বন কর; সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই।...বল ভাই, ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ

আমার কল্যাণ।" তাঁহার মন-প্রাণ জুড়িয়া ছিল 'ভারত', বাংলা বা অন্য কোন প্রদেশ মাত্র নয়। ভগিনী নিবেদিতা ভারতের জাতীয় জীবনে স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও বাণীর ভূমিকা-প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন, "প্রতিটি ভারতীয় গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের আশা-আদর্শকেই তিনি কেবল শিক্ষা করেননি—তাদের গৌরব-স্মৃতিকেও বরণ করেছিলেন। কলকাতার হিন্দুপল্লীর এই সন্তান কলকাতার গঙ্গাতীরে জীবন সমাপন করার জন্যই ফিরে এসেছিলেন—তবু পঞ্জাব সম্বন্ধে তাঁর উদ্দীপনা দেখে মনে হত, পঞ্জাবই বুঝি তাঁর জন্মস্থান, কিংবা একই কারণে রাজপুতানা বা হিমালয়খণ্ড—এমনই অন্যত্রও। গুরু নানকের, মীরাবাঈ-এর, তানসেনের গানের সুর ক্রমান্বয়ে ঝঙ্কৃত হত তাঁর কণ্ঠে। পৃথ্বীরাজ, প্রতাপসিংহের বীরত্ব-কাহিনী, দিল্লী বা চিতোরের ইতিহাসকথা, শিব-উমা-রাধা-কৃষ্ণের বা বুদ্ধের জীবনগাথা জড়াজড়ি হয়ে থাকত তাঁর মুখে। বিবেকানন্দ যেখানে অভিনেতা, সেখানে প্রতিটি নাটকই মহানাটক। তাঁর অংশগ্রহণে প্রতিটি দৃশ্যই জীবন্ত। **তাঁর মন-প্রাণ-আত্মা এক অখণ্ড মহাকাব্য, যা 'ভারত' এই নামোচ্চারণে মহারহস্য-ব্যাকুল।"**

ভারতীয় জাতি বলিতে ইহাই—এক লক্ষ্যাভিমুখী, আধ্যাত্মিকতার পথে যুগযুগান্ত ধরিয়া চরম সত্যের পরমতীর্থধাম-যাত্রী একটি জাতি। ভারতের সংহতি এখানেই; তার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক সব উন্নতিই এই সংহতিসূত্রকে অবলম্বন করিয়াই। ভারতকে দৃঢ়-সংহত করিতে হইলে এই ভাবকেই, ভারতের চিরন্তন ভাবকেই পূর্ণ-বিকশিত করিয়া তুলিতে হইবে, যাহা সাবলীল ভাবে আপন ভাবিয়া বুকে জড়াইয়া ধরিতে পারিবে বাঙালী, পাঞ্জাবী, তেলুগু, মারাঠী সব প্রদেশের ভারতবাসীকেই। এই ভাবের বিকাশের পথকে প্রশস্ততর না করা বা রোধ করার প্রচেষ্টা আমাদের জাতীয় সংহতি বিধানকে সাঙ্ঘাতিকভাবে ব্যাহত করিবে, বিভেদবুদ্ধিকে আরও বাড়াইয়াই তুলিবে। মূল ছাড়িয়া বাহিরে সংহতিসাধনের প্রচেষ্টা বৃথা। "দু'পয়সার ডাকটিকিট, সস্তায় রেলভ্রমণ, কাজ চলার জন্য একটা সাধারণ ভাষা—এসবের দ্বারা জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হবে, এমন কথা তাঁর (স্বামী বিবেকানন্দের) বুদ্ধির কাছে অগভীর ও হাস্যকর ঠেকেছিল"—পূর্বোক্ত প্রসঙ্গেই ভগিনী নিবেদিতা লিখিয়াছেন। সেইরূপ 'অগভীর ও হাস্যকর' প্রচেষ্টার মাধ্যমেই আজ জাতীয় সংহতিকে দৃঢ় করিতে চাওয়া হইতেছে, জাতীয় প্রাণের গভীরে ফিরিয়াও কেহ চাহিতেছেন না। আরো ভয়াবহ কথা, ভারতের জাতীয় সংহতির মূল এই জাতীয় ভাবকে নষ্ট করিয়া বিদেশ হইতে আনীত ভাবসূত্র দিয়া ভারতকে সংহত করিবার চেষ্টাও করিতেছেন কেহ কেহ।

আমাদের মনে হয় সর্বসাধারণের মধ্যে আমাদের জাতীয় ভাবকে উদ্বুদ্ধ করাইয়া জাতীয় সংহতিবিধানের পথ প্রশস্ত করিবার জন্য আশু প্রয়োজন সংস্কৃত শিক্ষার ব্যাপক প্রসার; সংস্কৃত ভাষাই যুগ-যুগ ধরিয়া অবিনশ্বর ভারতীয় ভাবকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছে এবং সমগ্র ভারতে পরিবেশন করিয়া আসিতেছে। ইহাই আমাদের জাতীয় ভাবের আকর, এখান হইতেই আহরণ করিয়া বিভিন্ন মাতৃভাষা উহা বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্নরূপে পরিবেশন করিয়াছে। আর প্রয়োজন, বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় বিধৃত এই একই মূল ভাবের বিভিন্ন রূপগুলিকে মাতৃভাষায় অনুবাদের মাধ্যমে সব প্রদেশেই কিছু কিছু পরিবেশন করা—যাহাতে ভারতের সামগ্রিক মানস-রূপটিও সকলের দৃষ্টিতে ফুটিয়া উঠে বিভিন্নতার মধ্যে সামঞ্জস্য কোথায় তাহা স্পষ্ট হয়; কেবল বাহিরের রূপটিই নয়। আর, সর্বাধিক প্রয়োজন, ভারতকে যিনি স্বপ্নেও খণ্ডিতদৃষ্টিতে দেখেন নাই, এবং শুধু ভারতবাসীর কাছেই নয় সমগ্র বিশ্বের কাছেই যিনি ভারতের যথার্থ রূপ আধুনিক চিন্তার আলোকেই উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়া ধরিয়াছিলেন—প্রাদেশিকতা, সাম্প্রদায়িকতা যে-ভারতের ছায়াও স্পর্শ করিতে পারে না, সেই স্বামী বিবেকানন্দের উদার, সর্বজনীন অথচ ভারতপ্রেমে ওতপ্রোত ভাবরাশির ব্যাপক প্রচার।

# স্বামী ব্রহ্মানন্দের অপ্রকাশিত পত্র

( ১ )

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

The Ramakrishna Math,
Belur P. O., Howrah,
Dated, 31. 3. 1916

My Dear Hari Maharaj.

আপনার শরীর আবার অত্যন্ত খারাপ হইয়াছে শুনিয়া আমরা সকলে বড়ই চিন্তিত আছি। আলমোড়া আপনার পক্ষে suit করিবে না বলিয়া আমার বরাবর ধারণা। মহাপুরুষ আপনাকে লইয়া যাইবার জন্য বিশেষ আগ্রহ করায় আমরা কোন কথা বলি নাই। এক্ষণে আপনার বিষয় ডাক্তার বিপিনবাবুকে জানাই, তাহাতে তিনি আলমোড়ার ন্যায় উচ্চ স্থানে আপনার একেবারেই থাকা উচিত নহে বলিলেন এবং দেরাদুন বা কন্‌খল প্রভৃতি স্থানে অবিলম্বে আসিতে পরামর্শ দিলেন। আমাদেরও একান্ত ইচ্ছা আপনি কন্‌খলে আসেন। সেখানে কিছুদিন থাকিলে এবং নিয়মিত ঔষধ-পথ্যাদি সেবন করিলে পুনরায় শরীর ভাল হইবে আশা করা যায়। আপনার পত্র পাইলে সমুদায় ব্যবস্থা ঠিক হইয়া যাইবে। এখানকার সমস্ত কুশল। বাবুরাম মহারাজ ভাল আছেন। মহাপুরুষ মিহিজাম গিয়াছেন, শীঘ্রই ফিরিবেন। আজকাল কেমন আছেন জানাইবেন। আমাদের প্রণাম ভালবাসাদি জানিবেন। ইতি—

Yours afftly
Brahmananda

( ২ )

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

Bull Temple Road.
Bangalore City
Dated 20. 8. 1916.

কেদারবাবা,

তোমার পত্র পেয়েছি, এই সময় ৺কাশী না গিয়ে এখানে আসিলে না কেন? আমাকে যদি লিখিতে তাহা হইলে এখানে আসিতে বলিতাম। আমার বিশ্বাস তুমি এখানে আসিলে তোমার মন ও শরীর উভয়ই ভাল হইতে থাকিত। এ স্থানটি বড় রমণীয়, গ্রীষ্মের কোন রকমই উৎপাত নাই। অথচ শীতের তীব্রতাও নাই। তুলসী মহারাজ এই আশ্রমটিকে ফুলফল ইত্যাদি বৃক্ষ রোপণ করিয়া বড় শোভাসম্পন্ন করিয়াছে। স্থানও যথেষ্ট সংগ্রহ করিয়াছে, প্রায় সর্বশুদ্ধ ১০ বিঘা জমি। তোমাদের ৺কাশীর আশ্রম অপেক্ষা অনেক বেশী।

আমাদের আশ্রম যেখানে আছে সে স্থানটি অতি নির্জন। আর এখানে ঘিঞ্জি নাই। সবই ভদ্রলোকের বসতি। তাই বলি, কেদার বাবা, কল্লে কি? বোধ হয় এ সময় ৺কাশী গরম। তোমার তত প্রীতিকর বোধ হচ্ছে না।

চারুবাবু, কালীবাবু এবং চন্দ্র প্রভৃতি কেমন আছে? তাহাদিগকে আমার ভালবাসা ও শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদাদি জানাইবে। কালীবাবুকে গাছপালাগুলি যত্ন করিতে বলিবে। একবার যদি তিনি আসতেন তবে এখানকার সরকারী লালবাগ দেখিয়া কত খুশী হইতেন। কত রকমের নূতন নূতন ফুল, তিনি দেখিয়া অবাক্ হইতেন। তিনি আমার নিকট Eucalyptus-এর গাছ চাহিয়াছেন। কলিকাতায় বেশী দাম বলিয়া পাঠাইতে পারি নাই। এখানকার আশ্রমে একটি নূতন ধরনের Eucalyptus-এর গাছ দেখিলাম। তাহার পাতায় লেবুর মত গন্ধ, গাছটিতে অনেক ফল হইয়াছে। বীজ পাকিলে ইচ্ছা আছে পাঠাইয়া দিব। সেই বীজ হইতে যেন চারা করিয়া লন।

আর একটি কথা তোমায় বলিতেছি—শ্রীযুক্ত নিতাইচরণ রায় ছেলেটি এখন ওখানে আছে। তাহার প্রতি একটু লক্ষ্য রাখিবে, যাহাতে তাহার কোন কষ্ট না হয়, এবং চন্দ্রকেও বলিয়া দিবে যাহাতে একটু যত্নাদি করে এবং দৃষ্টি রাখে; সে আমার অনেক সেবা করিয়া থাকে। আমি তাহাকে বড় ভালবাসি।

কালীবাবুকে আরও বলিবে যে, এখানকার সরকারী লালবাগে কতরকমের কত চমৎকার রঙের সব cana আছে। শীঘ্রই তাহার কিছু roots পাঠাইবার চেষ্টায় আছি। সুযোগ হইলে পাঠাইয়া দিব, এবং কালীবাবুকে বলিবে বিশেষ যত্ন লইয়া তাহাদিগকে রোপণ করে।

আরও একটি কথা তুমি চন্দ্রের নিকট জানিয়া লিখিবে। নিয়মিতরূপে প্রতি সোমবার শ্রীশ্রীবিশ্বনাথের পূজা দেওয়া হইতেছে কি না। যদি টাকা ফুরাইয়া গিয়া থাকে আপাততঃ চারুবাবুর নিকট হইতে টাকা লইয়া যেন সোমবার সোমবার পূজা দেওয়া হয়, ওটি যেন এখন বন্ধ না করে।

আর কি বলবো কেদারবাবা? শ্রীশ্রীবিশ্বনাথকে আমার কথা জানাইবে। তুমি আমার ভালবাসা ও আশীর্বাদাদি জানিবে এবং যথাযোগ্য সকলকে জানাইবে। ইতি

Yours in the Lord

Dear Kedar Baba

Yours affly

Brahmananda

# স্বামী প্রেমানন্দের অপ্রকাশিত পত্র

শ্রীশ্রীগুরুপদ ভরসা

Ramkrishna Advaita Ashrama,
Luxa, Banaras City, 17. 12. 10.

ভাই শশী,

তোমার অসুখ এখনও সারে নাই জেনে দুঃখিত হইলাম। যখন ডাক্তার হেলক্ তোমার কাছে রয়েছে আমার ইচ্ছা তুমি তাহার চিকিৎসায় কিছুদিন থাক। সে অতি সুন্দর ব্যবস্থা করে। রোগের শেষ রাখিতে নাই—শ্রীশ্রীপ্রভুর কথা মনে রেখো। তোমার ইচ্ছায় আমি ও হরি মহারাজ আগামী কল্যই বোধ হয় মঠাভিমুখে যাত্রা করছি। হরি মহারাজের শরীর বেশ সুস্থ হয়েছে। শ্রীযুক্ত গিরীশবাবু ভাল আছেন অনেক। তিনি তোমায় প্রণাম জানাইলেন। তোমরা আমার ভালবাসা ও প্রণাম জানিবে। Dr. হেলক্, রুদ্রপ্রকাশ নানুকে আমার ভালবাসা জানাইবে। আমরা সকলে ভাল আছি। সুরেন্দ্রবিজয় তার মার সহিত বাড়ী গিয়াছে। তোমার আশীর্বাদপ্রার্থী

দাস বাবুরাম

পুনঃ—হরি মহারাজের ভালবাসা ও নমস্কার জানিবে। ইতি দাস বাবুরাম

# স্বামী তুরীয়ানন্দের অপ্রকাশিত পত্র

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

শ্রীবৃন্দাবন
৮।১১।'০৪

শ্রীমান্ নিকুঞ্জলাল,

তোমার ৫ই তারিখের পোষ্টকার্ড পাইয়াছি। কিন্তু সুখী হইতে পারি নাই। এবার যেন তোমাকে কিছু ভয়ভীত দেখিতেছি। কিন্তু তুমি ইহা বেশই জান যে, স্থির চিত্তে সকল বিষয়ের উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া সেইমত কার্য করিয়া যাওয়াই একমাত্র আমাদের কর্ত্তব্য। ফলাফল শ্রীভগবানের হাতে। ভয় অথবা দুর্বলতা জাগিলেই সকলে চারিদিক হইতে চাপিয়া ধরে সাহায্যের হস্ত প্রসারণ করিতে বড় কাহাকেও মেলে না। এ সংসারে দৃঢ়তার বড়ই আবশ্যক। এ সব কথা আমার তোমাকে বলা অধিকন্তু মাত্র। তুমি সবই জান তবু পরস্পর বলিতে হয় বলিয়াই বলিলাম। একজনের উপর নিশ্চয় করিয়া কিছুদিন অবিচলিত চিত্তে ঔষধ সেবন করিলেই সারিয়া যাইবে। নিতাইবাবু তোমাকে অতি সৎপরামর্শই দিয়াছেন। যাহা হউক তুমি শীঘ্রই আরাম হইয়াছ শুনিলে সুখী হইব। আমার আবার গত একাদশীর দিন জ্বর হইয়াছিল তিন দিনের পর জ্বর ছাড়ে। এখন জ্বর নাই, কিন্তু বড়ই দুর্বল। প্রভুর ইচ্ছা যেমন আছে হইবে। কৃষ্ণলাল একটু ভাল আছে। আমাদের ভালবাসা ও শুভেচ্ছা জানিবে। ইতি—

শ্রীতুরীয়ানন্দ

# স্বামী সুবোধানন্দের অপ্রকাশিত পত্র

( ১ )

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণো জয়তি

The Ramkrishna Math
Belur P. O., Howrah
Dated, the…১৬ই আশ্বিন
1924

পরম কল্যাণীয়া শ্রীমতী প্রতিভাদেবী,

মায়ী, কয়েকদিন হইল বেলুড় মঠে তোমাদের পত্র পাইয়া খুব আনন্দিত ও সুখী হইয়াছি।

আমার এখন জ্বর হয় না, শারীরিক দুর্বলতা আছে। ৺পূজার পর ঢাকা আশ্রম হইতে একজন এখানে আসিবে কথা আছে। তারপর আমার ঢাকাতে যাইতে হইবে। আজকাল এখানে মধ্যে মধ্যে বৃষ্টি হয়।

মায়ী, চঞ্চল মনকে স্থির করিতে হইলে পর ভগবান সম্বন্ধে কিছু লইয়া থাকিতে হয়। যেমন ধর্ম সম্বন্ধে পুস্তক পড়া, তাঁর সম্বন্ধে কথাবার্তা চিন্তা ধ্যান, কত রকম আছে।

শীঘ্রই তো ঢাকায় যাইব, সাক্ষাতে সব কথাবার্তা হইবে।

আন্তরিক ভালবাসা শুভেচ্ছা জানিবে, তোমার বাবা মা সকলকে জানাবে।

মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী
শ্রীসুবোধানন্দ

( ২ )

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণো জয়তি

বেলুড় মঠ
বৃহস্পতিবার, ৬ই জ্যৈষ্ঠ
(1926)

কল্যাণীয়া মায়ী,

গতকল্য তোমার পত্র পাইয়া খুব আনন্দিত ও সুখী হইলাম। কয়েক দিন পূর্বে আর এক পত্র পাইয়াছিলাম, উত্তর দেবো দেবো মনে করে দেরি হইল। তোমার দিদির পত্র পাইয়াছিলাম, তাকে উত্তর দিয়াছি। আমার খুকী মায়ী এখন কোথায় ও কেমন আছে? আমি আজকাল ভাল আছি, মধ্যে মধ্যে দুর্বলতা বোধ করি, মঠ থেকে ইষ্টিমারে রোজ সকালে

বেড়াই। শীঘ্রই ৺ভুবনেশ্বর মঠে যাইব। সেখানকার জল বাতাস ভাল। সেইখানে কিছুদিন থাকিবার ইচ্ছা আছে। যেখানেই থাকিব মধ্যে মধ্যে সংবাদ পাইবে। আজকাল হেঁট হোয়ে বোসে বড় বড় পত্রাদি লিখিতে কষ্ট হয়, শরীর দুর্বল সেইজন্য। আজকাল মিষ্ট জিনিস, আলু খাই না, আর সব খাই; আমার প্রিয় জিনিস ছিল ডাল, ভাত—ডাক্তার তাই বন্ধ করে দিয়েছিল। যাই হোক শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায় ভাল হইয়া উঠিয়াছি—এই মঙ্গল। বিশ্বাস ও ভালবাসার দ্বারা ভগবানকে আপনার কোরে নিতে হবে। তিনি যদি সহায় থাকেন, হাবি-জাবি চিন্তা-ভাবনায় কিছু করিতে পারিবে না। রাখে কৃষ্ণ মারে কে, মারে কৃষ্ণ রাখে কে। জোর বিশ্বাস চাই।

আন্তরিক ভালবাসা শুভ ইচ্ছা জানিবে। সকলকে জানাবে ও কুশল সংবাদে সুখী করিবে। এই জ্যৈষ্ঠ মাসের মাঝামাঝি ৺ভুবনেশ্বর যাবার ইচ্ছা। ইতি

মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী
তোমাদের শ্রীসুবোধানন্দ

( ৩ )

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণো জয়তি

The Ramkrishna Math,
Belur P O., Howrah
সোমবার, ১২ই আশ্বিন
1925

পরম কল্যাণীয়া শ্রীমতী প্রতিভাসুন্দরী দেবী,

মায়ী, অনেকদিন তোমাদের পত্রাদি লিখিতে পারি নাই। এখানে মা দুর্গার প্রতিমাপূজা হইল। অসময়ে খাওয়া, ও সময়ে নিদ্রা নাই, সেইজন্য শরীর ক্লান্ত হইয়া আছে। ৺বিজয়ার ভালবাসা শুভ ইচ্ছা সকল সাধুদের জানাবে, তোমরা সকলে জানিবে। তোমার পত্রের সহিত রেণুর মাকে পত্র দিতেছি, পাঠাইয়া দেবে ( যোগেশ ঘোষের বাড়ী )।

তোমার দিদি, খুকী মায়ী এরা এখন কি তোমাদের বাড়ীতেই আছে? তাদেরও পত্র তোমার পত্র-মধ্যেই দিতেছি। তাহাদের দেবে।

মায়ী, তোমার কাছে শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা আর বেশী কি লিখিব। তিনি বলিতেন, এখানকার বিষয় যে যত চিন্তা করিবে, সে ততো জানিতে পারিবে। সুতরাং যাতে তাঁর বিষয় চিন্তা থাকে সেই বিষয় করিবে, তাঁর সম্বন্ধে বই পড়া, তাঁর কথাবার্তা লইয়া থাকা। আমি যে তোমায় বলিয়াছিলাম—শ্রীমদ্‌ভাগবত একাদশ স্কন্ধ পড়িবে, সেই সব জায়গায় কেমন সুন্দর সুন্দর কথা আছে।

মায়ী, আন্তরিক ভালবাসা ও শুভ ইচ্ছা তুমি জানিবে, ছেলেমেয়ে সকলকে ও তোমার পিতামাতাকে জানাবে। আশা করি সমস্ত কুশল সংবাদ।

মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী
তোমাদের শ্রীসুবোধানন্দ

# বর্তমান সমস্যাসমাধানে স্বামী বিবেকানন্দ

## স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ

প্রায় এক শতাব্দী পূর্বে সাধু-সন্ন্যাসীদের জন্মভূমি ভারত বিশ্বে উপহার দিয়েছিল মানবজাতির অন্যতম কুসুমরত্ন—বিশ্ববিশ্রুত স্বামী বিবেকানন্দকে। স্বামীজী ছিলেন বহুবিধ ব্যক্তিত্বের আধার—স্বদেশপ্রেমিক ও সন্ন্যাসী, জাতীয়তাবাদী ও আন্তর্জাতিকতাবাদী।

স্বামীজীই ভারতের মৃত অস্থিপঞ্জরে নবজীবন সঞ্চার ক'রে দেশবাসীদের নবীন প্রাণশক্তিতে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। তিনিই দেশবাসীদের জাতীয় চেতনায় জাগিয়ে তুলে তাদের শেখালেন সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে স্বদেশবাসীদের ভগবানের প্রতীকরূপে সেবা করতে। তিনি বলেছিলেন, 'সেবা ও ত্যাগ ভারতের জাতীয় আদর্শ; ভারতকে সেই ধারায় তীব্রগতিশীল ক'রে তোল; বাকি সব কিছু আপনিই এসে যাবে।' 'আত্মপ্রতিষ্ঠা নয়, আত্মত্যাগই অতি-জাগতিক বিধান।' তিনি বলতেন, 'ধর্ম চরম ত্যাগের সহযাত্রী। নিরাকাঙ্ক্ষ হয়ে ভগবৎসত্তাতে বেঁচে চলো। কোথায় গিয়ে ভগবানকে খুঁজে বেড়াবে? দীন, দুঃস্থ, দুর্বল—এরাই তো ভগবান; এদেরই আগে পূজো করো না কেন? তা না ক'রে গঙ্গাতীরে কূপ-খননের চেষ্টা কেন?'

'দুর্গতদের জন্য ভাবো। সাহায্য?—তা আসবেই। এই ভার হৃদয়ে চাপিয়ে আর এই ভাব মস্তিষ্কে নিয়ে বারো বছর আমি পরিক্রমা করেছি, তথা-কথিত ধনী আর বড়ো লোকদের দ্বারে দ্বারে ঘুরেছি। সাহায্য খুঁজতে ব্যথিত চিত্তে অর্ধজগৎ পাড়ি দিয়ে এই অপরিচিত দেশে (আমেরিকায়) পৌঁছেছি। ভগবান মহান্; জানি তাঁর সাহায্য পাবো। শীতে আর ক্ষুধায় এই দেশে আমার মৃত্যু ঘটতে পারে। কিন্তু তরুণসম্প্রদায়! দায়স্বরূপ তোমাদের দিয়ে যাচ্ছি দীন, অজ্ঞ ও নির্যাতিত জনগণের জন্য এই সহানুভূতি, এই সংগ্রাম।'

'জীবন ক্ষণস্থায়ী; যত পার্থিব অহমিকা সবই ভঙ্গুর। কিন্তু তাঁরাই চিরঞ্জীব যাঁরা অপরের জন্য জীবনধারণ করেন; অন্যেরা জীবন্মৃত।' স্বামীজীর সোচ্চার উক্তি—'আমি সেই ধর্মমতে বা ভগবানে বিশ্বাস কবি না, যাতে বিধবার অশ্রুমোচন বা অনাথের মুখে দু'মুঠো অন্ন যোগানো ব্যর্থ হয়।'

নিঃস্বার্থ প্রেম ও একনিষ্ঠ সেবাই জীবনভর স্বামীজী প্রচার করেছিলেন। তাঁর উপদেশাবলীর ভিত্তি ছিল বেদান্তসূত্রের প্রমাণাদি, বিশেষতঃ যেখানে বিশ্বাত্মার সমতা ও সর্বব্যাপিত্ব ঘোষিত হয়েছে। আবেগভরে স্বামীজী বলেছিলেন, 'সহস্রবিধ দুঃখকষ্ট ভোগ করতে বার বার যেন আমার জন্ম হয়, যাতে আমি পূজা করতে পারি একমাত্র সেই ভগবানকে—কেবলমাত্র যাঁর অস্তিত্বে আমি বিশ্বাসী, বিশ্বাত্মার সামগ্রিক সমষ্টি যিনি, সর্বোপরি আমার বিশেষ আরাধ্য আমার দুরাচাররূপী ভগবান, দীনতমরূপী ভগবান। মুক্তি বা ভক্তির প্রত্যাশা আমি করি না। বসন্ত ঋতুর মতো অতি সংগোপনে পরোপকার ক'রে সহস্র নরকে যেতেও প্রস্তুত আছি।—এই আমার ধর্ম।' অপর কোন মহত্তর উক্তি সুষ্ঠুতরভাবে স্বামীজীর উদার মনের পরিচয় দিতে পারে ব'লে তো আমাদের জানা নেই।

প্রকৃত দেশপ্রেমের স্বরূপ কি তা স্বামীজী আমাদের কাছে বলেছেন। তিনি বলেছেন, 'হে ভাবী-দেশপ্রেমিক, অন্তর দিয়ে অনুভব করো। তুমি কি অনুভব করো যে, তোমার লক্ষ লক্ষ স্বদেশবাসী যুগ যুগ ধরে উপোস ক'রে চলেছে? এতে কি তুমি ব্যাকুল হয়ে উঠ? এ কি তোমার রক্তে প্রবেশ করেছে? এতে কি তুমি উন্মাদ হয়ে তোমার নাম, যশ, পরিবার, সম্পত্তি, এমন কি তোমার দৈহিক সত্তা পর্যন্ত ভুলতে পেরেছ? তা কি তুমি করতে পেরেছ? তাই হবে দেশপ্রেমিক হবার প্রথম—একমাত্র প্রথম—সোপান।'

স্বামীজীর দেশসেবার ডাক সাড়া জাগিয়েছিল বহু দেশপ্রেমিকের অন্তরে। ভারতের আধুনিক আন্তর্জাতিকতাবাদী ও জাতীয়তাবাদীদের ভুললে চলবে না যে, যখন জাতীয় আন্দোলনের ঢেউ দেশের এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল, আর ভারতের জাতীয় জাগরণে হতবুদ্ধি ইংরেজ সরকার এই জাগরণের কারণ নির্ণয়ের জন্য 'রাউলেট কমিশন' নিয়োগ করেন, তখন এই কমিশনই সিদ্ধান্তে আসেন যে, এর মূলে স্বামী বিবেকানন্দ।

পর্যটক সন্ন্যাসিরূপে স্বামী বিবেকানন্দ ভারতের সর্বত্র পরিভ্রমণ করেন। হিমাদ্রি-শিখর হতে কন্যাকুমারী পর্যন্ত সকল তীর্থস্থান তিনি পরিদর্শন করেন, সামান্য কুটির হতে সুরম্য প্রাসাদও তাঁর অদেখা ছিল না। ইহা ভারতের প্রকৃত অবস্থা সুস্পষ্টভাবে জানতে নিঃসন্দেহে তাঁকে সাহায্য করেছিল। অনগ্রসর সম্প্রদায়গুলির ভয়াবহ দারিদ্র্য ও হীনাবস্থা, অসীম দুঃখদৈন্য ও তাদের ওপর অবর্ণনীয় সামাজিক নির্যাতন আর এই সবের প্রতি সুবিধাভোগীদের নির্মম অবহেলা—এ সমস্ত দেখে স্বামীজী স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন। নিরন্নের খাদ্যসংস্থান, প্রায়-নগ্নের বস্ত্রের ব্যবস্থা, পীড়িতের সেবা, তাকে সান্ত্বনাদান—কিভাবে এসব করা যায় এই চিন্তাই তাঁকে ভারাক্রান্ত ক'রে তুলেছিল। ভারতের প্রতি স্বামীজীর গভীর প্রেম ও তাঁর অতুলনীয় স্বাদেশিকতার প্রসার সম্বন্ধে কারো কোন সন্দেহ থাকতে পারে কি?

বলা যায়, ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলনে বিপুল অবদান পথিকৃৎ স্বামীজীর। আধুনিক ভারতের প্রথমসারির জাতীয়তাবাদী নেতাগণ স্বামীজীর কাছে তাঁদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ্যে স্বীকার করেছেন। মহাত্মা গান্ধী বলেছেন যে, স্বামীজীর রচনাবলী ভারত-মাতাকে ভালবাসতে ও বুঝতে তাঁকে অধিকতর প্রবুদ্ধ করেছিল। স্বামীজী কর্তৃক 'ছুঁয়োনা, আমায় ছুঁয়োনা' বা 'অস্পৃশ্যতা'-বাদের অসংবৃত ধিক্কার মহাত্মাজীর 'হরিজন-আন্দোলন'-এ মূর্ত প্রতিধ্বনি পেয়েছিল।

ভারতীয় জাতীয়তাবাদের মহান পথিকৃৎ তাঁর প্রিয় মাতৃভূমিকে যে ভাষায় আহ্বান করেছিলেন তার আবেগ ভারতবাসীর মর্মস্পর্শ না ক'রে পারে না—"হে ভারত, ভুলিওনা—তোমার নারীজাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী; ভুলিও না—তোমার উপাস্য উমানাথ সর্বত্যাগী শঙ্কর; ভুলিও না—তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন ইন্দ্রিয়সুখের—নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে; ভুলিও না—তুমি জন্ম হইতেই 'মায়ের' জন্য বলি-প্রদত্ত; ভুলিও না—তোমার সমাজ সে বিরাট মহামায়ার ছায়ামাত্র; ভুলিও না—নীচজাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই। হে বীর, সাহস অবলম্বন কর; সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী

আমার ভাই। বল—মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই; তুমিও কটিমাত্রবস্ত্রাবৃত হইয়া, সদর্পে ডাকিয়া বল—ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী; বল ভাই—ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ; আর বল দিনরাত, 'হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও; মা, আমার দুর্বলতা, কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর।' "

জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সব দেশের সব মানুষকে স্বামী বিবেকানন্দ যে ভালবাসা দেখিয়েছিলেন তা নিঃসন্দেহে অতুলনীয় ও অননুকরণীয়। তিনি পারতেন নিগ্রোর সঙ্গে করমর্দন করতে, অস্পৃশ্যের সঙ্গে আলিঙ্গনবদ্ধ হতে, চণ্ডালের সঙ্গে একই হুঁকো থেকে তামাক খেতে। জীবনের চরমসঙ্কটাপন্ন অবস্থায় পড়েও কখনো কারো অপেক্ষা তিনি শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করতে পরাঙ্মুখ ছিলেন। আমেরিকায় এমন হয়েছে যে, নিগ্রোভ্রমে তাঁকে হোটেলে প্রবেশাধিকার দেওয়া হয়নি, কিন্তু তিনি নিজেকে সনাক্তকরণের কোনো চেষ্টাই করেননি। সেই বিদেশ-বিভুঁই-এ দারুণ অর্থাভাবে তাঁকে মৃত্যুর সম্মুখীন হতে হয়েছিল, সে অবস্থায় সংস্থাবিশেষের কাছে সাহায্য চেয়ে প্রত্যাখ্যাতও হতে হয়েছিল। কিন্তু শ্রীভগবানের উপর নির্ভর ক'রে নির্ভীক ও স্থিরচিত্তে তিনি সংকল্পসাধনে অটল ছিলেন।

ভারতীয় ভাবাদর্শে সম্পূর্ণ অবহিত থেকে অদম্য উৎসাহে ও অকুণ্ঠ সাহসে স্বামী বিবেকানন্দ পথের সমস্ত বাধাবিপত্তি অগ্রাহ্য ক'রে ভারতপ্রেমিকদের পথনির্দেশের জন্যই তাঁর লক্ষ্যে পৌঁছুতে গতিবেগ ত্বরান্বিত করেছিলেন। কিন্তু হায়! সাম্প্রতিক কালের আত্যন্তিক প্রয়োজনেও আমাদের মধ্যে ক'জন উপযুক্ত নির্দেশের জন্য ফিরে তাকাচ্ছেন স্বামী বিবেকানন্দের দিকে, যিনি ছিলেন ভারতের প্রথমসারির জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে অদ্বিতীয় আর এযাবৎ-বিশ্বপ্রসূত আন্তর্জাতিকতাবাদীদের মধ্যে বরিষ্ঠ?

স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন পুরোপুরি বৈদান্তিক। তাঁর বৈদান্তিকতার অর্থই ছিল সর্বজনীনতা। সাম্প্রদায়িকতার উপর ছিল তাঁর তীব্র ঘৃণা। বেদান্তে তো সাম্প্রদায়িকতার কোনো স্থান নাই। বেদান্ত এমন একটি ধর্ম যাতে মিলে বহু আদর্শ। প্রবেশেচ্ছু যে-কারো জন্য এর দ্বার অবারিত, আর পছন্দমতো যে-কোন একটি আদর্শ বেছে নিতেও কোনো বাধা নেই কারো পক্ষে। স্বামীজী বলতেন সারা বিশ্বই তাঁর স্বদেশ, আর সত্যই তাঁর ধর্ম। এতেই কি নিঃসংশয়ে তাঁর বিশ্বমানবত্ব প্রমাণিত হয় না? বস্তুতঃ তিনি ছিলেন দুর্লভ শ্রেণীর আন্তর্জাতিকতাবাদী—আর আন্তর্জাতিকতাবাদ পেয়েছিল স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী ও বাণীর মধ্যে নতুন বর্ণ, নতুন পরিচ্ছদ এবং নতুন ব্যাখ্যা। স্বামীজীর পূর্বে মানবজাতির ইতিহাসে কোনো দেশে এমন কোনো মহামানবের সন্ধান মেলে না যিনি নিজ ধর্মপথ ও বৈশিষ্ট্যে প্রতিষ্ঠিত থেকেও সমগ্র মানবজাতিকে এক মূলধর্মাবলম্বী ও একজাতিভুক্ত মনে করতেন। এদিক দিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ কেবল ভারতের প্রথম আন্তর্জাতিকতাবাদী নন, সমগ্র পৃথিবীর প্রথম আন্তর্জাতিকতাবাদী।

বেঁচে থাকলে স্বামী বিবেকানন্দ আজ আঁতকে উঠে বলতেন, "কোথায় চলেছে ভারত?" তথাকথিত আন্তর্জাতিক ও জাতীয় দলগুলির সঙ্কীর্ণতা দেখে তিনি ব্যথিত হতেন

আমরা কি আজ আমাদের মাতৃভূমিকে তার আদর্শ থেকে ক্রমশ: দূরে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছি না? দেশের অমর্যাদাকর সমস্ত হীনতার পসরা মাথায় নিয়ে বিদেশের কাছে হাত পাতছি না? তিনি তারস্বরে ঘোষণা করেছিলেন, ভারতের কোনো সংস্থা গড়ে ও বেড়ে উঠতে পারবে না যদি ভারতের আধ্যাত্মিকতার মাটিতে এর শিকড় প্রবিষ্ট হতে না পারে। দেশের ভাবাদর্শের সঙ্গে অসমঞ্জস কোনো কিছুর এখানে স্থান নেই।

আজ আমাদের অন্যতম দূষিত বৈশিষ্ট্য এই যে, আমরা পরস্পরের কুৎসা না গেয়ে থাকতে পারি না। এতে তো নিজের পায়েই কুঠারাঘাত করা হচ্ছে। দেশপ্রেমিকদের হৃদয়পটে স্বামীজীর নিম্নোক্ত উদাত্ত বাণীটি অঙ্কিত থাকা উচিত—'হে অমৃতের সন্তান আমার স্বদেশবাসিগণ, আমাদের এই জাতীয় তরণী যুগ যুগ ধরে তার সভ্যতা বহন ক'রে সারা পৃথিবীকে তার অমূল্য সম্পদে সমৃদ্ধ করছে; কত শতাব্দী ধরে এ জীবন-সমুদ্র অতিক্রম ক'রে লক্ষ লক্ষ মানবসন্তানকে পরপারে—অমৃতলোকে নিয়ে যাচ্ছে। আজ আমাদের নিজেদের দোষেই হোক বা অন্য যে-কোনো কারণেই হোক—তা আমাদের চিন্তনীয় নয়—যদি এতে কোনো রন্ধ্র দেখা দিয়ে থাকে আর তা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে, তবে তোমরা—এর আরোহীরা—কি করবে? তোমরা কি পরস্পর বিবাদে রত হয়ে একক একে টানতে থাকবে? অথবা সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে যথাশক্তি ঐ রন্ধ্রগুলি রোধ করবে? আমাদের হৃদয়ের রক্ত দিয়েই তো তা করতে হবে আর যদি আমাদের সকল চেষ্টা ব্যর্থই হয়, তবে এসো, আমরা এক সাথে ডুবি, রসনায় অভিশাপ নয়, আশীর্বাণী নিয়ে।'

"শুধু আধ্যাত্মিক জ্ঞানই আমাদের দুঃখরাশির আত্যন্তিক নিবৃত্তি করিতে পারে। অন্য যে-কোন জ্ঞান কিছু সময়ের জন্য মাত্র আমাদের অভাব মিটাইতে পারে। আত্মজ্ঞানের উন্মেষ হইলেই অভাববোধ চিরতরে বিদূরিত হয়।

"দৈহিক শক্তির বিকাশ অবশ্যই বড় কথা; বৈজ্ঞানিক তথ্যানুসন্ধী যন্ত্রসমূহের মধ্য দিয়া মনীষার যে অভিব্যক্তি দেখা যায়, তাহা অদ্ভুত বটে; তবুও আত্মিক শক্তি জগতের উপর যে প্রভাব বিস্তার করে, তাহার তুলনায় এই সব শক্তি নগণ্য।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

# শ্রীরামকৃষ্ণ-সুপ্রভাতম্

স্বামী হর্ষানন্দ

ধর্মস্য হানিমভিতঃ পরিদৃশ্য শীঘ্রং
কামারপুকুর ইতি প্রথিতে সমৃদ্ধে।
গ্রামে সুবিপ্রসদনে হ্যভিজাত দেব
শ্রীরামকৃষ্ণভগবন্ তব সুপ্রভাতম্ ॥ ১

চারদিকে ধর্মের গ্লানি দেখে, কামারপুকুর নামক সমৃদ্ধিশালী গ্রামের সদ্‌ব্রাহ্মণের ঘরে, হে দেব, তুমি শীঘ্র জন্মগ্রহণ করেছিলে। হে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ, তোমায় প্রভাত-বন্দনা করি। ১

বাল্যে সমাধ্যনুভবঃ সিতপক্ষিপংক্তিং
সন্দৃশ্য মেঘপটলে সমবাপি যেন।
ঈশৈক্যবেদনসুখং শিবরাত্রিকালে
শ্রীরামকৃষ্ণভগবন্ তব সুপ্রভাতম্ ॥ ২

বাল্যকালে মেঘপটলের মধ্যে উড্ডীয়মান শুভ্রবলাকাদল দেখে তুমি সমাধিস্থ হয়েছিলে; (পুনরায়) শিবরাত্রিতে শিবের সঙ্গে একাত্ম হয়ে আনন্দানুভব করেছিলে। হে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ, তোমায় প্রভাত-বন্দনা করি। ২

নানাবিধানয়ি সনাতনধর্মমার্গান্
ক্রৈস্তাদিচিত্রনিয়মান্ পরদেশধর্মান্।
আস্থায় চৈক্যমনয়োরনুভূতবাংস্ত্বং
শ্রীরামকৃষ্ণভগবন্ তব সুপ্রভাতম্ ॥ ৩

সনাতন ধর্মের বিভিন্ন পথে এবং পরদেশের খৃষ্টানাদি ধর্মসমূহ অনুসরণ ক'রে তুমি নিজ থেকে সিদ্ধান্ত উপলব্ধি করলে যে এসকল একই লক্ষ্যে নিয়ে যায়। হে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ, তোমায় প্রভাত-বন্দনা করি। ৩

হে কালিকাপদসরোরুহকৃষ্ণভৃঙ্গ
মাতুস্সমস্তজগতামপি শারদায়াঃ।
ঐক্যং হ্যদর্শি তরসা পরমং ত্বয়ৈব
শ্রীরামকৃষ্ণভগবন্ তব সুপ্রভাতম্ ॥ ৪

হে কালিকাপাদপদ্মাশ্রিত কৃষ্ণভ্রমর, তুমি অতি সহজেই ( নিজপত্নী ) সারদাদেবী ও বিশ্বজননীর অভেদত্ব উপলব্ধি করলে। হে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ, তোমায় প্রভাত-বন্দনা করি। ৪

রাখালতারকহরীংশ্চ নরেন্দ্রনাথম্
অন্যান্ বিশুদ্ধমনসঃ শশিভূষণাদীন্।
সর্বজ্ঞ আত্মবয়ুনং ত্বমিহানুশাসৃসি
শ্রীরামকৃষ্ণভগবন্ তব সুপ্রভাতম্ ॥ ৫

হে সর্বজ্ঞ, এখানেই ( অর্থাৎ পাহাড়ে নয়, জনারণ্যের মধ্যেই ) তুমি রাখাল, তারক, হরি, নরেন্দ্রনাথ, শশিভূষণ প্রভৃতি শুদ্ধচিত্ত ( যুবকদের ) আত্মবিদ্যা শেখালে। হে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ তোমায় প্রভাত-বন্দনা করি। ৫

নিত্য সমাধিজসুখং নিজবোধরূপম্
আস্বাদয়ন্ তব পদে শরণাগতাংশ্চ।
আনন্দয়ন্ প্রশময়ন্নুপতিষ্ঠসে ত্বং
শ্রীরামকৃষ্ণভগবন্ তব সুপ্রভাতম্ ॥ ৬

সমাধিজ আত্মজ্ঞানরূপ আনন্দ নিত্য উপলব্ধি ক'রে তুমি নিজপদে শরণাগতদের আনন্দ ও শান্তি দিলে। হে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ, তোমায় প্রভাত-বন্দনা করি। ৬

স্বীকৃত্য পাপমখিলং শরণাগতৈর্যদ্
আজীবনং বহু কৃতং দয়য়া স্বদেহে।
তজ্জাতখেদনিবহং সহসে স্ম নাথ
শ্রীরামকৃষ্ণভগবন্ তব সুপ্রভাতম্ ॥ ৭

হে প্রভু, শরণাগতদের বহু জন্মের নানাপ্রকার পাপ করুণাবশতঃ নিজদেহে গ্রহণ ক'রে তজ্জনিত কষ্ট তুমি নীরবে সহ্য করেছো। হে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ, তোমায় প্রভাত-বন্দনা করি। ৭

প্রাতঃ প্রণামকরণং তব পাদপদ্মে
সংসারদুঃখহরণং সুলভং করোতি।
মত্বেতি ভক্তিভরিতাঃ প্রতিপালয়ন্তি
শ্রীরামকৃষ্ণভগবন্ তব সুপ্রভাতম্ ॥ ৮

প্রভাতে তব পাদপদ্মে প্রণাম সংসার-দুঃখনাশের অনুকূল জেনে ভক্তিবিনম্রচিত্তে

( ভক্তেরা ) তোমার দর্শনাকাঙ্ক্ষায় অপেক্ষা করছে। হে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ, তোমায় প্রভাত-বন্দনা করি। ৮

গাতুং স্তুতীস্তব জনা অমৃতায়মানাঃ
　　সম্প্রাপ্য দর্শনমিদং তব পাদয়োশ্চ।
ধন্যা নরেশ ভবিতুং মিলিতাস্সমীপং
　　শ্রীরামকৃষ্ণভগবন্ তব সুপ্রভাতম্ ॥ ৯

তোমার অমৃত-নিঃসারী স্তব গাইতে ও চরণ-দর্শনের দ্বারা ধন্য হতে বহু লোক, হে লোকপ্রভু, এখানে সমবেত হয়েছে। হে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ, তোমায় প্রভাত বন্দনা করি। ৯

সন্দায় দর্শনসুখং শরণাগতেভ্যো
　　মোহান্ধকারমখিলং ত্বমপাকুরুষ।
জ্ঞানার্ক ভক্তিজলধে সকলার্তিহস্তঃ
　　শ্রীরামকৃষ্ণভগবন্ তব সুপ্রভাতম্ ॥ ১০

হে জ্ঞানভাস্কর, দর্শনানন্দ প্রদান করে তুমি শরণাগতদের নিখিল অজ্ঞানান্ধকার দূর করো। হে ভক্তিবারিধি, হে সর্বদুঃখনাশক, হে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ, তোমায় প্রভাত-বন্দনা করি। ১০

আহৈতুকীতি করুণা কিল তে স্বভাবো
　　দুষ্টাঃ কঠোরহৃদযা অপি তে ভজন্তে।
ত্বামেব সর্বজগতাং জননি প্রপাত্রি
　　শ্রীশারদেশ্বরি রমে তব সুপ্রভাতম্ ॥ ১১

হে মা সারদেশ্বরী, তুমি কল্যাণীরূপা, অহৈতুকী করুণাই তোমার স্বভাব জেনে কঠোর-হৃদয় দুষ্টেরাও তোমার পূজা করে। তুমি সর্বজগতের রক্ষাকর্ত্রী, হে মা, তোমায় প্রভাত-বন্দনা করি। ১১

সুপ্তাংস্তু ভারতজনান্ স্ববচঃপ্রহারৈ-
　　রুদ্বোধয়ন্ বিবশয়ন্ নিজধর্মমার্গে।
প্রোৎসাহয়ন্ পরমতাং প্রকটীকরোষি
　　বীরেশদত্তমহিমন্ তব সুপ্রভাতম্ ॥ ১২

শিব-প্রসাদিত ( মহিমায় ) যিনি মহিমময়, যিনি স্বীয় বাগাঙ্কুশের সাহায্যে সুপ্ত

ভারতবাসীদের নিজধর্মপথে জাগ্রত ও উৎসাহিত ক'রে তুলে নিজ মহিমা সর্বদা প্রকাশ করেছেন, সেই তোমাকে ( স্বামী বিবেকানন্দকে ) প্রভাত-বন্দনা করি। ১২

প্রাতরুত্থায় যো দেবং
রামকৃষ্ণং স্মরন্ স্মরন্।
স্তোত্রমেতৎ পঠেৎ ভক্ত্যা
সোঽমৃতত্বায় কল্পতে ॥

যে কেউ প্রাতঃকালে উঠে ( প্রভু ) শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে স্মরণ করেন এবং ভক্তিসহকারে এই স্তোত্র আবৃত্তি করেন, তিনি অমৃতত্বলাভের যোগ্য হয়ে ওঠেন।

"যন্ত্র কখনও মানুষকে সুখী করিতে পারে নাই, কখনও পারিবে না। যাহারা যন্ত্র-সভ্যতার মাহাত্ম্য প্রচার করে তাহাদের মতে যন্ত্রের মধ্যেই সুখ নিহিত। বাস্তবিকপক্ষে সুখের উদ্ভব ও স্থিতি মনেই। মন যাহার বশে, সেই-ই সুখী, অপর কেহ নয়। সমগ্র পৃথিবীকে নিয়ন্ত্রণ করিবার শক্তিও যদি পাও, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেকটি পরমাণুকে যদি করতলগত করিতে পারো, তাহাতেই বা তোমার কি লাভ? বস্তুতঃ প্রকৃতিকে জয় করিবার জন্যই মানুষের জন্ম; পাশ্চাত্য জনগণ 'প্রকৃতি' বলিতে স্থূল অর্থাৎ বহিঃপ্রকৃতিকেই বুঝিয়া থাকে। অশেষ শক্তির আধার নদী, পর্বত, সাগর প্রভৃতি অসংখ্য বৈচিত্র্যের সমাবেশে এই বহিঃপ্রকৃতি সত্যই বিরাট! কিন্তু ইহা অপেক্ষাও এক মহত্তর প্রকৃতি—মানুষের অন্তর্জগৎ। এই অন্তর্জগতের সমীক্ষাতেই প্রাচ্য-প্রতিভা সম্যক্ বিকশিত হইয়াছে, যেমন বহির্জগতের ক্ষেত্রে প্রতীচ্য-প্রতিভা।

"পাশ্চাত্যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ যেমন সত্য, প্রাচ্যে অতীন্দ্রিয় জগৎ সেইরূপ। মানবজাতির অগ্রগতির জন্য পাশ্চাত্য আদর্শের মতো প্রাচ্য আদর্শেরও প্রয়োজন রহিয়াছে; বোধ হয় সে প্রয়োজন আরও বেশী।

"পার্থিব ক্ষমতায় শক্তিশালী জাতিগুলি মনে করে যে, ঐ শক্তিই একমাত্র কাম্য, উহাই প্রগতি ও সংস্কৃতি; যাহাদের বিত্তলালসা নাই, ঐহিক প্রতাপ নাই- তাহারা বাঁচিয়া থাকিবার অযোগ্য। পক্ষান্তরে অন্য কোন জাতি মনে করিতে পারে—নিছক জড়বাদী সভ্যতা একান্ত নিরর্থক! প্রত্যেকটিরই নিজস্ব গুরুত্ব ও মহিমা আছে। এই দুইটি আদর্শের মিলন ও সামঞ্জস্যই হইবে বর্তমানকালের মীমাংসা।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

# স্বামী প্রেমানন্দের স্মৃতিকথা

স্বামী নিখিলানন্দ

[ অনুবাদক : স্বামী চেতনানন্দ ]

১৯১৫-১৬ সালের শীতকালে স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী প্রেমানন্দ ঢাকায় যান। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন স্বামী শঙ্করানন্দ, স্বামী মাধবানন্দ, স্বামীজীর ভাই মহেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি। তখন আমি ঢাকা কলেজে তৃতীয় বর্ষের ছাত্র।

এক সন্ধ্যায় আমরা ঢাকা কলেজের হস্টেলের খাওয়ার ঘরে একটা ছাত্রসভার আয়োজন করি। কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক শ্রীঅশ্বিনীকুমার মুখোপাধ্যায়কে আমরা সভাপতি করলাম।

আমি অগ্নেস ভিলাতে ( Agnes Villa ) বক্তাদের আনবার জন্য গেলাম। স্বামী প্রেমানন্দ আমাকে সঙ্গে নিয়ে ঐ বাড়ীর ছাদে উঠলেন ; স্বামী ব্রহ্মানন্দ তখন সেখানে সান্ধ্য-ভ্রমণ করছিলেন। তাঁর কাছ থেকে বিদায় নেবার কালে স্বামী প্রেমানন্দ পা ছুঁয়ে প্রণাম করলেন এবং আশীর্বাদ ভিক্ষা করলেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ বিব্রত বোধ করে বললেন, 'ভাই বাবুরাম, কর কী ? ঠাকুরের কৃপায় সব ঠিক হয়ে যাবে।' যদিও তিনি বাধা দিতে চেষ্টা করলেন, তবুও স্বামী প্রেমানন্দ গুরু-ভাইকে প্রণাম করলেন এবং ভাবের সঙ্গে কম্পিত কণ্ঠে আশীর্বাদ চাইলেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দের প্রতি স্বামী প্রেমানন্দের ঐকান্তিক শ্রদ্ধা দেখে আমি যার-পর-নাই মুগ্ধ হলাম।

সভাপতি অশ্বিনীবাবুর একটা মুদ্রাদোষ ছিল—সেটা আমরা বক্তাদের বলে দিতে ভুলে গিছলাম। কয়েক মিনিট বাদ বাদ নিজের ঘড়ির দিকে তাকানো তাঁর একটা অভ্যাস ছিল। এমন কি কলেজে ক্লাস নেওয়ার সময়ও তিনি ঐরূপ করতেন। স্বামী প্রেমানন্দ ছিলেন প্রথম বক্তা। তিনি সবেমাত্র কয়েক মিনিট বলেছেন, অমনি অশ্বিনীবাবু ঘড়িটা বের করে একবার দেখে নিলেন। স্বভাবতই প্রেমানন্দজী মনে করলেন যে, তাঁকে থামবার জন্য ইঙ্গিত করা হচ্ছে। অথচ তখন কেবল-মাত্র তাঁর ভাষণে ওজস্বিতা প্রকাশ পেতে শুরু করেছে। বক্তৃতা বন্ধ করে আসন গ্রহণ করবেন কিনা, সভাপতিকে জিজ্ঞাসা করলেন তিনি। এতে অশ্বিনীবাবু ক্ষমা প্রার্থনা করে বক্তৃতা চালিয়ে যেতে বললেন। সভাপতি কয়েক মিনিট পর আবার ঐরূপ করলেন। এরূপ ঘড়ি দেখা চলল অনেকবার। অবশেষে স্বামী প্রেমানন্দ বললেন, 'মহাশয়, আমি আপনাদের মত পাশ্চাত্য শিক্ষিত বক্তা নই যে ঘড়ি ধরে সময় মেপে বক্তৃতা দেব। আমি মূর্খ মানুষ। ঠাকুর যেমন বলান তেমনি বলি। আমি আপনাদের ওসব ইংরেজী আদব-কায়দা পালনে অক্ষম। আপনারা ধৈর্যহীন হয়ে পড়েছেন, সুতরাং আমি আর কিছু বলব না।' সভাপতি তাঁকে ঘড়ির ব্যাপার অগ্রাহ্য করে বক্তৃতা বন্ধ না করতে অনুরোধ জানালেন, কিন্তু স্বামী প্রেমানন্দ চুপ করে রইলেন। তিনি বলছিলেন তীব্র আবেগের সঙ্গে। বক্তৃতা-কালে ক্রমাগত বাধা ভঙ্গ করছিল তাঁর সেই প্রাণ-আলোড়নকারী ভাবোচ্ছ্বাসকে, শক্তি-প্রবাহকে, স্নায়ুতন্ত্রীগুলোকে। ফলে তিনি পড়লেন অসুস্থ হয়ে।

* Swami Premananda: Teachings and Reminiscences গ্রন্থ হ'তে অনূদিত।

অগ্নেস ভিলাতে একদিন সকালে মহারাজদের সঙ্গে আমাদের নিয়মিত সাক্ষাতের পর, প্রেমানন্দজী যখন নীচের তলায় নামছিলেন তখন আমি তাঁর অনুসরণ করলাম। তাঁকে একা পেয়ে বললাম, 'মহারাজ, আমি আপনার সঙ্গে একটু গোপনে কথা বলতে চাই।' ফিরে চাইলেন তিনি আমার দিকে। বললেন দৃপ্তভাবে: 'তুমি একজন বিপ্লবী?' বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গেলাম আমি। জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনি কি করে জানলেন?' তিনি বললেন, 'আমরা সব বুঝতে পারি। দেশকে সেবা করার পথ এ নয়। ভুল পথ ধরেছ তোমরা।' উত্তেজনা তাঁর বেড়ে চলল। তিনি বললেন, 'ওসব করে কিছুই হবে না। তোমার আর সব বিপ্লবী বন্ধুদের নিয়ে কাল সকালে এস। তোমাদের মহারাজের (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) কাছে নিয়ে যাব।'

পরদিন সকালে দু-জন বিপ্লবী বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে ভিলাতে হাজির হলাম। স্বামী প্রেমানন্দ আমাদের একটা ছোট ঘরে নিয়ে গেলেন। সে ঘরে দু'টি তক্তাপোষ ছিল। স্বামী ব্রহ্মানন্দ একটিতে বসেছিলেন; স্বামী প্রেমানন্দ অপরটিতে বসলেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দের সেবককে ঘরের বাইরে যেতে বলা হল; ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দেওয়া হল। স্বামী ব্রহ্মানন্দকে প্রণাম করে আমরা মেঝেতে বসলাম।

স্বামী প্রেমানন্দ ব্রহ্মানন্দজীর সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, 'মহারাজ, এই যুবকদের প্রতি একটু তাকান। এরা ভাল ছেলে, কিন্তু ভ্রান্তপথে চালিত। ভারতকে সেবা করবার জন্য এরা হয়েছে বিপ্লবী। আপনি দয়া করে এদের একটু সদুপদেশ দিন।' স্বভাবসুলভ গুরুগম্ভীর স্বামী ব্রহ্মানন্দ অতি দরদের সঙ্গে আমাদের বিদ্বেষের পথ, জিঘাংসার পথ ছেড়ে দিয়ে স্বামী বিবেকানন্দের প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করতে বললেন। তিনি প্রথমেই বললেন আমাদের চরিত্র গঠন করতে, তারপর যেন আমরা দেশসেবায় ব্রতী হই। তিনি আমাদের সাবধান করে বললেন যে, বিপ্লবীদের মধ্যে কিছু দুষ্ট স্বার্থপর লোক আছে—সেজন্য কোন ফল হচ্ছে না। চরিত্রের অভাবই এই নিষ্ফলতার কারণ। উদাহরণস্বরূপ তিনি বললেন, 'ভিজে বারুদে বিস্ফোরণ হয় না। যতই জ্বালাবার চেষ্টা কর না কেন, তাতে কেবল দেশলাই-এর কাঠি নষ্ট হবে। আর বারুদ যদি শুকনো হয় তবে একটা কাঠি মুহূর্তে ঘটাতে পারে বিরাট বিস্ফোরণ।' তিনি খুব জোর দিয়ে বললেন: 'স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন প্রকৃত দেশপ্রেমিক এবং আমাদের উচিত তাঁর নির্দেশ মেনে চলা।'

আমি বললাম: 'কিন্তু মহাশয়, আপনারা তো স্বামী বিবেকানন্দকে বুঝতে পারেননি। আমরা তাঁর বই-এ পড়েছি—তিনি চাইতেন আমরা যেন ভারতের স্বাধীনতার জন্য রক্ত-মোক্ষণ করি। আর বিপ্লবীরা তো তাই করছে। আপনারা স্বামী বিবেকানন্দের উপদেশ ধরতে পারেননি।'

এ ধরনের উক্তি স্বামী প্রেমানন্দের পক্ষে সীমাহীন অসহ্যের ব্যাপার। তিনি ফেটে পড়লেন: 'নির্বোধের দল। তোরা জানিস না কার সঙ্গে কথা বলছিস। বিশ বছরেরও অধিক আমরা স্বামীজীকে জানি। আমরা একসঙ্গে খেয়েছি, খেলেছি, কথা বলেছি, আমাদের কর্মপন্থা নিয়ে আলোচনা করেছি—আর আমরা তাঁকে বুঝিনি!! আহাম্মকের দল, তাঁর বই-এর দু পাতা পড়ে ভাবছিস তোরা তাঁকে সম্পূর্ণ বুঝে ফেলেছিস?'

তারপর তিনি ব্রহ্মানন্দজীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'মহারাজ, শুনলেন আহাম্মকের কথা? এ বলছে কিনা আপনি স্বামীজীকে বোঝেননি! আপনি কি মনে করেন যে, একটা ঘোড়ার চেয়ে এর অধিক বুদ্ধি আছে? দেখি—পিঠে করে এ আমাকে বইতে পারে কিনা।'

ক্ষিপ্রতার সঙ্গে তিনি বিছানা ছেড়ে উঠলেন এবং আমাকে নীচু হয়ে চার-হাত-পায় হামাগুড়ি দিতে বললেন। তারপর আমার পিঠের উপর বসে দু-পাশে দু-পা ঝুলিয়ে দিয়ে ঘরের চারপাশে তাঁকে নিয়ে ঘুরিয়ে বেড়াতে আদেশ করলেন। তখন আমি যেন একটা সত্যিকার ঘোড়া। আমি তাঁর আজ্ঞা পালন করলাম। দু-এক মিনিট পর তিনি আমার পিঠের উপর থেকে নেমে বললেন, 'সব ঠিক হয়ে যাবে।'

স্বামী ব্রহ্মানন্দ সপ্রেমে আপনভাবে সমস্ত ব্যাপারটা দেখলেন। তারপর আবার আমাদের চরিত্রগঠনের উপদেশ দিলেন। ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম আমরা। আর সেই থেকে ছিন্ন হয়ে গেল বিপ্লবী সমিতির সঙ্গে আমার যোগসূত্র।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ সপার্ষদ ঢাকা ছেড়ে কয়েক মাইল দূরবর্তী নারায়ণগঞ্জে চলে গেলেন। সেখানে তাঁরা এক ভক্ত-বাড়ীতে উঠলেন। এক সন্ধ্যায় আমি দুজন বন্ধুসহ মহারাজদের প্রণাম করতে গেলাম। নৈশ-ভোজের সময় পর্যন্ত আমরা সেখানে বসে ছিলাম। আমাদের অত সময় বসে থাকায়, গৃহস্বামী বেশ একটু বিরক্তি প্রকাশ করলেন। যেহেতু তাঁর বাড়ীতে আমাদের খাওয়ার ব্যবস্থা ছিল না।

এতে স্বামী প্রেমানন্দ বেশ রেগে গেলেন এবং গৃহস্বামীকে বললেন: 'এরা সব ঠাকুরের ভক্ত। এদের খাওয়ার ব্যবস্থা না করলে আমিও অভুক্ত থাকব।' গৃহস্বামী ক্ষমা প্রার্থনা করলেন এবং আমরা সকলে খেতে বসলাম।

১৯১৬ সালে গ্রীষ্মাবকাশে স্বামী প্রেমানন্দের অনুমতি নিয়ে উপস্থিত হই বেলুড় মঠে। তাঁকে জানালাম আমার সংঘে যোগদানের ইচ্ছা। কিন্তু তিনি আমাকে প্রথমে বি. এ. পাশ করতে বললেন; এবং জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীমায়ের কাছে পাঠিয়ে দিলেন কৃপালাভের জন্য।

১৯১৬ সালের অগস্ট মাসে ঢাকাতে আমি বন্দী হই। কারণ বিপ্লবী দলের সঙ্গে পূর্বে আমার সংযোগ ছিল। আমাকে দু বছর অন্তরীণ করে রাখা হয়। তারপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে বন্দিদশা থেকে ছাড়া পেয়ে বেলুড় মঠে যাই। মঠে গিয়ে শুনলাম স্বামী প্রেমানন্দ গুরুতর অসুস্থ। তার অল্প কিছুদিন পরেই তিনি চলে গেলেন।

জীবনের এক সংকট-মুহূর্তে তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ। এই মহান আত্মার সঙ্গে সেই অল্প মিলন-স্মৃতিগুলি পরবর্তীকালে বহু দুর্যোগের মধ্যে, জীবনের নানাবিধ ঝড়-ঝঞ্ঝার মধ্যে আমাকে জুগিয়েছে সাহস ও অনুপ্রেরণা, এনে দিয়েছে আত্মবিশ্বাস ও সান্ত্বনা।

# ভারতীয় সমন্বয়ধারা ও শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীহীরেন্দ্রনারায়ণ সরকার

ভারতবর্ষ অতি প্রাচীন দেশ। ইহার সংস্কৃতিও খুব প্রাচীন ও সমৃদ্ধিশালী। ভারতের ইতিহাস পাঠ করিলে জানা যায় যে, প্রাগৈতিহাসিক কাল হইতে এখানে বহু মানবগোষ্ঠী ও জাতি বাস করিয়াছে এবং কালক্রমে সে-সকল গোষ্ঠী ও জাতি একত্র মিলিত হইয়া এক ভারতীয় জাতিতে পরিণত হইয়াছে। বিভিন্ন জাতির মিলনের ফলে তাহাদের বিভিন্ন সংস্কৃতিরও মিলন ঘটিয়াছে এই ভারতভূমিতে। এই মিলন বা সমন্বয়ই ভারতীয় ঐতিহ্যের একটি মূল সুর।

ভারতের প্রথম অধিবাসী হইল আদিম-জাতি। বর্তমান কোল, ভীল, ওঁরাও, মুণ্ডা, সাঁওতাল প্রভৃতি জাতি আদিম জাতির বংশধর। তারপর দেখা যায় ভারতে দ্রাবিড় জাতির আবির্ভাব; সিন্ধুসভ্যতা তাহাদেরই কীর্তি। দ্রাবিড়দের পর আর্য জাতির আগমন ঘটে এই ভারতবর্ষে। তাঁহাদের আদি নিবাস সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। স্বামী বিবেকানন্দের মতে আর্যগণ ভারতের বাহির হইতে আসেন নাই—ভারতই আর্যগণের আদি বাসভূমি। বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন জাতি—পারসীক, গ্রীক, শক, হুন, পারদ, কুষান, তীব্বতীয়, আরব, পাঠান, মুঘল—ভারতবর্ষে আসিয়াছে এবং এখানে একজাতিতে মিশিয়া গিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়:

হেথায় আর্য, হেথা অনার্য,
হেথায় দ্রাবিড়, চীন—
শক, হুনদল পাঠান, মোগল
একদেহে হল লীন।

আধুনিক কালে পর্তুগীজ, দিনেমার, ফরাসী, ইংরেজ ভারতে আগমন করে। ফলে, ভারত বহু জাতি, ভাষা, ধর্ম ও সংস্কৃতির মিলন-ক্ষেত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভারতে দেখা যায়, বহুর মধ্যে ঐক্য; এই ঐক্য সংস্কৃতিগত ও ভাবগত; ইহা ভারত-ইতিহাসের এক প্রধান বৈশিষ্ট্য। তাই কবি গাহিয়াছেন:

"নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধান,
বিভেদের মাঝে দেখ মিলন মহান।"

ভারত-সংস্কৃতির এক বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহা ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক। এবং এই ভাবটি ভারতীয় সাহিত্য, শিল্পকলা এবং সঙ্গীতেও পরিস্ফুট। আমাদের সংস্কৃতির মূলে দেখি—এই আধ্যাত্মিক ভাবধারা বৈদিক যুগ হইতে চলিয়া আসিয়াছে এবং এই ধারার প্রধান কথাই হইল সামঞ্জস্য ও সমন্বয়। এই ধর্ম ও অধ্যাত্মবাদের চরম ঐক্য ও সমন্বয় ঘটিয়াছে আধুনিকালে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মধ্যে।

বর্তমান ভারতীয় সংস্কৃতি হইতেছে আদিম সংস্কৃতি, দ্রাবিড় সংস্কৃতি, আর্য সংস্কৃতি, জৈন ও বৌদ্ধ সংস্কৃতির সমন্বয়। ভারত কিছুই বর্জন করে নাই—সবই গ্রহণ করিয়াছে, ভারত বাহ্য পার্থক্যকে নষ্ট করিয়া ভিতরের নিগূঢ় যোগ আবিষ্কার করিয়াছে এবং প্রভেদের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করিয়া নানা পথকে একই লক্ষ্যে চালনা করার শিক্ষা দিয়াছে ভারতীয় সংস্কৃতি। এই উদারতা ও বিশ্বজনীন গ্রহণ (universal acceptance) আমাদের জাতি ও কৃষ্টির মূল বৈশিষ্ট্য। ভারতীয় কৃষ্টির আর এক বৈশিষ্ট্য হইল মানবপ্রেম, ত্যাগ ও সেবা। আমাদের

এই জাতীয় বৈশিষ্ট্য আধুনিককালে বিশেষভাবে প্রকাশ পাইয়াছে রামমোহন, বিদ্যাসাগর, শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, শ্রীঅরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ ও মহাত্মা গান্ধীজীর মধ্যে।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার অধ্যাত্মসাধনার দ্বারা ভারতের কয়েক হাজার বৎসরের সমন্বয়ের ঐতিহ্যকে এই যুগে পরিপুষ্ট ও দৃঢ় করিয়াছেন। তাঁহার সাধনালব্ধ অভিজ্ঞতার ফলশ্রুতি হইল—"যত মত তত পথ।" তাঁহার এই মহাসমন্বয়বাণীর তাৎপর্য আমরা এখানে হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করিব।

উপনিষদে ধর্ম, দর্শন ও ঈশ্বর সম্পর্কে দুইটি ধারা দেখিতে পাওয়া যায়। একটি ধারার নাম অদ্বৈতবাদ, অপরটি ভাগবতবাদ। এই দুই ধারা এখনও হিন্দু ধর্ম ও দর্শনে বর্তমান। অদ্বৈতবাদ অনুযায়ী ব্রহ্ম নিরাকার, নির্বিশেষ, নির্গুণ ও নৈর্ব্যক্তিক; ব্রহ্মলাভের উপায় জ্ঞান; জগৎ দেশ, কাল ও নিমিত্তের বা নামরূপের সমষ্টি অর্থাৎ ইহার সত্যিকারের সত্তা নাই এবং মুক্তিতে জীবাত্মা পরমাত্মায় বা ব্রহ্মে লীন হইয়া যায়, উহার আর নিজস্ব বিশেষত্ব থাকে না। দ্বিতীয় ধারা মতে, ব্রহ্ম বা ঈশ্বর সাকার, সবিশেষ ও গুণময় এবং তিনি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্তা; জগৎ ঈশ্বর-সৃষ্ট বলিয়া অস্তিত্বসম্পন্ন; ভগবানকে লাভ করা যায় ভক্তির মাধ্যমে। ভাগবতমতে মুক্তির পরও জীবাত্মার অস্তিত্ব থাকে এবং ঈশ্বরসান্নিধ্যে অপার শান্তি ও আনন্দ অনুভব করে। মধ্যযুগের প্রারম্ভে এই দুই ধারাকে দার্শনিক-ভিত্তিতে স্থাপন এবং বিশেষভাবে প্রসারিত ও পরিপুষ্ট করেন যথাক্রমে আচার্য শঙ্কর ও আচার্য রামানুজ।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার সাধনালব্ধ অভিজ্ঞতার আলোকে বলিলেন—"ঈশ্বর সাকার আবার নিরাকার, আবার সাকার-নিরাকারেরও পার। তাঁর ইতি করা যায় না।"—( শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ২য় ভাগ)। ঠাকুর ঈশ্বরকে সাকার ও নিরাকার উভয় ভাবেই সবিশেষ উপলব্ধি করিয়াছেন। তিনি একত্র ভক্ত ও জ্ঞানী—তাই তিনি বিজ্ঞানী। উল্লেখযোগ্য যে, ঠাকুর ঈশ্বরকে সাকার ও নিরাকার উপলব্ধিতে নিঃশেষ করেন নাই। ঈশ্বর সম্পর্কে ইহা এক মৌলিক ও বৈপ্লবিক কথা এবং চরম সত্যের এই ধারণায় ধর্মের বিভিন্ন মত ও উপলব্ধির সমন্বয় সুষ্ঠুভাবে সম্ভব হয়।

জগৎ সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পূর্ণ এক নূতন আলোকপাত করিয়াছেন। তিনি বলেন—"যতক্ষণ ঈশ্বর-উপলব্ধি না হয়, ততক্ষণই জগৎ মিথ্যা মনে হয়, আর ঈশ্বর-উপলব্ধি হইলে জগৎকে সত্য মনে হয়।" পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে,—"যত মত তত পথ।" "কিন্তু তা বলে মতুয়ার বুদ্ধি ( dogmatism ) ভাল নয়। ছাদ কি জানবার জন্য সিঁড়ি বেয়ে ছাদে উঠছ আর বলছ 'নেতি-নেতি'। ছাদে উঠে দেখলে ছাদ হচ্ছে ইট-চুণ-সুরকি। তখন নামতে গিয়ে দেখ সবই ইট-চুণ-সুরকি" ( কথামৃত, ২য় ভাগ )। অতি সহজ একটি কথায় অদ্বৈতবাদীর "নেতি নেতি" ও ভাগবত-বাদীর "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"—এই দুই আপাত পরস্পরবিরোধী বাক্যের মধ্যে সমন্বয় হইয়া গেল যাহা লইয়া বিবর্তবাদী আর পরিণামবাদী শত শত বৎসর ধরিয়া তর্কের ধূলা উড়াইয়াছেন।

এইভাবে দেখা যায় ঠাকুর অদ্বৈতবাদ ও বৈষ্ণববাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করিয়াছেন। উপনিষদে সব ভাবই আছে। এখন আমরা তাঁহার উপলব্ধির আলোকে উপনিষদের শ্লোক-

গুলির অর্থ আরো ভালভাবে বুঝিতে পারি।

শ্রীরামকৃষ্ণের সাধন-জীবন বিশ্বের এক বিস্ময়কর ঘটনা। তিনি প্রথমে শাক্তমতে সাধনা করেন এবং শ্রীশ্রীজগন্মাতার দর্শন লাভ করিয়া ধন্য হন। তারপর এক এক করিয়া পুরাণোক্ত পঞ্চভাবের—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—সাধনায়ও সিদ্ধিলাভ করেন। ভারতে প্রচলিত প্রধান চৌষট্টিখানি তন্ত্র অনুযায়ী সাধনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করেন। অদ্বৈতমতে সাধনায় নির্বিকল্প সমাধিতে ব্রহ্ম উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তাহা ছাড়া, ইসলাম ও খৃষ্টধর্মানুযায়ীও তিনি সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। এইরূপ অভূতপূর্ব সাধনার ফল ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী এবং ইহা ভারতীয় সমন্বয়ের ধারাই বহন করে।

এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ভারতে সুলতানী আমলে মধ্যযুগের ধর্মসমন্বয়-কারী কয়েকজন সাধক ও সংস্কারক আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে দাদূ, নানক, কবীর, রামানন্দ, চৈতন্য, একনাথ প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁহারা প্রচার করিলেন—'হিন্দুর ভগবান ও মুসলমানের আল্লা অভেদ; যে-ই রাম, সে-ই রহিম; হিন্দুকা গুরু, মুসলমানকো পীর; যে-ই সত্যনারায়ণ সে-ই সত্যপীর'। তাঁহারা আরও প্রচার করিলেন যে, সৎ ও পবিত্র জীবন যাপন করিলে এবং ভক্তি থাকিলেই ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। তাঁহারা জাতিভেদ মানিতেন না এবং হিন্দু-মুসলমান-নির্বিশেষে শিষ্য গ্রহণ করিতেন। এইভাবে তাঁহারা মধ্যযুগে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে মিলনের প্রচেষ্টা করেন। যুগে যুগে এই মিলন ও সমন্বয়ের বাণীই ভারত প্রচার করিয়া আসিয়াছে। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, সুলতানী ও মুঘল আমলে হিন্দু-মুসলমান-সমন্বয়-প্রচেষ্টার সাথে ভারতীয় শিল্পের সঙ্গে পারস্য প্রভৃতি মুসলিম দেশের শিল্পরীতির সমন্বয় ঘটিয়াছিল এবং মুসলিম যুগের এই সংমিশ্রিত শিল্পরীতি ইন্দোমুসলিম বা ইন্দো-সেরাসেনিক শিল্পরীতি নামে খ্যাত, যেমন ঘটিয়াছিল মৌর্যযুগে হিন্দু-গ্রীক শিল্পের সমন্বয় যা 'গান্ধার শিল্প' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ভারতীয় চিত্রে ও সঙ্গীতে ও মধ্যযুগে হিন্দু-মুসলমান রীতির সমন্বয় ঘটে এবং আধুনিক যুগে ভারতীয় চিত্র, সঙ্গীত ও নৃত্যে ইউরোপীয় ধারার সমন্বয় ঘটিয়াছে। ভারতে যুগে যুগে বিভিন্ন প্রকারের সমন্বয় দেখিয়া ইহাই প্রমাণিত হয় যে, ভারতীয় মনীষা প্রধানতঃ সমন্বয়ের মনীষা, ভারতীয় প্রতিভার বৈশিষ্ট্য হইল সকলকে আপন করিয়া গ্রহণ করা। ভারতীয় এই সমন্বয়-মনীষার উল্লেখযোগ্য প্রকাশ ঘটে আধুনিককালে ধর্ম-ও অধ্যাত্মক্ষেত্রে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের মধ্যে, আর সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে, দর্শনে শ্রীঅরবিন্দের মধ্যে।

ইংরেজ আমলে ভারতে খৃষ্টধর্ম প্রসার লাভ করে এবং অনেক শিক্ষিত ভারতবাসী খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেন। ভারতকে খৃষ্টধর্মের হাত হইতে রক্ষাকল্পে রামমোহন প্রতিষ্ঠা করিলেন ব্রাহ্মধর্ম। রামমোহন হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, পারসীক প্রভৃতি ধর্মের মূল গ্রন্থ হইতে সার সঙ্কলন করিয়া বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে ঐক্যস্থাপনের প্রচেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার সময় হইতে ভারতে নবজাগরণের (Renaissance) সূত্রপাত হয়, তিনিই ইহার জনক। এখানে বলা প্রয়োজন যে, তাঁহার প্রচেষ্টা ছিল বুদ্ধির স্তরে (intellectual level)। কিন্তু ধর্মের সমন্বয় দৃঢ়তর হয় যদি উহার ভিত্তি হয় আধ্যাত্মিক-তত্ত্বগুলির উপলব্ধি। ধর্মসমন্বয়ের এইরূপ ভিত্তিই

স্থাপন করিলেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁহার বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান সকল ধর্মই সত্যই নিজজীবনে উপলব্ধি করিয়াছেন। ভারতের কয়েক হাজার বৎসরের অধ্যাত্মসাধনার পূর্ণ বিকাশ ঘটে তাঁহার মধ্যে। তিনি এক মহাসমন্বয়কারী যুগাবতার এবং তাঁহার সর্বধর্মসমন্বয় অধুনা বিবদমান ও পরমত-অসহিষ্ণু মানবসমাজকে উন্নতির পথে লইয়া যাইতে এবং জগতে শান্তিস্থাপনে এক সার্থক ও কার্যকর শক্তি।

# প্রার্থনা

ডক্টর মতিলাল দাশ

মুছিয়ে দাও, দাও মুছিয়ে আমার যত কালো
পথের মাঝে প্রভু, তোমার প্রেমের আলো জ্বালো,
সকল গ্লানি মুছিয়ে দাও তুমি।
কণ্ঠে আমার জাগাও তোমার চির অভয় বাণী
এবার যেন পথে যেতে ভয় কোন না মানি,
চলি তোমার চরণছায়া চুমি॥

দিনে দিনে ছলনারে নিলেম কেবল টানি
সত্য যাহা তাহার খবর কিছুই নাহি জানি,
বেড়াই শুধু বিপথ পানে ঘুরে।
এবার এস হৃদয়স্বামী লও আমারে টানি
বাঁধিয়া লও বেসুরো এই হৃদয়বীণাখানি,
তোমার সুরে, তোমার আপন সুরে—
আপন হাতে বাঁধিয়া লও তুমি॥

# স্বামীজী ও তাঁর গুরুভক্তি

## স্বামী জীবানন্দ

তরুণবয়সে স্বামীজী যখন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পদপ্রান্তে উপস্থিত হতেন, তখন ঠাকুর আনন্দে উল্লসিত হতেন, তাঁর মধুর কণ্ঠের গান শুনে সমাধিস্থ হতেন, তাঁকে 'সাক্ষাৎ নারায়ণ' বলতেন, তাঁকে নিজের হাতে প্রসাদ খাওয়াতেন, ভাল ভাল জিনিস খাওয়াবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়তেন, তাঁকে সকলের থেকে বড় আধার ব'লে ঘোষণা করতেন, যত ভাল ভাল উপমা সব তাঁরই উপর প্রয়োগ করতেন। বলতেন: "নরেন্দ্রের খুব উঁচু ঘর,—নিরাকারের ঘর! পুরুষের সত্তা। এত ভক্ত আসছে, ওর মতো একটিও নাই।

"এক একবার ব'সে ব'সে খতাই। তা দেখি, অন্য পদ্ম কারুর দশদল, কারুর ষোড়শ-দল, কারুর শতদল, কিন্তু পদ্মমধ্যে নরেন্দ্র সহস্রদল।

"অন্যেরা কলসী, ঘটী, এ সব হ'তে পারে; নরেন্দ্র জালা।

ডোবা-পুষ্করিণীর মধ্যে নরেন্দ্র বড় দীঘি—যেমন হালদার পুকুর।

"মাছের মধ্যে নরেন্দ্র রাঙাচক্ষু বড় রুই, আর সব নানারকম মাছ,—পোনা, কাঠী-বাটা এই সব।

"খুব আধার—অনেক জিনিস ধরে। বড় ফুটোওলা বাঁশ।

"নরেন্দ্র কিছুর বশ নয়। ও আসক্তি, ইন্দ্রিয়সুখের বশ নয়।"—('কথামৃত', ৫ম ভাগ পরিশিষ্ট)।

"...নরেন্দ্রের মতো একটি ছেলেও আর দেখিতে পাইলাম না!—যেমন গাইতে-বাজাতে, তেমনি লেখাপড়ায়, তেমনি বলতে-কইতে, আবার তেমনি ধর্মবিষয়ে! সে রাতভোর ধ্যান করে, ধ্যান করতে করতে সকাল হয়ে যায়, হুঁশ থাকে না!—আমার নরেন্দ্রের ভিতর এতটুকু মেকি নাই...।"—('লীলাপ্রসঙ্গ', দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ)।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এত প্রশংসা, এত স্নেহের অধিকার লাভ ক'রেও স্বামীজীর অহংকারের লেশও দেখা যেত না। অধিকন্তু তিনি প্রতিবাদ করতেন, কখনো মৃদুভাবে, কখনো কঠোর ভাবে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব যখন ব্রাহ্মনেতা জগদ্বিখ্যাত কেশবচন্দ্রের মধ্যে যেরূপ একটি শক্তির উৎকর্ষ নরেন্দ্রনাথের মধ্যে ঐরূপ আঠারোটি শক্তি পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ব'লে ঘোষণা করেছিলেন, তখন স্বামীজী সে-কথা মানতে চাননি। মা ভবতারিণীর যন্ত্র ঠাকুর, জগজ্জননী তাঁর মধ্য দিয়ে কথা বলতেন, মাকে জিজ্ঞাসা ক'রে এসে সে-সব প্রতিবাদের উত্তর দিতেন তিনি, তাঁর কথা যে সত্য তা জানিয়ে দিয়ে ভুল দেখিয়ে দিতেন।

স্বামীজী ঠাকুরকে নানাভাবে পরীক্ষা করেছেন, দিনরাত্রি তাঁকে দেখেছেন তাঁর মন মুখ এক কি না, চরমতম ত্যাগের ভাবে তিনি প্রতিষ্ঠিত কি না; তাঁর বিছানার তলায় টাকা রেখে দেখেছেন সত্যই ধাতুস্পর্শে তাঁর হাত বেঁকে যায়, দেখেছেন তিনি পূর্ণভাবে সত্যে প্রতিষ্ঠিত, কথায় ও কাজে তাঁর একটুও অমিল নেই।

সাধারণতঃ লোকে স্বামীজাকে মহা-বৈদান্তিক যুক্তিবাদী ব'লে জানে, তিনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে তর্ক করেছেন, তাঁকে

'যাচিয়ে বাজিয়ে' নিয়েছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের সম্মুখে স্বামীজীর যুক্তিবাদী তার্কিক মূর্তিটিই বেশি উজ্জ্বল। যুক্তিবিচারপূর্ণ বৈজ্ঞানিক যুগে স্বামীজী যেন অসংখ্য যুক্তিবাদীর সমষ্টি-মন নিয়ে তাদের মুখপাত্র হয়ে ঠাকুরের কাছে নানা প্রশ্ন উপস্থাপিত করেছেন এবং সব সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান পেয়ে আনন্দে বিভোর হয়েছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব যেমন নরেন্দ্রনাথকে সর্বোচ্চ আধার বলতেন, তেমনি স্বামীজীরও ছিল অতুলনীয় গুরুভক্তি।

স্বামীজীর গুরুভক্তির কথা স্মরণ করলে মনে পড়ে প্রাচীন কালের সেই সব গুরুগতজীবন মহাপুরুষের কথা যাঁদের গুরুভক্তির বিষয় স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ আছে উপনিষদে,পুরাণে. প্রাচীন সাহিত্যে। স্বামীজীর গুরুভক্তির কথায় মনে পড়ে গুরুভক্ত উপমন্যু, আরুণি, সত্যকামের কথা; স্মৃতিতে আসে ঐতিহাসিক যুগের বুদ্ধশিষ্য আনন্দ ও আচার্য শঙ্করের শিষ্য পদ্মপাদের কথা। এঁদের সকলের গুরুভক্তি যেন স্বামী বিবেকানন্দের দিব্য দেহরূপ আধারে সম্মিলিত। কিভাবে— তা জানা যাবে? তাঁর জীবন পরিক্রমা করলে, শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে সামনে রেখে মহাজীবন অনুধ্যান করলে জানা যাবে মহাকাশের সঙ্গে মহাসাগরের মিলন হ'ল কিভাবে! স্বামীজীর ছিল যেমন অসামান্য গুরুভক্তি, তেমনি ছিল অসীম আত্মবিশ্বাস। এই গুরুভক্তি আর আত্মবিশ্বাসের বলেই তিনি লোকোত্তর মহাপুরুষ—যুগনায়ক।

স্বামীজী ঠাকুরকে দিনে দেখে রাতে দেখে সব রকমে পরীক্ষা ক'রে যখন বুঝেছেন তাঁর ভালবাসার শেষ নেই, সে ভালবাসা কোন প্রতিদান চায় না, সম্পূর্ণ অহেতুকী সে ভালবাসা, যখন জেনেছেন সবাই পরিত্যাগ করলেও তিনি সুখদুঃখের চিরসাথী, তখনই তাঁকে বলেছেন 'LOVE personified'— প্রেমের মূর্তিমান্ বিগ্রহ। তখনই স্বামীজী তাঁর শ্রীপাদপদ্মে দেহ-মন-প্রাণ সমর্পণ করেছেন, সর্বস্ব ঢেলে দিয়েছেন। উচ্ছ্বসিত ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে এই শরণাগতি:

'দাস তব জনমে জনমে দয়ানিধে!'
'তস্মাত্ত্বমেব শরণং মম দীনবন্ধো!'
'যামি গুরুং শরণং ভববৈদ্যম্।'
'ত্যাগীশ্বর, হে নরবর, দেহ পদে অনুরাগ॥'

কাশীপুর উদ্যানবাটীর একটি ঘটনা থেকেই স্বামীজীর অগাধ গুরুভক্তি সম্বন্ধে যে ধারণা হয়, তাতে বিস্ময়ে মুগ্ধ না হয়ে থাকা যায় না। শ্রীরামকৃষ্ণসঙ্ঘের ইতিহাসে কাশীপুর উদ্যান-বাটী বিভিন্ন দিক থেকে চিরস্মরণীয়। এখানে গুরুগতপ্রাণ ত্যাগী সন্তানদের শ্রীগুরুর সেবা, ঈশ্বরের আরাধনা, তপস্যা, সঙ্ঘসৃষ্টির বিভিন্ন প্রচেষ্টার নিদর্শন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

তখন বহু ভক্ত শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে অবতার-রূপে স্বীকার করলেও তাঁরা ভাবতেন শুদ্ধসত্ত্ব শরীরে ঠাকুরের ব্যাধি লীলা ছাড়া আর কিছু নয়, এতে সত্যসত্যই তাঁর দৈহিক যন্ত্রণা হয়, এরূপ মনে করার কারণ নেই। অনেকে মনে করতেন জীবদুঃখে কাতর করুণাময় ঠাকুর পাপী-তাপীর পাপ গ্রহণ ক'রে এই গল-রোগে কষ্ট পাচ্ছেন। কিন্তু যখন রোগবৃদ্ধি পেল, তখন এঁদের অনেকেই এই বিষয় নিয়ে জল্পনা-কল্পনা করতে লাগলেন, ভাবভঙ্গীতেও আত্মরক্ষা ক'রে চলার ভাব দেখাতে লাগলেন। অনেকের মনে সন্দেহও জাগল, হয়তো বা অসাবধান হ'লে তরুণ সেবকদের শরীরে দুশ্চিকিৎস্য দারুণ ব্যাধি সংক্রামিত হ'তে পারে। ত্যাগী সেবকবৃন্দ কিন্তু ঠাকুরের প্রত্যক্ষদৃষ্ট কষ্টকে অস্বীকার করতে পারেননি, তাই তাঁরা

বিতর্কে যোগ না দিয়ে মন প্রাণ ঢেলে গুরু-সেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

স্বামীজী ছিলেন বিশ্বাসের মূর্তবিগ্রহ, যেন জ্বলন্ত পাবক। দেবমানব শ্রীরামকৃষ্ণের লীলায় তাঁর এমন বিশ্বাস ছিল, যাকে শুধু মানব বা দেবতার মাপকাঠিতে দেখা চলে না, বিচার করাও যায় না। তিনি সকলের ভ্রান্ত ধারণা ও সন্দেহের অবসান ঘটাতে দৃঢ়সংকল্প হলেন। একদিন ঠাকুরের পথ্যগ্রহণের পর পুযরক্তমিশ্রিত পথ্যের পাত্রটি হাতে নিয়ে অম্লানবদনে নির্বিকারচিত্তে তিনি পথ্যাবশিষ্ট পান করলেন। সকলের সকল সন্দেহ চিরতরে স্তব্ধ হ'ল। একদিকে ভ্রান্ত ধারণা ও সন্দেহের সম্পূর্ণ নিরসন, অন্য দিকে অত্যাশ্চর্য গুরুভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন—সকলে স্তম্ভিত, বিস্ময়বিমুগ্ধ।

কাশীপুর উদ্যানবাটীর আর একটি ঘটনাও স্বামীজীর অসীম গুরুভক্তির পরিচয় বহন করে। অসুস্থ ঠাকুরের সেবাদির জন্য গৃহী ভক্তগণ প্রয়োজনমত অর্থ দিতেন এবং তরুণ সেবকগণ তা খরচ করতেন। তাঁরা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সেবাকার্যে এত তন্ময় থাকতেন যে, অনেক সময় খরচপত্রের ঠিক ঠিক হিসাব রাখা সম্ভব হ'ত না। এর ফলে যাঁরা টাকা দিতেন, তাঁদের মনে সন্দেহ জাগে। ক্রমে এমন অবস্থা হয় যখন স্বামীজী অত্যন্ত মনঃকষ্ট পেয়ে ঠাকুরকে সমস্ত নিবেদন করতে বাধ্য হন; তখন কৃপাময় ঠাকুর তাঁকে বলেন, 'তুই আমাকে কাঁধে ক'রে যেখানে নিয়ে যাবি, সেখানে থাকব।'

'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি'তে ঘটনাটির বিবরণ :
'নরেন্দ্রে দেখিয়া ক্ষুণ্ণ কন প্রভুরায়।
চল আমি যাব তোরা যাইবি যেথায়॥
যেখানে থাকিবি তোরা সেইখানে রব।
যেমন রাখিবি মোরে তেমনি থাকিব॥
নরেন্দ্র বলেন, স্কন্ধে তোমায় লইয়া,
রাখিব খাওয়াব ভিক্ষা দুয়ারে মাগিয়া॥'

যিনি গুরুবাক্যের তাৎপর্য যথাযথ হৃদয়ঙ্গম ক'রে জীবনে রূপায়িত করতে পারেন এবং সেই ভাব অপরের মধ্যে সঞ্চারিত করতে সমর্থ হন তিনি উত্তম শিষ্য, শ্রেষ্ঠ গুরুভক্ত। 'আশ্চর্যো বক্তা কুশলোঽস্য লব্ধা, আশ্চর্যো জ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ॥' দক্ষিণেশ্বরে যেদিন শ্রীরামকৃষ্ণদেব ভাবাবেশে বলেছিলেন, জীবে দয়ার পরিবর্তে শিবজ্ঞানে জীবের সেবা, সেদিন স্বামীজী ঠাকুরের কথায় অদ্ভুত আলোক দেখতে পেয়েছিলেন, বুঝেছিলেন বনের বেদান্তকে ঘরে আনা যায়, সংসারের সকল কাজে একে অবলম্বন করা যায়। সেদিন তিনি ভেবেছিলেন, ভগবান যদি কখনও দিন দেন তবে এ সত্য সংসারে সর্বত্র প্রাণপণ প্রচার করবেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কৃপায় তিনি পণ্ডিত-মূর্খ ধনী-নির্ধন সবশ্রেণীর সর্বস্তরের মানুষকে শিবজ্ঞানে জীবসেবার মহাবাণী, কর্মপরিণত বেদান্তের মর্মকথা শুনিয়ে মুগ্ধ করেছেন। রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের আদর্শরূপে তাকে গ্রহণ করেছেন—শিবজ্ঞানে জীবসেবায় নিজের মুক্তি এবং জগতের কল্যাণ—'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ।'

স্বামীজী শুকদেবের মতো সমাধির আনন্দে ডুবে থাকতে ইচ্ছা ক'রে প্রাণের আকুতি শ্রীরামকৃষ্ণ-সমীপে নিবেদন করেছিলেন। ঠাকুর তাতে বলেছিলেন, 'তুই এত বড় আধার—তোর মুখে এই কথা। ভেবেছিলুম, কোথায় তুই একটা বিশাল বটবৃক্ষের মতো হবি—তোর ছায়ায় হাজার হাজার লোক আশ্রয় পাবে—তা না হয়ে কিনা তুই শুধু নিজের মুক্তি চাস।' স্বামীজী সেদিন ঠাকুরের কথার তাৎপর্য উপলব্ধি করেছিলেন, দরবিগলিত ধারায় তাঁর অশ্রু নির্গত হয়েছিল! বুঝেছিলেন ঠাকুরের হৃদয় কত মহৎ—'মহতো মহীয়ান্'

তিনি। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কৃপায় স্বামীজী নির্বিকল্প সমাধির আনন্দ লাভ করেছিলেন, সেখান থেকে ব্যুত্থিত হয়ে সর্বভূতে ব্রহ্মদর্শন ক'রে জগতের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন এবং বিরাট মহীরুহের মতো অগণিত ত্রিতাপদগ্ধ মানুষের শান্তির নিলয় হয়েছিলেন, তা সকলেরই জানা। যে স্বামীজী ব্যক্তিগত পূর্ণানন্দের প্রার্থী হয়েছিলেন, তিনিই পরবর্তী কালে আচার্যরূপে বলতেন—যদি নিজের মুক্তি কামনা কর তা হ'লে মুক্তি সুদূরপরাহত, কিন্তু যদি অপরের মুক্তি চাও তবে মুক্ত হবে অচিরেই করতলগত। কী মহাপ্রাণ তিনি! বজ্রবাণীতে ঠিক শ্রীগুরুর বাণীরই প্রতিধ্বনি।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন, 'খালি পেটে ধর্ম হয় না।' 'দারিদ্র্যদোষো গুণরাশিনাশী'। ধর্মজীবন যাপন করতে গেলে খাওয়াপরার সচ্ছলতাটুকুও চাই। তাই স্বামীজীও বলেছেন, 'দরিদ্রদেবো ভব'। স্বামীজী আরও বলেছেন, 'মূর্খদেবো ভব'। এ সব কথায় অপূর্ব তত্ত্ব নিহিত রয়েছে। যারা রিক্ত, অবহেলিত, অশিক্ষিত, অনুন্নত তাদের প্রতি স্বামীজীর অসীম সমবেদনা। যাঁরা সমাজের উচ্চস্তরে আছেন, যাঁরা শিক্ষায় সম্পদে উন্নত, তাঁদের লক্ষ্য থাকবে অনুন্নতদের সর্ববিষয়ে উন্নত করবার দিকে, নিজেদের সমান স্তরে তোলবার দিকে।

স্বামীজী লোকশিক্ষক হতে চাননি, কিন্তু ঠাকুর তাঁকে এমন লোকশিক্ষক করেছিলেন যে, সারা বিশ্ব তাঁর বাণীতে তড়িৎস্পর্শ অনুভব করেছিল। তিনি বিশ্ববাসীকে জানিয়েছিলেন আত্মার অমরত্ব, মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্ব, ঈশ্বরের আবির্ভাবতত্ত্ব, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সার্বভৌম মহাভাব ও ধর্মসমন্বয়। তিনি পাশ্চাত্যকে উৎকট ভোগবাদ থেকে বাঁচবার পথ নির্দেশ করেছেন—বেদান্তের মহিমা উপলব্ধি ক'রে আধ্যাত্মিকতার প্রতি দৃষ্টি দিতে বলেছেন। আবার ভারতকে বলেছেন শিল্প-বিজ্ঞানের অনুশীলন করতে, কিন্তু আধ্যাত্মিকতাকে বর্জন ক'রে নয়, আত্মোন্নতির প্রতি অতন্দ্র দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে। দেশের প্রতি ভালবাসা, দেশের উন্নতির জন্য বাস্তবানুগ পথ নির্ধারণ করা ও তার রূপায়ণে প্রচেষ্টা করা, সেই পথে শত বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হওয়া, সবাই যদি ত্যাগ করে তবু একাই নির্ভয়ে অকপট হৃদয়ে অগ্রসর হওয়া ইত্যাদি কত কথাই বলেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব যে চেয়েছেন মনুষ্যজীবনের পূর্ণাঙ্গ উন্নতি তা স্বামীজীর বাণী থেকে বেশ বোঝা যায়, কারণ স্বামীজীই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মহাজীবনের মহাভাষ্য-স্বরূপ।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সমগ্র জীবনটিই ধর্ম—তাঁর জীবনে পরম সত্যের বিভিন্নভাবে উপলব্ধি ও নব নব আলোকমালায় আধ্যাত্মিক ভাবের অপূর্ব বিচ্ছুরণ। আবার তাঁর সমস্ত আধ্যাত্মিক শক্তি স্বামীজীর মধ্যে সঞ্চারিত। শ্রীশ্রীঠাকুরের উক্তি: 'যথাসর্বস্ব তোকে দিয়ে ফকীর হলুম। তুই এই শক্তিতে জগতের অনেক কাজ করবি। কাজ শেষ হ'লে ফিরে যাবি।' সেই কাজ স্বামীজী কী প্রচণ্ড গতিবেগ নিয়ে করছেন, সারা দুনিয়াটাকে নাড়া দিয়েছেন, দেখেছেন মানুষের মধ্যে অনন্ত শক্তি ঘুমিয়ে রয়েছে, জানিয়ে দিয়েছেন তাকে সে শক্তি জাগাবার উপায়; ধর্ম শুধু কথায় নয়, তার রূপায়ণ হবে চিন্তায়, অনুভূতিতে, চালচলনে, প্রতিটি কর্মে, জীবনটাকেই ধরে রাখবে ধর্ম—শ্রীরামকৃষ্ণের মহাজীবনে স্বামীজী নিজেকে বিলুপ্ত ক'রে দিয়ে তাঁর উদার মহাভাব, প্রকৃত ধর্মভাব জগতের সামনে তুলে ধরেছেন অভিনবরূপে। এই হ'ল তাঁর গুরুভক্তি।

যিনি শ্রীগুরুর কাজে হৃদয়ের প্রতিটি শোণিতবিন্দু পাত করেছেন, তাঁর গুরুভক্তির পরিমাপ করবে কে ?

স্বামীজী শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা বলতে বলতে আত্মহারা হয়ে যেতেন। বলেছেন, শ্রীরামকৃষ্ণের মতো এত উন্নত চরিত্র কোন কালে কোন মহাপুরুষের হয়নি। ধন্য তাঁর গুরুভক্তি! কী জ্বলন্ত বিশ্বাস! বলেছেন—তারকা চর্বণ ক'রব, সবলে ত্রিভুবন উৎপাটন ক'রব, আমাদের কি জান না? আমরা রামকৃষ্ণের দাস।

'কুর্মস্তারকচর্বণং ত্রিভুবনমুৎপাটয়ামো বলাৎ।
কিং ভোঃ ন বিজানাস্যস্মান্—রামকৃষ্ণদাসা বয়ম্॥'

বলেছেন—যদি কিছু সারগর্ভ কল্যাণবাণী তাঁর মুখ দিয়ে নিঃসৃত হয়ে থাকে, তবে তা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এবং যদি তিনি অসার কিছু ব'লে থাকেন তা তাঁর নিজের। স্বামীজী অসার তো কিছু বলেননি, তাঁর প্রতিটি কথা, প্রতিটি কথা কেন, প্রতিটি নিঃশ্বাসই জগতের কল্যাণের জন্য। বলেছেন—শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শক্তি হয়েছে জগদ্ব্যাপী, অন্যান্য লোকেও তাঁর প্রভাব পরিব্যাপ্ত হবে, তাঁর কৃপা এ দুনিয়ার সকল নরনারী তো পাবেই, অন্য লোকেও গিয়ে পৌঁছুবে তাঁর কৃপার প্রভাব। ভারতবাসী যদি তাঁর চিন্তা করে তবে সর্ববিষয়ে মহত্ত্ব লাভ করবে নিঃসন্দেহে। স্বামীজী আরও বলেছেন—'যে তাঁর পূজা করবে সে অতি নীচ হলেও মুহূর্তমধ্যে অতি মহান হবে—মেয়ে বা পুরুষ।' 'Sri Ramakrishna, the Saviour of women, Saviour of the masses, Saviour of all high and low'—শ্রীরামকৃষ্ণ নারীজাতির উদ্ধারকর্তা, জনসাধারণের উদ্ধারকর্তা, উচ্চ-নীচ সকলের উদ্ধারকর্তা। 'ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, মেয়ে বা পুরুষ—তাঁর পূজোয় সকলের অধিকার। যে ঘটস্থাপন বা প্রতিমা ক'রে তাঁর পূজা করবে—মন্ত্র হোক বা না হোক—যেমন ক'রে যে-ভাষায় যার হাত দিয়ে হোক—খালি ভক্তি ক'রে যে পূজা করবে, সেই ধন্য হয়ে যাবে।' 'যে তাঁর সেবার জন্য—তাঁর সেবা নয়—তাঁর ছেলেদের—গরীব-গুরবো, পাপী-তাপী, কীট-পতঙ্গ পর্যন্ত, তাদের সেবার জন্য যে যে তৈরী হবে, তাদের ভেতর তিনি আসবেন—তাদের মুখে সরস্বতী বসবেন, তাদের বক্ষে মহামায়া মহাশক্তি বসবেন।'

শ্রীভগবানের নরলীলার সহচর অখণ্ডের ঋষি স্বামীজীর গুরুভক্তির স্মরণে মননে অনুধ্যানে মানুষের শরীর-মনের সর্বপ্রকার বন্ধন-বিমুক্তি আর পরমানন্দ!

# শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ও নবযুগ

শ্রীজয়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায

বিশ্ববিজয়ী স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন: যেদিন শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন সেদিন হইতেই পৃথিবীতে নবযুগ আসিয়াছে। ইহা ঋষিদৃষ্ট অমোঘ সত্য। আমরা সাধারণ মানুষ ইহার মর্মার্থগ্রহণে অসমর্থ। বাহিরের গোলমাল ও অশান্তিতে আমরা ব্যতিব্যস্ত, আবার অন্তরেও শান্তি কিভাবে রাখিতে হয় তাহা জানি না। সেই কারণেই শিবাবতার স্বামীজীর বাণী ধারণা করিতে পারি না।

কিন্তু সামান্য স্থির হইয়া চিন্তা করিলেই আমাদের মনে আর কোন সংশয় থাকে না যে, শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা ও স্বামীজী এই তিন রূপে একই মহাশক্তির প্রকাশ বাহ্যিকভাবে দক্ষিণেশ্বরে হইলেও ইহা সমগ্র পৃথিবীর জন্যই।

আধুনিক সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গেই পৃথিবীতে জড়বাদ ও তৎসহ জটিলতা প্রাধান্য পাইয়াছে। ভারতীয় সভ্যতার সুবর্ণযুগ আর নাই। পাশ্চাত্য সভ্যতার বিস্তারের সঙ্গে আমাদের চিরন্তন সত্য এক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখী হইয়াছিল। যে পাশ্চাত্য সভ্যতা পৃথিবীতে ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে, শ্রীরামকৃষ্ণের অবতরণের পূর্ব হইতেই সে সদম্ভে ঘোষণা করিতেছিল যে, মানবজাতির সব চাহিদা সে মিটাইয়া দিবে। শ্রীরামকৃষ্ণই ইহার উত্তরে বলিলেন, জগতের সমস্ত কিছুই অসম্পূর্ণ, তাহা কখনো মানুষকে পূর্ণতা দিতে পারে না, তাহার চাওয়াকে পূর্ণ করিতে পারে না, ঈশ্বরলাভের দ্বারাই মানুষ এই জড়শক্তির কবল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া শান্তিলাভ করিতে পারে। কিন্তু তাহা হইলে এই যে জড়বিকাশ ইহা কি মানুষের অপ্রোজনীয়? ইহার উত্তরে শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন—না; খালি পেটে ধর্ম হইতে পারে না। শক্তি ও শিবের সমন্বয় আবশ্যক, তাহা দ্বারাই জীবের যথার্থ মঙ্গল সাধিত হইবে। স্বামীজী আরো স্পষ্ট ভাষায় বলিলেন, পাশ্চাত্যের কার্যোদ্যম বিজ্ঞান ও শিল্পোন্নতির সঙ্গে আধ্যাত্মিকতার সমন্বয় চাই। জড়কে চৈতন্যের শক্তিতে জাগাইতে হইবে—চৈতন্যের বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গেই মানুষ তাঁহার অন্তরস্থিত পূর্ণত্বের অমৃতস্বাদ অনুভব করিতে পারিবে।

সাম্প্রতিক কালের বিশ্বের ঘটনাপ্রবাহ বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় চতুর্দিকেই জড়বাদ-ভিত্তিক এক ধ্বংসাত্মক ভাব জগৎকে ছাইয়া ফেলিযাছে। শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব সত্ত্বেও মানুষ কেন ধ্বংসাত্মক কর্মে ও ভাবে উদ্বুদ্ধ হইল? স্বামীজী তো বলিয়াছেন, ঠাকুরের এই ভাব দেড় হাজার বৎসর চলিবে। দেড় হাজার বৎসরের পটভূমিকায় এই কয়েক বছর অবশ্য কিছুই নয়। ভারত স্বাধীনতা পাইয়াছে স্বামীজীর কথামত ঠিক পঞ্চাশ বছর পরেই। ভারতের স্বাধীনতা পাওয়ার অর্থ সমগ্র পৃথিবীর মানুষের মনুষ্যত্ববিকাশের পথ উন্মুক্ত হওয়া। স্বাধীনতা আমরা পাইলেও তাহার যোগ্যতা আমরা অর্জন করিতে পারি নাই, উচ্ছৃঙ্খলতাকেই স্বাধীনতা বলিয়া এখনও ভাবিতেছি। তবে আমরা স্বাধীনতা পাইয়াছি। স্বাধীনতা আমাদিগকে আর কিছু দিক বা না দিক স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে দিয়াছে—আর দিয়াছে আপন মনোভাব অনুযায়ী কাজ

করিবার স্বাধীনতা, তাহা ভালর দিকেই হউক বা মন্দের দিকেই হউক। ভারত বিনিদ্র হইয়াছে এবং নিদ্রাভঙ্গের পরেই সে তাকাইয়া দেখিল চারিদিকে অন্ধকার। জাতির পৌরুষ যেন নিঃশেষিত হইল স্বাধীনতা-আন্দোলনে, গঠন করিবার কাজে সে শক্তি যেন নাই; এমনকি, অন্যায়কে বাধা দিবার শক্তিও নাই। সে জন্যই এক পুরুষ ধরিয়া একদল পরম আক্রোশে যেন সব কিছু ভাঙিয়া চুরিয়া ফেলিতে চাহিতেছে, আর আমরা নিতান্ত 'বেশ-আছি' থাকার দল ভাবিতেছি, আমাদের দিন শেষ হইয়াছে, এ জাতি আর বাঁচিবে না!

ক্রিয়ামাত্রেরই প্রতিক্রিয়া আছে। ধ্বংস-লীলায় আমরা যত মাতিয়া উঠিতেছি আমাদের অন্তরে সৃষ্টির বীজও তত তাড়াতাড়ি উপ্ত হইতেছে। 'গেল—গেল' ধ্বনির মধ্যে আমরা আর একটি ধ্বনি স্বাভাবিক ভাবেই তুলিতেছি, 'পথ কোথায়?' পথ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের, পথ শ্রীশ্রীমায়ের জীবন ও বাণীতে। ত্রিধা প্রকাশিত এই মহাজীবনে যে পথ প্রদর্শিত হইয়াছে, সেই পথই নব যুগের পথ—নূতন জীবনের পথ। সব জাতির, সব ধর্মের, সব দেশের মানুষই নিজস্বতা বজায় রাখিয়া চলার পথে নবালোক পাইবে এ জীবন হইতে।

ব্যস্ততার অহমিকায় যাহারা 'গেল—গেল' ধ্বনিতে সরব হইয়াছেন, তাঁদের নিকট এই কথাই বলিতে হইবে,—আপনারা সম্মুখে আলোকিত পথ দেখিয়াও উৎসাহের সহিত সে পথে চলিতে চাহেন নাই। মনে হয় ধ্বংসের হাত হইতে বাঁচিতে হইলে এ পথ ছাড়া দ্বিতীয় পথ নাই।

প্রথম কাজ নিজের জীবনকে আগে এ আদর্শে গঠন করা; সেই সঙ্গে এ যুগের বাণী আপামর সকলকে দিবার আন্তরিক প্রচেষ্টা। শ্রীশ্রীঠাকুর-স্বামীজীর নির্দেশমত মানুষকে ভগবানজ্ঞানে সেবা করিতে শেখা ও শেখানো। এই ভাবেই অশুভ চিন্তার বিরুদ্ধে সব শুভ-শক্তিকে সংহত করা সম্ভব।

আপামর-সাধারণের মধ্যে শিক্ষার বিস্তারের কথা কবে বলিয়া গিয়াছেন স্বামীজী। পূর্বের তুলনায় এখন বিদ্যালয়—প্রাথমিক মাধ্যমিক, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের অনেক বেশী সংখ্যায় হইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু সমস্ত শিক্ষায়তনেই শিবহীন জ্ঞানযজ্ঞ চলিতেছে। এইসব শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে নিঃসন্দেহে অতি শীঘ্র শিবকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানসমূহে পুস্তক শিক্ষক গৃহ ইত্যাদির সহিত ভারতের জীবনাদর্শকে, ত্যাগ ও সেবার আদর্শকে, সত্য ঈশ্বর-বিশ্বাস ও পবিত্রতার আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। ছাত্রগণের সম্মুখে যুগপুরুষ হিসাবে স্বামীজীকে রাখিতে হইবে—জনসেবা, সমাজসেবা, শিক্ষা, সাম্য, প্রভৃতি সব আদর্শেরই যুগোপযোগী শ্রেষ্ঠ রূপ যাঁর জীবন ও বাণীতে মূর্ত।

শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ও সমাজে এই সব কল্যাণ-ভাব প্রচারের দায়িত্ব আমাদিগকেই গ্রহণ করিতে হইবে। ইহাতে রাজনীতির প্রশ্ন নাই, জীবনগঠনের প্রশ্ন। 'গেল—গেল' ভাব লইয়া জড়বৎ বসিয়া না থাকিয়া জাতির সেবাকাজে নামিতে হইবে। কাহারো উপর দোষারোপ না করিয়া, কাহারো মুখ চাহিয়া বসিয়া না থাকিয়া ভাবিতে হইবে ইহা আমারই দায়।

অনেকে প্রশ্ন তুলিবেন, ইহা অতি ব্যাপক কর্ম এবং ইহার বাস্তব রূপায়ণে বহু ব্যক্তির প্রয়োজন। স্বামীজী বলিয়াছেন, জগতের ইতিহাস কয়েকটি সার্থক মানুষের ইতিহাস।

কয়েকজন মাত্র সর্বান্তঃকরণে কাজে নামিলেই ঐ ব্রত সুসম্পন্ন হইবে। যদি অন্য কোন সুযোগ না থাকে, নিজের গৃহেই এবং পাড়ায় বা গ্রামে আমরা স্বামীজীর বাণী পাঠ আলোচনা ইত্যাদি চালাইতে পারি। ক্ষেত্র সীমিত হইলেও আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া, জীবনে উহা ফুটাইয়া তোলা এবং সুযোগের অপেক্ষা করাও তো সাধনা। আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা থাকিলে অবশ্যই সুযোগ আসিবে। জগতের দ্বারে দ্বারে স্বামীজী একাই অগ্রসর হইযাছিলেন; তাঁহার সেই মর্মস্পর্শী বাণী, "শ্রীশ্রীঠাকুরের কাজে আমি আমার বুকের রক্ত তিল তিল দিচ্ছি—তোরা আমার একটুও সহায় হবি না?" এ বাণী কোন বিশেষ দেশ বা জাতি বা ধর্মের নয়, সর্বজনীন। এ বাণী কেবলমাত্র কোন ব্যক্তিকে বলা নয়, এ বাণী এক চৈতন্য সত্তার আবাহনে অপর চৈতন্য সত্তাব জাগরণের বাণী। সহস্রের মধ্যে একজনও এ বাণী শুনিলে চলিবে। ভগবান আমাদের সহায় বিন্দুমাত্র ভয় নাই। বিশ্বকল্যাণকামী স্বয়ং স্বামীজী আমাদের সহায় হইলে সত্যের জয় হইবেই। স্বামীজী সূক্ষ্ম শরীরে আমাদিগকে সাহায্য করিবার জন্য কত আশা লইয়া অপেক্ষা করিতেছেন।

যে মানুষ হইবার জন্য, অপরের সেবার জন্য ঈশ্বরবিশ্বাসী হইয়া আত্মত্যাগ ও সেবার ভাবে উদ্বুদ্ধ হইবে, স্বামীজী নিজেই বলিয়াছেন, তাহার বক্ষে মহাশক্তি জাগিবে, তাহার কণ্ঠে মা সরস্বতী বসিবেন। বর্তমান নেতিমূলক ভাবে সন্ত্রস্ত না হইয়া এ সত্যসাধন-যজ্ঞে নিজে ব্রতী হইতে হইবে এবং অপরকে ব্রতী করাইতে হইবে। যাঁহারা ব্রতী হইয়াছেন তাঁহারা নবযুগ নবভাব হৃদয়ে ধারণা করিতে পারিতেছেন। 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি' ভাব হইতেই আমাদের আশঙ্কার উদ্ভব। অন্তরের সঙ্গে যিনি নবযুগকে প্রত্যক্ষ করিতে চাহিবেন, তিনি অবশ্যই স্বামীজীপ্রদর্শিত পথে জনসেবাযজ্ঞে ব্রতী হইবেন। মুখে ব্যস্ততা দেখাইয়া অন্তরে 'বেশ-আছি' মনোভাব লইয়া বসিয়া থাকা স্বামীজীকে মানা নয়, আত্মপ্রবঞ্চনা মাত্র।

স্বামীজীর ভাবপ্রচারের কথা বলার উদ্দেশ্য অন্ধভাবে কোন ব্যক্তিত্বের পূজা নয় (যদি হইতও বা, অন্ধভাবে বিদেশের কোন ব্যক্তিত্বের পূজা অপেক্ষা তাহা সহস্রগুণ শ্রেয়); চোখ মেলিয়া চারিদিকে নিজে তাকান, স্বদেশের বিদেশের প্রাচীন ও আধুনিক সব জনকল্যাণকামী মহামানবগণের চিন্তা ও জীবন তন্ন তন্ন করিয়া বিশ্লেষণ করিয়া দেখুন; দেখিবেন, এ যুগে স্বামীজীর চিন্তাই এ বিষয়ে সর্বাধিক উজ্জ্বল, সর্বাধিক কল্যাণবর্ষী জনসেবার পথে।

শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী ও স্বামীজীর বাণীই নবযুগের বাণী।

# লীলা

শ্রীফণিভূষণ মৈত্র

সৃজনের কোন্ সেই প্রথম উষায়
এক যবে বহু হল আনন্দ-লীলায়,
সেই ক্ষণ হতে
যাত্রা যার হল শুরু
অবিচ্ছিন্ন অস্তিত্বের স্রোতে,
অবিরাম ভাসিতে ভাসিতে কোন্
অলক্ষ্যের পানে
নিরন্তর চলেছে সে
কী অলঙ্ঘ্য টানে !
জন্ম-মৃত্যু সত্তা তার করে না খণ্ডিত,
নাম-রূপে বন্দী তবু সে যে রূপাতীত।

কিন্তু এ কি !
অপার্থিব আনন্দ অপার,
অনাদি যে, যে অনন্ত,
অগোচর মন আর সীমিত ভাষার,
সে চেতন সত্তা অনির্বাণ
কেন ভাবে শিশুরূপে পাইয়াছি স্থান
ধরার মায়ের কোলে,
জন্মিয়াছি বিনশ্বর এ জীবন লয়ে ?
এ জীবনে কেন জাগে তার অভিমান,
কেন জাগে তীব্র আকর্ষণ ?
কেন থাকে ভুলিয়া সে
নামরূপাতীত তার সত্তা অনির্বাণ,
অনন্ত, মহান ?
চির-দুর্জ্ঞেয় ইহা। শুধু বলা যায়,
ইচ্ছা তাঁর, বহু হন আনন্দ-লীলায়।